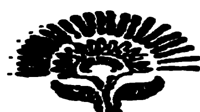
# ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি



# ছবির রাজনীতি
# রাজনৈতিক ছবি



দীপায়ন
২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা ৯



প্রস্তাবনা

অঙ্গুলিমেয়-র ভোগতন্ত্র উৎখাত করে
প্রকৃত জনমনজাগরণই
যদি হয় বিশ শতকের প্রধান রাজনৈতিক সংহিতা,
তবে ছবিও আজ
মুষ্টিমেয়-র উপভোগতন্ত্র খতম করে
বৃহত্তম জনগণ-অভিজ্ঞতায় গতি পায়—
এই তার শিল্পনীতির প্রাচীন অনুজ্ঞা ॥

গোষ্ঠীর হিতার্থে ও মঙ্গলকামনায়
একদা যে যৌথ ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের শুরু,
মনুষ্যজাতির সামাজিক মুক্তিসাধনায় আজও তার
মূল সূত্রগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটে
যৌথ কর্মসফলতায়.॥

গত দেড়-দুশো বছরে আধুনিক সমাজ-আন্দোলনের হাত ধরে
ছবি আজ নিতান্তই ছবি নয় আর,
ব্যক্তির একক উদ্যম ও পরিকল্পনা,
অর্জন ও প্রাণবস্তুর খণ্ডদৃশ্যই নয়,
সমষ্টিজীবনের সমূহ চাক্ষুষ উপাদান
ব্যবহার ও বিকাশেই আজ তার মুক্তি ॥

ছবিকার আজ সে-ই,
যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রকরণ ব্যবহার করে
পরিপার্শ্বের কায়েমী দৃশ্য-উপাদানের
সমান্তরাল এক দৃশ্যভাবনা যে গড়ে তুলছে,
এবং এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া
যখন যৌথ অভিজ্ঞতায় প্রসারিত হয়,
তখনই বহুস্তরসক্রিয়তার এক গতিশীল মাত্রা সেখানে যুক্ত হয়,
যাবতীয় সংস্কার-সীমানার বাইরে মুক্ত হাওয়াবাতাসে
ছবি তার প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে,
জেগে ওঠে সার্বিক তৎপরতায় ॥

সে-হিসেবে ছবি আর নেই সে-ছবি ॥

## এ বইয়ে যা আছে

এ বইয়ে
সমাজ ও সময়চেতনার স্পষ্ট অনুক্রমে
পৃথিবীব্যাপী সক্রিয় শিল্পসাধনের সেই সব ইতিবৃত্ত,
রাজনৈতিক অক্ষবদল ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের
প্রকৃতি ও পরিবর্তনসাপেক্ষে
কার্যকরী ভাষা-অন্বেষার
সেই সব পরিবর্তিত দিশা ও অভিব্যক্তি,
নান্দনিক অনুশীলনের সময়োচিত সংগঠনপ্রণালীর
রূপান্তরিত আচারবুদ্ধি ও সম্প্রসারিত ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতার
বহুরকম তথ্য ও সংবাদ থেকে
ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা ও কর্মসূচি, সমবেত ফতোয়া ও ইস্তাহারসহ
আধুনিক শিল্পধর্মের নানাবিধ গুরুতর বিতর্ক ও যুক্তিগল্পের
ক্রমসাযুজ্যে
সেই প্রাচীনা মর্মকথাই আছে—
যার ঐতিহাসিক সাক্ষ্যস্বরূপ
ছবিরও আধুনিক সংজ্ঞা
ব্যক্তির সাহসী নির্জন সামর্থ্য থেকে ক্রমেই
যৌথ উদ্ভাবনে প্রসারিত হয়েছে,
একক অভিনয় ক্রমশ
সমবেত অংশগ্রহণেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে ॥

এ বইতে
ইতিহাসের গতি ও ক্রমবিকাশের সূত্রে,
তার আবহ-উত্তেজনার মুখর ক্যালেণ্ডারে
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানভাবনার সংগ্রামী অংশী
সেই সমস্ত অনালোচিত শিল্পকর্মীর
সময়ানুপ্রাণিত আবিষ্কার ও আনন্দিত কর্মসংগঠন ঘিরে
বহুতর মানসিক অভিযান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বোপলব্ধির
বিস্তারিত কাঠামোয়
সহকর্মী লেখকের সারবান আলোচনা থেকে
বহুবিধ চিঠিপত্র, ডায়েরির পৃষ্ঠা ও আন্তরিক জীবনকথার
শিথিল বুনোটেও
এই সাধারণ নীতিসূত্র বুঝে নিতে
কোন অসুবিধা নেই যে
সময় ও সমাজ-রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও
বিকাশসূত্রের ধরতাই না-পেলে
ছবিছাবাও আজ বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রবেশের পথ পায় না কোন,
সামাজিক উপযোগ ছিন্ন হলে পড়ে থাকে শুধুই খড়ের কাঠামো,
সুফলা সৃষ্টি ও কার্যকরী উপযোগতত্ত্বের
এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-প্রযোজনায় অংশ না-নিলে
আধুনিক ছবিরও যাবতীয় অভিজ্ঞান
অধরা-ই থেকে যায় ॥

নির্বাচিত রসগ্রাহকের নিষ্ক্রিয় অবলোকনের
যাবতীয় সীমাশুদ্ধি ভেঙে
সর্বাধিক মানুষের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায়
কার্যকরী অংশগ্রহণের সজীব তাৎপর্যে
ছবি আজ মুখ্যত গণমানসিক,
ছাপাছবির প্রসারপ্রযুক্তির যোগ্যতর ব্যবহার থেকে
বিস্তৃত দেওয়ালছবিতে ব্যবহারিক ভাষাশৈলীর
মনোযোগী চর্চা ও প্রয়োগে,
জাগতিক সমূহ বস্তু-উপাদানের
রূপান্তরিত দৃশ্যানুষ্ঠান থেকে
যৌথ চেতনাক্রিয়ার
লুপ্ত সামাজিক ভূমির পুনরাবিষ্কারে
ছবি আজ উদ্দেশ্যত রাজনৈতিক ॥

বস্তুত এ দুই মলাটের ভিতর
আছে সে-ই রাজনৈতিক ছবিকথা—
সৃজনক্রিয়া ও সমাজপ্রক্রিয়ার
পারস্পরিক উপযোগ-সংঘাতে লব্ধ
নতুনতর দ্বন্দ্ববিকাশে যা
প্রকাশমুক্তির নিরন্তর আস্থা খুঁজে পায়,
বস্তুত এই সে ছবির রাজনীতি—
সামাজিক মূল্যবোধের পণ্যচরিত্র ধ্বংসেই
যার ক্ষুরধার সম্যক খোলে,
নিষ্ক্রিয় সমাবেশের কোন শুভাশুভ দৃষ্টিলাভ নয়,
এইসব নির্মাণকাণ্ড
প্রাগ্রসর গণমানুষের কর্মিষ্ঠ হাতেই
তার প্রার্থিত দৃশ্যরূপ পায় ॥

এ হিসেবেও ছবি আর সে-ই ছবি নেই ॥

এ-ছবি উৎপাদনের নীতিসূত্র আলাদা,
সম্পর্ক আলাদা, এমনকি ভোগবণ্টনের ব্যবস্থা থেকে
ভোক্তার চরিত্র পর্যন্ত আলাদা।
এ-ছবির বেচাকেনা চলে না—মূল্য যা-কিছু,
সর্বতোভাবেই তা প্রায়োগিক।

এ ছবি আজকের, এই মুহূর্তের,
যথার্থই সময়প্রাণ, তাই ব্যবহার আশু প্রয়োজনে।
চিরায়ত নয়, রীতিমতো দিনতারিখসম্বলিত।
শাস্ত্রীয় নয়, ফলে প্রতিদিনই তার
সংজ্ঞা ফিরে নতুন হয়।
এ-ছবি খুবই সময়োচিত,
সময়ের বুকে বাড়তি সংযোজনও।

প্রয়োজন থেকেই আবিষ্কার হলো—এইসব ছাপাছাপি,
দেওয়াল কিংবা গলিপথ,
( পুরো আকাশটাই-বা নয় কেন ? ) প্রকাশ্যে, দিনের আলোয়-
প্রতি জীবনের ছবি, প্রতিটি দিনের ছবি
অনুষ্ঠিত হলো ॥

এ-ছবির রঙ আলাদা, আলাদা চেহারা।
লোক আলাদা, আলাদা সঙ্গ।
সময়েরই ছবি, সময়ের পরিবর্ত-ছবি,
সর্বসক্রিয় সে আজকেই, গতিশীল কর্মঠ।

পরিবর্তনের পক্ষেই বরাবর ছিল,
উপস্থিত বিধিশাসনের বিরুদ্ধে—
বিরোধিতার মোট দায় ফলে সেখানেও বর্তায়,
ছবি নষ্ট হয়, বেআইনী, নিষিদ্ধ হয়—
সন্ত্রাসে বিবর্ণ নয় তবু, গভীর ও সংরক্ত।

এ-ছবির উদ্দেশ্য স্পষ্ট, সক্রিয়তা চূড়ান্ত।
অর্থনীতি অতি বাস্তব, কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে সীমাহীন।
এ-ছবির শেষ নেই, দ্বান্দ্বিক ও সপ্রাণ।
তার লক্ষ্য কিছু বিমূর্ত নয়, আকর-উৎস সামাজিক।
কার্যকরী যোগাযোগেই ইষ্ট ছবির, তা-ই এখনো অন্বিষ্ট ॥

রুদ্ধপ্রায় সামাজিক প্রগতি-সম্ভাবনার উৎসমুখে
অবিরল বৈজ্ঞানিক তৎপরতাই
যদি হয় আজকের প্রধান রাজনৈতিক দাবি,
তবে
ক্ষীণস্রোতা মানবিক যোগাযোগ-সংঘটনের উৎসমূলে
অবিরাম পরিকল্পিত দায়িত্বপালনেই
ছবির আজ পরমা প্রগতি ॥

## সংকলন প্রসঙ্গে অন্যান্য

ছবিপত্র নিয়ে চিন্তাচর্চার বাংলাভাষায় অনতিসক্রিয় একটা কাগজ আছে এবং কাগজ ঘিরে সংবৃত যৌথতার এক পরিবর্তমান দৃশ্যপট। বস্তুত 'পটে'র পৃষ্ঠাতেই এ কাজ শুরু, আপাতত শেষ হলো এইখানে।

এক হিসেবে, এ বইও যৌথকর্ম—অনুবাদকেরা স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করেছেন, মুদ্রণ-কর্মীরা চোখ জ্বেলে হরফ সেজেছেন. প্রকাশকের কথা বলাই বাহুল্য—আপাতত শেষ হলো সে-কারণেই।

পাঠক জানেন যে-কোন সংকলনই কার্যত অসম্পূর্ণ। এ বইয়ের বিষয়-উপাদান প্রায় দুষ্প্রাপ্য, সহযোগিতা সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর, সংস্থান খুবই সামান্য, সংকলকের উদ্যমও ফলে বাধ্যত স্তিমিত। এই পর্যন্ত হলো, বাদবাকি নিশ্চয়ই পরে হবে।

অর্থাৎ কোন সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। বরং ভবিষ্যতে এ কাজের অনুসন্ধানযোগ্য ক্ষেত্রগুলির সামান্য পরিচয় দেওয়া হলো মাত্র।

এ-বইয়ের যাবতীয় উপাদান যতদূর সম্ভব প্রাথমিক উৎসের, ফলে একটা বড় অংশই তার অনুবাদ। এ কাজের আনুষঙ্গিক বাধাবিপত্তি সম্পর্কে সকলেই কমবেশি অবহিত আছেন, নিজেদের পরিশ্রমের দাবিটুকুই আপাতত করা যায় এখন।

সংকলিত লেখাপত্রের আপন চরিত্রভেদে উদ্দিষ্ট পাঠক এখানে স্বভাবত ভিন্ন, অভিন্ন গ্রন্থনার সূত্রগুলি পাঠক খুঁজে নেবেন শুধু। অন্যথায় প্রতিটি রচনার উৎসই যথাস্থানে নির্দেশিত, টীকাভাষ্য দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনমতো।

বানানের বিধানে একটা সমতা রাখার চেষ্টা হয়েছে আপ্রাণ, যদিও ত্রুটি সর্বদা এড়ানো যায়নি। কিন্তু বিপর্যয় ঘটে গেছে অন্যত্র। বিদেশী নামের উচ্চারণে আমাদের জড়তা স্বাভাবিক, ফলে প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে সাংঘাতিক। যেমন :

শুরুতেই Baudelaire সম্ভবত বোদল্যার হবে। ফিলিপঁর কাগজের নাম শারিভারি ( Charivari ) ; 'রুয়ঁসনোন্যা' ছাপা হয়েছে 'এঁসনোন্যা' ; লিবর্তে নয়, লিবের্তে। এসবই ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে। ২৩ পৃষ্ঠা থেকে অনেক জায়গায় জার্মান নামের আগে 'ডাই' ছাপা হয়েছে, প্রকৃত উচ্চারণ 'ডি', মানে ইংরাজির 'দি'। জিমারমান হবে সিমারমান ( পৃ. ২৬,৩৬ ) ভোগলর হবে ফোগলর ( পৃ. ৪৭ ), জ্যাগেন্ড বা য্যাগেন্ড হবে 'য়্যুগেন্ড' ( পৃ. ৭৮, ৯৭ )। Grosz-এর উচ্চারণ লেখা হয়েছে দুরকম—গ্রোসৎস / গ্রোস্, মাঝামাঝি কিছু একটাই ঠিক। এছাড়া

ভাইল্যান্ড হবে ভাইলান্ট ; সিমপ্লিসিজিমাস নয়, সিমপ্লিসিজিমুস ( পৃ. ৯৯, ১১২ )। মোটামুটি ভুলের ধরন এর চেয়ে মারাত্মক নয়। এছাড়া রুশ, স্প্যানিশ ও চীনা নামেও এজাতের ভুল থাকা অসম্ভব নয়, পাঠক ক্ষমা করবেন।

আরেক সমস্যা পরিভাষার। ছবিপত্র নিয়ে বাংলাভাষায় লেখালেখির ধারাই তেমন প্রবাহিণী নয়, অন্যদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ অতিব্যবহারে জীর্ণ। এই উভয় সংকটে পড়ে আমাদের সমাধান যে সর্বদা সঠিক হয়েছে তা নয়, কিন্তু সম্ভবত অর্থবিপর্যয় ঘটেনি কোথাও।

অতঃপর ছাপার ভুল। ছাড়, ছুট, চোখ-এড়ানো, যন্ত্রপালানো। সে প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না। গুরুতর ভুল কিছু শুধরে নিন।

পৃ. ১৭-এর মাথায় ছাপা হয়েছে : সংযোজনা : ২৩৮৯। একেবারেই অবিশ্বাস্য, শেষ তিনটি সংখ্যাই বাদ যাবে।

পৃ. ৭৫-এ One-way Street & Other writings-এর প্রকাশকাল ছাপা হয়েছে ১৯৭৪-৭৬। এ সময় ইংরিজী সংস্করণের, মূল জার্মান রচনা ১৯২৬-২৭-র।

পৃ. ২৭২-এ চিত্তপ্রসাদের ৩০ নভেম্বর '৫৮-এর চিঠির শুরুতেই এক লাইন ছাড় গেছে— 'খেলাঘরের খেল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি'। যোগ করে নিলে অর্থ পরিষ্কার হবে।

শার্ল বোদল্যার, গেয়র্গ বুসমান, ডেভিড কুনজলে ও এড্রিয়েন হেনরির লেখা অনুবাদ করেছেন নিরঞ্জন গোস্বামী।

কুর্বের চিঠি, কোলভিৎসের ডায়েরি, মায়াকোভস্কির আপন খবর ও কথাভাষ্যের হাতিয়ার এবং পল হোগার্থ, ডেভিড শাপিরো, সিকেরাস ও মেৎসগার, মাও-ৎসে-তুঙ এবং ধূর্জটিপ্রসাদ : অনুবাদ করেছেন সন্দীপন ভট্টাচার্য।

গেয়র্গ গ্রোস, পিটার সেলজ ও রবার্ট উইলিয়মসের অনুবাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দোমিয়ে-র চিঠি ও লু স্যুনের অনুবাদক সঞ্জীব মন্ডল।

জননী কোলভিৎস অনুবাদ করেছেন অরিন্দম চক্রবর্তী।

মায়াকোভস্কির প্রথম দুটি লেখা শেখর কর্মকারের অনুবাদ।

কুক্রিনিক্সির অনুবাদক দেবজ্যোতি চক্রবর্তী।

শেষপর্যন্ত নির্ঘণ্ট, নির্দেশিকা, গ্রন্থতালিকা, পরিভাষা পরিচয় ও রাজনৈতিক কালপঞ্জী প্রত্যাহৃত হলো।

ছবি ছাপা হচ্ছে সাধ্যমতো।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে
এ বই নিবেদন করা হলো

লেনিনমূর্তির পাদদেশে
এবং
চিত্তপ্রসাদের স্মৃতির উদ্দেশে




## কৃতজ্ঞতা

সমস্ত লেখক-শিল্পী ও তাদের প্রকাশকগণ। সকল অনুবাদক। ছাপাখানার সমস্ত কর্মীকারিগর। ফিল্ম ও ব্লক তৈরির সকল শিল্পীকারিগর। সুবীর সাহা। শোভন সোম। খালেদ চৌধুরী। সোমনাথ হোর। অরণি। পরিচয়। অনুষ্টুপ। কালধ্বনি। কবিতাদর্পণ। এখন এইরকম। সঞ্জীব মণ্ডল। অলোক সোম। গোপাল মুখার্জি। সমীর রায়। ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়। সৌমিত্র চৌধুরী। মিলন চট্টোপাধ্যায়। বিধান বিশ্বাস। বিভিন্ন গ্রন্থাগার। 'পটে'র প্রথমাবধি সকল বন্ধুজন ও শুভানুধ্যায়ী এবং সলিল সাহা।

# লেখাপত্র



















# ছবিপত্র

□

মায়াকোভস্কি : রোস্টা উইনডোর জন্য ৩৩৬ সংখ্যক পোস্টার □
১২৯ পৃষ্ঠার আগে
মায়াকোভস্কি : মিস্ট্রি বাফে নাটকের সেভেন পেয়ারস অফ আনক্লিন ওয়নস-এর
জন্য পোষাক পরিকল্পনা □ ১৩৬ পৃষ্ঠার পরে
চীনা রেজিসট্যান্স পোস্টার □ ১৩৭ পৃষ্ঠার আগে
দাভিদ আলফেরো সিক্যেরাস : ইকো অফ্ এ স্ক্রীম □ ১৬৮ পৃষ্ঠার পরে
ইয়াং না-ওয়েই : রিপ্রিট, উড্‌কাট □ ১৯২ পৃষ্ঠার পরে
মাই কান : স্টারভেশন, উড্‌কাট □ ১৯২ পৃষ্ঠার পরে
লিয়াং ইয়ুং-তাই : অফ-ডিউটি, উড্‌কাট □ ২০০ পৃষ্ঠার পরে
ইয়েন হান : এমিগ্রেশন, উড্‌কাট □ ২০৮ পৃষ্ঠার পরে
আর্ট ওয়র্কার্স কোয়ালিশন : এ্যান্ড বেবিস ? এ্যান্ড বেবিস □
২২৪ পৃষ্ঠার পরে
বড় হরফের দেওয়ালনামা, ফটোগ্রাফ □ ২৪০ পৃষ্ঠার পরে
চিত্তপ্রসাদ : লিনোকাট □ ২৫৬ পৃষ্ঠার পরে
চিত্তপ্রসাদ : লিনোকাট □ ২৫৭ পৃষ্ঠার আগে
রামকিঙ্কর : ক্ষুধা, এচিং □ ২৭২ পৃষ্ঠার পরে
চিত্তপ্রসাদ : ভুখা বাংলা সিরিজ থেকে, ড্রয়িং □ ২৭৩ পৃষ্ঠার আগে
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় : ড্রয়িং □ ২৮০ পৃষ্ঠার পরে
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় : ড্রয়িং □ ২৮৮ পৃষ্ঠার পরে
সোমনাথ হোর : উড্‌কাট □ ২৯৬ পৃষ্ঠার পরে
জয়নুল আবেদিন : বাংলার মন্বন্তর, ড্রয়িং □ ৩০২ পৃষ্ঠার পরে
জয়নুল আবেদিন : বাংলার মন্বন্তর, ড্রয়িং □ ৩০৩ পৃষ্ঠার আগে
অলোক সোম : উড্‌কাট □ ৩১২ পৃষ্ঠার পরে

প্রচ্ছদের ছবি : মিস্ট্রি বাফে নাটকের জন্য মায়াকোভস্কির পোষাক পরিকল্পনা : সেভেন পেয়ারস অফ আনক্লিন ওয়নস, ১৯১৯।

খালেদ



## BAD TIMES

The tree tells why it bore no fruit.
The poet tells why his lines went wrong.
The general tells why the war was lost.

Pictures, painted on brittle canvas.
Records of exploration, handed down to the forgetful.
Great behaviour, observed by no one.

Should the cracked vase be used as a pisspot ?
Should the ridiculous tragedy be turned into a farce ?
Should the disfigured sweetheart be put in the kitchen ?

All praise to those who leave crumbling houses.
All praise to those who bar their door against a demoralised friend.
All praise to those who forget about the unworkable plan.

The house is built of the stones that were available.
The rebellion was raised using the rebels that were available.
The picture was painted using the colours that were available.
Meals were made of whatever food could be had.

Gifts were given to the needy.
Words were spoken to those who were present.
Work was done with the existing resources, wisdom and courage.

Carelessness should not be forgiven.
More would have been possible.
Regret is expressed.
( What good could it do ? )

—BERTOLT BRECHT



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

## শার্ল বদল্যের

# অনারে দোমিয়ের সৃষ্টি

এবার শুধু ব্যঙ্গচিত্রেই নয়, সমগ্র আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজনের কথা আমি বলতে চলেছি। এমন একজনের কথা এখন বলব যিনি প্রতি-দিন আমাদের শহরের লোকজনকে কৌতুকে মুগ্ধ করেন, নাগরিক আনন্দের প্রাত্যাহিক চাহিদা যিনি মেটান ও কৌতূহল বরাবর জীইয়ে রাখেন। বুর্জোয়া ভদ্রলোক কিংবা ব্যবসায়ী, চ্যাংড়া ছোঁড়া থেকে গৃহবধূ সকলেই হাসতে-হাসতে নিজের পথে চলে যায়— কিন্তু হায় অকৃতজ্ঞতা!—তাঁর নামের দিকে কেউ দে ওও দেখে না। এযাবৎ কেবল তাঁর সহশিল্পী বন্ধুরাই তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় গুণাগুণ বুঝতে পেরেছেন এবং তাঁর কাজ যে সত্যিই নিবিষ্ট মননের দাবি রাখে এসম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনুমান করা গেছে যে আমি দোমিয়ে-র কথাই বলছি। ওনোরে দোমিয়ে-র যাত্রাপথের সূচনায় তেমন বিস্ময়কর কিছু নেই। তিনি ছবি আঁকতেন কারণ এক আভ্যন্তরীণ তাগিদ তাঁকে আঁকতে বাধ্য করত—এবং এই তাঁর অনিবার্য বৃত্তি। প্রথমে তিনি উইলিয়াম ডুকেৎ সম্পাদিত একটি ছোট কাগজে কিছু স্কেচ দেন;[১] তারপর আকিল রিকুর নামে একজন ছাপাছবির

ব্যবসায়ী তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু ছবি কেনেন।[২]

১৮৩০-এর বিপ্লব অন্য যে-কোন বিপ্লবের মতোই ব্যঙ্গচিত্রের ব্যবহারে এক প্রবল জোয়ার এনেছিল। ব্যঙ্গচিত্রীদের কাছে সেই দিনগুলি যেন স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত দিন। সরকার ও বিশেষত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের সেদিনে মানুষ ছিল স্বভাবত আবেগ ও ক্রোধে উদ্দীপ্ত। 'লা কারিকাতুর' নামক ঐতিহাসিক ভাঁড়ামোর সেই বিশাল গ্যালারি, নথিভুক্তির সেই চমৎকার কমিক সিরিজ, যেখানে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীই অংশ নিয়েছেন—আজ তার দিকে প্রকৃত কৌতূহলের সঙ্গে তাকানো যেতে পারে। দারুণ হুল্লোড়, এ এক জটপাকানো সময়-উল্লাস, কখনো অকিঞ্চিৎকর, প্রায় হাস্যকর, কখনো রক্তাক্ত এক শয়তানি কমেডি, যার পাতায় পাতায় রাজনৈতিক এলিটগণ ভাঁড়ের বিকট পোষাকে মিছিল করে চলেছেন। রাজতন্ত্রের উষারম্ভের সেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই কি নেই যাঁরা এখনি বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছেন? অলিম্পিয়ান মহত্ত্বের 'নাশপাতি'-র আদালতজড়িত স্মৃতিই এই সমগ্র ফ্যানটাসটিক এপিকের প্রধান ও শীর্ষপুরুষ হয়ে বেঁচে আছেন। আশা করি সকলের মনে আছে সেই সময়ের কথা যখন ফিলিপ (হিজ ম্যাজেস্টির ন্যায়নীতির সঙ্গে যার বিরোধ ছিল চিরন্তন) বিচারসভার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে কাঁটাওলা ঐ নাশপাতির মতো নির্দোষ কোন কিছু নেই, এবং কীভাবে তিনি সভার সামনেই ছবির একটি সিরিজ আঁকেন যার প্রথমটি অবিকল রাজার মুখচ্ছবি এবং ক্রমশ তা থেকে পরিবর্তিত হতে হতে অবশেষে সেই মারাত্মক পরিণতিতে এসে ঠেকে—হায় 'নাশপাতি!' "তবেই দেখুন আপনারা," তিনি বলে ওঠেন, "এই শেষ স্কেচটির সঙ্গে প্রথমটির আদৌ কোন মিল রয়েছে কি?" খ্রীষ্ট ও এ্যাপোলোর মস্তক নিয়েও এইধরনের পরীক্ষা চালানো হয়, এবং মনে হচ্ছে এদের একজনের সাথে এইভাবে এমনকি ব্যাঙেরও মিল দেখানো সম্ভব হয়েছিল। এসব দিয়ে কিন্তু প্রমাণ কিছুই হয়নি। এক কার্যকরী তুলনার সাহায্যে আবিষ্কার করা হলো প্রতীকটিকে: তারপর থেকে প্রতীকটিই ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট। এই ধরনের প্ল্যাস্টিক শ্ল্যাং-এর সাহায্যে যা ইচ্ছে বলা যেতে পারে বা বোঝানো যেতে পারে। ফলে ঐ অত্যাচারী ও যাচ্ছেতাই নাশপাতি সমস্ত দেশপ্রেমিক রক্তপিপাসুর লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াল। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তারা বিস্ময়কর কাঠিন্য ও আত্মশক্তি নিয়ে কাজে নেমেছিল এবং প্রশাসন যতই দৃঢ় প্রত্যাঘাত হানুক না কেন, আজ যখন আমরা এই কমিক নথিপত্রের পাতা ওলটাই, খুবই অবাক হতে হয় যে এমন ভীষণ এক যুদ্ধ কীভাবে বছরের পর বছর ধরে লক্ষ্যে স্থির ছিল।

১. সম্ভবত 'লা সিলুয়েৎ' (১৮২৯-৩১), প্যারিসে প্রকাশিত ব্যঙ্গবিদ্রূপের কাগজ—একথা টীকা থেকে পাওয়া—কিন্তু হাওয়ার্ড পি. ভিনসেণ্টের মতে লা সিলুয়েৎ ছিল শার্ল ফিলিপ'র পত্রিকা। কিন্তু দোমিয়ে-র কর্মজীবনের সূচনায় উইলিয়াম দুকেৎ-এর নাম উচিৎভাবেই এসেছে।

২. রিকুর-এর দোকান ছিল ল্যুভরু-এর কাছে। ১৮৩২ সালে তিনি 'লাঁতিস্ত'-এর সূচনা করেন।

কিছুক্ষণ আগেই মনে হয় আমি 'রক্তাক্ত ভাঁড়ামো'র কথা বলেছি। এ ড্রয়িংগুলি সত্যিই রক্ত ও আবেগে পরিপূর্ণ। গণহত্যা, বন্দীত্ব, গ্রেফতার, বিচার, তল্লাশি ও পুলিশি পীড়ন—১৮৩০-এ সরকারি শাসনের প্রথম কয়েক বছরের এইসব ঘটনা ঘুরে ঘুরে এসেছে। নিজেই দেখুন :

স্বাধীনতা, এক সুন্দরী তরুণী, তার ফ্রিজিয়ান টুপি মাথায় বিপজ্জনক নিদ্রায় মগ্ন। আসন্ন বিপদের লেশমাত্রও তার মুখে নেই। একটি 'লোক' ঘোর দুরভিসন্ধি নিয়ে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। বাজারের কুলি বা হৃষ্টপুষ্ট জমিদারের মতো তার চওড়া কাঁধ। তার নাশপাতি হেন মাথার উপরে একগোছা চুল চোখে পড়ে, দুদিকে মোটা জুলফি। দৈত্যের মতো লোকটিকে পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে এবং ফলে তার পরিচয় অনুমান করার মজায় নিঃসন্দেহে ছবিটির মূল্য বেড়েছে। সে তরুণীটির প্রতি বলপ্রয়োগ করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে। 'Have you pray'd tonight Madam ?'—ওথেলো-ফিলিপ চলেছে অসহায় কান্না ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও নির্দোষ স্বাধীনতার গলা টিপে ধরতে।

কিংবা আর একটি, খুব সন্দেহজনক কোন বাড়ির সামনের পথ দিয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে ; জনতারই একজন, কোন সাধারণ শ্যামলা মেয়ে, স্বাভাবিক চাতুরীর সঙ্গে সে ফ্রিজিয়ান টুপিটি মাথায় পরেছে। মঁসিয় এক্স ও মঁসিয় ওয়াই ( পরিচিত মুখ—অবশ্যই মাননীয় দুজন মন্ত্রী মহোদয় ) এবারে নতুন খেলায় মেতেছেন তাঁরা বেচারী মেয়েটিকে ছেঁকে ধরেছেন এবং তার কানে ফিসফিস করে অশ্লীল চাটুকারিতা ও কৌতুক করতে করতে তাকে ক্রমে সংকীর্ণ গলিপথের দিকে ঠেলছেন। দরোজার পিছনের 'লোক'টিকে একটুখানি দেখা যায়, তবু চিনতে কোন অসুবিধা নেই। ওই এক গোছা চুল এবং মোটা জুলফির দিকে তাকালেই যথেষ্ট। সে অধীর, প্রতীক্ষারত, আঃ এত দেরি কেন ?

অথবা এখানে দেখুন, স্বাধীনতাকে প্রোভোস্ত-এর বিচারসভায় বা অন্য কোন গথিক বিচারসভায় দোষী হিসাবে ধরে আনা হয়েছে। মধ্যযুগীয় পোষাকে সমকালীন ব্যক্তিদের বিরাট গ্যালারি এখানে।

কিংবা এই যে এখানে স্বাধীনতাকে টর্চার চেম্বারে নিয়ে আসা হলো। তার কোমল পায়ের জোড় দেওয়া হবে ভেঙে, জল খাইয়ে তার পাকস্থলী অসুস্থ করে তুলবে এরা এবং তারপর প্রয়োগ করে দেখা হবে আর যা যা পীড়নের কৌশল এদের জানা আছে। নগ্ন হাত, পেশীবহুল, অত্যাচারী খেলোয়াড়দের সহজেই চেনা যায়। মঁসিয় এক্স, মঁসিয় ওয়াই ও মঁসিয় জেড—জনগণের মধ্যে যাঁরা কুখ্যাত।[৩]

৩. এই ছবিগুলির কোনটিকেই ঠিক শনাক্ত করা যায়নি। শঁফ্লেরী বলতে চান যে এগুলি গ্রাঁভিল ও ফ্লাভিরেস-কৃত, কিন্তু ২৭।৬।১৮৩১-এর 'লা কারিকাতুর' পত্রিকায় একটি ছবি আছে দ্যকঁ-র, যাতে লিবের্তে ( স্বাধীনতা ) প্রোভোস্ত-এর আদালতে বিচারের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

এই ছবিগুলির প্রতিটিতেই ( যার অধিকাংশই লক্ষণীয় নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যের যাথার্থ্য নিয়ে আঁকা ) রাজাকে দেখানো হয়েছে এক নররাক্ষস, হত্যাকারী, চির-অতৃপ্ত এক গরগাঁতুয়া হিসেবে[৪] বা কখনো আরো খারাপভাবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের[৫] পর থেকে আমি আর একটি মাত্র ছবি দেখেছি যার ক্রূরতা আমাকে আগেকার ঐ চরম রাজনৈতিক আবেগের দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়েছে। কারণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে যে-সব রাজনৈতিক ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, যে সময়ের কথা এতক্ষণ বলছিলাম তার সঙ্গে তুলনায় সেগুলি দুর্বল প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছুই নয়। এই ব্যতিক্রমটি ঘটে রুয়ঁর দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের কিছু পরে।[৬] ছবির সম্মুখভাগে, একটি স্ট্রেচারের উপর, অজস্র বুলেটবিদ্ধ শবদেহ পড়ে আছে: তার পিছনে ইউনিফর্ম পরিহিত, নিখুঁত সাজপোষাকে ইস্ত্রিকরা উইগ ও অহংকারী গোঁফ নিয়ে সব বড় বড় নগরকর্তারা সমবেত। এদের মধ্যে অবশ্যই কিছু বুর্জোয়া ড্যাণ্ডি রয়েছে যারা কোটের বোতামঘরে ভায়োলেটগুচ্ছ গুঁজে ঘোড়ায় চড়ে প্রহরা অথবা জনতার দাঙ্গা শায়েস্তা করার কাজে যায়—সংক্ষেপে আমাদের বিখ্যাত বক্তার ভাষায় 'garde bourgeoisie'-র যারা আদর্শস্বরূপ।[৭] স্ট্রেচারের সামনে বিচারকের পোষাকে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন ফ্রা. কা.,[৮] তার মুখ হাঁ হয়ে আছে যার মধ্যে দুই সারি হাঙরের দাঁত, দুহাত চালিয়ে সে আয়েসের সঙ্গে শব আঁচড়াচ্ছে, বলছে—"আহ! এই নর্মান! এ শুধু মৃতের অভিনয় করছে যাতে ন্যায়ের কাছে কৈফিয়ত না দিতে হয়।"

ঠিক একই রকম আগ্নেয় ক্রোধে 'লা কারিকাতুর' সরকারি নিগ্রহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং সেই দীর্ঘ লড়াই-এ দোমিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিংবা 'শারিভরি'র ক্ষেত্রে সরকারবিরোধী ছবি ছাপার জন্য যে-অসংখ্য শাস্তিমূলক ফাইন চাপানো হতো, তার ব্যয়সংকুলান করার বিকল্প উপায় বের করা হয়েছিল অন্যান্য ছবির অতিরিক্ত বিক্রিবাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে। রু এঁসনোন্যাঁ-র শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পরে আঁকা ছবিটিতে দোমিয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রিণ্টটি বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করে ফেলার জন্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এ ছবি নিছক ব্যঙ্গচিত্র নয়—এ হলো ইতিহাস, সংঘটিত বাস্তব, তুচ্ছ অথচ ভয়ংকর! দরিদ্র, সাধারণ ঘরে, প্রোলেতারিয়ানের ঘর চিরকাল যেমন হয়, বাহুল্যবিহীন কিছু আসবাব রয়েছে, তার মধ্যে এক শ্রমিকের শবদেহ। পরনে সুতির শার্ট ও টুপি ছাড়া আর কিছু নেই। চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে সে পড়ে আছে, মৃত। নিশ্চয়ই হুলুস্থুল হয়ে গেছে, ঘরে তার চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে, চেয়ার উল্টে পড়েছে, ছোট টেবিল ও কলসি স্থানচ্যুত,

৪. দোমিয়ে এ ছবির জন্য ( ডিসেম্বর ১৮৩১ ) ছ'মাস কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

৫. ১৮৪৮-এর বিপ্লব।

৬. ১৮৪৮, এপ্রিলে ডিপার্টমেণ্টাল নির্বাচনের সময়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

৭. বিখ্যাত বক্তা সম্ভবত লাফায়েত।

৮. ফ্রাঙ্ক কারে, একজন ঘৃণিত আঞ্চলিক রাজনীতিক।

ভাঙাচোরা। লাশের নিচে, পিঠ ও মেঝের তক্তার মাঝখানে একটি শিশুর মৃতদেহ—চাপা পড়ে মরেছে বাপের জোয়ান শরীরের নিচে। এই হিমঘরের সকলই শুধু নৈঃশব্দ এবং মৃত্যু।

এরই সমসময়ে দোমিয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিদ্রূপাত্মক ছবি এঁকেছিলেন। দুটি সিরিজ ছিল—একটি প্রমাণ সাইজ ও অন্যটি বুক-পর্যন্ত পোর্ট্রেটের। অন্য আরেকটি সিরিজ মনে হয় পরে আঁকা হয়েছিল এবং এতে শুধু উচ্চসভার সদস্যদের ছবি আছে। বিষয়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে হাস্যকরভাবে অতিরঞ্জিত করেও বাস্তবতায় তাঁর শিকড় এমন দৃঢ়মূল যে এই কাজগুলি সকল পোর্ট্রেট-শিল্পীর আদর্শ হতে পারে। আত্মার সামান্যতম নীচতা, তুচ্ছ অ্যাবসার্ডিটি, বুদ্ধির সামান্যতম চাতুরী, হৃদয়ের প্রতিটি পাপ এই পাশবায়িত মুখগুলিতে সহজেই পড়া যায়। অথচ সবকিছুই জোরালো ও স্পষ্টভাবে আঁকা, দোমিয়ে এখানে শিল্পীর স্বাধীনতার সঙ্গে যাথার্থ্যের গুণাগুণ মিলিয়েছেন। অথচ তাঁর এই সময়ের কাজ তিনি এখন বর্তমানে যা করছেন তার থেকে অনেক আলাদা। পরে তিনি এক সহজিয়া দর্শন ও বিস্তার, পেন্সিলের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আয়ত্ত করেছিলেন যা এই সময়ের কাজে নেই। এখানে তার চলন কখনো একটু গুরু, ওজনদার, কিন্তু সবসময়েই সুসম্পন্ন, কুশলী ও কঠিনভাবে যথাযথ।

আর একটি খুব ভালো ছবির কথা আমার মনে পড়েছে যা এই একই শ্রেণীর অন্তর্গত—"লা লিবর্তে দ্য লা প্রেস" (ছাপাখানার স্বাধীনতা)। একজন ছাপাখানার কর্মী এবং তার মুক্তির অস্ত্র অর্থাৎ ছাপার যন্ত্র। ছাপাখানার মাঝখানে, কাগজের টুপি কান পর্যন্ত টেনে, জামার হাতা গুটিয়ে, তার শক্তিশালী দু'পায়ে ভর রেখে দুহাতের মুঠি পাকিয়ে সে কটমট করে তাকিয়ে আছে। গ্রেট মাস্টারদের ছবির যে-কোন শরীরী ভাস্কর্যের মতোই লোকটির শক্তপোক্ত পেশীবহুল চেহারা। পশ্চাৎপটে অবশ্যম্ভাবীভাবে ফিলিপ তার পুলিশবাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে, কি.. তারা এগোতে সাহস করছে না।

যাই হোক, আমাদের মহান শিল্পী বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। আমি চাই তাঁর বিবিধ কাজ থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবির বর্ণনা করতে। তারপর আমি এই অসামান্য মানুষটির দার্শনিক ও শৈল্পিক গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করব। এবং শেষ করার আগে আমি তাঁর কাজের বিভিন্ন ধরন ও বিভিন্ন সিরিজের একটি তালিকা দেব, বা বলা ভালো দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ এই মুহূর্তে তাঁর 'শিল্পকর্ম' বস্তুত গোলকধাঁধা, এক পথহীন অরণ্যের মতো।

'ল্য দ্যর্নিয়ের বঁ্যা' (শেষ স্নান) একইসঙ্গে সিরিয়াস ও করুণ ব্যঙ্গচিত্র। একটি লোক জেটির সীমানায় দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে, তার দেহ ভূমির সাথে এক সূক্ষ্মকোণ তৈরি করেছে—যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আগের মুহূর্ত, সে নদীতে

ঝাঁপিয়ে পড়বে, এখনই। তার মন স্থির কারণ সে শান্তভাবে হাতগুলি ভাঁজ করে রেখেছে এবং একটি বিশাল পাথর দড়ি দিয়ে তার গলার সঙ্গে বাঁধা। সে শপথ নিয়েছে যে সে কখনোই পালাবে না। এ কোন কবির আত্মহত্যা নয় যে তাকে উদ্ধার করা হবে এবং ফলে স্বভাবতই লোকে তাকে নিয়ে আলোচনা করবে। শুধু ঐ নোংরা, ভাঁজপড়া ফ্রককোটটার দিকে দেখুন, যার ভেতর থেকে শুকনো হাড়গুলি ঠেলে বেরিয়ে আসছে। আর ঐ নোংরা সাপের মতো প্যাঁচানো টাই ও গলার তীক্ষ্ন, হাড় বেরনো কণ্ঠমণি। সভ্যতার বর্ণাঢ্য সমারোহ থেকে অথৈ জলের নিচে পালানোর জন্য নিশ্চয়ই এই লোকটিকে দোষ দিতে কারো মন সরবে না। নদীর অন্যদিকে এক হৃষ্টপুষ্ট চিন্তাশীল বুর্জোয়া ছিপ নিয়ে মাছ ধরার নির্দোষ প্রমোদে মত্ত।

এবারে কল্পনা করুন সীসার মতো সূর্যপীড়িত কোন জনবিরল মফস্বলের এক প্রত্যন্ত কোণ। মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী একটি লোক, সম্ভবত কোন সৎকার সমিতির কর্মী কিংবা ডাক্তার—ধুলোপড়া কাঠের সাপোর্ট থেকে ঝুলন্ত এক বিশুষ্ক বৃক্ষের তলায় গেলাস নিয়ে বসে বীভৎস কঙ্কালের সাথে আলাপ ও পানে ব্যস্ত। বালুকা-ঘড়ি ( hour-glass ) ও কাস্তে একপাশে পড়ে রয়েছে। ছবির নাম ভুলে গেছি, তবে এই দুজন আত্মব্যস্ত লোক নিশ্চয়ই কোন খুনের জাল ছড়াচ্ছে বা হয়তো মরণশীলতা সম্পর্কে বিদগ্ধ আলোচনা করছে।[৯]

দোমিয়ে তাঁর প্রতিভা হাজারো বিচিত্র কাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি 'লা নেমেসিস মেদিকাল' নামে এক বাজে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ও ক্যাবিক পত্রিকার অনুচিত্রণ করার কাজ পেয়ে কয়েকটি অসাধারণ ড্রয়িং করেছিলেন। তার মধ্যে একটির বিষয় কলেরা, সেখানে দেখা যাচ্ছে শহরের একটি চৌক আলো ও তাপে উদ্ভাসিত। সমস্ত দুঃখশোকের দিনের মতো অথবা রাজনৈতিক আলোড়নের সময় প্যারিসের আকাশ যেমন আয়রনিকভাবে দারুণ সুন্দর হয়ে থাকে এখানেও তাই ; শুভ্র এবং তাপে উজ্জ্বল। ছায়াগুলি কালো ও সুস্পষ্ট। দরোজার মুখে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। একজন মহিলা দ্রুত আসতে গিয়ে নাকমুখ চেপে দৌড়ে পালাচ্ছে। চৌকটি পরিত্যক্ত একটা তিক্ত চুল্লির মতো—দাঙ্গার পরে যে-কোন জনবহুল চৌক যেমন ফাঁকা হয়ে যায় তার থেকেও জনহীন। পশ্চাৎপটে দেখা যাচ্ছে কুৎসিৎ বৃদ্ধাদের সিলুয়েট, তারা কফিনের গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর নির্জনতার এই মঞ্চে একটি হতশ্রী, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কঙ্কালসার কুকুর দু'পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে ফুটপাথের ধুলো শুঁকছে।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখছি জেলখানা। কালো কোট ও সাদা টাই পরিহিত এক অত্যন্ত বিদ্বান ভদ্রলোক, হিতকারী মানবসেবক, অন্যায়ের প্রতিকারক পরমানন্দে দু'জন ভীষণদর্শন অপরাধীর মাঝখানে বসে আছেন—দুজনেই জড়বুদ্ধির মতো নির্বোধ, বুলডগের মতো ভয়ানক ও পুরনো বুটজুতোর মতো নারকীয়। তাদের মধ্যে

৯. ২৬।৫।৪০-এ 'লিমিটেড কোম্পানি ফর দি এক্সপ্লয়টেশন অফ হিউম্যানিটি' নামে ছাপা হয়।

একজন বলছে যে সে তার পিতাকে হত্যা করেছে, বোনকে ধর্ষণ করেছে বা এমনি আরো কোন বীরত্বের কাজ। পণ্ডিত আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছেন, "অহো, বন্ধু, তুমি কী দারুণ লোকই না ছিলে!"

দোমিয়ের চিন্তা প্রায়শই কত সিরিয়াস এবং কী তেজের সঙ্গে তিনি তাঁর বিষয়কে আক্রমণ করেন তা দেখানোর জন্যে এই উদাহরণগুলিই যথেষ্ট। তাঁর কাজের দিকে দেখলেই আপনি দেখতে পাবেন এক বিশাল নগরীর সমস্ত জ্যান্ত ভীষণতা, তার অদ্ভুত রোমহর্ষক বাস্তবতা। তার ভাণ্ডারে ভয়ংকর অথবা বীভৎস, অর্থহীন বা হাস্যকর এমন কিছুই নেই দোমিয়ে যা জানেন না। জীবিত ও বুভুক্ষু মৃতদেহ, হৃষ্টপুষ্ট পরিতৃপ্ত শব, সংসারের হাস্যকর ঝামেলা, মুর্খতা, প্রতিটি ক্ষুদ্র অহং, এবং বুর্জোয়ার প্রতিটি নতুন উৎসাহ ও প্রত্যেক হতাশা—সবই সেখানে রয়েছে। দোমিয়ের মতো আর কেউ বুর্জোয়াকে এরকম সম্পূর্ণভাবে জানেননি বা ভালোবাসেননি ( অবশ্যই শিল্পীর মেজাজে )—আর বুর্জোয়া, মধ্যযুগের শেষ চিহ্ন, সেই গথিক ভগ্নাবশেষ যা সহজে লুপ্ত হয় না, একই সঙ্গে খুব সাধারণ অথচ অস্বাভাবিক, একসেন্ট্রিক। দোমিয়ে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে বাস করেছেন, দিবারাত্র তার উপর কুট নজর রেখেছেন, এমনকি তিনি তার শয়নকক্ষের রহস্যও ভেদ করেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলেছেন। তিনি তার নাকের সূক্ষ্ম গড়ন এবং মাথার গঠন জানেন, তার সংসারী মেজাজ সম্পর্কে তিনি পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল।

দোমিয়ের শিল্পকর্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। পরিবর্তে আমি তাঁর ছবির প্রধান প্রধান সিরিজের নামগুলি বলছি, তার উপর আলোচনা বা মন্তব্যে যাচ্ছি না। প্রত্যেকটিতে দারুণ দারুণ কাজ রয়েছে। রোবের মাক্যার, ম্যর কঁজুগাল, তিপ পারিসিয়ঁ্যা, প্রোফিল এ সিলুয়েৎ, লে বেইঞার লে বেঞনুজ, লে কানোতিয়ে পারিসিয়ঁ্যা, লে বা-ব্লো্যা, পাস্তোরাল, ইস্তোয়ার অঁসিয়েন, ল্য বঁ বুর্জোয়া, লে জঁ দ্য জুস্তিস, লা জুর্নে দ্য মঁসিয় কোকলে, লে ফিলঁত্রোপ দ্যু জুর, অ্যাক্তুয়ালিতে, তুস্কঁ ভুদ্রা, লে রপ্রেসঁত রপ্রেসঁতে। এছাড়া আরো দুটি পোর্ট্রেট সিরিজ যার কথা আগেই বলেছি।

এর মধ্যে রোবের মাক্যার ও ইস্তোয়ার অঁসিয়েন, এই দুটি সিরিজ সম্বন্ধে আমার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে। রোবের মাক্যার[১০] ছিল আচরণের (manners) ব্যঙ্গচিত্রের সুস্পষ্ট সূচনা। বিরাট রাজনৈতিক যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। আইনের ভয়ংকর কঠোরতা, ক্ষমতায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সরকারের মনোভাব এবং মানবচরিত্রের স্বাভাবিক ক্লান্তি তার উত্তাপ ও আগুনকে অনেকটা নির্বাপিত করেছে। নতুন কিছুর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্যাম্ফ্লেট এখন কমেডিকে স্থান ছেড়ে দিয়েছে। 'সাতির

---

১০. 'লা শারিভরি'-তে ১০০টি ছবি বেরিয়েছিল আগস্ট '৩৬ থেকে নভেম্বর '৩৮ পর্যন্ত, অক্টোবর '৪০ থেকে সেপ্টেম্বর '৪২ পর্যন্ত বেরিয়েছিল আরো ২০টি।

মেনিপ্পে'[11] আসন ছেড়ে দিয়েছে মোলিয়েরের কমেডিকে এবং দোমিয়ের চোখ-ধাঁধানো রোবের মাক্যার-এর এপিক সাইক্ল বিপ্লবের উন্মাদনা ও অপ্রত্যক্ষ উল্লেখের ছবিকে স্থানচ্যুত করেছে। এরপর থেকে ব্যঙ্গচিত্রের চাল পালটেছে। তা আর বিশেষত রাজনৈতিক নয়। তা সাধারণভাবে জনগণেরই স্যাটায়ার। এবং ক্রমে তা উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করেছে।

'ইস্তোয়ার অ'সিয়েন' সিরিজটি[12] আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে কারণ এটি সেই বিখ্যাত পংক্তির,—'কে আমাদের গ্রীক ও রোমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবে?' ('Qui nous deliverra de Grecs et des Romains?') শ্রেষ্ঠ রূপান্তর বলা যেতে পারে। দোমিয়ে এখানে কঠোরভাবে এ্যান্টিকুইটিকে আঘাত করেছেন, বা মিথ্যা এ্যান্টিকুইটিকে, কারণ এ্যান্টিকুইটির মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতো কেউ সচেতন নন। তিনি তাকে আঙুল মটকে উড়িয়ে দিয়েছেন। মাথা-গরম এ্যাকিলিস, ধূর্ত ইউলিসিস, জ্ঞানী পেনিলোপি, সেই অজমূর্খ তেলেম্যাকাস, এবং সুন্দরী হেলেন, যে ট্রয় ধ্বংস করেছিল—তারা সকলেই আমাদের চোখের সামনে প্রাহসনিক কুশ্রীতায় আবির্ভূত হয় যা আমাদের সেই অথর্ব ট্র্যাজিক অভিনেতাদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাদের কখনো কখনো নাট্যমঞ্চের উইংসে নস্য নিতে দেখা যায়। খুব উপভোগ্য এবং প্রয়োজনীয় দেবনিন্দা। আমার মনে পড়ে আমার পরিচিত একজন লিরিক কবি— 'পাগান স্কুল'-এর একজন—এই সিরিজে অত্যন্ত বীতরাগ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এ কালাপাহাড়ি মনোবৃত্তি এবং অন্যরা যেমন শ্রদ্ধার সাথে কুমারী মেরীর কথা বলে তেমনভাবে তিনি সুন্দরী হেলেন সম্পর্কে কথা বলতেন। কিন্তু যাদের অলিম্পাস বা ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বিরাট কোন শ্রদ্ধা নেই, তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিলেন।

সমাপ্তিতে বলা যায় দোমিয়ে তাঁর শিল্পের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন; তিনি ছবিকে একটি সিরিয়াস চিন্তাকর্মে পরিণত করেছেন। তিনি একজন মহান ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। তাঁকে প্রকৃত মর্যাদার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হলে তাঁকে শৈল্পিক ও নৈতিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিশ্লেষণ করা দরকার। শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর প্রতিটি রেখা, আঁচড়, স্পর্শের অনিবার্যতা। তিনি আঁকেন যেভাবে গ্রেট মাস্টাররা আঁকতেন। তাঁর অঙ্কন প্রাচুর্যসম্পন্ন ও সাবলীল— স্থায়ী কল্পনাশক্তি সেখানে কাজ করে। তবু তা কখনো চটকদারের পর্যায়ে নেমে আসে না। তাঁর রয়েছে এক অসাধারণ, প্রায় দেবদত্ত স্মৃতি, যা তাঁর ক্ষেত্রে মডেলের কাজ করে। তাঁর ছবির সমস্ত শরীর তাদের পায়ের উপর শক্তভাবে দাঁড়ায় এবং তাদের গতি সব

১১. নাটকীয় প্রহসনের আঙ্গিকে লিখিত একটি রাজনৈতিক প্যামফ্লেট, আক্রমণের লক্ষ্য ছিল লীগ, ১৫৯৪-এ প্রকাশিত।

১২. ৫০টি ছবি—'শারিভরি', ডিসেম্বর '৪১ থেকে জানুয়ারি '৪৩।



সময়েই সত্যানুবর্তী। তাঁর দৃষ্টি এতই নিশ্চিত যে আপনি তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটাও মস্তক পাবেন না যা তার বহনকারী দেহের সঙ্গে ঠিক ঠিকভাবে মেলে না। সঠিক নাক, ঠিকঠাক ভ্রু, চোখ, সঠিক পা ও অনিবার্য হাত। এখানে 'জ্ঞানী'র যুক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে এক চটুল ও পলাতক শিল্পের ক্ষেত্রে, যা জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে দ্বন্দ্বরত।

নীতিবাদী হিসাবে দোমিয়ের অনেক মিল রয়েছে মোলিয়েরের সঙ্গে, তাঁর মতোই তিনি সরাসরি মূল বিন্দুতে চলে যান। মূল বক্তব্য কী তা আপনার কাছে প্রথমেই পরিষ্কার হয়ে যায়। বোঝার জন্য শুধু এক লহমার দেখাই যথেষ্ট। তাঁর ছবির তলায় যে-সব কাহিনী লেখা থাকে, সেসবের বিরাট কিছু মূল্য নেই, এবং অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। তাঁর হিউমার বলা যেতে পারে অনিচ্ছাকৃত। এই শিল্পী ভাবনাকে খোঁজেন না, বরং বলা যায় তিনি তা কেবলমাত্র আপনা থেকে প্রকাশিত হতে দেন। তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের পরিধি বিরাট, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বর্জিত। তাঁর সমস্ত কাজে শীলতা ও সরলতার এক ভিত্তি রয়েছে। অনেক সময়ে তিনি স্যাটায়ারের পক্ষে খুব উপযুক্ত দারুণ কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করতে অস্বীকার করেছেন, এই কারণে যে তা তাঁর মতে কমিকের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সমসাময়িক মানুষজনের হৃদয়ে তা আঘাত দিতে পারে। এবং তাই, যখনই তিনি আঘাতক্ষম ও ভয়ানক হয়ে ওঠেন, তা তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তিনি যা দেখেছেন তাই শুধু বর্ণনা করেছেন এবং তার ফল এই দাঁড়ায়। তাঁর যেহেতু প্রকৃতির প্রতি এক আবেগপূর্ণ ও স্বাভাবিক ভালোবাসা আছে তাই বিশুদ্ধ কমিকের পর্যায়ে ওঠা তাঁর পক্ষে কষ্টকর। এমনকি ফরাসী জনগণ সহজে ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে না এমন যা কিছুকে এড়ানোর জন্য তিনি নিজের স্বাভাবিক পথ ছেড়ে চলতেও রাজি আছেন।

আরো একটি কথা। দোমিয়েরের অসাধারণ ক্ষমতাকে যা সম্পূর্ণ করে এবং তাঁকে এক বিরল শিল্পীতে পরিণত করে যিনি গ্রেট মাস্টারদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তা হলো তাঁর ড্রয়িং স্বভাবত বর্ণময়। তাঁর লিথোগ্রাফ ও কাঠখোদাই ছবিগুলি বর্ণের আবেশ উদ্রেক করে। তাঁর পেন্সিল শুধুমাত্র রেখাঙ্কনের জন্য একটি কালো দাগ অপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্যের অধিকারী। তা বর্ণের আবেশ সৃষ্টি করে, যেমন তা ভাবনার ইঙ্গিত দেয়—এবং এ এক উন্নততর শিল্পের চিহ্ন—যে চিহ্ন সকল ধীমান শিল্পী তাঁর কাজের মধ্যে লক্ষ করেছেন।[১৩] □

---

১৩. Mirror of Art থেকে Some French Caricaturists-এর নির্বাচিত অংশ, লেখাটির নাম বদল্যেরের নয়।

# ছবির মুক্তি আরও তথ্য

লিথোগ্রাফি দোমিয়ের (২৬/২/১৮০৮) একটু আগে জন্মায়। ১৭৯৮-য়ে জার্মান অ্যালোয়েজ সেনেফেলডার লিথোগ্রাফির কৌশল আবিষ্কার করেন। তারপরের প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে লিথোগ্রাফির ব্যবহার যেন মানবিকতার দলিল। গণতান্ত্রিক, সুলভ-সস্তা মুদ্রণব্যবস্থার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এরপর জায়গা বেদখল করে নিল 'হাফটোন' পদ্ধতি। ফোটোগ্রাফির পুনর্মুদ্রণ এ ছাড়া চলে না। ১৮২৪-এ স্পেন থেকে নির্বাসিত গোইয়া বোর্দো ও পারিতে লিথোর সঙ্গে পরিচিত হন। গোইয়ার 'বুল ফাইট'-ক্রমের লিথোগ্রাফিক ছাপাইগুলি দোমিয়ের মানসগঠন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

দোমিয়ের সমগ্র জীবন বিপ্লব আর পরিপূর্ণ হিংসার প্রেক্ষায় রচিত হয়েছে। তাঁর শৈশবের চোখ নাপোলেয়ঁর পলায়ন প্রত্যক্ষ করেছিল। দেখেছিল ফিরে আসতেও। পরে দেখতে হয়েছে বিপ্লবের ঘূর্ণি, লুই নাপোলেয়ঁর অবৈধ ক্ষমতাদখল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান সমর। পারি কম্যুনের শূন্যগহ্বর। ১৮৩০-এর গৌরবময় বিপ্লবের ক্ষেত্রেও সেকথা বলা যায়। খুব কাছ থেকে দেখা। এবং দৃশ্যসাক্ষ্যে তাকে সমালোচনা করার দুর্লভ সুযোগ। আমাদের কাছে যা শুধুই পাঠ্যবস্তু বা দ্যলাক্রোয়ার পেইন্টিং। কিন্তু দোমিয়ে বা তাঁর সহমর্মীর কাছে তা আরও কিছু। রাজনীতিক-সামাজিক সম্ভাবনার বিকীরিত উৎসমুখ।

## □ ১৮৩০-র বিপ্লব ও 'লা কারিকাতুর'

১৮৩০-এর ২৬শে জুলাই অর্ডিন্যান্স জারি হলো। রাজা শার্ল, প্রধানমন্ত্রী পলিয়্যাকের হাত দিয়ে এই ত্রাস সঞ্চার করলেন। কড়া অর্ডিন্যান্স, প্রেস সেন্সরশিপ, পরিবর্তিত নির্বাচনী আইন এবং নতুন নির্বাচনের ঘোষণা করা হলো। প্রেস বিরোধী অর্ডিন্যান্স মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। মারাত্মক এবং সফল প্রতিহিংসা। প্রতিবাদী সাংবাদিকরা এক ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। অবাধ্যতার ভাষায় জানালেন এ আইন তাঁরা মানেন না। আহ্বান জানালেন এ অত্যাচার ধ্বংস করো। প্রচার প্রচন্ড সফল হলো। উদার 'গ্লোবে'র সম্পাদক আর 'লা ত্রিবিউনের' অগুস্ত ফাব্রের অবদান সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। বিক্ষিপ্ত লড়াই ছড়িয়ে পড়ল। ২৮শে জুলাই বিকেলের মধ্যে পারির পূর্বদিক বিপ্লবী শক্তির দখলে চলে আসে। রাজা ইংল্যান্ডে পালাতে বাধ্য হলেন। বিদ্রোহী রিপাব্লিকানরা নেতৃত্বশূন্য। লড়াইতে তারা দলে দলে প্রাণ দিচ্ছেন। বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ঘটনার রাশ নিজেদের অনুকূলে টেনে নিল, সিংহাসনে উঠে বসল লুই ফিলিপ।

ফ্রান্সে এখন স্বচ্ছ তিনটি মৌলিক মতাদর্শ বিভাগ নজরে পড়ে। পুরনো রাজতন্ত্রী-শার্লপন্থীরা। রিপাব্লিকানরা অসংগঠিত কিন্তু বিস্ফোরক। আর সম্পত্তি-শালী মধ্যশ্রেণী। এ ব্যাপারে হাইনে খুব সঠিক একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন—'১৮৩০-এর বিরাট যুদ্ধে কে জিতল? হারলই বা কে?' দুটি প্রশ্নেরই উত্তর—'রিপাব্লি-কানরা'। লুই ফিলিপ কৌশলে তিনটি দলকেই তুষ্ট করলেন। পুরনো খাতেই বয়ে চলল ফ্রান্স। মার্কসের বর্ণনায়—"রাজা ও তার মন্ত্রীরা, সম্পদ শোষণের একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খুলল। তার লভ্যাংশ পেল মন্ত্রী, চেম্বার আর দুলাখ চল্লিশ হাজার নির্বাচক। এবং তাদের অনুগত ব্যক্তিরা। মোট জনসংখ্যা দুকোটি আশি লক্ষ। লুই তাদের ডিরেক্টর।"

নতুন সরকার বহু কিছু প্রতিশ্রুতি দিল। "ফরাসী আইন অনুযায়ী জনতা তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে। ছাপতে পারবে। সেন্সর কখনো চাপানো হবে না।"

নতুন অবস্থায় ফ্রান্সের প্রেস বেড়ে উঠতে লাগল। রাজনীতিগতভাবে পত্রসমূহ তিনটি প্রধান রাজনৈতিক লাইন অনুসারী। দি লেজিটিমিস্ট—ন্যায্য অধিকারবাদী, রাজতন্ত্রী। দি রিপাব্লিকানস, সংসদীয় গণতন্ত্রী। অপরটি সরকারপন্থী। রিপাব্লিকান-দের প্রধান মুখপত্র 'ল্য নাসিওনাল', সম্পাদক আরমঁ কারে এবং 'লা ত্রিবিউন—সম্পাদক মারাসাত। সাংবাদিকতার জগতে প্রচন্ড ডামাডোল। শার্ল ফিলিপঁ সুযোগ বুঝে সবশুদ্ধু ঝাঁপ দিলেন দ্রুত। ফিলিপঁর প্রধান কৃতিত্ব লিথোগ্রাফির সম্ভাবনা বিচার করায়। এবং সেই সম্ভাবনা আন্দাজ করে তাকে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন বা পুস্তক বিস্তারণের কাজে লাগানোয়। তাঁর প্রথম সাময়িকী 'সিল্যুয়েৎ' (১৮২৯-৩০)। বহুমুখী পত্রিকা। প্রতিটি সংখ্যায় লিথো-আলেখ্য। সিল্যুয়েতের অভিজ্ঞতা, বিপ্লবের সময় নতুন একটা পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিল। সঙ্গে যুক্ত হলেন তাঁরই মতো দুর্দান্ত যুবকশিল্পীরা। বিরাট এক বন্ধুতার বৃত্তে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সাহসী যুবমন্ডলী। এক একটি দুর্দান্ত ধারালো মস্তিষ্ক। ফিলিপঁ ১৮৩০-এর চৌঠা নভেম্বর 'ক্যারিকেচারে'র ('লা কারিকাতুর') জন্ম দিলেন। দুবছর বাদে জোড় মেলাল 'শারিভরি'। রাজনীতিক ঘটনাবলী, যেমন আশা করা গিয়েছিল সেভাবেই আরো খারাপ হয়ে পড়ল। প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা অর্জনে ফরাসী উদারনৈতিকরা প্রতিবাদের লড়াই শুরু করলেন। অনুপ্রাণিত ক্যারি-কেচারের সামনে নতুন একটা লক্ষ্য। ক্যারিকেচার তখন রাজনীতিকভাবেই ক্যারিকেচারাল, ব্যঙ্গাত্মক সাংবাদিকতায় তার মহান ভূমিকার ব্যাপারে তীক্ষ্ণচেতন সে। ১৮৩১-এর ২৮শে এপ্রিল ফিলিপঁ বিবৃতি দিলেন. "সেন্সর প্রথার সক্রিয়তার জন্য বিরোধের এই শক্তির (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের) কথা জুলাই বিপ্লবের আগে বোঝা যায়নি। সাধারণ মুদ্রণে সেন্সরশিপ ছিল না ঠিকই, কিন্তু ছাপাই ছবি বা লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা ওঠেনি।

"আমাদের ঘৃণিত যুগের বিশ্বাসী প্রতিফলন হয়ে ওঠা বন্ধ করবে না ক্যারিকেচার। রাজনীতিক বিশ্বাসঘাতকের বাঁদরামো, পবিত্র সমারোহের কপট প্রদর্শন, রাজতান্ত্রিক বা দেশপ্রেমিক মুখোশের আধিক্যে এসময় রাজদরবারে নাচছে মুদি—কার্বোনারি সামরিক আইন বানাচ্ছে, আর যথার্থ গুণী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে।"

কেতা, রীতি ও আচরণের ব্যঙ্গ ক্যারিকেচারের প্রাথমিক সংখ্যাগুলোয় প্রচুর। এবার তার বদলে এল রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র। যাতে হুলের জ্বালা তীব্র। অতএব যখন তখন দপ্তরে পুলিশ। ফিলিপঁকে জেলে পোরার ভয় দেখানো। রাজ-বিরোধিতার কারণে শেষ অবধি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেন। ছ'মাসের কারাদন্ড। সেইসময় বালজাক এগিয়ে এলেন। জরিমানা আর আদালতের খরচবাবদ পঞ্চাশ ফ্রাঁ, সঙ্গে দিলেন লড়াই চালিয়ে যাবার পরামর্শ।

১৮৩২-এর সাতাশে আগস্ট দোমিয়ের কারাদন্ড হলো। ট্রায়াল অব গরগাঁতুয়া। গরগাঁতুয়া, একদা লিয়ঁ অঞ্চলের লোকনায়ক। রাবেলের রচনায় তিনি অমর হয়ে আছেন। দোমিয়ে ছবিতে লুই ফিলিপকে গরগাঁতুয়া রূপে চিত্রায়িত করলেন। [দ্র. সংযোজন : ২] এরপর আইন পরিষদের স্ফীতোদর বা সংসদীয় ভুঁড়ি—'লেজিসলেটিভ বেলি' পর্যায়ে দোমিয়ে ৩৮টা রঙিন, মাটির আবক্ষ মূর্তি তৈরি করলেন। প্রতিটি ছ'ইঞ্চি উঁচু। সেগুলি লিথোগ্রাফিক ছবি, মুখোশ আর ছাপাই ছবি 'লেজিসলেটিভ বেলি' পর্যায়ের মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গরগাঁতুয়া উপকথা সৃষ্টির আগে রাজাকে বিবৃত করতে দোমিয়ে আরেকটি মডেল বানান। এটাও ফিলিপ র আবিষ্কার। রাজার মুখ যেন কন্টকিত কোন সুস্বাদু ফল, যেন নাশপাতি।

'দি সোসাইটি ফর দি ফ্রিডম অফ দি প্রেস' প্রতিষ্ঠিত হলো। উদ্দেশ্য রিপাব্লি-কান কাগজগুলোকে সাহায্য করা। লাফায়েত তার সদস্য। এদিকে সংস্থান শূন্য। ২।৮।১৮৩০ থেকে ১।১০।১৮৩৪ পর্যন্ত শুধু পারিতেই ৫২০টা প্রেসের বিচার। ১৮৮টায় অপরাধী সাব্যস্ত—১০৬ বছরের জেল—৪৪০০০ ফ্রাঁ জরিমানা। ফিলিপঁর পক্ষে প্রতিটি সম্ভাব্য উপলব্ধ ফ্রাঁই ভীষণ প্রয়োজনীয়। ৬টি রায়, ৩টি মামলা ; ৬০০০ ফ্রাঁ জরিমানা তাঁর বিরুদ্ধে। ফিলিপঁ এক নতুন প্রকল্প হাতে নিলেন : প্রিন্ট অফ দি মান্থ, এ মাসের ছবি। বিরাট বিরাট লিথোগ্রাফিক প্লেট। প্রতিটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ-চিত্রীর আঁকা। সুন্দর ছাপা। প্রতিমাসে নিয়মিত বের হতো। পরোক্ষ এই আক্রমণের উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ আক্রমণের জবাব দেওয়া। ফিলিপঁর 'প্রিন্ট অব দি মান্থ ক্লাব' ২৪টি প্লেট প্রকাশ করে। দোমিয়ের 'বিধায়কী ভুঁড়ি'—১৮তম। রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ইতিহাসে এ এক দুর্দান্ত অধ্যায়। 'ফ্রিডম অব দি প্রেস'—এ পর্যায়ে ২০তম।

১৮৩৪, ২০শে মে লাফায়েতের মৃত্যু। দোমিয়ের চতুর্থ প্লেটের বিষয়। লাফায়েত দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতীক ছিলেন। এসময় তাঁর মৃত্যু রিপাব্লিকান-

দের পক্ষে এক বিপর্যয়। তাঁর মৃত্যু তাই ফিলিপের সামনে প্রচ্ছন্ন এক সমস্যার সৃষ্টি করল। দীর্ঘদিনের বন্ধু, তাঁর রাজত্বপ্রাপ্তির কারণও বটে। তবু তিনবছর আগে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে বর্ষীয়ান লোকটিকে রাজা সরিয়ে দেন। সশস্ত্র রিপাব্লিকান অভ্যুত্থানের আশঙ্কায়। এখন তাই শোকের ভান করতে হলো। যদিও প্রচ্ছন্ন আনন্দে।

এই মৃত্যু লুই ফিলিপের সামনে এক কৌশলগত সমস্যা হিসেবেও উঠে এল। অন্তিম শোকযাত্রায় দাঙ্গার সম্ভাবনা। কিন্তু রাজার সমাধান যেন মাস্টার স্ট্রোক। শিল্পগুরুর তুলির টান। রাষ্ট্রীয় সৎকারের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। দোমিয়ের কিন্তু 'কাটাফলের' রাজা ফিলিপের দু'নম্বরীতে ঠকেননি। তার ছবি "দি ফিউনেরাল অফ লাফায়েত"—বীরের প্রতি শ্রদ্ধা। পক্ষান্তরে 'পীয়ার কিং'য়ের ভন্ডামিও আর গোপন থাকল না।

'রু এ'সনোন্যা' লিথোগ্রাফের অপর এক পর্যায়। ১৮৩৪, এপ্রিলের রায়ট, যার পরিণতি রু ত্র'সনোন্যা-র গণহত্যায়। এরপর ১৮৩৫, ৩০শে জুলাই। লুই ফিলিপকে হত্যার অসফল চেষ্টা। তার পেছনেই ১৮৩৫-এর ৯ই সেপ্টেম্বর নতুন আইন। রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উবে গেল ফ্রান্সের আগামী তেরো বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে।

বালজাকের 'কমেদি ইউম্যেন'-এর পরিপূরক অঙ্কন দোমিয়ের হাতে অতি যথার্থতায় চিত্রিত। পদ্ধতিগতভাবে তিনি মিকেলাঞ্জেলো, আলোর কাজে রেমব্রা ঘরাণার। শিল্পী দোমিয়ের তুলির স্পর্শ নিশ্চয়তার ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।

দোমিয়ে-বালজাকের যোগাযোগের মূলে তাঁদের সাধারণ সমিত শ্যাঁফ্লারি। তাঁর ধারণা, বুর্জোয়ারা তাঁদের জন্য দুজন মারাত্মক ঐতিহাসিক পেয়েছিল, একজন স্বয়ং বালজাক, অন্যজন অবশ্যই দোমিয়ে। তাঁদের এই সংযোগের মাধ্যম ছিল উভয়ের বিষয়বস্তু ও তা অনুভবের গভীরতা। দুজনেরই প্যারির মানুষজন সম্পর্কে তীব্র অনুরাগ ছিল। বালজাক তাঁর পরিকল্পনা আগেই করেছিলেন। "ফরাসি সমাজ ঐতিহাসিকতায় পরিণতি পেতে চলেছিল। আমার কাজ ছিল তার সহকারী সচিব হয়ে ওঠা।" সেই সময়—এই দুই ব্যক্তিত্বের হাতে সংরক্ষিত, ভবিষ্যতের জন্য নথিবদ্ধ। দোমিয়ের ছাপাই নথিতে ভাঙ্গ ও আকারের বিশিষ্টতা বালজাকের মতো। বালজাকের হাতে বিশাল ভৌত বিশ্লেষণ। খুঁটিনাটির বিশিষ্ট তালিকা। উভয়েই সমগুণমানে। বাস্তববাদী অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা। এখানে রয়েছে বিস্তৃত দৃষ্ট ও লিপিবদ্ধ বিষয়, তার নির্দিষ্ট অনুক্রম। দোমিয়ের তুলনায় একটু এগিয়ে। তাঁর ভণিতাহীন প্রত্যক্ষগুণে, অপ্রয়োজনীয়তার বর্জনে দোমিয়ের কাজ প্রাত্যহিক ব্যঙ্গ-চরিত্রের নিয়মিত দায়িত্ব থেকে, অনুশীলন থেকে পরিকল্পিত।

মজার ব্যাপার, বালজাকই প্রথম লোক যিনি দোমিয়ের প্রয়োগে রেনেসাঁর স্মরণীয় প্রতিভার অবশেষ খুঁজে পেয়েছিলেন।—"লোকটার কাজের ধরন মিকেলাঞ্জেলোর মতো।" বদল্যের বলতেন, "ও আঁকে যেন এক শিল্পগুরু।" "নিজে স্পষ্ট, আবরণ-হীন, মানুষকেও সেভাবেই দেখেছে। তার নিজস্ব অন্তর্গত স্বচ্ছ স্ফটিকের মাঝখান থেকে।"—টি. এস. এলিয়ট। ব্লেকের কথায়—"সব কিছুর কাছেই তাঁর এগিয়ে যাওয়া। সমসাময়িক মতামতের আবিলতায় সমাচ্ছন্ন হয়ে। তাঁর মধ্যে হয়তো বিরাট কিছু ছিল না। আর এই ব্যাপারটাই তাঁকে ভয়ংকর ধারালো করে তুলেছে।"

দোমিয়ের ব্যাপ্তি বিশাল। ১৮৩৩-৪৮, ১৬০০ লিথোছাপ, ১০০ কাঠ-খোদাই। ৪২ বছরে ৪০০০ লিথো প্রতি বছর ৯৫টির হিসেবে, ১০০০ কাঠখোদাই, কয়েকশ' পেইন্টিং, দারুণ কিছু ভাস্কর্য।

□ ১৮৪৮-এর বিপ্লব ও দোমিয়ে

২২।২।১৮৪৮ উদার বুর্জোয়ারা পারিতে এক বিশাল খানাপিনার আয়োজন করেছিল। আতঙ্কিত সরকার সমাবেশটি বন্ধ করে দেয়। রিপাব্লিকান সংবাদ-পত্রগুলি সঙ্গে সঙ্গে ঐদিন একটা প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিল। সেটাও বন্ধ করা হলো। ফ্রান্সের গোলযোগ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। হাজার হাজার লোক ত্যুইলেরির দিকে এগিয়ে চলেছে। সৈন্যরা পথ আটকে দাঁড়াল। উত্তেজনা তর্কাতর্কি। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। সৈন্যরা রাইফেল উঁচু করে গুলি ছুড়াচ্ছে। বিপ্লব না হলেও বিদ্রোহ হুংকার দিয়ে উঠল। ন্যাশনাল গার্ড, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্ট সামরিক বাহিনী। সহ-নাগরিকদের বিরুদ্ধেই তাদের লড়াই। এবং ব্যর্থ। ২৮শে ফেব্রুয়ারির সকালে জনতা হুড়মুড়িয়ে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ঢুকে পড়ল। ঐসময় চেয়ারম্যান লামার্তিন জনতাকে শান্ত করলেন। তাদের বোঝানো হলো—"অন্তবর্তী সরকার তৈরি হচ্ছে। যে কোন ধরনের রাজতন্ত্র শেষ করে দেওয়া হবে। কোন ভাবেই তার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।"

দোমিয়ের রাজনীতিক ব্যঙ্গচিত্রের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো। ১৮৪৮, দোসরা মার্চ। সবদলের মিলিত সরকার আদেশ জারি করল, "রাজনৈতিক বা প্রেস আইন ভঙ্গের সমস্ত অপরাধের শাস্তি রদ।"

ছ'দিন পর পাকাপাকি জানা গেল "১৮৩৫-এর সেপ্টেম্বর আইনসমূহ বাতিল করা হলো।" নভেম্বরে নতুন সংবিধান রচনার পর ঘোষণাসমূহের আনুষ্ঠানিক প্রচার হলো। ১৩ বছরের কড়া সেন্সরব্যবস্থার পর ফরাসি প্রেস লাগামছেঁড়া কথায় আক্রমক হয়ে উঠল। নতুন নতুন জার্নাল। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের দিনে 'শারিভরি'। মানে এক প্রচণ্ড গর্জন, উন্মত্ত রাগিণী, ফুটন্ত ক্রোধ—ঘটনার ঘূর্ণি, উত্তেজনা আর সম্ভাবনার প্রকাশ।

প্রুধোঁ-প্রধান তাত্ত্বিক। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে লক্ষ রাখছিলেন। বহু সমস্যার সৃষ্টি করছিল সে, যে জন্যে কেউই ঠিক প্রস্তুত ছিল না। ক্যারিকেচার ও

শারিভরিতে ১৮৩১-৩৫-এর মধ্যে ফিলিপ'র হয়ে দোমিয়ে কাজ করছেন। তাঁর তুলিতে ধরা পড়ছিল বিপ্লবী মতাদর্শের অবনমন। ফিলিপ'র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। অন্য সম্পাদকের সঙ্গে কাজ শুরু হলো। বিপ্লবী আদর্শের আরো বিচিত্র পরিচয় ফুটে উঠল সেখানে। বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপের অদ্ভুত সব বাগাড়ম্বর। শুধু রাজনৈতিক সুযোগ হাতানো। ক্ষমতা দখলে রাখার মারাত্মক উপদলীয় লড়াই। সাচ্চা আদর্শবাদ নয়। নীচ আবেগতাড়িত বস্তুনিচয়।

১৮৪৮-৫২ লা মার্তিনির অন্তবর্তী বিধানমণ্ডলীর হাত থেকে লুই নাপোলেয়'র বেআইনী ক্ষমতা দখল। কোন ঘটনাই দোমিয়ের নজর এড়ায়নি। সংহতির বিরাট বিভাজন চিত্রিত হয়েছে তাঁর হাতে।

খুব অল্পসময়ের জন্য রিপাব্লিকানদের আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে উঠল। ঘটনাবলী তাদের অনুকূল। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তাদের লক্ষ্য ও আশার প্রধান বাধা ছিল বুর্জোয়ারা। অথচ এই শ্রেণীই বিপ্লবকে উস্কে তুলেছিল। এবং বলা যায় রিপাব্লিকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল। কারণ বুর্জোয়ারা, অসংবদ্ধতার চেয়ে অন্যায়কে সমর্থনই সঠিক বলে ভেবেছিল। মধ্যশ্রেণী যে-দৈত্যকে খাঁচার বাইরে আসতে দিয়েছিল সে নিয়ে যথেষ্ট আতঙ্কিত। এইসব সত্য দোমিয়ের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। নিজের ছবিতে এদের নিয়ে স্রেফ মজা করেছেন। মধ্যবিত্ত বহু ছবিতেই—ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। 'দি সেণ্টিমেণ্টাল এডুকেশনে' ফ্লবোর বলেছেন, "রিপাব্লিকানরা বড়লোকদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, ধর্মীয় মহিমার মতো সম্পদের উচ্চাসনে উঠছিল তারা। ভগবানের সঙ্গে তারা নিজেদের গুলিয়ে ফেলছিল। এই সম্পদের ওপর যে-কোন আক্রমণই তাদের চোখে অপবিত্র। সেখানে তখনও পর্যন্ত সর্বকালের মধ্যে সর্বোত্তম মানবিক আইনী প্রতিষ্ঠান। তবু ১৭৯৩-এর দিনগুলো যেন ফিরে ফিরে আসছিল। রিপাব্লিকের প্রতিটি সিলেবল উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন গিলোটিনের কোপ নেমে আসছিল।"

১৮৪৮-এর বসন্ত। অন্তবর্তী বিধানমণ্ডলী। সমস্ত রাজনৈতিক দলের গঠিত কংগ্রেস। তীব্র বেকারির সংকট। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কাতারে কাতারে আসছে কায়শ্রমিকেরা। নতুন ব্যবস্থা থেকে সুযোগ পাওয়ার আশায় তারা জড়ো হচ্ছে প্যারিতে। লুই ব্লাঁ জাতীয় কর্মশালাসমূহের অর্থগত দুর্বল অবস্থার মোকাবিলায় ব্যর্থ হলেন। ২৩।৬ থেকে ২৬।৬ তিনদিনের তুমুল লড়াই। ৪০০ নিহত, ৩০০০ কারান্তরে, দেশান্তরী অথবা মৃত্যুদণ্ডিত। বিদ্রোহ উৎপাটিত হলো। এবং নিঃসন্দেহে আইনী শক্তির অত্যাচারে এ বিজয়। কারণ নির্ভেজাল, অহিংস সমাজসংস্কার নেহাতই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জনগণ ও মধ্যশ্রেণীর বিধায়কদের মধ্যে ততদিনে পরিষ্কার বিভাজন ঘটে গেছে।

কামানগুলো রাস্তায় শান্তি ফিরিয়ে আনল। নতুন সংবিধানের মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যেই নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। একটা তৈরি ধাঁধার খসড়ায় সুরক্ষার ছলে

রিপাব্লিকের মৃত্যুই নিশ্চিত হলো। সরকারকে একটা কৌটোয় পুরে প্রেসিডেণ্টের হাতে পুরো ক্ষমতা তুলে দেওয়া হলো। কার্যক্রম তিনবছরে বাঁধা। সংবিধানে খোলাখুলি ক্ষমতাদখলের আহ্বান ছিল। কোন এক স্বৈরাচারীকে প্রলোভিত করার। নতুন সংবিধানসভা। একটা গাধার আড্ডা। দোমিয়ে এই সময় দ্বিতীয় রিপাব্লিকের বিধায়কদের নিয়ে একটা নতুন পর্যায় শুরু করেছেন, অপর একটি ক্রমে বিধায়কদের নীচতা নির্দেশ করে, তাদের মেকি মহত্ত্বের মুখোস খুলে। 'পার্লিয়ামেণ্টারি আইডিলস'—বিধানসভার পল্লীকাব্য। শক্তিমান মন্ত্রীরা—ফন এবং স্যাটিরের ছদ্মবেশে চিত্রিত। যারা মূল্যবান সময় নিয়ে বাঁদরামো করছে। জুয়ো খেলছে। আর দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে রিপাব্লিক।

১৮৪৮ সাল পর্যন্ত নাপোলেয়ঁবাদের চর্চা শুধুই নির্দোষ স্মৃতি। একটা মতাদর্শ বা দেশপ্রেমী আবেগ ছাড়া কিছু নয়। রাজনীতিগতভাবেও নাপোলেয়ঁবাদ ভয়াবহ অবস্থানে আসতে পারেনি। ব্যাপারটা পালটে গেল। ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত লুই নাপোলেয়ঁ। ক্ষমতায় ফিরে আসার তার প্রচণ্ড লোভ। নিজের নামের যাদু সুযোগ হিসেবে ব্যবহৃত হলো।

১০/২/১৮৪৮ লুই নাপোলেয়ঁ সমস্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত সংযুক্ত সংখ্যার থেকেও অধিক সমর্থন পেলেন। ফ্রান্সের ঘটনাবলী একটি মানুষের ওপর কেন্দ্রীভূত হলো। যদিও তার এই নির্বাচন সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার এক অশুভ পূর্বাভাস ছাড়া কিছুই ছিল না। অতএব স্বাভাবিক শক্তিসংগ্রহের, প্রতিষ্ঠার পর, সে জোর করে অবশ্যম্ভাবী ক্ষমতা দখলের রাস্তায় এগোল। ভয়ংকর শেষ মুহূর্তটি হাজির হলো ২/১২/৫১-র রাতে—নাপোলেয়ঁর ক্ষমতাদখল।

নির্বাচনের ফলাফল দোমিয়ে ও শারিভরিকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাঁরা লক্ষ করলেন—প্রতিক্রিয়ার শক্তি বেড়ে চলেছে। সাম্রাজ্য বিস্তারের রাস্তাও খুলে দেওয়া হলো। দক্ষিণপন্থী প্রচারবিদরা দক্ষতার সঙ্গে ভয়ের নাটক জমিয়ে তুলল। 'রেড স্পেকটার' নিয়ে, বামপন্থীদের ভীতি নিয়ে। নাপোলেয়ঁ ইতালিতে ফরাসি বাহিনী পাঠালেন জনগণের বিরুদ্ধে। ফরাসিদের পোপ ও চার্চকে রক্ষা করতে হলো। শিক্ষা বিলে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ চার্চের হাতে গেল। স্বাধীন মুদ্রণব্যবস্থার গলা চেপে ধরা হলো, ট্রেড ইউনিয়ন প্রথা ভাঙল। নতুন করে প্রবর্তিত হলো কঠোর সেন্সর।

দোমিয়ের মৃত্যু ১৮৭৮। কিছু আগে আয়োজিত এক বিশাল প্রদর্শনীতে তাঁর কালোচিত অনিবার্যতা প্রথম স্বীকৃত হয়।[১] □

১. Howard P. Vincent : Daumier and his World. / সম্পাদিত অংশ।





# জেল থেকে দোমিয়ে-র চিঠি

সঁ্যাৎ পেলাজি, পারি ; ৮ অক্টোবর, ১৮০২

বন্ধুবর জাঁরো[১], তোমাকে লিখতে প্রায় বাধ্য। ইচ্ছের সামান্য বেচালে সঁ্যাৎ পেলাজিতে বন্দী এখন, তোমার সাথে যে দেখা করব, তার উপায় নেই। এক মিনিট, কীসের একটা গোলমাল হচ্ছে ; কলম এখন বন্ধ রাখতে হচ্ছে, ততক্ষণে তুমি বরং বাইরে একটু ঘুরে আসতে পারো।

না, কিছু না। কার্লিস্টরা[২] নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, সম্প্রতি তারা সারাক্ষণ এ নিয়েই ব্যস্ত। কোন সম্মান বা মর্যাদারক্ষার প্রশ্ন নেই, স্রেফ পারিবারিক ঝগড়া, নয়তো পয়সাকড়ির হিসেব।

সে যা হোক, এখন আমি সশরীরে এখানে, চমৎকার জায়গা, ভালো যে অবশ্য সকলেরই লাগবে তা নয়। সে জানি, আমার কিন্তু দারুণ লাগছে। হলফ করে বলতে পারি গিসকে-র[৩] অতিথিশালায় দিব্যি থেকে যেতে পারতাম, যদি না মাঝে মাঝে শুধু বাড়ির কথা সংসারের কথা মনে পড়ত, আর নষ্ট না করে দিত এই পছন্দসই নির্জনতার আনন্দ!!

এছাড়া কারাবাসের আর কোন দুঃখের স্মৃতি আমায় জড়াবে না, বরং এই মুহূর্তে যদি আর একটু কালি থাকত। দোয়াতটা প্রায় নিঃশেষ, খুব বাজে ব্যাপার, বারবার কলম ডোবাতে হচ্ছে, বিরক্তিকর। এটুকুই ব্যাস, আর কোন অভাবের কথা তো আমার মনে পড়ছে না। পিতৃগৃহে থাকার সময় যত না কাজ করেছি, তার চারগুণ বেশি করছি এখানে। কিন্তু একদল শহুরে লোকের জোরজুলুমে আমার ঘোর লাগার উপক্রম, আমি আবেগ সন্ত্রস্ত, তারা আমার হাতে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নিতে প্রায় বদ্ধপরিকর।

আমি মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ, আমি পরিত্যক্ত এমনকি বিরক্ত বোধ করছি, যে-সমস্ত কারণ বন্ধু ব্র্যাকগার্ড ওরফে গরগাঁতুয়ার সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বাধা দিচ্ছে। ডাক-নামের জন্যই যেন জন্মেছি, যে-মুহূর্তে এখানে এসে পৌঁছেছি, লোকে আমার নামের চেয়ে ছবির কথাই মনে রেখেছে বেশি, সঙ্গে সঙ্গে ঐ গরগাঁতুয়াই আমার নাম, পরিচয়। সে যা হোক, হয়তো বিশ্বাস করবে না যে তোমায় লিখছি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে, কাল থেকে শুরু করে আজ এই পর্যন্ত। মাঝখানে দুবার উঠতে হয়েছিল, একবার দেখা করতে আসা লোকেদের জন্য, আর একবার জিওফ্রয়ের সঙ্গে খানা খেতে গিয়ে। ও, কী একটা খানা! ব্র্যাকগার্ডদের বর্ষপঞ্জিতে একটা ঘটনা

১. ফিলিপ অগুস্ত জাঁরো, শিল্পী, দোমিয়েব সহমর্মী বন্ধু।
২. ডন কার্লোস-এর সমর্থক, যারা স্পেনের সিংহাসনের দাবিদার সেসময়ে।
৩. পারির পুলিস প্রধান।

বটে। ম'সিয় ফিলিপ' আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন আমার পরিচিত কোন দেশভক্ত আঁকিয়ে আছে কিনা। আমি তাকে কাবা ও উয়ের কথা বলেছি। তুমি ফিলিপ'কে তাদের যে কোন একজনের ঠিকানা দিতে ভুলো না। এমনভাবে দিও যাতে তাদের চিঠি লেখা যায়।

আমি তোমার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকব। ধৈর্যের অভাব হবে না। কাবা ও উয়ের খবরও জানিও। তোমার পরিবারের সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। তাহলে ব্ল্যাকগার্ডকে এখন বিদায় দাও।

—ইতি এইচ ডি.

পুনশ্চ: তিনি এই আনন্দের মধ্যে রয়েছেন। দয়া করে রাজনীতি বিষয়ে কিছু লিখো না। এখানে চিঠি খুলে পড়ার রেওয়াজ আছে। □

# পারি কম্যুন

## গুস্তাভ কুর্বের চিঠি

গুস্তাভ কুর্বে (১৮১৯-১৮৭৭) জন্মেছিলেন সুইস সীমান্তবর্তী ওরন' শহরে, একুশ বছর বয়সে প্রথম পারিতে আসেন। ন্যাচারালিজম বা দৃষ্টবস্তু / ঘটনার হুবহু চিত্রণ/অনুকরণ তত্ত্ব/আন্দোলনে বাদীপক্ষের অন্যতম নেতা, তাঁর 'stone breakers' (১৮৪৯) ও 'Burial at Ornans' (১৮৫০) ছবি দুটি ঐতিহ্যানুসারীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল একদা। ঠোঁটকাটা বোহেমিয়ান, প্রতিষ্ঠানবিরোধী চিত্রকর, ১৮৪৮-এর রিপাব্লিকান বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বভাবত, পরে ১৮৭১-এর পারি কম্যুনে আরো সক্রিয় প্রতিরোধে সামিল, গুস্তাভ কুর্বে কম্যুনের কাউন্সিল ও এডুকেশনাল কমিশনের নির্বাচিত সভ্য ছিলেন। বস্তুত তাঁরই প্রেরণায় কম্যুন স্থাপন করে 'federation des artiste de paris'। '৭১-এর এপ্রিলে ফেডারেশনের কর্মসূচিতে স্বাক্ষর করেন কুর্বে ছাড়াও আরো তেরোজন শিল্পী। দোমিয়ে ও কামি কোরো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যপদে নির্বাচিত হন, তৎসহ এদুয়ার মানে ও মিলে। স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম কবি ইউজেন পোতিয়ে, ১৮৪৮-এর ব্যারিকেড-ফেরৎ, কম্যুনের দিনগুলিতে লিখেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর 'আন্তর্জাতিক' সংগীত। যে-কোন রকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ফেডারেশন শিল্পীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে। শিল্পশিক্ষা, শিল্প-ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব ও দর্শনচর্চার ফেডারেশন-প্রস্তাবিত নতুন পাঠকেন্দ্র একোল দ্য বোজার-এর একাধিপত্যের বিরুদ্ধে শিল্পীদের সমবেত

রায়। ফেডারেশনের কর্মসূচিতে ন্যাশনাল মিউজিয়মের যাবতীয় শিল্পবস্তু সম্পূর্ণ সুরক্ষার অঙ্গীকার করা হয়, আকাদমির নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিবাদস্বরূপ গৃহীত হয় নতুন প্রদর্শনীর কর্মসূচি, সরকারি কাজে ঘোষিত হয় শিল্পীদের সমানাধিকারের কথা। সর্বসম্মতিক্রমে কম্যুনের আর্ট কমিশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন গুস্তাভ কুর্বে, ন্যাশনাল মিউজিয়ম ও অন্যান্য শিল্পবস্তু রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে।

কম্যুনের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের পর কুর্বে সুইৎজারল্যান্ডে পালান, প্লাস ভঁদোমে নেপোলিয়নের বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ ধ্বংসে প্রত্যক্ষ প্ররোচনার দায় চেপেছিল তাঁর মাথায়। ধ্বংসকান্ডের পর তাঁকে নাকি হাত মেলাতে দেখা গিয়েছিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে, যদিও এ-সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে-কাউন্সিল কুর্বে স্বয়ং তার সভ্য ছিলেন না। বিচারে ছ'মাসের জেল ও ৩,৫০,০০০ ফ্রাঁ জরিমানা হলো তাঁর। জেল থেকে মাদাম জলিক্ল্যরকে লেখা এই ছোট্ট চিঠিতে কুর্বে জানিয়েছেন তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

স্যাঁৎ পেলাজি, ১৮৭৫, শরৎ

পারি আর ভের্সাইয়ের রাস্তায়-রাস্তায় আমাকে লুঠ করা হয়েছে, মিথ্যে গ্লানি আর অপমানের বোঝা বইতে বইতে আমি ক্লান্ত, সর্বত্র তাড়া করে ফিরেছে নির্বোধের টিপ্পনি, বিধ্বস্ত আমাকে পথে-বিপথে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছে ওরা। এখন এই নির্জন রুদ্ধতায় আমি পচে মরছি, যেখানে শরীর নষ্ট হয়, লোপ পায় সাধারণ যুক্তিবোধ। কতদিন যে ঠান্ডা মাটিতেই শুয়েছি, নোংরা জঞ্জাল, আবর্জনার পূতিগন্ধ পিঠের নিচে, সেলের ভেতরে অন্ধ পোকামাকড়ের মতো বুকে হেঁটে ফিরেছি কতদিন। পুলিশের কালো ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে, জেল থেকে জেলে ঘুরিয়ে মেরেছে আমায়। হাসপাতাল, শুধু মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে। আর একটা লোকেরও জায়গা নেই, সাংঘাতিক ভিড় সব জেলখানায়, চারমাসের ওপর গলার কাছে সারাক্ষণ উঁচিয়ে আছে বন্দুকের নল।

আর আমি একাই নয়, মরে গেছে যারা, অথবা আমরা, প্রায় জীবন্মৃত, সব মিলিয়ে লাখ দুয়েকের ওপর। শ্রমিক মেয়েরা, সব বয়সের শিশু, অধিকাংশই রুগ্ন, অসুস্থ, পারির রাস্তাই ঘরদালান যাদের কেউ নেই, প্রতিদিন হাজারে হাজারে ধরে এনে জেলে পুরে দিচ্ছে তাদের।

না, পৃথিবীর কোথাও এরকম ঘটেনি এর আগে, কোন বিবরণে, কোন যুগে, কোন জাতির জীবনেই এরকম আক্রমক প্রতিশোধলীলা, হত্যা, ত্রাস, কশাইখানার এ চেহারা কোনদিন দেখা যায়নি।...

শেষপর্যন্ত অবশ্য জেল ভেঙে পালান কুর্বে, জরিমানার বিশাল অঙ্ক আর গুনতে হয়নি তাঁকে। স্বেচ্ছানির্বাসিত, হতোদ্যম এই বিদ্রোহী শিল্পী মারা যান ১৮৭৭, সুইৎজারল্যান্ডে। ☐

ভেরনের টিম

# জননী কোলভিংস

কোন মহান শিল্পীর বিকাশের পথচিহ্ন সন্ধান করে তার পরিপার্শ্ব ও কালিক উৎসে ফিরে যাওয়ার মতো আনন্দ-উৎসাহের কাজ আর হয় না। অবশ্য, প্রধান চালিকা-শক্তির দিক থেকে নজর না সরিয়ে প্রারম্ভিক পর্যায়ের বহুবিভক্ত ও দূরবিস্তৃত মূলগুলিকে খুঁড়ে বের করার এবং বহুমুখী, প্রায়শ পরস্পরবিরোধী প্রভাবসমূহ উন্মুক্ত করার কাজে প্রচুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

ক্যোথে কোলভিংসের কাজের প্রধান চালিকাশক্তি তাই খুঁজতে হবে কোনিগস্‌বার্গে। এই শক্তি এত জোরালো ও প্রভাবশালী যে এর দ্বারাই তাঁর শৈল্পিক বিকাশের পরিপূর্ণ দিশা নির্ধারিত হয়। কারণ, যদিও তিনি পঞ্চাশ বছরের ওপর বার্লিন শহরে বসবাস এবং কাজ করেছিলেন, তাঁকে কেউ হাইনরিখ্‌ জিল বা অটো নাগালের মতো বার্লিন গোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে ধরেন না। তিনি উত্তরদেশাগত। তাঁর মানসিকতা ও শৈল্পিক নিজস্বতা বরাবর সেই উত্তরের উৎসের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। বার্লিনের শিল্পীবন্ধুদের চেয়ে তিনি আর্নস্ট বারলাখ, এডভার্ড মুন্‌খ, এমিল নোল্ড এবং এক ব্যাপকতর অর্থে রেমব্রাঁর নিকটবর্তী। কোনিগস্‌বার্গ শুধুমাত্র ক্যোথে কোলভিৎসের জন্মস্থানই ছিল না। এই

হলো শিল্পী হিসাবে তাঁর কাজের উদ্ভব ও ভিন্ন পথে যাত্রার উৎসবিন্দু এবং এখানেই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশের চাবিকাঠি। শিল্পীজীবনের গোড়ার দিকে তাঁকে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। পরবর্তী বিচারে, প্রায়শই আমরা তাঁর পরিণত শিল্পকর্মের মধ্যে সেইসব সমস্যার যথাযথ সমাধান খুঁজে পাই। প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে জোরালো এক আবেগপূর্ণ সম্পর্কই কোলভিৎসের কাজের অন্যতম প্রধান সদ্‌গুণ। কোনিগস্‌বার্গে থাকতেই অভ্রান্ত অনন্যচিত্ততার সাথে তিনি সেই সম্পর্ক আরো বিকশিত করেন।

"বহুকাল ধরে আমার যাবতীয় প্রধান কাজের বিষয়বস্তু কেন শুধু শ্রমিকদের জগৎ থেকে আহৃত হতো তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রমিক-অধ্যুষিত আমাদের এই ব্যস্ত, ব্যবসা-প্রধান শহরের সরু সরু গলিরাস্তায় আমি যে দীর্ঘ সময় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতাম, তার মধ্যে।

"সেই সময় থেকেই প্রধানত শ্রমিকদের জীবন থেকে উপাদান বেছে নিতে শুরু করি। এর আসল কারণ, সেই পরিমণ্ডলের সবকিছুই আমার কাছে খুব সহজ ও অকৃত্রিম সুন্দর বলে মনে হতো। সুন্দর, মানে আমার কাছে কোনিগস্‌বার্গের কেউ যখন ভারি মাল বইছে অথবা 'উইটিম্লেন'-এর পোলিশ 'জিম্‌কি'রা ; শ্রমজীবীর প্রাণবন্ত শরীরগতির চেয়ে সুন্দর সত্যি আর কী হতে পারে? মধ্যবিত্তরা আমাকে আদৌ আকর্ষণ করে না। তাদের পুরো জীবনটাই মনে হয় পুঁথিসর্বস্ব, অন্যদিকে প্রোলেতারিয়েত জীবনে আছে বিশাল শক্তিস্রোত।" কারো মনে হতে পারে বিশুদ্ধ নান্দনিক দিকের ওপর এক্ষেত্রে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, এই ঝোঁক সন্দেহ নেই যে একটু বিশেষ ধরনের পারিবারিক পশ্চাৎপট দ্বারা লালিত ও প্রভাবিত হয়েছিল। আকাদমি অফ্‌ দি আর্টস-এ ১৯১৯ সালে ক্যোথে কোলভিৎস যে সংক্ষিপ্ত অতীত বিবরণী পেশ করেছিলেন সেখানে তাঁর পিতা'র সম্পর্কে বলেছিলেন, "কোনিগসবার্গের মুক্ত ধর্মীয় সমাজের প্রচারক"। ক্যোথের বাবা কার্ল শ্মিড গোড়ায় আইন পড়লেও ক্রমে স্থপতির পেশায় থিতু হন। ক্যোথের মাতামহ জুলিয়াস রূপ ছিলেন জার্মানির প্রথম মুক্ত ধর্মীয় সমাজের প্রবর্তক। ক্রমে তাঁর কাছ থেকে কার্ল প্রচারকের কার্যভার গ্রহণ করেন। ব্যক্তিত্ব ও র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জুলিয়াস একাধিকবার শাস্তি ভোগ করেন, বিশেষ করে ১৮৪৮-এর পরের বছরগুলিতে। শিশু নাতনির ওপর এই মানুষটির দৃঢ় ও ঋজু ব্যক্তিত্বের জোরালো প্রভাব ছিল। কোলভিৎস নিজে তাঁর বাবাকে এমন একজন মানুষ বলেছেন যিনি "সমাজতন্ত্রে উত্তরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।" তার ভাই কন্‌রাড সম্পর্কেও একথা সত্যি। কন্‌রাড সমাজ-অর্থনীতিবিদ ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডে এঙ্গেল্‌স্‌-এর সাথে দেখা করেছিলেন। তার বান্ধবী হেলেন ব্লথের কাছে আমরা আর একটি তথ্যের জন্য ঋণী— দুজনেই তখন নিয়মিত কোনিগস্‌বার্গের এক সান্ধ্য মিটিঙে যেতেন। কার্ল মার্ক্সের



দৃষ্টিভঙ্গি যিনি জনপ্রিয় করেছিলেন সেই কার্ল কাউট্স্কির রচনা সেখানে পড়া হতো। একথা পরিষ্কার যে মানবিক ও নান্দনিক একনিষ্ঠতার সঙ্গে গোড়া থেকেই তাঁর ক্ষেত্রে যুক্ত ছিল একধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা, যা অন্তত সে সময়ে খুবই বিস্ময়কর।

১৮৮৪/৮৫ সালে বার্লিনের 'আকাদমি ফর লেডিসে' কার্ল স্টফার-বার্ণই প্রথম ক্যোথের ড্রইং-এর বিশেষ ক্ষমতায় আকৃষ্ট হন। ক্যোথে নিজেও সে সময়ে ছবি আঁকার জোরালো তাগিদে ব্যস্ত এবং পরবর্তীকালে মিউনিখের 'আকাদমি ফর লেডিসে' লুডভিগ হার্টরিখের কাছে যখন পড়ছেন, তখনও তাঁর লক্ষ্যবিষয়ে সংশয় নেই। মিউনিখের আল্ট পিনাকোথেক-এ যেসব মহান শিল্পীর কাজ তিনি দেখেন তার মধ্যে সবচেয়ে গভীর ছাপ থেকে যায় রুবেন্সের: "রুবেন্স আমায় আত্মহারা করেছে।" ফ্লেমিশ মহাশিল্পীর উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়াবেগের আসক্তি তাঁকে মুগ্ধ করত। এই কারণেই তাঁর শৈল্পিক বিকাশকে একপেশে ও সীমাবদ্ধ ভাবার প্রলোভন সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

একুশ বছরের ছাত্রীর স্বাধীন শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব মিউনিখে ১৮৮৮ নাগাদই স্ফুরণ লাভ করতে থাকে। সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা এল জোলার 'জার্মিনাল' পড়ে। ফরাসি খনি-শ্রমিকদের জীবন নিয়ে লেখা এই ন্যাচারালিস্ট উপন্যাস বছর তিনেক আগে প্রকাশিত হয় এবং বিশেষ করে অল্পবয়সীদের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। স্কুলের বাইরে

☐ ছবি: সলিডারিটাট (১৯৩১)

বাছাই করা বিষয়ের ওপর ছবি আঁকার জন্য তখন কমবয়সী ছবি-আঁকিয়েরা অনেকেই নিয়মিত মিলিত হতেন। সেখানে বিষয় হিসাবে যখন দেওয়া হয় দ্বন্দ্ববিবাদ, ক্যোথে বেছে নেন 'জার্মিনালে'র একটি দৃশ্য, যেখানে ধোঁয়াচ্ছন্ন শুঁড়িখানায় সবাই উপন্যাসের ক্যাথিকে নিয়ে লড়াইয়ে মত্ত।

ক্যোথের খসড়া-রচনা নির্বিচারে প্রশংসিত হয়। তাঁর নিজের কাছে এ ছিল এক নির্ধারক সাফল্য। সঠিক পথ বেছে নেওয়ার প্রত্যয় এর ফলে সুনিশ্চিত হলো। কোনিগসবার্গে ফিরে এসে স্কেচগুলিকে তিনি একটি বড় তৈলচিত্রের মূল উপাদানরূপে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তখন তাঁর বার্লিনযাত্রা খুবই নিকটবর্তী। সেখানে কাজের পরিবেশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য, একারণে তিনি পুরোপুরি তেলরঙ ত্যাগ করে শুধু এচিং-এ মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করার জন্য তিনি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক এচার গুস্তাভ ময়্যারের কাছে কাজ শেখেন। যে-ছবিগুলির জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত এখানেই সে কাজের সূচনা হলো।

১৮৯১-এ ক্যোথে শ্মিড বিয়ে করেন ডা. কার্ল কোলভিৎসকে এবং বার্লিনে চলে আসেন। যেখানে তিনি বাস করতেন ২৫ নম্বর ভাইসেনবার্গারস্ট্রাস (বর্তমানে কোলভিৎসস্ট্রাস) অবশ্য ২য় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়; আজ সেখানে তাঁর উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে এক স্মৃতিস্তম্ভ। ১৮৯৩ তাঁর জীবন ও কর্মের দিক থেকে আর একটি ঘটনাবহুল বছর। '৯৩-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি 'ফ্রেই বুহ্নে' (ফ্রি স্টেজ) গেরহার্ট হাউপ্টমানের 'ডাই ভেবের' (দি উইভার্স)-এর একটি ঘরোয়া অভিনয় দেখলেন। সর্বসাধারণের সামনে নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। সাইলেশিয়ার তাঁতিশিল্পীদের দুর্দশা ও ১৮৪৪-এ তাদের দুঃসাহসিক বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে রচিত এই নাটকটি তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে। আনুপূর্বিক বিচারে একটা জিনিস লক্ষ করা যায়। নিখুঁত শিল্পনৈপুণ্যে হাউপ্টমান নাটকে যে কাজ করে ছিলেন কোথের নিজের সৃজনপ্রকল্পে সেসবই প্রধান হয়েছিল: . হারার সামাজিক বঞ্চনা, বিপ্লবী প্রতিবাদের মূলমানস—এবং মৃত্যু। 'এ রিভোল্ট অফ উইভার্স' সিরিজটিই তাঁর প্রথম মহান কীর্তি। এমনকি জার্মিনালের ওপর করা এচিংগুলিও এসময় তিনি পাশে সরিয়ে রাখেন। মডেলগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা থেকে শুরু করে বছরের পর বছর অক্লান্ত, কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করে একের পর এক শরীরাবয়ব ও দৃশ্যপট পুনর্নির্মাণ করেন। ভঙ্গি ও ভাষাবিন্যাস স্থির করার জন্য এক্ষেত্রে অগণন খুঁটিনাটি পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। সমগ্রের নকশা অসংখ্য মিশ্র স্কেচের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। জীবনের বেশির ভাগ সময়েই তিনি এই প্রথাগত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যদিও পরে তিনি বারবার গোড়া'র বাস্তবধর্মী শিল্পশৈলী থেকে স্বচেষ্টায় সরে এসে স্বাধীন, মুক্ত এক শিল্পভাষায় আবো স্ফূর্তি ও সাফল্য লাভ করেন। 'উইভার্স' সিরিজের ছ'টি প্রিন্ট '৯৩ থেকে '৯৭-এর মধ্যে

রচিত হয়। কৌশলগত সমস্যার দরুন সেগুলো দুটি ভিন্ন মাধ্যমে করা হয় : তিনটি এচিং ও তিনটি লিথোগ্রাফ। কয়েকটির কিছু ভিন্ন রূপান্তরও আছে। শেষ আরো একটি প্রিণ্ট পরিকল্পনায় ছিল। কিন্তু যখন জুলিয়াস রাপ উল্লেখ করেন যে প্রথম প্রিণ্টগুলির বাস্তবধর্মিতা এবং সপ্তম প্লেটের বিমূর্ত প্রতীকধর্মিতার মধ্যে এক শৈলীগত দ্বন্দ্ব রয়েছে তখন তা পরিত্যক্ত হয়।

কোন কাজ শুরু করে কোলভিৎস কখনও তা সহজে পরিত্যাগ করতেন না। 'জার্মিনালে'র দৃশ্যটি শেষপর্যন্ত দুটি এচিং-এর বিষয় হয়ে ওঠে। একইভাবে, নয়া খসড়া রূপান্তর, আংশিক বর্জন ও শিরোনাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি 'উইভার্স' সিকোয়েন্সের পরিত্যক্ত শেষ প্রিণ্টটির আইডিয়ার ওপর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। 'জীবন' নামে একটি ট্রিপ্‌টিকন শেষ করেন, কিন্তু এর এচিং-রূপান্তরটির আরো স্পষ্ট ও যথার্থ একটি নাম দেন, 'ক্রাশড্ আণ্ডারফুট'। ১৯০০ সাল নাগাদ একক অবয়ব-গুলির মধ্যে তাঁর শৈল্পিক দক্ষতা প্রগাঢ় অভিব্যক্তির শিখরে পৌঁছয়, এবং অবশ্যই মহৎ অভিব্যক্তি। যেহেতু 'ট্রিপ্‌টিকনে'র সমগ্র অংশ কখনও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি ; শেষপর্যন্ত শুধু মা-বাবা ও শিশুর দলটি নিজ অধিকারে আলাদা প্রিণ্টরূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে 'উইভার্স' প্রদর্শিত হওয়ার সাথে সাথেই শিল্পী হিসাবে ক্যোথে কোলভিৎসের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি কমিটি তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করার প্রস্তাব রাখে, কিন্তু জার্মান সম্রাট এক্ষেত্রে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন।

'উইভার্স' শেষ করার অল্পদিন পরেই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ঘূর্ণি থেকে তিনি মনোযোগ সরিয়ে নেন জার্মান ইতিহাসের একটি অতীত বিষয়ে। ১৮৯৯ সালে তিনি 'দি পিজ্যাণ্টস্ ওয়র' এচিংটি শেষ করেন ; পরে এর নাম পাল্টে রাখা হয় 'রিভোল্ট'। ১৯০১-এ তিনি ফরাসি বিপ্লবের প্রতি একটি এচিং উৎসর্গ করেন : 'লা কার্মানোল'। এখানে প্রাচীন গুদামঘরের পশ্চাৎপটে গিলোটিন ঘিরে এক উদ্দাম নৃত্য দেখানো হয়েছে। সেই বছরই তিনি 'ডার বয়ার্নক্রিগ' নামক বিখ্যাত সিরিজটির ওপর কাজ শুরু করেন। একাজে তাঁকে বহুবছর পরিশ্রম করতে হয় এবং সিরিজটির বৃহৎ ফর্ম্যাটই তার গুরুত্বের সূচক। তাঁতীদের মিছিলের তীব্র নাটকীয় দৃশ্যগুলি যেন এখানে আবার ধ্রুপদী বিন্যাসে পুনরাভিনীত হয়েছে। 'দি প্লোম্যানে' চিত্রিত হয়েছে কৃষকদের ভূমিদাসত্ব, তাদের ক্রীতদাসদের মতো শোষণের ইতিকথা। পরের দুটি ছবিতে চিত্রিত হয়েছে লড়াইয়ের প্রস্তুতি। সিরিজটির স্মরণীয় মধ্যমণি 'দি স্টর্ম ব্রেক্‌স্' ; এর পরেই 'দি ব্যাটল্‌ফিল্ড' এবং বিদ্রোহের বিয়োগান্ত পতন—'দি এণ্ড'। অতীত ইতিহাসের বিষয় হলেও যে সময়ে কোলভিৎস কাজ করছেন, ছবিতে তার স্পষ্ট ছাপ ছিল। শ্রমিক-শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার সুস্পষ্ট সমকালীন ইঙ্গিতের ফলে একাজের প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব পরিষ্কারভাবেই আরো বেড়ে যায়।

১৮৯৩-এর আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ম্যাক্স হ্যালবির নাটকীয়



প্রেমকাহিনী 'যৌবন' সে বছরই প্রথম অভিনীত হয় এবং কোলভিৎসের ওপর তার গভীর ছাপ পড়ে। হাউপ্টমানের "দি উইভার্স" তাঁর সামাজিক দায়িত্ব-নিষ্ঠা আরো গভীর করে; হ্যালবির নাটক অস্তিত্বের অন্য এক সংকটে তাঁর চোখকে ফেরায়। জাগতিক পরিস্থিতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত মানসিক অবস্থা অবশ্যই একঅর্থে মানুষের অস্তিত্বেরই সমস্যা। একই সংকটের কথা এডভার্ড মুনখ সেসময়ে ব্যক্ত করার চেষ্টায় ছিলেন। যখন এই নরওয়েবাসীর ছবি ১৮৯২-এ প্রথমবার বার্লিনে দেখানো হয় তখন এমন কুৎসা রটে যে প্রদর্শনী কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু তিনি বার্লিনে থেকে যান এবং যখন ১৮৯৩-এ তাঁর ও ক্যোথে কোলভিৎসের কাজ কমিটি-বিহীন শিল্প প্রদর্শনীতে দেখানো হয় ( ক্যোথে কোলভিৎসও ইতিমধ্যে সরকারি প্রদর্শক কমিটি দ্বারা বাতিল হয়েছিলেন ), সমালোচক জুলিয়াস ইলিয়াস প্রথম ক্যোথের কাজের প্রশংসা করেন এবং বিশেষভাবে তার একটি প্যাস্টেলের কাজের ওপর মুনখের প্রভাবের কথা বলেন। তরুণ দম্পতির ছবির পেছনও ওই একই প্রভাব হয়তো রয়েছে। একাজের উপাদান হ্যালবির প্রেমের নাটক দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ১৮৯৩ সালের পর থেকে আমরা এবিষয়ে বেশ কয়েকটি ছবি এবং একটি এচিং পাই। এই কাজগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় তার শিল্পভাবনা সম্পূর্ণ অন্য দিকেও বিকশিত হওয়া সম্ভব ছিল। 'এ রিভোল্ট অফ উইভার্স" বিপুল সাফল্য পেল। ছাত্র থেকে তিনি শিক্ষক হলেন, কারণ সেই বছরই ( ১৮৯৮ ) তাঁকে 'আকাদমি ফর লেডিসে' শিক্ষকপদের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং তিনি তা গ্রহণ করেন।

অন্যান্য যে সমস্ত প্রভাব ক্যোথে কোলভিৎসের ওপর কাজ করেছিল সেসবও এখানে সংক্ষেপে বলা দরকার, কেননা যদিও তাঁর ব্যক্তিত্ব জোরালো ও স্বনির্ভর, তবুও চারপাশে যা ঘটত তার সবকিছু সম্পর্কেই তিনি খুব ভাবগ্রাহী ছিলেন, তাঁর কৌতূহলের বিস্তার নিয়ে অতিকথনের সুযোগ নেই; তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও তীব্র। আমরা দেখেছি তিনি জোলার উপন্যাস 'জার্মিনাল' ও হাউপ্টমানের 'ভাই ভেবের' পড়ে কত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেভাবে মানসিক অভিজ্ঞতা তাঁর সৃজনী শক্তিকে অনুপ্রাণিত করেছে তা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক। একটি প্রদর্শনীতে ক্লিংগারের 'আইন লেবেন' ( এ লাইফ ) দেখে সে সম্পর্কে তিনি লেখেন, "জীবন আমাকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলেছে।" সমসাময়িক শিল্পসাহিত্য ছাড়াও রাজনৈতিক ওঠাপড়া সমেত প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার অভিনয় এবং সামগ্রিক অর্থে জনগণের জীবনযাত্রায় তাঁর কৌতূহল ও উৎসাহের মাত্রা বরাবর তীব্র ছিল। যদি কোলভিৎস নিজে কোন সময়তালিকা প্রস্তুত করতেন তবে নিঃসন্দেহে তা এ লেখার শেষে যে নীরস সময়যাত্রা সংযোজিত হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি বর্ণাঢ্য হতো। তাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পাশাপাশি ছোটখাটো আনন্দকাহিনীরও উল্লেখ থাকত, যেমন 'সোয়ালোরা ফিরে এসেছে'। সেপ্টেম্বর ১৯১১-তে লেখা আছে: 'তেসরা সেপ্টেম্বর ট্রেফো পার্কে শান্তির

জন্য গণবিক্ষোভ', এবং ১৫ এপ্রিল ১৯১২-র : '১১০০-এর ওপর লোক নিয়ে ব্রিটিশ স্টীমার টাইটানিক ডুবে গেছে'। শিল্পীর যে দিনপঞ্জি ঘটনাচক্রে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি, মন দিয়ে পড়লে সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব কখনও অপ্রত্যাশিত আলোয় উন্মোচিত হয়ে পড়ে। যেমন মানসিক বিষন্নতায় যখন ভুগছিলেন তখনকার (১৯১০) লেখা : 'আগে আরো কাজ করতাম কারণ অনেক বেশি মন দিয়ে বাঁচতাম। ঠিক একজনের যেমন বাঁচা উচিত যদি সে আবেগ ও কৌতূহল নিয়ে চারপাশের সব বিষয়ে মন দেয়'। এই একটা লেখাই জীবনের প্রতি তাঁর মনোভাবের সারকথা।

শিল্পীর ওপর লেখা প্রবন্ধে আর্থার বোনাস বলেছেন, "ম্যাক্স ক্লিংগারের এচিং-গুলি থেকেই তিনি সবচেয়ে জোরালো শৈল্পিক প্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সাক্ষ্য অনুযায়ী সাহিত্যই তাঁর ওপর সবচেয়ে জোরালো প্রভাব বিস্তার করেছিল—বিশেষ করে জোলা, ইবসেন, আর্ন গারবোর্গ, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গোর্কি, গেরহার্ট হাউপ্টমান, আর্নো হোল্জ এবং জুলিয়াস হার্ট। কিন্তু এই আধুনিক লেখকরা ছাড়াও তাঁর কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন গোটে।" এই তালিকার সাথে আরো নাম সহজেই যোগ করা যায়, উল্লেখযোগ্য কবি ফার্দিনান্দ ফ্রিলিগ্রাথ। ক্যোথে কোলভিৎস স্মরণ করেছেন : "শ্রমিকশ্রেণীর সুস্পষ্ট বিষয় নিয়ে প্রথম ছবি আঁকি ১৬ বছর বয়সে। সেটা ছিল ফ্রিলিগ্রাথের কবিতা 'ডাই অস্ওয়ানডারার ( দি [ স্টিয়ারেজ ] এমিগ্রান্টস )-এর একটি ব্যাখ্যাচিত্র।" প্রধান প্রভাব হিসাবে ক্লিংগার ও এডভার্ড মুন্খের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রাণিত হয়েছেন হোগার্থের ব্যঙ্গাত্মক ছবি, ম্যেনিয়ের ও ফোর‍্যাঁর কাজ এবং পরবর্তীকালে আর্ন্স্ট বারলাখের কাজে।

মিউনিখে অধ্যয়ন শেষ করার পর বিদায়-উপহার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন আলব্যের বেসনারের আঁকা 'লা পুসেল' ( সেন্ট জোয়ান অফ আর্ক )-এর একটি প্রতিরূপ। অবশ্যই সেই যোদ্ধা-সন্ন্যাসিনীর তেজের কিছুটা তাঁর ভেতরেও ছিল : লোর‍্যাঁর কৃষকবালিকা এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ সেই আর এক কৃষকরমণীর প্রতি-মূর্তির সাথে—'ব্ল্যাক অ্যান'—যে-রমণী 'পিজ্যান্টস্ ওয়র'-এর প্রথম ও সার্থকতম প্রিন্টে কৃষকপুরুষকে বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করছে। ১৯০১ থেকে ১৯০৮ অবধি তিনি এই সিরিজটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে স্বজ্ঞাবলেই তিনি এমন পশ্চাৎদৃশ্য বেছে নেন যা দর্শককে সহজেই উদ্দিষ্ট চেহারাটি চিনিয়ে দেয়। সচেতনভাবে হোক বা না হোক, ক্যোথে কোলভিৎস অ্যানের ইতিকথা ও এধরনের অন্যান্য চরিত্রের সাথে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। তিনি বারবার তাঁর 'বিপ্লব ও ব্যারিকেডের যৌবনময় স্বপ্নে'র শৈল্পিক বাস্তবায়নে আবেগের সাথে জড়িত হয়েছেন। ব্ল্যাক অ্যান যে-কোন স্বকল্পিত উদ্ভাবন নয়, এক ঐতিহাসিক চরিত্র, যাকে কোলভিৎস্ জিমার-ম্যানের 'হিস্ট্রি অফ্ দি পিজ্যান্টস ওয়র'এ আবিষ্কার করেছিলেন, এ তথ্যে কিছু

আসে যায় না। যার সাথে নিজেকে একাত্ম করা যায় এমন এক নারীকে মহান বিপ্লবী সংগ্রামের মুখ্য চরিত্র হিসেবে মূর্ত করেছে যে আবিষ্কার তার গুরুত্ব নিশ্চয়ই তাঁর কাছে অপরিসীম। ১৮৯৯-এর এচিং 'অফ্‌বার' (রিভোল্ট)-এর আক্রমণকারী কৃষকদের মাথার ওপরে উড্ডীন প্রতীকি নগ্ন নারীকে এক্ষেত্রে তিনি মাটির ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়ানো এক গণনারী দ্বারা প্রতিস্থাপিত করলেন। প্রতীকধর্মিতার পরিবর্তে দৃঢ়তার সাথে বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কারণেও তা লক্ষণীয়। নারীচরিত্রে তাঁর মনোনিবেশের স্বরূপও একই রকম বিশিষ্ট : পত্নী ও মাতারূপে নারী, পরিবারে নারীর স্থান, মাঠে বা ফ্যাক্টরিতে কর্মরত নারীর ভূমিকা, বাড়িতে ঘাম ঝরা শ্রমে নিযুক্ত মেয়েরা। তাদের দুর্দশা, শোক, দুশ্চিন্তা এবং সুখের ঝলক নথিভুক্ত করার মধ্য দিয়ে তাঁর সময়কার সর্বহারা নারীদের উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী এক স্মৃতিস্তম্ভ তিনি রচনা করে গেছেন।

১৯০৪-এ ক্যোথে কোলভিৎস অধ্যয়ন করতে প্যারিসে যান। সমকালের স্বীকৃত শিল্পকেন্দ্রে তিনি যে-প্রেরণা পেলেন তার ফলে রেখা হয়ে উঠল আরো মুক্ত, আরো সাহসী টানাপোড়েনে শৈলী বা রচনার বুনোট হলো স্বাধীন, আরো স্বচ্ছন্দ। তাঁর স্বচ্ছ ও দূরদর্শী মন উপলব্ধি করতে পেরেছিল শিল্পের জন্য চাই আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ এবং জাতীয় গণ্ডির মধ্যে শিল্পের কোন উন্নতি হয় না। প্যারিসে তিনি রোজ সকালে আকাদমি জুলিয়ান-এ যেতেন। সেখানে ভিনদেশী শিল্পীদের যাতায়াত ছিল। তাঁর নিজের কথা অনুযায়ী, শিল্পের গোড়ার নীতি-নিয়মের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি ভাস্কর্যের ক্লাসে ভর্তি হন। ভাস্কর্যের দিকে তাঁর ঝোঁক এর আগে ১৯০৩ থেকেই দেখা যায়, বিশেষ করে 'উওম্যান উইথ হার ডেড চাইল্ড' এচিংটির মধ্যে। এই প্রবণতা পরে আরো জোরালো হয়ে ওঠে ; 'উইভার্স' সিকোয়েন্স, এবং 'পিজ্যান্টস্ ওয়র' নিয়ে কাজ করার সময় অন্যান্য আরো বিষয়ের সাথে, বিশেষত আলোআঁধারির দৃশ্যকল্পে তাঁর যে চিত্রশিল্পীসুলভ পক্ষপাত ছিল, কালক্রমে তা এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এসময় প্রায়ই তিনি রদ্যাঁ ও অন্যান্যদের কর্মশালা দেখতে যেতেন। বিকেলে তিনি কোনিগসবার্গের মতো প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, দেখতেন মঁমার্তের নাচের হল ও হালের কাছে কুখ্যাত ভাটিখানার শব্দবর্ণ। হাঁটতে হাঁটতে তিনি যা দেখেছেন তা ধরা আছে তাঁর প্রাণিত সাহসী রেখায়।

বার্লিনে ফিরে এলেন, তখন তাঁর ছবিতে এসেছে আরো মুক্তি ও প্রত্যয়। ১৯০৮-এ ক্যোথে কোলভিৎস সাপ্তাহিক ব্যঙ্গপত্রিকা সিম্‌প্লিসিজিমাসের সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করেন যে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ছবি ছাপতে আদৌ তিনি ইচ্ছুক কিনা। ক্রমে এই কাগজে তাঁর 'পিকচার্স ফ্রম দি লাইফ অফ দি পুওর' প্রকাশিত হতে শুরু করে। সিরিয়াস ছবিগুলির সাথে যে-ব্যঙ্গাত্মক সম্পাদকীয় শিরোনাম থাকত, সেসব প্রায়ই খাপ খেত না। অবশ্য যতক্ষণ কাম্য ফল পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ শহরের দৈনন্দিন জীবনের

দুর্দশার বিবরণ নিয়ে তাঁর সামাজিক অভিযোগ, প্রতিবাদ ব্যাপক জনগণের কাছে পেঁছে যাচ্ছে, ততক্ষণ তিনি কিছু মনে করতেন না।

১৯০৯ থেকে ১৯১১ এই সময়কালের মধ্যে ক্যোথে আর একবার মা ও শিশু এবং মৃত্যু বিষয়ে গভীরভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন ; শিশুর জীবনের জন্য মায়ের সংগ্রাম, মায়ের কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে মৃত্যু, অথবা জীবন ঢলে পড়ছে মৃত্যুমুখে। এই ট্র্যাজিক বিষয়ে তাঁর আক্রান্ত, নিযুক্ত হওয়ার অবশ্যই একটা আত্ম-নিগ্রহের দিক আছে। নিজের সন্তানদের কেন্দ্র করে সীমাহীন উদ্বেগ থেকেই তা আংশিক-ভাবে উদ্ভূত। এক গোপন "মরণাঘাতের ভয়, যা প্রায়ই অনুভব করি" রহস্যময় পূর্বাশঙ্কার মতো তাড়া করে বেড়াত। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম কাজ 'উওম্যান উইথ হার ডেড চাইল্ড' এচিং-এ তাঁর যে-ছেলে মডেল হয়েছিল তাকে তিনি শেষপর্যন্ত হারান। পিটার, তাঁর আদরের ছোট ছেলে ; ১৯১৪-র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে যুদ্ধে নাম লেখায় এবং সীমান্তে পেঁছিনোর পরে পরেই তার মৃত্যু হয়। ছেলের মৃত্যু তাঁকে ভয়ানক আঘাত করে। সে আঘাত থেকে বাস্তবিকপক্ষে তিনি কোনদিনই সেরে ওঠেননি। প্রায় সাথে সাথেই তিনি বেলজিয়ামের মাটিতে ছেলের কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা নেন। কালক্রমে গড়ে ওঠে যুদ্ধে নিহত মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অংশ যৌবনের উদ্দেশে নির্মিত সেই গভীর মর্মস্পর্শী স্মারকস্তম্ভ— 'আর যুদ্ধ নয়' সংকল্পের দৃঢ় ঘোষণা। শোকাহত পিতামাতার বিশাল গ্রানাইটস্তম্ভ নির্মিত হয় ১৯৩২-এ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাত বছর আগে। ছেলের মৃত্যু ও যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবের সাথে তাঁর বোঝাপড়ায় আসার সংগ্রাম অনেক ছবি ও প্রিন্টে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। ১৯১৬-য় লিখেছেন "এক মায়ের ছবি এঁকেছি, সে তার মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে আছে। এরকম শতশত ছবি আঁকতে পারি কিন্তু তবুও তার কোনটাই আমায় ওর কাছে নিয়ে যাবে না।" ১৯২৪-এ তিনি 'দি ওয়র' শিরোনামে একটি সিরিজ প্রকাশ করেন। বহু বছরের শ্রমের ফসল এই সিরিজে তিনি এবিষয়ে সংক্ষুব্ধ চিন্তাভাবনার সার সংকলন করেছেন। প্রতিটি প্রিন্টের আলাদা নাম তাঁর ভাবনার দিক-নির্দেশক : 'দি স্যাক্রিফাইস'—যুবতী মা তার সন্তানকে উৎসর্গ করছে, 'দি ভলান্টিয়ার্স', 'দি উইডো', 'দি মাদারস্', 'দি পিপল্'।

কীভাবে যুদ্ধের প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব বাড়তে বাড়তে শেষটায় প্রকাশ্য বিরোধিতায় দাঁড়ায় তার কথা পরিষ্কার লেখা আছে তাঁর দিনপঞ্জিতে। "কখনও কখনও এমন জায়গায় পেঁছেছি যখন যুদ্ধের মধ্যে শুধু একটা জিনিসই দেখতে পেতাম, অপরাধের উন্মত্ততা।" একথা লেখেন অক্টোবর, ১৯১৫-য়। এবং জুন ১৯১৭, লিখেছেন : "বারবার ভাবছি শান্তির প্রচারে কোন অবদান রাখতে পারি কিনা।" ১৯১৮-র গোড়ার দিকে তিনি পড়লেন ট্রেঞ্চের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা বারবুসের বিখ্যাত উপন্যাস, 'ল্য ফ্য' (দি ফায়ার)। অক্টোবর ১৯১৮-য় কবি রিচার্ড ডেহ্মেল যখন

জার্মানির শেষ জীবিত লোক পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন, তিনি Vorwarts পত্রিকায় খোলা চিঠি লিখে তাকে মুখোমুখি আক্রমণ করলেন। লেখাটি শেষ করলেন গ্যেটের উক্তি দিয়ে : "Seed corn must not be ground!" যুদ্ধের সমাপ্তি এবং রাশিয়া ও জার্মানিতে বিপ্লব তাঁকে আবার বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলির মুখোমুখি ফিরিয়ে আনল। "১৯১৮, যুদ্ধ শেষ হলো, বিপ্লব আসন্নপ্রায়। ভয়ংকর, যুদ্ধের অসহ্য চাপ আর নেই, আমরা অনেক সহজে শ্বাস নিচ্ছি। একথা সত্যি কেউ আর বিশ্বাস করছে না যে ভাল সময় আসছে। কিন্তু যে সংকীর্ণ শুঁড়িপথে আমরা বন্দী ছিলাম, নড়তে পারিনি, তার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আলো দেখতে পাচ্ছি, খোলা আকাশের নিচে বুকভরে শ্বাস নিতে পারছি। সামনের বছরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটে যাবে হয়তো।" এই বিপুল আশা অচিরেই চুরমার হয়ে গেল। ১২ জানুয়ারি, ১৯১৯-এ ক্যোথে কোলভিৎস উপলব্ধি করলেন, "প্রতিক্রিয়ার শক্তি বাড়ছে, এগিয়ে আসছে।" কয়েকদিন পর, ১৫ই জানুয়ারি, কার্ল লিবনেখ্ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গকে হত্যা করা হলো। ক্যোথে গভীরভাবে নাড়া খেলেন। লিবনেখ্টের পরিবার তাঁকে একটি মরণোত্তর প্রতিকৃতি এঁকে দিতে অনুরোধ করলে শুরু হলো প্রায় দুবছর ধরে বিষয়টি নিয়ে তীব্র অনুশীলন—শৈল্পিক ও রাজনৈতিক উভয় স্তরেই। লিবনেখ্টের জন্য তাঁর গভীর বেদনার ভাষারূপে তার পরিণতি—মেমোরিয়াল টু কার্ল লিবনেখ্ট—একটা উডকাট, তিনি শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। সর্বান্তঃকরণে অবলম্বন ও গ্রহণ করতে পারেন এমন একটি রাজনৈতিক প্রত্যয়ের জন্য গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে কেটেছে এই কটি বছর। ১৯ জানুয়ারি ১৯১৯-এ তিনি প্রথম ভোট দেন : "এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিলাম, কিন্তু এখন আবার সংকল্পহীনতা ও উদ্যমের অভাবে মরছি। আমি ভোট দিয়েছি মেহ্‌রিটসোজিয়ালিস্টেনদের [ মেজরিটি সোস্যালিস্টরা ম. পন্থী ]। তাদের প্রার্থীতালিকার শীর্ষস্থানীয় স্কিডমানের জন্য নয়, ভোট দিয়েছি মেজরিটি সোস্যালিজমের নীতির জন্য। আরো বাঁদিকে ঝুঁকে পড়ছি, ক্রমশ…।" অবশ্য, সর্বহারার প্রতি একনিষ্ঠতায় তাঁর কোনদিন দোলাচল ছিল না। 'সোনালি বিশ দশকে'র দুর্দশা—বেকারি, ক্ষুধা, নিরাশ্রয়ের আকাশ, অসুখ আর রোগের ঝাপট এবং মৃত্যু—তাঁর কাজে সবসময় প্রতিফলিত হয়েছে। নিশ্চয়ই তাই ছিল সেদিনের সবচেয়ে বড় বেদনার তিক্ত অভিযোগ।

পরিণত সামাজিক চেতনা এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের নির্দিষ্ট প্রয়োজনে, সময়দাবিতে সক্রিয় তাঁর ছবির যাত্রা এখান থেকে শুরু। "যে-কাজের প্রকৃত বাস্তব উপযোগ লক্ষ্য ব্যবহার আছে সে কাজই করতে চাই আমি। এত অসহায় ও বিভ্রান্ত সকলে, এরকম সময়ে আমি সত্যি কিছু করতে চাই" ( নভেম্বর ১৯২২ )। দুবছর আগে, ৫ জানুয়ারি ১৯২০, উপবাসী ভিয়েনার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একটি পোস্টারে কাজ করার সময় তিনি লিখেছেন : "আমি মৃত্যুই

আঁকতে চাই। মৃত্যু তার ক্ষিদের চাবুক মারছে নির্বিচারে নারীপুরুষ শিশুর এই দীর্ঘ মিছিলে, ওরা কাঁদছে, খোলা, নোয়ানো মেরুদণ্ডের দুপাশে চাবুক পড়ছে। যখন বসে বসে শিশুদের দুর্দশার ছবি আঁকতাম তা আমায় ওদের সাথে কাঁদিয়ে ছাড়ত এবং যে ভার আমাকে বহন করতে হবে সেকথা তীব্রভাবে স্মরণ করতাম। বুঝতে পারতাম সমর্থন প্রত্যাহার করার কোন অধিকারই আমার নেই, সেই আমার নির্দিষ্ট কাজ। মানুষের যন্ত্রণা আমায় দেখতেই হবে। তার কোন শেষ নেই, আর এখন তা পাহাড়ের মতো জমে উঠেছে, পথ আটকে।" পোস্টারের প্রতি আন্তরিক সহজাত টান তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরই যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি। পোস্টার এমন একটি মাধ্যম যার স্পষ্ট বক্তব্য সকলের জন্য, সরাসরি স্পষ্ট আহ্বান : "···যদি সম্ভব হয়, শুধু এ ধরনের কাজই, যার পরিচ্ছন্ন অভীষ্ট, লক্ষ্য আছে কার্যসিদ্ধির প্রেরণা আছে··।" আশ্চর্যের কথা এই যে কাউকে এখনও অবধি তাঁর এজাতীয় কাজের ওপর ব্যাপক নিরীক্ষা বা সর্বাঙ্গীন বিশ্লেষণ করতে দেখা যায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ক্যোথে কোলভিৎস্ পোস্টার আঁকতে শুরু করেন। এক প্রদর্শনীর জন্য ১৯০৬-এ একটা পোস্টারে তিনি গৃহশ্রমের ভয়াবহ ত্রাস, রক্ত ঘামের আড়াল টেনে খুলে দিয়েছিলেন। বড় বড় শহরে শিশুদের খেলার মাঠের সুবিধার জন্য আবেদন রেখে আর একটি পোস্টার আঁকেন ১৯২২-এ। পোস্টার দুটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার চরিত্রই কাজের প্রচণ্ড শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রথমটি সম্রাজ্ঞীকে অসন্তুষ্ট করে, এবং দ্বিতীয়টিকে প্রদর্শনস্থল থেকে তুলে নিতে হয় কারণ শ্রেণীঘৃণা উস্কে দেওয়ার বিষ ছিল তার রঙরেখায়। তবে তাঁর বেশিরভাগ পোস্টারই বিশের দশকে। ১৯১৯-এর পোস্টার 'ফ্রি দি প্রিজনার্স'। এরপরই ১৯২০, মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে তিনটি ব্রডশিটের আক্রমণ এবং ভিয়েনার দুর্ভিক্ষে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে আর একটি কাজ : 'ভিয়েনা মরছে, শিশুদের বাঁচাও'। ১৯২১-এ ইণ্টারন্যাশনাল ওয়র্কার্স এইডের জন্য একটি পোস্টার 'হেল্প রাশিয়া!' এবং ১৯২২-এ আমস্টার্ডামের ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ ট্রেড ইউনিয়নের জন্য যুদ্ধবিরোধী পোস্টার 'দি সারভাইভরস্ ডিক্লেয়ার ওয়র অন ওয়র'। ১৯২৪-এও অনেকগুলি কাজ করলেন। ইণ্টারন্যাশনাল ওয়র্কার্স এইডের জন্য : 'জার্মানি'স চিলড্রেন আর স্টার্ভিং'। বারবুসের বিখ্যাত উপন্যাস 'ল্য ফ্য' থেকে স্লোগান নিয়ে, মধ্য জার্মানিতে একটি যুব সমাবেশের জন্য 'নেভার এগেইন' এবং শেষে, কঠোর গর্ভপাত আইনের পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির জন্য একটি পোস্টার। ১৯২৫-এ তিনি দ্বিতীয়বার গৃহকর্মের উপর একটি পোস্টার করেন, এবং তার পরের বছর শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রচার সমর্থনে আর একটি। এই পোস্টারগুলির বেশিরভাগই বিশেষভাবে পরিকল্পিত ড্রইং থেকে তৈরি লিথোগ্রাফ বা প্রিন্ট। তালিকা মোটেই সম্পূর্ণ নয়। অবশ্য তাঁর সব কাজই তাঁর চারপাশের শোচনীয় দুঃখযন্ত্রণার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগের প্রকাশে আপোসহীন এবং এই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

'সর্বহারা' শিরোনামে ১৯২৬-এ প্রকাশিত তিনটি কাঠখোদাইয়ের কাজ—'আন-এমপ্লয়েড', 'হাঙ্গার' ও 'লিটল চিলড্রেন ডাইং'—শ্রমজীবীর বেপরোয়া জীবনযাত্রার চূড়ান্ত স্নায়ুবিদারক ছবি।

একজন শিল্পীর কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করে তার যাবতীয় সংঘাতময় বৈচিত্র্যসহ সময়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দাখিল করা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণ, কোলভিৎসের সমসাময়িক হাইনরিখ জিল শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর কৌতুক ও কাব্য চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন, কোনরকম রাষ্ট্রীয় পীড়নই যা দমিয়ে রাখতে পারে না। গেয়র্গ গ্রোসৎস, অটো ডিক্স এবং ম্যাক্স বেকমান তাঁদের হিংস্র ব্যঙ্গাত্মক প্রিন্টে সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজের মাত্রাধিক উল্লাস নিয়ে উপহাস করেছেন। কিন্তু ক্যোথে কোলভিৎসই একমাত্র যিনি সর্বদা শোষিত নিরাশ্রয়, অনাহারে রুগ্ন, উদ্বেগক্লিষ্ট মায়েদের সপক্ষে সওয়াল করেছেন। হতাশ, নিজেকে যে হত্যা করছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ, মরছে, এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে তিনি একক সংগ্রামী। বার্লিনের দরিদ্র শ্রমিকপাড়ার এক ডাক্তারের স্ত্রী হিসেবে তিনি শ্রমজীবীদের অকথ্য দুর্দশার কথা জানতেন। শিল্পী হিসেবে তাঁর অন্বিষ্ট ছিল এই অভিজ্ঞতা এমন এক বাস্তবধর্মী রূপবন্ধে প্রকাশ করা যার সত্যি কোন তাৎপর্য আছে। এক অর্থে তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পথিকৃৎ। "রাস্তার সাধারণ মানুষের জন্য কোনরকম লঘুশিল্পের দরকার নেই। হতে পারে যে অর্থহীন তুচ্ছ কোন কাজই তার বেশি পছন্দ। কিন্তু নিশ্চিত যে সে এছাড়াও আরো কিছু উপভোগ করতে পারে, ছবিও পারবে, যদি তা লঘু না হয়েও সরল হয়। আমি বিশ্বাস করি যে শিল্পী ও জনগণের মধ্যে কোন একটা বোঝাপড়া সত্যি সম্ভব। মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তাই বরাবর ঘটছে।"

ক্যোথে কোলভিৎসের দিনপঞ্জি নিশ্চয়ই সময়ের অমূল্য দলিল কখনও তীব্র, সরাসরি, কখনও মার্জিত, অন্তর্গত ভাষায় যুগের ভয়াবহ সমস্যা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। এই একই কথা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ও তাড়নায় বয়ে এসেছে তাঁর কাজে, তাঁর চিন্তার পদ্ধতি ও আবেগের নির্যাস এখানেই পাওয়া যাবে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে এরকম কয়েকটি শব্দবাক্যের পরিপ্রেক্ষিত ইতিহাস—২৩ অক্টোবর ১৯২৩: "রাইনল্যান্ডে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছে ; ডলারের বিনিময় হার ৪০,০০০ মিলিয়ন ; আগামীকাল ধর্মঘটের কথা। চারপাশে খিদের হাঁমুখ, আমরা কিছুই করছি না। মন ভারি হয়ে আসছে, বিষণ্ন অবসাদে ডুবে যাচ্ছি।" সে সময়ে জার্মানিতে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারি চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল। ১৯৩০-এ লিখেছেন "সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়ার দুষ্টক্ষত ধীরে ধীরে, চোরের মতো এগিয়ে আসছে। রেমার্কের ফিল্ম 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' এখনও নিষিদ্ধ। খুব খারাপ সময়ের মধ্যে আছি, বা হয়তো সময়টাই এমন। মহাদেশ জুড়ে বেকারি।" কিন্তু তবুও তার ১৯৩১-এর 'সলিডারিটাট' ও 'ডেমনস্ট্রেশন' লিথোগ্রাফ দুটিই বলছে যে শেষের

সেদিনেও ক্যোথে কোলভিৎস্ প্রগতিশীল শক্তির চূড়ান্ত বিজয়ের আশা ছাড়েননি। দুবছর পরে অবশ্য আমরা এই সংক্ষিপ্ত লেখাটা পাই : "থার্ড রাইখ শুরু হলো · ৩০ জানুয়ারি [ ১৯৩৩ ] হিটলার চ্যান্সেলর হয়েছে। একসাথে সব আঘাত এসে পড়ল।" ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যোথে কোলভিৎস্ ও হাইনরিষ মানকে আকাদমি থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলো কেননা তাঁরা সমস্ত বামপন্থী পার্টির কোয়ালিশনের আবেদনে সই করেছিলেন। "গ্রেপ্তার আর তল্লাশি · পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্র"। ১ এপ্রিল ১৯৩৩ : "ইহুদী বর্জন · অপসারণ।" ১০ মে :"·· ওরা বই পোড়াচ্ছে।"

মৃত্যুচিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন দীর্ঘদিন, ধারণা ছিল বেশিদিন বাঁচবেন না। বলা যেতে পারে, মৃত্যুই তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, বোন লিজের ধারণা ক্যোথের সারা জীবনই মৃত্যুর সাথে কথোপকথন। এখানে আমরা এডভার্ড মুন্খের সঙ্গে আবারও সাদৃশ্য খুঁজে পাই কেননা মুন্খের কাজও জীবন ও মৃত্যুর অন্তর্নিহিত বিরোধে দীর্ণ। ক্যোথে ভেবেছিলেন সারাজীবনের কাজকে ভূষিত করবেন মৃত্যু নিয়ে শেষ একটা দৃশ্যকল্পের আয়োজনে, মৃত্যুর গভীরে শেষতম স্মারকের সন্ধানে ছিলেন তিনি। এ পরিকল্পনা নতুন নয়. সেই ১৯২৭-এর "একটা বিরাট উদ্যোগে নিজেকে যুক্ত করার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছি ··আমার কর্মক্ষমতাকে আরো সংহত করে আনতে হবে এবং আরো কাজ চাই, আরো ছাপা, আরো প্রিন্ট। মৃত্যু নিয়ে আঁকব, হ্যাঁ মৃত্যু, আঁকতেই হবে আমাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।" ১৯৩৪-এ সিরিজটি শেষ করার আগে পুরো সাতটা বছর শেষ হয়। বার্ধক্যের প্রজ্ঞা এবং জীবনের দুঃখযন্ত্রণার গভীরে তাঁর ট্র্যাজিক অন্তর্দৃষ্টি এখানে খোদাই করা আছে। আলফ্রেড রেথেলের কাঠখোদাইয়ে যেমন মৃত্যুকে দেখানো হয়েছে বন্ধু, ঠিক তেমনি ক্যোথে কোলভিৎসের কাজে মৃত্যু হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধ, হতাশ উৎপীড়িতের দিকে, মুক্তির স্মিত ভঙ্গি তার মুখে। কিন্তু এ তাঁর শেষ কাজ নয়, শেষ কথাও নয়। তাঁর শেষ আলোকিত বার্তা মৃত্যুর নয়, বেঁচে থাকার, বাঁচিয়ে রাখার কথাই বলেছে। বাধ্যতামূলক মিলিটারি সার্ভিসের খোলাখুলি বিরোধিতা করেছে 'সিড কর্ণ মাস্ট নট বি গ্রাউন্ড' লিথোগ্রাফটি। ক্যোথে কোলভিৎস্ যুদ্ধের সমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি। নাৎসি জার্মানির আত্মসমর্পণের কয়েকদিন আগে মরিৎসবার্গের আশ্রমে, তিনি মারা যান ২২ এপ্রিল, ১৯৪৫-এ। □


LEBENDEN DEM TOTEN . ERINNERUNG AN DEN 15. JANUAR 19

# মৃত্যুর সঙ্গে কথোপকথন

## ডায়েরির ছিন্নাংশ

অগস্ট ২২, ১৯১৬

যখন খুব শুকিয়ে উঠি, তেষ্টা পায়, সেই দুঃখই যেন কামনা করি আবার। কিন্তু যখন তা ফিরে আসে তারপর, কাজের জন্য দরকারি শক্তি আর থাকে না, সব কেড়ে নেয় শোক।

একটা ড্রইং করেছি : মায়ের বাড়ানো হাতে মৃত শিশু। এরকম ড্রইং আমি শ'য়ে শ'য়ে করতে পারি, তাতেও আমি কোনদিনই পিটারের কাছে পেঁছতে পারব না, আমি খুঁজছি ওকে, হয়তো কাজের মধ্যেই ওকে ফিরে পাব আবার। অথচ যা কিছু করছি তা এত সামান্য, এত ছেলেমানুষের মতো দুর্বল, অস্পষ্টভাবে বুঝছি যে এ-অভাব আমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, কাজের মধ্যেই আছে পিটার, হয়তো ওকে আমি সত্যিই ফিরে পাব। না তা ও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, খুব ভেঙে পড়েছি, অসুস্থ, আমার চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে সময়। আমি যেন টমাস মানের সেই লেখক, যে শুধু লিখতে পারে, যা কিছু লেখা হলো, তার মধ্যে বেঁচে থাকার শক্তি নেই তার। একটাই তফাৎ শুধু, আমি ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। কোন প্রতিভাধর বা ও'র পক্ষে সম্ভব হয়তো, আমার দ্বারা হবে না একাজ।

কাজের জন্য কঠিন হতে হয়, স্থূল জীবনের যা-কিছু তার বাইরে যেতে হয়—যখনই ভাবছি সেকথা, ভুলতে পারছি না আমিও এক মা, যার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে—মাঝে মাঝে সবকিছুই এত কঠিন হয়ে আসে···

মার্চ ১৯, ১৯১৮

গতকাল থেকেই ভাবছিলাম : কীভাবে আনন্দ ধারণ করে লোকে, যখন চারপাশে অন্তত আনন্দের কিছুই নেই? তবু তাই হয়, কেননা আনন্দ প্রায় আত্মশক্তির সমান। অসহ যন্ত্রণার ভার বুকে চেপেও কেউ আনন্দে থাকতে পারে তবু—তা কি সম্ভব? সত্যিই কি একেবারে অসম্ভব তবে?

যুদ্ধ যাদের শরীরে ক্ষত পোড়া দাগ রেখে গেল, তারা কি আনন্দ প্রত্যাখ্যান করবে তা বলে, আবার মরণ তবে, আনন্দহীন মানুষ মানে শব, অশরীরী ; জীবনধর্মে বাধা দিচ্ছে তারা··· । যখন কেউ মারা যায়, রোগভোগে, যদি তার বয়স কমও হয়, আমাদের কোন হাত নেই যেখানে, ক্রমেসয়ে যায় সেক্ষেত্রে—সে মারা গেল, কেননা তার প্রকৃতিই বিরুদ্ধ, কিন্তু যুদ্ধে বিষয়টা একেবারে অন্যরকম। একটাই মাত্র সম্ভাবনার দিক, একটাই মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে তখন তার অর্থ আছে—যদি তুমি স্বেচ্ছায় বলি দাও নিজেকে, মানে সেই বিশ্বাস থাকতে হবে যে জার্মানি ঠিক করছে, তাকে বাঁচাতে হবে।

প্রথমে আমার পক্ষে ধারণা করে ওঠাই শক্ত ছিল যে যুদ্ধের অর্থ শেষে এই দাঁড়াবে, এখন যেমন মায়েরা ছেলেদের যুদ্ধে পাঠাচ্ছে, বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আসলে পাঠাচ্ছে এক কশাইখানায়। পুরো বিষয়টাই বদলে গেছে এখন, চরম বিশ্বাসহন্তার হাতে পড়েছি। তা নাহলে আজ হয়তো পিটার বেঁচে থাকত। পিটার, পিটারের মতো লক্ষ ছেলে— সব কটা ছেলের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

কিছুতেই শান্ত হতে পারছি না সেজন্য, শরীরে জোয়ার বইছে। নিজেকেই প্রশ্ন করি : কী ঘটল তাহলে, শেষপর্যন্ত? এতগুলো ছেলের আত্মবলি, আমাদের এই নিদারুণ ত্যাগস্বীকার—তারপরও কি সব একইরকম থেকে গেল না? মন ক্ষুব্ধ, ভয়ানক তোলপাড় চলছে ভেতরে।

জুন ২৮, ১৯২১

অল-স্যোল ডে-তে আমি আর কার্ল একসাথে গিয়েছিলাম রাইখস্টাগে: যুদ্ধে নিহতদের স্মরণ-সমাবেশে। এ ক্ষেত্রে, যখন জানি যে আমি কাজ করছি কোন যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক সমিতির সঙ্গে, আমার অনেক ভালো লাগে। অবশ্যই জানি যে, ধরা যাক স্মিড-রটলাফের মতো শিল্পের শুদ্ধতা অর্জন করা অন্তত আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, কিন্তু এ-ও তো ছবি। প্রত্যেকেই তার জানা শ্রেষ্ঠ উপায়ে কাজ করে, আমি খুশি যে আমার ছবির, তার ফ্রেমের বাইরেও কোন উদ্দেশ্য আছে। যখন লোকে এত হতভম্ব, বিমূঢ়, যখন তার পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন আমি যদি কিছু করতে পারি। হয়তো আরো অনেকেই তার দায় অনুভব করছে, পরোক্ষে প্রভাববিস্তারের কথা ভাবছে, কিন্তু আমার পথ খুব পরিষ্কার, একটাই কথা। অনেকেই খুব গোলমেলে পথে হাঁটছে, ধরা যাক প., দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রচার করছে, অ্যাকশনের কথা বলছে, কিন্তু সে হলো অন্তর্মুখী ক্রিয়া : এ জীবনের পোড়া ক্ষত ঢের দেখা হলো, এ জীবন পুরো ভুল, চলো এখান থেকে, আধ্যাত্মিক মুক্তির জমি তৈরি করি চলো। কেউ কেউ নব্য প্রেমের বাণী ছড়াচ্ছে, যত সব ধর্মীয় ভবঘুরের দল···এই সমস্ত ভূয়োদর্শীদের তুলনায় আমার কাজকর্ম স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ—আশা করি আরো অনেকগুলো বছর এভাবেই কাজ করে যেতে পারব।

নভেম্বর, ১৯২২

আমি আর কার্ল গিয়েছিলাম থিয়েটার দেখতে—'দি উইভার্স'—ওফ্ সেই আগুন ছড়ানো জনতার দৃশ্যগুলি। প্রথম দিনের মতোই, সেই একই অনুভূতি, হয়তো তাঁত-শিল্পীদেরই তা ব্যঙ্গ করে, তবু সেই প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা যে চোখের বদলে চাই চোখ, দাঁতের বদলে খুলে নেব দন্তপংক্তি। একই অনুভূতি হয়েছিল যখন 'উইভার্স' সিরিজের কাজ করছি নিজে।

ইতিমধ্যে বিশাল ঝড় পেরিয়ে এসেছি, বিপ্লবের দিনগুলি, বুঝেছি যে মোটেই প্রকৃত বিপ্লবী নই আমি, ব্যারিকেডে মৃত্যুবরণের সেই শৈশব-স্বপ্নপূরণের আর আশা নেই,

ব্যারিকেড গড়ে তোলার ক্ষমতাই নেই, কেননা আজ আমি জানি বাস্তবে তার অর্থ কী। কী বিভ্রমের মধ্যেই না ছিলাম এতদিন, এতগুলো বছর, নিজেকে ভেবেছিলাম বিপ্লবী, এখন দেখছি যে নেহাতই বিবর্তনবাদী। জানি না আদৌ আমি সমাজতন্ত্রীও কিনা, নেহাৎ গণ-তান্ত্রিক হওয়ারও যোগ্যতা নেই আমার। বাস্তবের ঠেলায়, বিষাক্ত হুলের জ্বালায় সব বিভ্রম ঝরে গেছে, কনরাডেরও তাই হয়েছে। হ্যাঁ, হয়তো সে, এবং আমিও পারতাম অনেক কাজ করতে, যদি প্রকৃত বিপ্লব মানে তাই হতো, যা আমরা কল্পনা করেছিলাম। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। তবু হাউপ্টমানের মতো কেউ যখন বিপ্লবের শিল্পরূপ এভাবে দেখায়, আবার মনে হয় নিজেকে বিপ্লবী, সেই পুরনো ভুল, একই ছল বারবার। □

কোথে কোলভিৎস : সংযোজনা : ২

# ক্যোথের সময়যাত্রা

১৮৬৭ : নর্থ-জার্মান ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা। 'ডাস ক্যাপিটাল', ১খণ্ড। ৮ জুলাই—স্থপতি কার্ল শ্মিড ও ক্যাথারিনার মেয়ে ক্যোথের জন্ম। ১৮৬৯ : সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির (SDAP) প্রতিষ্ঠা। ১৮৭০ : লেনিনের জন্ম। ৭০-৭১ : ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধ।

১৮৭১ : ১৮ জানুয়ারি—প্রাশিয়ার রাজা প্রথম ভিলহেলম্ ভার্সাই-য়ে নিজেকে জার্মান সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলেন, জার্মান রাইখ-এর প্রতিষ্ঠা। ফ্রান্সে প্রথম প্রোলেতারীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, পারি কম্যুন। ৭৮-৭৯ : বিসমার্কের নতুন আইন, সমাজতন্ত্রী ও সমস্ত প্রগতিপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে ; SDAP নিষিদ্ধ হলো। ৮১-৮২ : কোনিগস্‌বার্গে ক্যোথের প্রথম পাঠ।

১৮৮৩ : কার্ল মার্কস মারা গেলেন ; অগুস্ত বেবেল-এর 'উওম্যান অ্যাণ্ড সোশ্যা-লিজম' প্রকাশিত হলো। ফার্দিনান্দ ফ্রিলিগ্রাথের কবিতা 'দি এমিগ্রান্টস' ক্যোথের প্রথমদিকের ছবির প্রেরণা, গেরহার্ট হাউপ্টমান ও আরনো হোলজের সঙ্গে পরিচয়। ১৮৮৪ : ক্যোথের পিতামহ জুলিয়াস রাপের মৃত্যু, নাতনির ওপর তাঁর প্রগতিভাবনার প্রভাব ছিল তীব্র। 'জার্মান-ফ্রি রিলিজিয়াস কম্যুনিটি'র প্রবক্তা জুলিয়াসের মৃত্যুর পর ক্যোথের বাবা সে দায়িত্ব নিলেন স্বেচ্ছায়।

৮৪-৮৫ : ক্যোথে তখন বার্লিনে আকাদেমি ফর লেডিসে পড়ছেন। ১৮৮৫ : কোনিগসবার্গে ক্যোথে ; কার্ল কোলভিৎস, তখন ডাক্তারি পড়ছেন, ক্যোথের প্রেম। ১৮৮৮ : দ্বিতীয় ভিলহেলম জার্মান সম্রাট। ৮৮-৮৯ : জোলার 'জার্মিনাল', অনেক-গুলি এচিং করলেন, রুবেন্স ক্যোথের মনে নিশ্চিত ও গভীর ছাপ রেখে গেল।

১৮৮৯ : সেকেণ্ড ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রথম কংগ্রেস। শ্রমজীবীর শ্রেণী-সংগ্রামে পয়লা মে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম দিবস হিসেবে ঘোষিত হলো। ১৮৯০ : ছাপাছবির কৃতকৌশলে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করবেন, ক্যোথের সিদ্ধান্ত।

১৮৯১ : ১৩ জনে—কার্ল কোলভিৎসের সঙ্গে বিয়ে, বার্লিনে ফিরলেন, কার্ল তখন হেল্থ ইনসিওরেন্স প্যানেলের সামান্য ডাক্তার। বার্লিনের গরীব পাড়ায় বসতি, সে রাস্তার নাম এখন কোলভিৎসস্ত্রাস। ভাই কনরাড ইংল্যাণ্ডে এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা করে ফিরলেন।

১৮৯২ : ক্যোথের প্রথম সন্তান, হান্‌সের জন্ম।

৫ নভেম্বর : বার্লিনে মুন্‌খের প্রদর্শনী এমন কেচ্ছাকলরবের কেন্দ্র হয়ে উঠল যে সাতদিন পর মুন্‌খ প্রদর্শনী বন্ধ করে ছবি নিয়ে বাঁচলেন।

১৮৯৩ : ২৮ ফেব্রুয়ারি—১৮৪৪-এ শিল্পবিপ্লবের বিরুদ্ধে সাইলেসিয়ার তাঁতীদের বিদ্রোহ নিয়ে রচিত হাউপ্টমানের নাটক 'দি উইভার্স' দেখে ক্যোথের প্রাণিত ছবির সিরিজ 'এ রিভোল্ট অফ উইভার্স'। কাজ শেষ হলো '৯৭-এ। ম্যাক্স হালবির নাটক 'ইয়ুথ' দেখে আঁকলেন তরুণ স্বামী-স্ত্রীর সংসারনাট্যের ট্র্যাজেডি। জুন—গ্রেট বার্লিন আর্ট এক্সিবিশনে স্থান হয়নি। প্রথম তিনটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল 'এক্সিবিশন উইদাউট কমিটি'র আয়োজনে। সেখানে মুন্‌খেরও ছবি ছিল।

১৮৯৬ : দ্বিতীয় সন্তান পিটারের জন্ম ; প্রথম লিথোগ্রাফ।

১৮৯৮ : গ্রেট বার্লিন আর্ট এক্সিবিশনে তাঁর 'দি রিভোল্ট অফ উইভার্স' সিরিজের ছবির জন্য প্রস্তাবিত স্বর্ণপদক সম্রাটের আদেশে নাকচ হয়ে গেল। ম্যাক্স লিবারমানের নেতৃত্বে সোসাইটি ফর বার্লিন আর্টিস্ট-এর রক্ষণশীল, সরকারপন্থী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে 'berlin secession'-এর সদস্য হলেন।

১৯০১ : ফরাসি বিপ্লবের উদ্দেশে উৎসর্গিত এচিং 'la carmagnole'।

১৯০১ : পিজ্যাণ্টস ওয়র সিরিজের সাতটি এচিং—"কৃষক যুদ্ধের ছবিগুলি নিছক সাহিত্যের অনুসরণ নয়। মিছিলে সামিল কৃষকদের উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া এক মেয়ের একটি ছোট প্রিন্টের পর বিষয়টি বহুদিন আমার মনে থেকে যায়, আশা ছিল কোন একদিন আমি নিশ্চয়ই আবার কাজ করতে পারব। এসময়ে জিমারমানের 'দি পিজ্যাণ্টস ওয়র' পড়ে কৃষকপুরুষের প্রেরণাদাত্রী এক নারী-চরিত্রের কথা জানতে পারি। কৃষক হত্যার একটি বিশাল ছবির কাজে হাত দিই, সমস্ত বিষয়টি এরপর আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।" 'স্টর্ম ব্রেকস' এই সিরিজের অন্যতম ছবি।

১৯০৩ : 'উওম্যান উইথ ডেড চাইল্ড' এচিং, ক্যোথের জীবনব্যাপী কাজকর্মের অন্যতম প্রধান থিম। জীবন সরে যাচ্ছে মৃত্যুমুখে, সুখ বদলে যাচ্ছে হতাশায়, ক্যোথের ছেলেদের ঘিরে নিদারুণ দুশ্চিন্তা, সময়ে-সময়ে যা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে।

১৯০৪ : প্যারিস গেলেন। ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর উৎসাহ বেড়েছে।

১৯০৫/০৭ : প্রথম রুশ ( বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ) বিপ্লব।

১৯০৫ : ড্রেসডেনে 'the bridge'-এর নতুন শিল্প আন্দোলন। ম্যাক্সিম গোর্কির গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ।

১৯০৬ : বার্লিনে গোর্কি, 'লোয়ার ডেপথস্'-এর দারুণ জনপ্রিয়তা। ক্যোথের

পোস্টার—জার্মান এক্সিবিশন অফ হোমওয়র্ক'-এর জন্য। জার্মান সম্রাজ্ঞীর প্রদর্শনী প্রত্যাখ্যান, দেখতে যেতে পারেন, শর্ত : ক্যোথের পোস্টার সরাতে হবে।

১৯০৭ : রুমানিয়ায় কৃষকবিদ্রোহ, হাজারের বেশি মৃত্যু।

১৯০৮ : সোসাইটি ফর হিস্টোরিক আর্ট তাঁর 'পিজ্যাণ্টস ওয়র' সিরিজের ছবি ছেপে প্রকাশ করল।

১৯০৯-১০ : চেহারায় বিপ্লবী, আচরণে সমাজতান্ত্রিক, সরকারি চোখে অনৈতিক 'সিমপ্লিসিজিমাস' কাগজে ক্যোথের সিরিজ—পিকচার্স ফ্রম দি লাইফ অফ দি পুওর।

১৯০৯-১১ : মৃত্যু, নারী এবং শিশু ঘুরেফিরে নিবিড় হয়ে আসছে তাঁর কাজে।

১৯১২ : খনিশ্রমিকের স্ট্রাইক, রুঢ় জেলায়। SPD-র নির্বাচনে জয়লাভ। 'শিশুদের খেলার মাঠ চাই'—এই দাবিতে ক্যোথের পোস্টার : 'ফর গ্রেটার বার্লিন', শহরের হোর্ডিং থেকে মুছে ফেলার নির্দেশ। ক্যোথে তখন কাজ করছেন বাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের নিয়ে এক প্রদর্শনী প্রকল্পে।

১৯১৪ : বিশ্বযুদ্ধ ১। ফ্ল্যাণ্ডার্সে ২২/২৩ অক্টোবর, ছোট ছেলে স্বেচ্ছাসৈনিক পিটারের মৃত্যু। মৃত পুত্রের জন্য পরিকল্পিত সৌধ ক্রমশ যুদ্ধে নিহত যৌবনের স্মারকস্তম্ভে প্রসারিত হলো।

১৯১৭ : রুশবিপ্লব। বার্লিনে ধাতু শ্রমিকদের ধর্মঘট। ক্যোথের প্রথম প্রদর্শনী।

১৯১৮ : সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মুখপত্র Vorwarts-এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্যোথের খোলাচিঠি। জার্মানিতে নভেম্বর বিপ্লব। বার্লিনে স্বাধীন জার্মান প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা। রাজপ্রাসাদের ব্যালকনি থেকে লিবনেখ্ট ডাক দিলেন, বিপ্লব আরো দূর এগিয়ে নিয়ে যান, লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। ডিসেম্বরে জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা—লিবনেখ্ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের নেতৃত্বে।

১৯১৯ : ১৫ জানুয়ারি—লিবনেখ্ট ও রেড রোজাকে হত্যা করা হলো। রোমাঁ রোলাঁর নাটক 'The day will dawn'—ক্যোথের ড্রইং। জুন : ভার্সাই চুক্তি। নভেম্বর : তাঁর স্টুডিওতে ইয়ুথ ইণ্টারন্যাশনালের ডেলিগেটদের গোপন মিটিং।

১৯২০ : দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শ্রমিকের ধর্মঘট, প্রতিরোধ। পোস্টার : 'Vienna is dying, Save its Children', উডকাট : লিবনেখ্ট-এর মৃত্যু-স্মৃতি। ছবির নিচে লিখেছিলেন, 'Those who live to him who died'.

১৯২১ : রাশিয়ায় নিদারুণ খরা। ক্যোথের পোস্টার 'হেলপ্ রাশিয়া !'

২১-২৩ : Parting & Death—নতুন ড্রইং সিরিজের ফোল্ডারে ভূমিকা লিখেছিলেন হাউপ্টমান। ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ ট্রেড ইউনিয়নস্ ইন আমস্টার্ডামের জন্য ক্যোথের যুদ্ধবিরোধী পোস্টার ; থিয়োডোর লিভিয়ের প্রকাশিত ফোল্ডারে উডকাট : ক্ষুধা, যার বিক্রয়প্রাপ্ত অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল।

২২-২৩ : সাতটা উডকাট, বিষয় : যুদ্ধ।

১৯২৩ : জার্মানিতে চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতি, সাক্সনির সাংবিধানিক শ্রমিক সরকার উৎখাত, হামবুর্গের বিদ্রোহ মনে হলো যেন দেশজুড়ে নতুন বিদ্রোহের সূচনা করবে।

অটো ডিক্সের ছবি—Trenches ; ২৩-২৪ : পোস্টার : 'Germany's children are starving' ; ১৯২৪ : সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান ছবিপত্রের প্রথম প্রদর্শনী, ডিক্সের যুদ্ধ নিয়ে ৫০ টা এচিং-এর ফোল্ডার প্রকাশিত হলো। ১৯২৫ : 'প্রোলেতারিয়েত'—উডকাট সিরিজ।

১৯২৭ : ফ্যাসিবাদের ক্রমপ্রসারের বিরুদ্ধে ভিয়েনায় শ্রমিকবিদ্রোহ। ক্যোথে ও কার্ল রাশিয়া ঘুরে এলেন। ১৯২৮-২৯ : ভারি যুদ্ধজাহাজ তৈরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। হাইনরিষ জিল মারা গেলেন, জিলের চলচ্চিত্রে ক্যোথের সক্রিয় ভূমিকা, ব্যাসলে বিরাট প্রদর্শনী। আর্নস্ট বারলাখের Magdeburg Memorial নির্মাণ, ডিক্স যুদ্ধ নিয়ে ট্রিপ্টিকনের কাজে হাত দিলেন।

২৯-৩২ : পৃথিবী জুড়ে অর্থনীতিক মন্দা, সাড়ে সাত মিলিয়ন বেকার জার্মান। অসলোয় প্রদর্শনী—নতুন লিথোগ্রাফ—Demonstration.

১৯৩২ : রাশিয়ায় ক্যোথের বিরাট প্রদর্শনী। বেলজিয়াম গেলেন—পিটারের সমাধিস্থলে ক্যোথের ভাস্কর্য।

১৯৩৩ : হিটলার। সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলির যৌথ-সক্রিয়তার আবেদনে সই করার ফলে ক্যোথে ও হাইনরিষ মান আকাদমির সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। ১৯৩৪ : কোলভিৎস-নাগেল-জিল যৌথপ্রদর্শনী, আমস্টারডামে।

৩৪-৩৫ : কাজের বিষয় মৃত্যু এবং মৃত্যু। নুরেমবার্গ রেসিয়াল ল' প্রবর্তন। ম্যাক্স লিবারমানের মৃত্যু, হান্স গ্রুন্ডিগ শুরু করলেন অ্যাণ্টিফ্যাসিস্ট ট্রিপ্টিকন।

৩৬-৩৯ : জার্মানি স্পেনের সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করছে, ৩৮-এ অস্ট্রিয়া আক্রমণ ও দখল।

১৯৩৮ : ৯-১০ নভেম্বর—ইহুদি বিরোধী সন্ত্রাস, 'আমরা যন্ত্রণা ও লজ্জা অনুভব করছি, লালন করছি কঠিন ক্রোধ', ক্যোথে লিখলেন।

৩৯-৪৫ : বিশ্বযুদ্ধ ২।

১৯৪০ : কার্ল কোলভিৎস মারা গেলেন।

১৯৪২ : যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যোথের পৌত্র পিটারের মৃত্যু, শেষ লিথোগ্রাফ—

"This is my last will and testament : 'Seed corn must not be ground !' My heart has been very heavy these days, so I drew once more the same picture ; boys, real Berlin youngsters, straining to go like young horses scenting the morning air are held back by a woman. The woman (an old woman) is standing over the boys, holding them inside her cloak. She spreads her arms and hands around them in a violent and commanding gesture. Seed corn must not be ground ! This is fundamental—like 'war, never again !' Not a fervent wish but a commandment, indeed a peremptory demand."

১৯৪৩ : বোমার আঘাতে ক্যোথের পুরনো বাড়ি ধ্বসে পড়ল, '৪৫-এর ২২ এপ্রিল তিনি মারা গেলেন। □



গেয়র্গ বুসমান

বিশের দশকে জার্মানি :

# সক্রিয় রাজনীতি ছবির কর্মপ্রত্যয়

"আজকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশের দশকের ইউরোপীয় শিল্পের রিয়্যালিস্ট প্রবণতার দিকে তাকালে মনে হয় বিমূর্তকরণে ফিরে যাওয়ার পথে যেন এক শ্বাসগ্রহণের স্বল্প পরিসর যা কিছুদিনের জন্য অন্তত আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।"[১]

"শিল্পে রিয়্যালিজমের প্রশ্নটিকে প্রায়ই এভাবে দেখা হয়ে থাকে যেন তা শুধু শিল্পের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে শিল্পের নিজস্ব এক রিয়্যালিজম থাকে, অর্থাৎ রিয়্যালিজম বলতে শিল্পীরা বোঝেন নিছক শৈল্পিক কোন বিষয়; এবং যেহেতু শিল্প সম্পর্কে তাঁদের প্রাক্‌নির্দিষ্ট কিছু ধারণা আছে—যে-ধারণা এমনকি বাস্তবধর্মী শিল্পের পক্ষে তাঁরা প্রচার শুরু করার আগেই প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, রিয়্যালিজম সম্পর্কে তাঁদের ধারণা তাই পূর্বগঠিত এবং খুব সীমাবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়াও একজন শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের পাশাপাশি রিয়্যালিস্টিক অথবা আনরিয়্যালিস্টিক মনোভাব পোষণ করতে পারেন। ভালো হয়, যদি তিনি রিয়্যালিজমের ধারণা তাঁর শিল্পকর্ম ছাড়াও শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে, এমনকি শিল্প নয় এমন সব বিষয়ে, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে প্রযুক্ত হয়

সেইভাবে গ্রহণ করতে পারেন।"[২]

১৯১৮ সালের পরাজয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ও কাইজার রাজত্বের সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ব্যবস্থার পতন বুর্জোয়া সংস্কৃতির গভীরে এক তীব্র সংকটের সৃষ্টি করেছিল, যা তখনো অনেকটাই জার্মান ভাববাদী ঐতিহ্যে প্রোথিত ছিল। চিরায়ত মূল্যবোধগুলির আসন্ন ধ্বংসের প্রতি শিল্পীদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল নানাভাবে, সনাতন ভাব-ঐতিহ্যের সচেতন ধ্বংস, শ্লেষ-বিদ্রূপ-নিন্দার মধ্যে দিয়ে যেমন, তেমনি অন্যদিকে এক নতুন সামাজিক ভিত্তির সন্ধান ও অর্জনের প্রয়াসেও তা লক্ষণীয়।

শিল্পীরা আগের থেকে অনেকবেশি তীব্রভাবে তাঁদের কার্যক্ষেত্রের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, যেমন শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব ও লক্ষ্যের প্রশ্নে, নিজেকে বোঝার প্রশ্নে এবং সমসময়ে শিল্পের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে জড়িত যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ে। শিল্প তার প্রবল ক্ষমতা নিয়োজিত করে, আত্মদর্শন ও ভাবপ্রকাশকে ছাড়িয়ে তা আরো কিছু হয়ে উঠতে চায়, চায় মানুষের ওপর এক ঘনবদ্ধ ছাপ ফেলতে এবং অবশেষে বিশেষ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে চায় সমাজের সঙ্গে তার অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতার মূল উৎপাটন করতে। কোলভিৎসের সেই বিখ্যাত উক্তি—"আমি আমার সময়ের ওপর একটা ছাপ ফেলতে চাই"—এক্ষেত্রে তিনি খোলাখুলিভাবেই তাঁর কাজের এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা স্বীকার করেছিলেন। এইরকম যাবতীয় ধারণার, প্রয়াসের এ হলো চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত রূপ।

□ ভেরিজম্ ( Verism )

যুদ্ধ থেকে যেসব শিল্পী ক্লান্ত ক্লিষ্ট হয়ে ফিরেছিলেন, তাঁদেরই প্রথম সুযোগ এসেছিল নিজেদের অভিজ্ঞতার অবিকল স্মৃতিচারণ করার ও ঘরে ফিরে তাঁরা কী পেলেন তা নথিভুক্ত করার। "মূর্তের প্রতি এই অত্যন্ত জার্মান এবং তীব্র তার্কিক মনোভাব, এই গোঁড়া সত্যনিষ্ঠা যা আঙ্গিক বা রূপগঠনের সমস্যার প্রতি কোন আলোকপাত করে না, কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে, এক বিষাক্ত সময়ের বিশৃঙ্খল দিকগুলি সম্পর্কে সরাসরি আমাদের মন্তব্য দাবি করে, তার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে, এইসব মনোভাবকে শিল্পীরা আরো বেশি স্বচ্ছ বাস্তব উপায়ে প্রাকৃত কাঠামোর মধ্য দিয়ে কাটিয়ে বেরোতে চান। এই খেলো স্বচ্ছতা, চিত্রবস্তুর এই ইচ্ছাকৃত 'অশৈল্পিক' চরিত্র, এই পুরো বুর্জোয়ার-গালে-চড়-মারার ধরনে তার দোষ, তার পাপ, অলস মানসিকতা এবং তার সংকীর্ণতাকে প্রকাশ করা, এসবের মধ্য দিয়ে তাঁরা বাহ্যত একটা অমিশ্রিত অপরিপক্ক পরিণতি ( effect ) আনতে চান। অবশ্য এর কার্যকরী ফল যদি ষাঁড়কে লাল কাপড় দেখানোর মতো না হয়ে বরং

বিরক্তিকর হয় তাতে আর আশ্চর্য কী।"[৩] শুধু এই একদেশদর্শীভাবে বস্তুর হুবহু চিত্রকরণেই শেষ হয়নি—যদিও 'দৃশ্যগত জগতের নিজস্ব প্রকাশ'ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কোন নির্দিষ্ট বস্তু যাতে সত্য বলে মনে হয়, সেজন্য তার বৈশিষ্ট্যগুলি আনা চাই ; সহজেই যাতে চেনা যায়, তার ব্যবস্থা রাখা চাই। কিন্তু দেখা গেছে আরো বিস্তারিত প্রসঙ্গকে ধরতে গিয়ে প্রকাশের রূপ এক্ষেত্রে বারেবারেই নীতিবাচক রূপকে পরিণত হয়েছে।

গেয়র্গ গ্রোসৎস্ ছাড়া বিশের দশকে verism-এর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন অটো ডিক্স। জাঁকালো প্রকট চরিত্রের dadaist কাজ থেকে শুরু করে ও বিগত শতাব্দীগুলির শিল্পের নিরীক্ষা, বিশেষত প্রাচীন জার্মান শিল্পগুরুদের প্রয়োগকৌশল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন তাঁর অনুপুঙ্খে যথাযথ ছবির কুশলী নির্মাণে যা এক প্রবল সাম্প্রতিকতা এবং বাস্তব থেকে দূরত্বের ঠিক ভারসাম্যে দাঁড়িয়ে আছে। "একটা শ্লোগান গত কয়েকবছরে আমাদের সমসাময়িক সৃজনশীল শিল্পীদের ভাবিয়েছে। শ্লোগানটা হলো, 'প্রকাশের নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করুন'। এরকম আদৌ সম্ভবপর কিনা আমার খুব সন্দেহ আছে। যাঁরা প্রাচীন শিল্পগুরুদের কাজের সামনে দাঁড়িয়েছেন বা আরো অনুপুঙ্খভাবে তাঁদের সৃষ্টি নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজন অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত হবেন। সে যাই হোক, আমার কাছে চিত্রকলায় যা নতুন বলে মনে হয় তা হলো বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিস্তার এবং প্রাচীন শিল্পগুরুদের শিক্ষায় রয়েছে এমন একটি প্রকাশেরই আরো ঘনীভূত আঙ্গিক। আমার কাছে অবশ্য বিষয়বস্তুই প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আঙ্গিক সৃষ্টি হয় একমাত্র বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে। এই কারণে যে প্রশ্নটি চিরকালই আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আমি যা দেখেছি তার যতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব ততদূর আমি আদৌ যেতে পেরেছি কিনা, কারণ 'কীভাবে'-র থেকে 'কী' আমার কাছে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। একমাত্র 'কী' থেকেই 'কীভাবে' নির্মিত হবে।"[৪]

ম্যাক্স বেক্‌মান, বিশের দশকে যাঁর কাজ verism-এর খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, ডিক্স-এর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় তিনি আরো বেশি উদ্দীপনার সাথে নীতিবাচক রূপক-উপাখ্যানধর্মী প্রকাশকে শেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য দিনলিপি পড়লে মনে হয় বেক্‌মানকে তাঁর সমকাল বিহ্বল করেছিল। আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তাঁর ছবিতে, যেখানে আমরা দেখি সমূহ বস্তুপুঞ্জ যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন নয়, মানুষেরা হয় বন্দী, নয় পরিত্যক্ত। তাঁর লেখায় তিনি মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার জন্যই যে-আপাত মানববিদ্বেষী রূঢ় ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, তা যেন আমাদের কখনো না

৩. পাউল ফার্ডিনান্ড শ্মিট।

৪ অটো ডিক্স, ১৯২৭।

ছুলিয়ে দেয় যে গোড়া থেকেই ম্যাক্স্ বেক্‌মানের কাজ দাঁড়িয়ে আছে এক দায়বদ্ধ মানবতাবাদের ভিত্তিতে ও মানুষের দিকে মোড় নেওয়ার পথে।

"অবশেষে তাহলে যুদ্ধ তার বিশ্রী সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু জীবন সম্পর্কে আমার ধারণার কিছুই তা পরিবর্তন করতে পারেনি, বরং আরো প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে আরো কঠিনতর সময় অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন যুদ্ধের আগের থেকেও আরো বেশি করে মানুষের মধ্যে থাকার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়ে উঠছে। শহরে, আমাদের স্থান এখন সেখানেই। যে বিপুল দুর্দশা ভবিষ্যতে ঘনিয়ে আসছে, আমাদের তার ভাগ নিতেই হবে। ওই গরীব প্রতারিত জনতার প্রতারিত হওয়ার বীভৎস কান্নার কাছে আমাদের হৃদয় ও স্নায়ুকে সমর্পণ করতেই হবে। এখন আমাদের যতদূর সম্ভব মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। একমাত্র একাজ করলে তবেই আমাদের মূলত অনর্থক ও স্বার্থপর শিল্পী হিসেবে অস্তিত্বের একটা সার্থকতা পাওয়া যাবে; মানুষের কাছে তার নিয়তির একটা ছবি তুলে ধরা, মানুষকে যদি কেউ ভালবাসে সে একমাত্র একাজই করতে পারে। মূলত মানুষকে, এই সব অহংকারের পাহাড় (যার মধ্যে আমিও আছি) ভালোবাসার পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবু আমি তাকে অবশ্যই ভালবাসি—আশা করা যাক্, আগের অনেক কিছুকে আমরা পরিত্যাগ করেছি। দৃশ্য-জগতের চিন্তাহীন অনুকরণ, অবক্ষয়ী অলংকরণ ও আড়ম্বরপূর্ণ ভাবুক দুর্জ্ঞেয়তা ছেড়ে হয়তো এবার আমরা সেই সর্বোৎকৃষ্ট চিন্ময়তাকে আয়ত্ত করব যা প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে আসে, যেমন তা আছে মেলেস্-কির্শার, গ্রুনেভাল্ড্ এবং ব্রয়েগল-এর সৃষ্টিতে, সেজান বা ভান্ গখ্-এর ছবিতে।

"যদি আমরা লাভের হিসাব নিয়ে একটু কম ব্যস্ত হতাম; যদি, আমার আশা প্রকাশ করতে সাহস হয় না, আমরা আরো দৃঢ় কম্যুনিস্ট আদর্শে জীবন কাটাতাম, তবে আমরা বস্তুকে কেবল তাদের জন্যই আরও প্রবলভাবে ভালোবাসতে পারতাম। এবং আমার মনে হয়, আবার এক মহান বিশ্বজনীন রীতির ধারণায় পৌঁছনোর এই একমাত্র সুযোগ।"[৫]

গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রগুলির বাইরে কার্লসরুহতে কার্ল হুবাখ ও ভিল্‌হেল্‌ম্ শোল্‌ৎস্ কাজ করতেন। হুবাখ্ তাঁর স্পষ্ট রেখায়, অনুপুঙ্খ ড্রইং ব্যবহার করে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের এক-একটি দৃশ্য গড়ে তুলতেন; তাঁর কাজে নীতিপূর্ণ রূপক উপাখ্যানের মতো উপাদানই তাঁকে অদ্ভুত নিখুঁত ভিটেলে সামাজিক অবস্থার চিত্রণে সাহায্য করেছিল। শোল্‌ৎসের কাজে তাঁর জন্মস্থান বাডেন-এর সহজসুন্দর নিসর্গচিত্রণ ছাড়াও আছে এমন অদ্ভুতচরিত্র মানুষের ছবি যা অনেক স্পষ্ট ও জোরালো কথাই বলে।

৫. ম্যাক্স্ বেক্‌মান, ১৯২০।

## □ রিয়্যালিজম ও আসসোর ( A.S.S.O ) শিল্পীরা

Association of Revolutionary Visual Artists in Germany বা সংক্ষেপে A.R.B.K.D. বা ASSO-র সদস্য একদল তরুণ শিল্পী যাঁদের মধ্যে অটো গ্রীবেল, কুর্ট কর্ভেনার এবং হান্স ও লী গ্রুণ্ডিগ ছিলেন, verism-এর গণ্ডি থেকে বের হয়ে এসে এক রাজনীতিসম্পন্ন রিয়্যালিজম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ডিক্সের কাজ ছিল তাঁদের উদাহরণ ও উৎসাহের উৎস। ডিক্সের মতো গ্রীবেলও অত্যন্ত ধৈর্য-সহকারে তাঁর চারপাশের পরিবেশচিত্রণ দিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা ছাড়িয়েও তাঁর কাজে ভেরিজমের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করা যায়, যেমন পি. এফ. শ্মিট ১৯২৪ সালে বলেছিলেন : "কেউ যদি সত্যের ভিত্তির উপরে এক নতুন জগৎ গড়তে গিয়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান, তবে সেই প্রেমের প্রয়োজন, যা হয়তো তাঁর বর্তমান বিরূপতার আড়ালে লুকিয়ে আছে। কিন্তু একদিন যখন নুড়িপাথরগুলো সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হবে, তখনই ধারাটি যথেষ্ট প্রাবল্যের ঘূর্ণিতে বয়ে যাবে।" গ্রীবেল তাঁর কালের একজন সাক্ষীমাত্র বা সমালোচকের চেয়ে আরো বেশি কিছু হতে চান। তিনি বিকল্প উপায় এবং কর্মের দিকনির্দেশ কবতে চান। তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ উপলব্ধ হয়েছিল তাঁর 'দি ইণ্টারন্যাশন্যাল' ছবিটিতে, যা ঐক্যের প্রতি এক বিরাট তোরণ, ঐক্যের মূর্ত ধারণা।

গ্রীবেলের মতো কুর্ট কর্ভেনারও ভেবেছিলেন শ্রমিকের মুখচ্ছবি, তাঁর ক্ষেত্রে বিশেষত কৃষকের, প্রোলেতারিয়ান ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি বলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মনে হয়েছিল যে খুব সাধারণ ঐতিহ্যানুসারী চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারটি বোধহয় 'এক নতুন মানবতা'র গড়ে ওঠা ও ভবিষ্যতের একমাত্র আশা হিসেবে তার তাৎপর্য নথিভুক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায়।

ASSO-র ড্রেসডেন গ্রুপে হান্স ও লী গ্রুণ্ডিগ ছিলেন; তাঁদের কা[illegible], যেখানে তাঁরা সঠিক ও সত্য রূপায়ণের চেষ্টা ছাড়াও সময়ের উপর বিশ্বাসযোগ্য আলোকপাত করতে চেয়েছেন, সেখানে কিছু এক্সপ্রেশনিস্ট উপাদান লক্ষণীয়। "তুমি বলছো তুমি বর্ণনা করতে চাও জীবনের খুঁটিনাটি জিনিসগুলি, সকলেই যা অবহেলা করে। আমিও সংক্ষেপে তাই চাই, কারখানার শ্রমিক, একটি ছোট মেয়ে, রাস্তা, কোন পরিত্যক্ত ফ্ল্যাট, শিশুরা, গাছগুলি, বাগান অথবা শৌচালয়। এটাই আমি সম্পূর্ণ সঠিক ও ভালো উপায় বলে মনে করি। আজ সমস্ত শিল্পই, যা প্রোলেতারীয় ভাবাদর্শ থেকে উদ্ভূত নয়, তা নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য, না বললেও চলে, ছবি আজ তার দুর্দশার স্বরূপ দেখতে পায়; আমরা শিল্পীরা, আর যাই হই, অন্তত অন্ধ নই। সেই তথাকথিত শিল্প পরে কীভাবে গড়ে উঠবে আমাদের তা না ভাবলেও চলবে। আজ আমাদের কর্তব্য আমাদের ছবির সাহায্যে কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের প্রসারে সাহায্য করা, তার মানে হলো পুরনো বুর্জোয়া সমাজকাঠামোর ধ্বংসে সাহায্য করা। একটা ব্যাপার আমি খুব

পরিষ্কারভাবে বুঝেছি—এই যে শিল্প, হতে পারে তা প্রোলেতারীয় বা সেই আদর্শের জন্যে সংগ্রাম করছে, সম্পূর্ণ অর্থহীন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই পুরনো বুর্জোয়া আদর্শকেই আঁকড়ে ধরে থাকছি—অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের কেবলমাত্র শিল্পী বলেই ভাবছি। হ্যাঁ, অবশ্য প্রোলেতারীয় আদর্শে বিশ্বাসী শিল্পী, তা ঠিক। কিন্তু আমাদের সক্রিয়ভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িত হতে হবে। এই দায়িত্ব এখনও আমাদের পালন করতে হয়নি, ছবি আঁকার থেকেও যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যদি আমরা নিজেদের জীবনের এক পাশে পরিত্যক্ত রোম্যান্টিকমাত্র বলে ভাবতে আদৌ না প্রস্তুত থাকি।

"একবার আমাদের সমসাময়িক অধিকাংশ শিল্পীর দিকে তাকাও; জীবনের দ্বারা প্রহৃত দুর্বল কয়েক ব্যক্তি, তাঁদের প্রত্যেকেই নিজস্ব কামনাবাসনাকে তাঁদের নিভৃত স্টুডিয়োর এককোণে এঁকে চলেছেন, কারণ তাঁরা জানেন না কীভাবে বাঁচতে হয় এবং বিখ্যাত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগটির জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। এভাবে শুরু করা হাস্যকর, তাছাড়া এসব দুর্বলতার পরিচয়ও বটে।" ৬

প্রোলেতারীয় আত্মবিশ্বাসের একটা নতুন ছোঁয়া খুব স্পষ্টভাবে verist শিল্পীদের সঙ্গে এবং আরও বেশি করে neo-realist শিল্পীদের সঙ্গে ASSO-র শিল্পীদের ফারাক নির্দেশ করেছিল। সক্রিয় পার্টিসদস্য হিসেবে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির আলোয় সৃষ্ট তাঁদের কাজগুলি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সাহায্যের ভাবনা থেকেই প্রসূত। শিল্প আর কেবলমাত্র বাস্তবকে তুলে ধরবে না বরং তা বাস্তবতাকে ক্ষমতার শৌর্যে গড়ে তুলবে। ASSO-র শিল্পকৃতি (যার সদস্যদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট পার্টিরও সদস্য ছিলেন) স্বাভাবিক কারণেই পার্টির ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পার্টি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ASSO ষোলটি গ্রুপে বা ইউনিটে বিভক্ত ছিল, মোট সদস্য সংখ্যা ছিল আটশো।

"জার্মানিতে পাঁচ বছর বিপ্লবী শিল্পের জন্য সংগ্রাম। ১৯২৮ সালের বসন্তে বেশ কিছু শিল্পী মিলে Union of German Revolutionary Artists of Fine Art (B.R.B.K.D.) প্রতিষ্ঠাকালে এই শিল্পীদের সামনে ছিল এক সম্পূর্ণ নতুন ও কঠিন কাজ।··· যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানিতে যে বিভিন্ন আঙ্গিকবাদী (formalist) শিল্পতত্ত্বের আন্দোলন চলছিল, সেগুলি নিজেদের বিপ্লবী বলে দাবি করত। বস্তুত জার্মানিতে বৈপ্লবিক সংকট বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশে যে আদর্শগত ভাঙন ধরিয়েছিল, এই আন্দোলনগুলি তারই প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিপ্লবের প্রগতির ফলে যেমন সম্মুখভাগের লড়াই আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠল এবং

৬. হান্স গ্রুন্ডিগ, ১৯২৭।

বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের দায়িত্ব আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, আঙ্গিকগত সমস্যা ও আঙ্গিকের সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত শিল্পতাত্ত্বিক আন্দোলন ততই আরো বেশি করে ছদ্ম-বিপ্লবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। প্রত্যক্ষ কাজের দায়িত্বে কার্যসূচী প্রণয়নের পদ্ধতি ও সংগ্রামরত শ্রমিকদের সঙ্গে শিল্পীদের ঐক্যের জন্য আঙ্গিকের সমস্যাগুলিকে যেখানে তাদের প্রকৃত স্থান সেখানেই ফিরতে বাধ্য করল, অর্থাৎ শিল্পীর প্রয়োগ-কৌশলের গবেষণাগারে। · অর্থাৎ 'দায়বদ্ধ শিল্প' না 'অমিশ্রিত শিল্প' ASSO কখনো এই প্রশ্ন তোলেনি। বরং বলেছে, একমাত্র দায়বদ্ধ শিল্পেরই অস্তিত্ব সম্ভব, কারণ তা শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধ ; শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধ বলে তা আমাদের সময়ের প্রতিও দায়-বদ্ধ। অবশ্য এরকম মন্তব্য 'চিরায়ত মূল্যবোধ'গুলিকে অস্বীকার করে না, তা কেবল এই মূল্যবোধের প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে। কারণ, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির অন্তর্গত সব কিছুর মতোই মানুষের কাছে এই 'চিরায়ত মূল্যবোধে'রও প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। এখানে যা দরকারী কথা তা হলো আমাদের সময়ে একজনের শ্রেণী-অবস্থান যে পরিমাণে পরিবর্তিত হয় এই প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যও তার কাছে সেই পরিমাণে বদলায়। Association-এব শৈল্পিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংগ্রামরত সর্বহারার অবস্থানই চূড়ান্ত। যাঁরা এই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার অথবা বিরোধিতা কবেছেন, তাঁদের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য।

"যদি Association এই দায়বদ্ধতার প্রতি জোর দিয়ে থাকে, তার মানে এই নয় যে আঙ্গিকবাদী সৃষ্টিকে তা হীন চোখে দেখে। তা শুধু এই কথার ওপরই জোর দেয় যে তার শিল্পকর্মে সর্বহারার মুক্তির জন্য সংগ্রামই সবচেয়ে বড় কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে Association অর্থহীন এবং সম্পূর্ণ অনুচিত 'পুরোনো' ও 'নতুন' আঙ্গিক নিয়ে বিবাদের বিরোধিতা করে। একটি রীতির জন্য আর একটি রীতিকে ত্যাগ করা, অন্য রীতিগুলিকে বাদ দিয়ে মাত্র একটি রীতিকেই বিপ্লবী বলে আখ্যা দেওয়ার অর্থ হলো সমস্যাটিকে ভুল জায়গায় ধরা এবং অনুচিতভাবে কোন শিল্পকর্মের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে সংকুচিত করা। এই ভাবনা অনুযায়ী BRBKD আঙ্গিকমূলক সৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে তার নিজ লক্ষ্য অনুসরণ করতে দেয়। তবে এই বাধ্যতামূলক শর্তটি থাকেই যে কোন শৈল্পিক উৎপাদন, আঙ্গিক অথবা বিষয়বস্তুর প্রশ্নে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি কাজের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ এবং ব্যবহারযোগ্যতা, এবং তার আন্দোলনগত ও প্রচারগত মূল্য, যা অবশ্য কোনভাবেই সাধারণত্ব বা লঘুতা বোঝায় না ; বরং দর্শকের ওপর সবচেয়ে কার্যকরী ফল, যা কাজটির শিল্পগত মূল্যের অন্তর্গত তাকেই বোঝায়। একটি শিল্পকর্মের বিপ্লবী মূল্য স্থির করা হবে এইভাবে : (১) কোন্ বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজটি সৃষ্ট হয়েছে ; (২) কোন্ বাস্তব উদ্দেশ্য থেকে কাজটির সৃষ্টি হয়েছে ; (৩) প্রত্যক্ষভাবে কাজটি কতদূর সর্বহারার স্বার্থসাধন করার উপযুক্ত।"[৭]

৭. এ্যালেক্স কেইল ( স্যাণ্ডোর ), ১৯৩৩।

কোলভিৎসের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টিকর্মের আলোচনা ছাড়া ASSO-র কাজে যে এক নতুন আবেগের ছোঁয়া লেগেছিল তার পূর্ণ ধারণা সম্ভব নয়। তিনি নিজে যদিও কোন পার্টির সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁর যে দায়-সমর্পণ তা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সমালোচনামূলক ন্যাচারালিজম্‌ ও ASSO-র শিল্পকর্মে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের গোড়া-পত্তনের মধ্যে এক সেতু নির্মাণ করেছিল। ১৯০০ সালের পর থেকে, সম্ভবত এক্সপ্রেশ-নিজমের প্রভাবে কোল্‌ভিৎস তাঁর আগেকার ড্রয়িং-এর পরিশীলিত ভঙ্গির বদলে এমন এক চিত্রভাষা গ্রহণ করেন যার চওড়া মুক্ত টান তাঁর কাজকে আরো সংবদ্ধ ও উন্নত করেছিল। রাশিয়া থেকে একবার ঘুরে আসার পর ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ফলে ১৯২৫ থেকে তাঁর কাজে আক্রমণাত্মক ও কখনো কখনো এক নৈরাশ্যবাদী রুক্ষতা ছাড়াও ইতিবাচক, আরো আত্মবিশ্বাসী, এমনকি জোর দিয়ে বলার বিশেষ এক ভঙ্গি লক্ষ করা যায়।

"আমি কেন কম্যুনিস্ট নই তা বলার জায়গা এটা নয়। কিন্তু এখানে একথা ঘোষণা করা যায় যে গত দশ বছরে রাশিয়ায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, বিশালত্বে এবং দূরগামী তাৎপর্যে তা একমাত্র মহান ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। ১৯১৭-র নভেম্বরে একটা পুরনো পৃথিবী, যার ভিত্তি চার বছর ব্যাপী যুদ্ধ ও বিপ্লবী খননকার্যে প্রায় ক্ষয়ে গিয়ে-ছিল তা ধ্বংস করা হয়েছে। বলিষ্ঠ হাতুড়ির আঘাতে জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে এক নতুন পৃথিবী। সোভিয়েত 'রিপাব্লিকের প্রথমদিকে লেখা একটি রচনায় গোর্কি উপর দিকে পা করে ওড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। এই ঝড়ে ওড়ার স্বপ্ন আমার মনে হয় রাশিয়ায় আমি অনুভব করতে পারি। আমি প্রায়ই কম্যুনিস্টদের এই স্বপ্নের উড়াল এবং তাদের বিশ্বাসের এই তীব্রতাকে ঈর্ষা করেছি।"[৮]

ভেরিস্ট বা রিয়্যালিস্টরা যাঁরা তাঁদের কাজে নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধানে ও তাকে শক্তিশালী করে তোলার সংগ্রামে সমর্পিত ছিলেন, অনেকটাই পুরনো মাধ্যম—যেমন ফলকচিত্র (Panel Painting), ড্রয়িং ও ছাপাই ছবির স্থিতিস্থাপকগুণের ওপর নির্ভর করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাচীন শিল্পগুরুদের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজতেন এবং ডিক্সের মতো তাঁদের এক বিশাল শৈল্পিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরী মনে করতেন। আবার অনেকে ছিলেন যাঁরা নিজেদের কাজ আরো বেশি করে ছড়িয়ে দেবার জন্য ছাপানো পোস্টার, ক্রোড়পত্র ও সংবাদপত্রে অনুচিত্রণ প্রভৃতি মাধ্যমের সাহায্য নিতেন। আরো ছিল ফলকচিত্রণের কৌশল, যা তার তাৎপর্যের জন্য অবিসংবাদী এবং উন্নততর আঙ্গিক ও ফলদায়ী প্রদর্শন ক্ষমতার জন্য স্বীকৃত ছিল।

ASSO-র বাস্তববাদীদের কাছে এবং রাশিয়ায় A.C.H.R.R-এর সমমাসিকতা-সম্পন্ন শিল্পীদলগুলি, যাঁদের সঙ্গে এঁরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে চলতেন, তাঁদের

৮. ক্যোথে কোল্‌ভিৎস, ১৯২৭।

কাছে এই কাজের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল সম্ভবত লেনিনের উত্তরাধিকার তত্ত্ব, যা ১৯২০-র ৮ অক্টোবর এক সিদ্ধান্ত মারফৎ 'বুর্জোয়া উত্তরাধিকার দখল' করার কথা ঘোষণা করেছিল। তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করা নয়, বরং সমালোচনা ও যুক্তিতর্কের প্রয়োগে তার কতটুকু সর্বহারার বিপ্লবী উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খায় তার সচেতন পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও গ্রহণের কথা বলেছিলেন :

"মার্ক্সবাদ বিশ্বের ইতিহাসে বিপ্লবী সর্বহারার আদর্শ হিসাবে স্থান পেয়েছে বুর্জোয়া যুগের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জনগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে নয়, বরং ঠিক বিপরীত ভাবে, ২000 বছরেরও বেশি সময়ে মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির বিবর্তনে যা কিছু মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করে।"

কিন্তু আরো কিছু শিল্পী ASSO-তে যোগ দিয়েছিলেন যাঁরা রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়াও তাঁদের কাজের জন্য নতুন মাধ্যম ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছিলেন।

ASSO-র সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন, হাইনরিখ ভোগ্‌লর-এর (জন্ম : ১৮৭২) ব্যক্তিত্বে ও কাজে বিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহের তীব্রতা ও দ্বন্দ্বের ছাপ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। তাঁর প্রথমদিকের কাজগুলি পুরোপুরি 'jugendstil'[৯] প্রভাবিত, দ্বিতীয় স্তরের কাজগুলি বেরিয়ে এসেছে তাঁর প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে যা তিনি করেছিলেন প্রধানত ব্রাকেনহাফে তিনি যে কম্যুন্‌ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার জন্য এবং 'ওয়র্কার্স' এ্যান্ড্‌ সোলজার্স' কাউন্সিল'-এর জন্য।

"যুদ্ধ আমাকে কম্যুনিস্টে পরিণত করেছে। যে শ্রেণীর মাত্র কিছু লোকের মুনাফা-লালসা লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে, যুদ্ধের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরে আর তার অন্তর্গত থাকার কোন যুক্তি দেখতে পেলাম না। যুদ্ধের ফলে শ্রমজীবী সাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া করের বোঝা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল; সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্ঘটনা ও অভাব ছাড়া আর কিছুই লাভ হলো না। ক্রমে তারা আর শাসকশ্রেণীর দ্বারা শোষিত হতে রাজি হলো না। শ্রমিকরা সঠিকভাবেই বুঝলেন ব্যক্তিগত সম্পদই লালসার মূল।"[১০]

ভোগ্‌লর তাঁর মহান প্রতিবাদমূলক ফলকচিত্র ও সংযুক্ত চিত্রগুলিতে (compo-

৯. ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে শিল্পের গতানুগতিক আঙ্গিকের বদলে এক নতুন রূপগঠনের সন্ধান, পরে তা শিল্পের ইতিহাসে নবধারার কাজ বলে চিহ্নিত হয়। অন্যতম প্রবক্তা উইলিয়াম মরিস—আধুনিক আর্বান ডিজাইন ও বিজ্ঞাপনের এক অর্থে পূর্বসূরী, অন্যদিকে মরিসের ভাবনায় ছিল নগরকেন্দ্রিক নতুন সমাজ-ভিত্তিতে শিল্পী ও কারিগরের পুনর্বাসনের জরুরী প্রশ্নটি। মেটিরিয়াল বা উপাদান ও উপকরণের যথার্থ ব্যবহারের প্রশ্নটিও এ সময় বিশেষ গুরুত্বসহ আলোচিত হতে শুরু করে।

১০. হাইনরিখ ভোগ্‌লর ১৯১৮।

site picture) তাঁর নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক বাস্তবধর্মী আঙ্গিক খুঁজে পেয়েছিলেন। একটা বিশেষ বক্তব্যের মধ্যে খুঁটিনাটি বাস্তবচিত্র ব্যবহার করে বা জুড়ে জুড়ে নক্ষত্র বা অনুরূপ কোন জ্যামিতিক নকশার আদলে ছবিটি গড়ে তুলতেন। খুঁটিনাটি বাস্তবধর্মী ছবির ব্যবহারের ফলে তা সব সময়েই সহজে বোঝা যেত, আর একটি ছবিতে এক সঙ্গে বহু দৃশ্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঘটনার জটিল ও সমগ্র চিত্রটি রূপ পায়, শুধু তাই নয়, নতুন ভাবাদর্শের জয়ের পাশাপাশি বিপ্লবের অগ্রগতির পথে বিঘ্নগুলি ও দ্বন্দ্বগুলিও যাতে ফুটে ওঠে। প্রথমে ফলক চিত্রগুলিকে দেওয়ালচিত্রের মতো করে যাতে একসাথে বহুলোক দেখতে পায়, এভাবে নির্মাণ করা যাচ্ছিল না। তাই বক্তৃতা সফরগুলিতে ভোগ্‌লর্‌ স্লাইডস্‌ নিয়ে ঘুরতেন ও সেগুলিকে দেওয়ালে প্রতিফলিত করে ব্যাখ্যা করতেন।

ASSO-র অন্যান্য অনেক শিল্পী দেওয়ালচিত্রণের মাধ্যমটিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এক্ষেত্রে আগে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন ক্যের্ল ফ্যল্‌কার, ওস্কার নার্লিঙ্গার ও এ্যালিস লেক্স নার্লিঙ্গারের মতো কনস্ট্রাকটিভিস্ট[১১] শিল্পীরা। ক্যের্ল ফ্যল্‌কার, পেশায় স্থপতি ছিলেন, সংবাদপত্র ও প্রচারপত্রের জন্য প্রচুর ড্রয়িং ছাড়াও তিনি মেসবুর্গে জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির (K P.D) আঞ্চলিক সংগঠনের সমিতিকক্ষের জন্য দেওয়ালচিত্র এঁকেছিলেন। ওস্কার নার্লিঙ্গার 'ডি এ্যাব্‌-স্ট্রাক্টেন' নামক শিল্পীদলের একজন প্রথম সারির সদস্য ছিলেন ও নিজে বিমূর্ত কনস্ট্রাকটিভিস্ট চিত্রকলার একজন প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা নতুন বিষয়-বস্তুর সৃষ্টি সন্ধানে নিয়োজিত করতে চান ও ১৯২৮ সালে ASSO-র সাথে যুক্ত হন।

"বিশের দশকের প্রথমদিকে আমরা দেখলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল কী—মুদ্রাস্ফীতি, বেকারি, শিশুদের অকথ্য দুর্দশা, আত্মহত্যা এবং তারই পাশাপাশি আমরা দেখলাম বিবেকহীন সেই অর্থলিপ্সুদের, যারা মানুষকে শোষণ করে মুনাফার পাহাড় বানায়। আমরা যারা বিপ্লবকে দমিত ও শ্রমিকদের প্রতারিত হতে দেখেছিলাম, প্রথমে অবশ্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা যদি এখনও আমাদের আঙ্গিকগত কৌশলগুলিকে দোষমুক্ত করে আবার দাঁড় করাতে পারি তবে তা জনগণের জীবনধারার প্রকৃত রূপগ্রহণে সাবধানবাণী উচ্চারণের মতো কাজ করবে। কিন্তু পরে আমাদের স্বীকার করতে হলো যে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা বুঝতে পারলাম যে পরিবেশকে প্রভাবিত করার জন্য আমাদের আরো শক্তিশালী শৈল্পিক বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। যদি অভাব, দুর্দশা ও দুর্নীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয় তবে আমাদের ছবির বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই আমরা খুঁজে পেলাম বিমূর্ত থেকে মূর্ত আঙ্গিকে যাওয়ার পথ, শুধু তাই নয়, এক

১১. বিশ শতকের শিল্প-আন্দোলনগুলির অন্যতম। মস্কোয় জন্ম, তাৎলিনকে প্রধান প্রয়োগকর্তা বলা যায়। নাওম গাবোর ইস্তাহার দ্রষ্টব্য।

স্পষ্ট বক্তব্যের রিয়্যালিজম, যা আমাদের ভাইমার রিপাব্লিকের[১২] পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করতে সাহায্য করেছিল। যাই হোক এ এমন একটা ঘটনা যা আমাদের স্টুডিয়োর বিচ্ছিন্নতায় সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়েছিল একমাত্র জীবন ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে অবিরাম যুক্ত থাকার ফলে · । বিপ্লবী সর্বহারার ক্ষমতা বুঝতে শিখেছি, তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা হেঁটেছি। আমাদের মধ্যে অধিক সক্রিয় সদস্যরা ASSO-র সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সংগঠনের সদস্যপদ নিলেন এবং ক্রমে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য মনোনীত হলেন। ঘটনার ক্রমবিকাশের ফলে আমাদেব কাজ-কর্মের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ হলো · ।"[১৩]

ওস্কার্ নার্লিঙ্গার্ ও এ্যালিস্ লেক্স-নার্লিঙ্গারের কাজে ধ্রুপদী অংকনপদ্ধতির সঙ্গে কোলাজ ও spatter-work technique ছাড়াও আরো যুক্ত হলো আলোক-চিত্রগত উপাদান, যা তার কৌশলগত ও বিষয়গত আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সময়ে ধ্রুপদী অংকনশৈলীর কাঠামোয় আলোকচিত্রের সরাসরি অন্তর্ভুক্তির ফলে উদ্ভাবিত কৌশল পরে বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক শিল্পে দারুণভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

## ☐ ফটোগ্রাফি ও ফটোমন্তাজ

প্রযুক্তিগত শর্তগুলি পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশের দশকে ফটোগ্রাফি খুব দ্রুত একটি গণমাধ্যমে পরিণত হলো। অবশ্য শুরুতে হাতে-আঁকা ছবির তুলনায ফটোগ্রাফির যে অধিক যাথার্থ্য ও সত্যতা দাবি করা হতো, পরে পত্রিকাগুলি যে-হাবে ফটোগ্রাফ ছাপতে শুরু করল, তার বন্যায় সে-দাবি তলিয়ে গেল। "সচিত্র রঙিন পত্রিকাগুলিতে লোকে এমন এক পৃথিবীকে দেখে, যার বস্তুসত্য কোন কিছুর সঙ্গেই মেলে না · এমন অদ্ভুত যুগ আগে কখনো আসেনি যে-সময় আজকের মতো নিজের সম্পর্কে এত অজ্ঞ। শাসকশ্রেণীব হাতে রঙিন সচিত্র কাগজ জ্ঞানের প্রসার রোধ করার এক অস্ত্র, শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয় ফটোগ্রাফের অনির্দিষ্ট, এলোমেলো বিন্যাসে। অর্থহীনভাবে পাশাপাশি সাজিয়ে বেশ ভেবেচিন্তে বিচার-সচেতনতার যোগসূত্রটি এক্ষেত্রে ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ফলে 'ছবিগত ধারণা' প্রকৃত

১২ ভাইমাব বেপুব্লিক বা Weimar Republic সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের ক্ষমতায থাকাকালীন (ফ্রিড-রিশ এবার্ট তখন রাইখ চ্যান্সেলর) ভাইমারে National Conference-এ ভাইমাব সংবিধান গৃহীত হয়। এর খসড়া করেন হুগো প্রয়েস ফন নামক একজন উদারপন্থী রাজনীতিবিদ। এই সংবিধান ছিল পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের, এবং তখন আদর্শ গণতন্ত্রী রাষ্ট্র বোঝাতে ভাইমার রিপাবলিক কথাটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু যে ভাইমাব সংবিধান এক আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা জাগিয়েছিল সেখানে হিটলারের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকে রোধ করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। রচনার সময় (১৯১৯) ভাইমাব সংবিধান যথেষ্ট প্রগতিশীল মনে করা হলেও এক যুগের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে। বস্তুত হিটলার এই সংবিধান থেকে প্রভূত সাহায্য নিয়েছিলেন।

১৩ ওস্কার নার্লিঙ্গার, ১৯৫৯।

জীবনধারণাকে হটিয়ে দেয় ; এই অবিরল তুষারঝড়ে যে-বস্তুর ছবি তোলা হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়, ফটোগ্রাফের অসম্ভব সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে বক্তব্যের প্রতি তার স্পষ্ট অবহেলা।"[১৪]

Cologne progressive দলের লেফট্ সার্কেলের-এর একজন সদস্য, আলোকচিত্রী অগস্ট সাণ্ডারের কৃতিত্ব হলো যে তিনি দর্শকের অসচেতনতার সুযোগ নেওয়া বা জোর করে বোঝানোর জন্য কোন বিশেষ কৌশল ব্যবহারের চেষ্টা থেকে ফটোগ্রাফিকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। যাকে তিনি বলতেন 'exact photography', তদনুযায়ী তিনি তাঁর বিষয়বস্তু নির্মোহ পর্যবেক্ষণের চোখে দেখতেন এবং প্রসঙ্গটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে তবেই দর্শকের কাছে উপস্থিত করতেন।

"আমাকে প্রায়ই এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে যে এই কাজের প্রেরণা আমি কোথা থেকে পেলাম: তাকাও, লক্ষ করো, ভাবো, তাহলেই উত্তর পাওয়া যাবে। আমাদের সমকালের এক সম্পূর্ণ যথাযথ ছবি তুলে ধরতে ফটোগ্রাফির চেয়ে বেশি উপযুক্ত আর কোন মাধ্যম আছে বলে আমার মনে হয় না। যে কোন যুগেই আমরা দলিল ও চিত্রিত বই-এর সন্ধান পাই, কিন্তু ফটোগ্রাফি আমাদের হাতে নতুন সম্ভাবনা ও ছবির থেকে এক ভিন্ন দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। ছবি আঁকার ক্রিয়াকরণ বস্তুগুলিকে অপরূপ সৌন্দর্য অথচ নিদারুণ সত্যের আলোয় হাজির করে, কিন্তু তা আবার মর্মান্তিক প্রতারণাও করতে পারে। আমাদের অবশ্যই সত্যকে দেখার মতো সহনক্ষম হতে হবে; কিন্তু আমাদের তো সহযাত্রী সঙ্গীদের ও উত্তরসূরীদের হাতেও কিছু অর্পণ করে যেতে হবে, তার জন্য আমরা তাদের প্রিয়পাত্র হই অথবা তা না-ই হতে পারি।

"অতএব আমি যদি একজন সুস্থমস্তিষ্কের লোক হয়ে বাস্তব ঠিক যেমন তাকে তেমনভাবেই দেখার মতো অবিনয়ী হই, এবং তা কেমন হওয়া উচিত ছিল বা কেমন হতে পারত তা না দেখি, তবে বোধহয় আমি ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু অন্যরকম কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

"তিরিশ বছর ধরে আমি একজন ফটোগ্রাফার, আমি গভীর গুরুত্ব ও নিষ্ঠা নিয়ে ফটোগ্রাফির চর্চা করেছি, ভালো-মন্দ সব পদ্ধতিই আমি ব্যবহার করেছি এবং যখন ভুল করেছি তখন তা আমি বুঝতে পেরেছি।

"ক্যোলনিশ্চার কুন্স্ট্ভেরেনের প্রদর্শনীটি আমার এই অনুসন্ধানের ফল এবং এখনও আমি আশা করি, সঠিক পথেই হাঁটছি। সস্তা কৌশল, নিছক ভঙ্গি বা এফেক্ট ব্যবহার করে এমন লঘু মিষ্টি ফটোগ্রাফির মতো আর কোনকিছুকেই আমি এত গভীরভাবে ঘৃণা করি না।

১৪. সিগ্‌ফ্রিড ক্রাকার, ১৯২৭।

"অতএব আপনারা আমাকে আমাদের যুগ ও তার মানুষজন সম্পর্কে সত্যি কথা সৎভাবে বলতে দিন।"[১৫]

"· সাণ্ডার ফটোগ্রাফি ও নিজের প্রতি যে-দায়িত্ব আরোপ করেছেন তা ফটোগ্রাফিকে এমন এক অর্থবহতার সন্ধান দিয়েছে যাব প্রয়োজন ঘনিযে উঠেছিল এবং সেই কাবণেই কেউ তা দাবি করারও প্রয়োজন মনে করেননি। আমাদের সমকালীন জীবনের ছবি নথিবদ্ধ করে দলিল হিসাবে উত্তরসূরীদের হাতে রেখে যাওয়ার দায়িত্ব থেকে ফটোগ্রাফি শিল্পকে মুক্ত করেছে। এবং এইভাবে তা চিত্রশিল্পের উপর অন্য সেই দায়িত্বটি তুলে দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীর একটা ইউটোপীয় ছবির স্বপ্ন দেখানো।"[১৬]

ASSO র আরেকজন সদস্য জন হার্টফিল্ড ফটোগ্রাফিকে চূড়ান্ত শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহাব করেছিলেন। এবং তিনিই ধ্রুপদী মাধ্যমগুলি থেকে খুব মৌলিক উপায়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। যতবেশি সম্ভব বিতরণের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব ফল অর্জন করাব জন্য ফটোগ্রাফে কোলাজ পদ্ধতির ব্যবহার কবে ও কাজটিকে প্রচুর পরিমাণে ছেপে তিনি ঐতিহ্যানুসারী শিল্পের মৌলিকত্ব, অদ্বিতীয়তা, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দাবিগুলিকে নস্যাৎ করেছিলেন। শিল্পী হয়ে ওঠেন 'চালক' যে-মুহূর্তে শিল্প একটি গণ-উৎপাদনে পরিণত হয়—হয়ে ওঠে একটা 'অস্ত্র'। ১৯৩৩ সালের আগে 'আবেটাইটার ইলুস্ট্রিয়েটে ৎসাইটুং' বা 'A.I.Z.', একমাত্র যে-পত্রিকাটির জন্য হার্টফিল্ড কাজ কবতেন, একটি সংস্করণে প্রায় আধ-মিলিয়ন করে ছাপা হতো। এই বিরাট সংখ্যক পাঠকের চাহিদাপূরণে হার্টফিল্ডের কাজকে যে শুধু রিয়্যালিস্ট ছবির থেকে বেশি জোরালো ও শিক্ষামূলক করার প্রয়োজন ছিল তাই নয়, উপরন্তু এখন তার দায়িত্ব আরো অনেক বেশি, শত্রুর স্পষ্ট ও প্রকট ছবি এঁকে ক্রমাগত তার বিরুদ্ধপ্রচার।

"নতুন রাজনৈতিক সমস্যা প্রচারের নতুন মাধ্যম দাবি করে। এই কাজের জন্য ফটোগ্রাফিরই আছে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষমতা।"[১৭]

"ফটোগ্রাফি একটা যান্ত্রিক মাধ্যম কিন্তু ফটোমন্তাজ ফটোগ্রাফির উৎপন্ন ফলাফল কাজে লাগায়। এ কাজের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ক্রমে এক সামগ্রিক ঐক্যরূপ লাভ করে। ফিল্ম 'শুট করা' বা টেক্ করা বলার রীতিটি প্রতিক্রিয়াশীল। একটা ফিল্ম 'কনস্ট্রাক্ট' করতে হয়, ক্রমে গড়ে তুলতে হয়, তাকে দিয়ে কথা বলাতে হয়, অর্থাৎ একটা ফিল্ম নির্মাণ বা সৃষ্টি করতে হয়। আমাদের শিল্পতত্ত্ব ও বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের এই পার্থক্যই নির্দেশ করে আমাদের কাজ কেমন হবে ও একটা তথ্যবহুল

---

১৫. অগস্ট সাণ্ডাব ১৯২৭।

১৬. অগস্ট সাণ্ডাবেব বইয়ের সমালোচনা।

১৭. জন হার্টফিল্ড, ১৯৩৫।

ফটোমন্তাজ শেষপর্যন্ত কীভাবে উপস্থাপিত হবে। যখন আমি তথ্যসংগ্রহ করি, পাশাপাশি ফেলে তার তুলনাবিচার করি, তখন আমি তা করি শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে এবং তার ফলে জনগণের উপর তার বিক্ষোভ-প্রচারমূলক ক্রিয়া হয় বিরাট। কাজের এ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, কাজের ভিত্তি। আমাদের কাজ স্পষ্টতই কীভাবে জনগণের ওপর সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে প্রবল ও তীব্র প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করা যায় তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রয়োগ।”[১৮]

## □ কনস্ট্রাক্টিভিস্ট ও প্রগ্রেসিভ গ্রুপ

কোলনের প্রগতিবাদী দল যাদের মধ্যে আমরা কেবল হাইনরিষ্ হ্যর্লে, ফ্রানৎস্ ভিল্হেল্ম্ সাইভার্ট ও গের্ট আর্ন্ট্স-এর কথা আলোচনা করব, আর একটি ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানকে সূচিত করে। তত্ত্বগতভাবে সংগঠনের কার্যসূচী প্রণয়ন করেছিলেন প্রধানত সাইভার্ট এবং নিছক বিবৃতির পরিবর্তে তার কোন কোন অংশে ছিল বিশ্লেষণী বিস্তার। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত তার পরিধি বিস্তৃত ছিল।

কোলনের প্রগ্রেসিভদের কাজে ডাচ 'ডি স্টিল (de stijl) ও রুশী কনস্ট্রাকটিভিজম ও মালেভিচ-প্রবর্তিত সুপ্রিম্যাটিজম-এর সঙ্গে বৌদ্ধিক ও আঙ্গিকী সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই শিল্প আন্দোলনগুলির বিপরীতে কোলন প্রগ্রেসিভদের কাজ ছিল সর্বতোভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক এবং তার ফলে বরাবরই এঁরা এক আপাত সহজবোধ্যতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ছবির আয়তাকার ফ্রেমের ভিতরে মনুষ্যশরীরাবয়বনির্ভর দৃশ্যগুলি মৌল জ্যামিতিক কাঠামোর আদলে গড়ে তোলা হতো। হ্যর্লের ছবিতে ছিল ফার্দিনান্দ লেজেরের সঙ্গে তুলনীয় ত্রিমাত্রিক চরিত্র এবং valori plastici বা ছবিগত প্ল্যাস্টিক গুণ। কিন্তু সাইভার্ট ছবিকে গড়ে তুলতেন দ্বিমাত্রিক কাঠামোয় এবং স্থানিক চরিত্র আনতেন রঙের সাহায্যে।

গের্ট আর্ন্ট্স্ যিনি প্রগতিবাদী দলের অনাবাসিক সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর ছাপাই ছবির কাজে কনস্ট্রাকটিভিজমের রীতি হয়ে দাঁড়াল এক সুবোধ্য, নিরপেক্ষ কিন্তু আবেগসম্পন্ন চিত্রভাষা। পত্রিকাগুলিতে বহুলব্যবহৃত এবং আ. শিংকেল ও পে. আল্মার সহযোগিতায় ভিয়েনার ভির্টশাফ্ট্-উনড্ গেজেলশ্যাফ্ট্ মিউজিয়ামের এ্যাট্লাসেও প্রকাশিত আর্ন্ট্স-এর কাজ বহুক্ষেত্রে চিরাচরিত শিল্পের পরিধি অতিক্রম করে গিয়েছিল।

“ছেঁড়া জায়গাগুলোতে তালি জুড়ে-জুড়েও আর শ্রেণীবহুল সমাজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না ; বুর্জোয়াদের আর একটি চিত্রভাষার জন্ম কোনমতেই সম্ভব নয়। কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যা, স্থাপত্যশিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন

---

১৮ জন হার্টফিল্ড, ১৯৩৬।

কোন প্রকল্পের সঙ্গে শিল্পীদের কোন সংহতিও স্বয়ংক্রিয়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আর কোন নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেবে না। এই সংহতি একটি সাধারণ যুক্তিপূর্ণ পুনর্বিন্যাসের অঙ্গ এবং তা ক্রমে সেইসব উপাদানের সৃষ্টি করবে যা বর্তমান সমাজব্যবস্থার অবসানেই সাহায্য করবে। চিত্রভাষায় এই আমূল পরিবর্তনের শুধু প্রতিফলন ছাড়াও আরো বেশি কিছু এখনই লক্ষ করা যাচ্ছে। এরকমই ঘটতে থাকবে ও মননের আলো প্রবল এক বিপ্লবী পরিবর্তনে তা সমাপ্ত হবে।"[১৯]

হ্যার্লে, সাইভার্ট ও আর্ণ্টস-এর কাজের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো ছবিতে উপস্থাপিত মনুষ্যশরীর ও চরিত্রের এমন পরিকল্পনা যাতে তারা সম্পূর্ণ নামহীন হয়ে দাঁড়ায়। চিত্রশিল্পীদের কাছে এই পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত উচ্চধারণার সমালোচনার কারণে। তাঁদের ছবিতে তাঁরা একটা নব্যযৌথতার ধারণা, নতুন এক সমষ্টিচরিত্র ফুটিয়ে তুলে তার বিপরীতে কথা বলার চেষ্টা করতেন। আঙ্গিকশৈলীর বিচারে প্রগ্রেসিভরা নিজেদের কাজকে সেজান থেকে শুরু করে ফিউচারিজম্ ও কিউবিজমের মধ্য দিয়ে কনস্ট্রাকটিভিজমে শিল্পের ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণতি বলে ভাবতেন, সুপ্রিম্যাটিস্টদের ছাড়িয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন বাস্তবতার এমন সত্য ছবি আঁকতে যা সস্তা বিষয়াবেগ ও কাকতালীয় দুর্ঘটনার বিপদ থেকে মুক্ত এবং তার ক্রিয়া যোগসূত্র ও টানাপোড়েনসমেত চিত্রিত। চেয়েছিলেন 'ছবির আঙ্গিকগত উপাদানগুলি সম্পর্কে একটা যৌথ ধারণা অর্জন করতে যা তার উদ্দেশ্যের একমুখীনতার জন্য অবশ্যই একক ছবি বা একক অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যাবে।'[২০]

প্রগ্রেসিভদের নিজেদের সম্পর্কে রাজনৈতিক ধারণা—যেমন পাওয়া যায় 'সোৎশিয়ালিসটিশে রেপুব্লিক ডাই আক্ৎসিওন, ডাই রেভোলুৎসিওন' ও ১৯২৯ থেকে '৩৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত দলের নিজস্ব পত্রিকা 'আ বিস্ৎসেট্'-এ প্রকাশিত অসংখ্য ঘোষণা ও রচনায়—তাদের চিহ্নিত করে 'মার্ক্সীয় পরিভাষা ব্যবহারকারী সোশ্যালিস্ট' হিসাবে। সাইভার্টকেই সেখানে বারবার বক্তার ভূমিকায় দেখা যায়। এই সমস্ত লেখাই বিপ্লবপূর্বে ও পরবর্তীকালের রাশিয়ায় উচ্চারিত রাজনৈতিক বিতর্কেরই ক্রমানুসরণ বলা যায় সর্বহারার শাসনের ভিত্তিরূপ কী হবে—পার্টি না কাউন্সিল প্রথা, সর্বহারার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও 'প্রোলেৎকুলৎ'-এর প্রশ্নটিকেই বা দেখা হবে কীভাবে।

সাইভার্ট লুনাচার্স্কি এবং বোগদানভের লেখা পড়েছিলেন এবং তাঁদের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন। শুরুতে 'প্রোলেৎকুলৎ'-র প্রবক্তাদের মতোই তিনিও বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত সমাজের কথা বলতেন যার যৌথসংস্কৃতিতে শিল্পী ও জনতার মধ্যেকার উৎপাদক ও ভোক্তার

১৯ গের্ট আর্ণ্টস, ১৯৩০।

২০ এফ ডব্লিউ সাইভার্ট, ১৯৩২।

বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যাবে এবং দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসাবে প্রত্যেকের কাজের ভিত্তি ও উপাদান হবে শিল্প।

"সর্বহারার সংস্কৃতি বলে কোন কিছু আদৌ নেই, কারণ নিপীড়িত শ্রেণী তার প্রভুর সংস্কৃতিই গ্রহণ করে। যেমন বাড়ির কাজে নিযুক্ত মেয়েরা তাদের মনিবনীর ফেলে দেওয়া পোষাকই পরে। সর্বহারার কোনদিনই নিজস্ব সংস্কৃতি হবে না, কেননা সর্ব-হারার ধারণাটি অবিচ্ছেদ্যভাবে মুনাফা-অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে যুক্ত। তার অবসান মানে সর্বহারারও অবসান এবং তখন তা হবে তার নিজস্ব সংস্কৃতিসৃষ্টির দায়িত্ব-সম্পন্ন এক শ্রেণীহীন সমাজ এবং এমন এক সংস্কৃতি, যা মানুষের ওপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে গঠিত নয়। এই সংস্কৃতির চেহারা কী হবে তা আমরা, যারা নোংরা দুর্নীতির মাটিতে জন্মেছি, তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেক্ষেত্রে কর্ম ও জীবনসংগঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্পের এক নিবিড় যোগ থাকবে।

"বোগদানভ বিজ্ঞানকে বলছেন মানুষের শ্রমের সংগঠন, যদি কেউ শ্রমকে ব্যক্তির জীবন ও সমষ্টিজীবনের রক্ষণাবেক্ষণের শিল্প হিসাবে সঠিকভাবে ধারণা করতে পারেন, তবে শিল্প শ্রম ও জীবনের গঠনক্রিয়ার প্রত্যক্ষীকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলকচিত্রণ যা হঠাৎ সৃষ্ট হয়নি বরং আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে এক আভ্যন্তরীণ তাগিদেই তৈরি হয়েছিল, ইদানীং তার অদ্ভুত বিকাশ হয়েছে। যাই হোক, ব্যক্তির একক শিল্প-কর্মের বিকাশ, তা এক আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির সাক্ষ্যস্বরূপই হোক অথবা তার মালিকের মালিকানার প্রমাণ হিসাবেই হোক, আর সম্ভব নয়। যে কোন কাজ সমগ্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের সচেতনতা থেকে সৃষ্ট হয় এবং নিজেকে সেই সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত করে। আজকের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সমাজের হয়ে পুনর্গঠন ক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

"বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা (এবং সকল বুদ্ধিজীবীই বুর্জোয়া) যারা ভবিষ্যতের সমাজস্বপ্নে অংশীদার, আপাতত একটিই কাজ করতে পারেন এবং তা হলো পুঁজিবাদী সমাজভিত্তির ধ্বংসে সাহায্য করা। যেহেতু বুর্জোয়া সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক বিকাশ বর্তমান সমাজের ভিত্তিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, সেখানে একথা ঘোষণা করা উচিৎ এবং ঘটনাপ্রবাহকে চাপা দেওয়ার অথবা জোড়াতালি দেওয়ার যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা উচিৎ। সমস্ত তথাকথিত 'প্রোলেতারীয়' সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাই 'বয়স্ক শিক্ষা' ধরনের বুর্জোয়া বিকল্প এবং জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা। শুধু তাই নয়, এসবই চেষ্টা করে বিপ্লবী আন্দোলনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে, একটি ধ্বংসমুখী সমাজ ও একটি সমাজ যা গড়ে তোলার জন্য তারা লড়ছে—এই দুয়ের মধ্যে এমনকি সাংস্কৃতিক স্তরেও যোগসূত্র থাকা সম্ভব, সর্বহারার মনে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার সঞ্চারে শ্রেণীসংগ্রামের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে। বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা সহজাত প্রেরণাবলে বোঝেন যে শ্রেণীহীন সমাজে মানুষের মধ্যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভেদ থাকবে না, শাসকনেতা ও শাসিতের

মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না, সর্বহারার মধ্যে বুর্জোয়া চেতনার বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁরা এভাবে নিজেদের অবস্থান রক্ষা করতে চেষ্টা করেন।"[২১]

রাশিয়ায় যখন লেনিন আত্মিক নেতা হিসাবে পার্টির ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে (লেনিন, লেফ্‌ট র‍্যাডিক্যালিজম্‌, দি টীচিং ট্রাবলস অফ্‌ কম্যুনিজম্‌ ১৯২০) এবং 'পিপল্‌স কমিশারিয়াট্‌ ফর ইনফর্মেশন'-এর দায়িত্বের সঙ্গে প্রোলেৎকুলৎকে সংযুক্ত করে (ফার্স্ট অল্‌ রাশিয়া প্রোলেৎকুলৎ কংগ্রেস, ১৯২০) সিদ্ধান্তমূলকভাবে পার্টির অবস্থানের পরিষ্কার ব্যাখ্যা রাখলেন তখন 'ভাইমার রেপুব্লিক্‌'-এর জার্মানিতে এই বিতর্কের শুরু হলো এবং প্রবল উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকল। সব সময়েই সাইভার্টের অবস্থান, তাঁব প্রোলেৎকুলৎ-এর আদর্শ গ্রহণের কথা ছেড়ে দিলে শাসকহীন সমাজ হিসাবে কম্যুনিস্ট সমাজের পরিকল্পনা তাঁর বরাবরের নৈরাজ্যবাদী ধারণাকে (বাকুনিনের সঙ্গে তুলনীয়) সূচিত করত। তাই সাইভার্টের ক্ষেত্রে একথা অবিসংবাদী ছিল যে নতুন সমাজের পুনর্গঠনপর্বের আগে 'বুর্জোয়াদের সমস্ত ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকের ধ্বংস প্রয়োজন এবং এই ভাবাদর্শের সংগ্রামী রূপ তখন থেকেই শাসকহীন হতে হবে'।

"আজ আব অন্য কোন উপায় নেই, সর্বহারাকে অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক ও কাবখানাকেন্দ্রিক উপায়ে সংগঠিত করার জন্য কোন শ্রমিকসংগঠন অথবা পার্টি এবং পার্টির উপর নির্ভরশীল কোন ট্রেড ইউনিয়নও নয়. প্রথমটি বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের পথ, আর দ্বিতীয়টি নিশ্চিতভাবে সুবিধাবাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এক সময়ে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা মনে করি এখন আর তার কোন প্রয়োজন নেই; তাই সংগ্রামের পরিচালনায় ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সবকিছুকেই মিশে যেতে হবে।"[২২]

শিল্পকর্মে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিকে আবো সুস্পষ্ট মূর্তকাঠামোয় প্রকাশ করার জন্য 'Progressive'-রা ছবি ছাড়াও প্রচাবপত্রেব জন্য অসংখ্য ড্রয়িং ও সংবাদপত্রের অনুচিত্রণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁবা যাঁদেব উদ্দেশে কথা বলতেন বা কাজ করতেন অর্থাৎ শ্রমিকজনতাই প্রায়শ সেসব কাজ বুঝত না। হার্লে ও সাইভার্টের ড্রয়িং-য়েব যে-ব্যক্তিত্বলোপী ও যৌথতাব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য তা শ্রমিকদের আঘাত করত তাদের মানবিক সত্তাবিনাশেব ছবি হিসাবে। অথচ এসমস্তই তাদের কাটিয়ে ওঠার কথা, নির্মম শোষণ-নিপীড়নেব ব্যক্তিত্বলোপী অন্ধকাব থেকে ব্যক্তি ও তার শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত এক নতুন সচেতনতার বিকাশের মধ্য দিয়ে।

কখনো কখনো প্রগ্রেসিভরা 'ASSO' এবং জার্মানির কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহ-যোগিতা করতেন, যেমন 'ইন্টাবনাৎসিওনাল আর্বেইটারহিল্‌ফে (IAH)-এর জন্য

২১ এফ. ডব্লিউ সাইভার্ট, ১৯৩২।

২২ এফ ডব্লিউ সাইভার্ট, ১৯২১।

কাজের ক্ষেত্রে। তবে সাধারণত প্রগ্রেসিভরা 'ASSO'-র সঙ্গে স্পষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন।

"বক্তব্যের মধ্যে কোথাও 'প্রোলেতারীয়' হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা আছে বলেই সর্বহারার সংগ্রাম, ঐক্য ও শ্রেণীসচেতনতা সম্পর্কে শুধু মন্তব্য করেই বুর্জোয়া শিল্প এখনও কোনভাবেই সর্বহারার শিল্পে পরিণত হয়নি। আঙ্গিককে অবশ্যই বক্তব্যের পরিবাহী হতে হবে : বক্তব্যকে প্রকৃত বক্তব্য হয়ে ওঠার জন্যও আঙ্গিককে ভেঙে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। এরকম যেখানে হয় সেখানে কাজটি যৌথ সচেতনতা থেকে সৃষ্ট হয় ; সেখানে যে ব্যক্তি কোন শিল্পকর্মের স্রষ্টা সে আর বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ নয়, এক যৌথসচেতনার উপকরণ, অস্ত্রস্বরূপ। মার্ক্স আমাদের একসাথে বিরাজমান সকল বস্তুর সমমর্যাদাকে স্বীকার করতে শিখিয়েছেন ; তিনি তার থেকে সাধারণ সূত্রটি বের করে আনতে শিখিয়েছেন। এই চেতনাসূত্র যে কেবল অতীতের সোশ্যাল ডেমক্রেটিক মার্কসিজমের সুবিধাবাদকেই প্রমাণ করে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কম্যুনিস্ট বিপ্লবী মার্কসিজমের জন্য দাবি জানায়। শিল্পের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, যে সমাজতান্ত্রিক শিল্প তখনই হতে পারে যখন আঙ্গিক ও বক্তব্য সমাজতান্ত্রিক।

"বুর্জোয়া শিল্প-আঙ্গিকের ব্যবহৃত বিষয়বস্তু সর্বহারার সমস্যাগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করলেই তা সর্বহারার শিল্প হলো এরকম বলা সম্পূর্ণতই সোশ্যাল ডেমক্রেটিক মনোভাব এবং এখানে অবশ্য সোশ্যাল ডেমক্রেটিকদের মধ্যে তারাও আছেন যাঁরা এমনকি কম্যুনিস্ট পার্টিরও সদস্য।

"অবিকল এই মনোভাবই সেখানেও কাজ করে যখন ভাবা হয়ে থাকে যে পুঁজিবাদী অর্থে, উৎপাদনের উপাদানগুলি, কম্যুনিস্ট সমাজে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, তার থেকেও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের আশায় উপরতলা থেকে নিচুতলার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব ; এই একই মনোভাব অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে বুর্জোয়া শিল্প (industry) থেকে বুর্জোয়া প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করা যায় এই আশায় যে বুর্জোয়ার সেবার জন্য বিকশিত বিজ্ঞানে খাঁটি, স্বাধীন ও বাস্তব সত্য থাকতে পারে এবং বুর্জোয়ার হাত থেকে নিয়ে নিলেই তা সর্বহারার বিজ্ঞানে পরিণত হবে। হ্যাঁ, সর্বহারার বিজ্ঞান, যাতে সর্বহারাই তারা থাকে. কিন্তু তা সর্বহারার উন্নতি ও মুক্তির কোন উপায় বাতলায় না।

"পুঁজিবাদী সমাজ ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবস্থান দখল করলেই কম্যুনিস্ট সমাজ ও কম্যুনিস্ট সংস্কৃতি সৃষ্ট হয় না। সর্বহারা শিল্প তখনই হয়ে ওঠে যখন তার রূপ জনগণের সংগঠন, ঐক্যের অনুভূতি ও শ্রেণীসচেতনতাকে প্রকাশ করে··।"[২৩]

২৩. এফ. ডব্লিউ, সাইভার্ট, ১৯৩১।

প্রগ্রেসিভদের নন্দনতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারার আপোসহীন প্রচার তাঁদের অনিবার্যভাবে শুধু মধ্যবিত্তের শিল্প আগ্রহী অংশটি থেকেই নয়, এমনকি বাম-সংগঠনগুলি থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। 'তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রইল। যদিও এই তাঁদের গর্ব ছিল তবু তা অবশ্যই দুঃখজনক পরিণতি। সম্ভবত প্রগ্রেসিভরা স্থূলরুচি বুর্জোয়া ও আবেগহীন পার্টি কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রতিদিনের ছোট ছোট লড়াইয়ে নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন।' বস্তুত এও নিশ্চিত যে তাঁরা নিজেদের সমালোচনাকে কাজে লাগানোর মতো করে ব্যবহার করার কোন সুযোগ পাননি। তাদের রাজনৈতিক ধারণার অবাস্তবতা থেকে বোঝা যায় যে সেসবই বাস্তব সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরেই বিকশিত হয়েছিল। সাইভার্ট-এর তত্ত্ব থেকে যা শেষ-পর্যন্ত পাওয়া যায় তা হলো ধ্বংসবাদী দৃষ্টিই সবসময় তাঁর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক ছিল। তিনি কোন ইতিবাচক অবদান রাখতে অস্বীকার করেছিলেন এবং রসগ্রহণ, অন্তর্দৃষ্টি ও বোধের উপর ক্রিয়া করে মানুষের কাজের উপর শিল্প যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে তাকে অস্বীকার করেছিলেন। □

We shall be unable to solve this problem unless we clearly realise that only a precise knowledge and transformation of the culture created by the entire development of mankind will enable us to create a proletarian culture. The latter is not clutched out of thin air, it is not an invention of those who call themselves experts in proletarian culture. That is all nonsense. Proletarian culture must be the logical development of the store of knowledge mankind has accumulated under the yoke of capitalist, landowner, and bureaucratic society. All these roads have been leading, and will continue to lead up to proletarian culture, in the same way as political economy, as reshaped by Marx, has shown us what human society must arrive at, shown us the passage to the class struggle, to the beginning of the proletarian revolution.

– LENIN, speech delivered at the 3rd All Russia Congress of the Russian Young Communist League Oct 2, 1920



## গেয়র্গ গ্রোস

# পদাতিকের জবানবন্দী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে কী আর বলি ? ছিলুম তো এক পাতিসৈনিক। পদাতিক। যুদ্ধ ব্যাপারটাকে প্রথম থেকেই ঘেন্না করেছি। তাই যুদ্ধ যত গড়িয়েছে, ততই মুষড়ে পড়েছি। আসলে আমার বেড়ে ওঠার পরিবেশটা ছিল অনেক মানবিক। যুদ্ধ আমার কাছে ভয়াবহ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সংকেত। অর্থহীন ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়। জানি, মহান জ্ঞানী লোকেরাও অনেকে এভাবেই ভাবেন।

যুদ্ধের শুরুর দিকের কথা। সারা জার্মানির মানুষ যেন ভুল বকছে। তারপর আবেগ একটু থিতোতেই সব চুপচাপ। বিরাট অভিযানের গালভরা প্রতিশ্রুতি। শেষপর্যন্ত···রাইফেলের নলে ফুল' বিবর্ণ হেলমেট। —কুৎসিত সবকিছু। উকুন আর একঘেয়েমি, রোগ আর বিকৃতি। বীরত্ব, আদর্শ, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম— কোন শব্দই তো আমাদের অপরিচিত ছিল না। অথচ ঠিক উল্টো শব্দগুলো দান উল্টে দিল। 'উৎসাহ', লোকে বলত, 'তো আর হেরিংমাছ নয় যে লঙ্কাবাটা মাখিয়ে যদ্দিন খুশি জারিয়ে রাখবে'। কটা বছর বাদেই জার্মানিকে নতজানু হতে হলো। ওঃ সেই চারটে বছর ! বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল ওরা। তবে আমার

ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। আমি তো আর যোদ্ধা নই, আদতে শিল্পী। অনেকের কাছে অবশ্য যুদ্ধ মানে দৈনন্দিন পাপ আর যত অন্ধকার 'না' থেকে পালিয়ে বাঁচা। ভোঁতা উত্তেজনার উন্মুক্ত নর্দমা। আজেবাজে সব কাজে কেনা গোলামি থেকে মুক্তি। মানুষ যদ্দিন এভাবে ভাবতে থাকবে সংগঠিত এই গণহত্যার দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারবে না কিছুতেই। না, যুদ্ধ আমার কাছে কখনোই মুক্তির কোন উপায় নয়।

আমি অতি সামান্য জীব, ঠিক আছে। তা বলে আমার নাম ধরে আমাকে ডাকা হবে না! আসলে এ ব্যাপারে কিছু বলতে বাজে লাগে। নিজে একটা শুধু সংখ্যা দিয়ে পরিচিত হতে আমার ঘেন্না করে। প্রথমদিকে খুব হম্বিতম্বি করতে গিয়েছি। আসলে সাহস হতো না। তারপর উল্টে ধমকাতে ছাড়িনি। যখনি পেরেছি তাদের বিরক্তিকর গাড়লপনা, জানোয়ারগিরির প্রতিবাদ করেছি। তবে খেলাটা ওদের একেবারে নিজের। ওদের খেলায়, ওদের আমি কখনো হারাতে পারিনি। শুধু শেষ অবধি একটা বিচ্ছিরি লড়াই করে গেছি। না, কোন আদর্শ নয়। কোন বিশ্বাসের ব্যাপার তাতে ছিল না। শুধু নিজের জন্যেই লড়েছি।

বিশ্বাস—হ্যাঁ! [illegible]? আমাদের বড় বড় কলকারখানায়,—তার মালিকদের ওপর, আমাদের গর্বের জাঁদরেল সেনাপতি, প্রিয় পিতৃভূমি! মনে মনে লোকে খুব ভেবেছে। খালি ভাবাই—। আমি অন্তত খোলাখুলি বলার সাহস দেখিয়েছি। তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে আমি কম ভিতু। সত্যি বলতে কি চোখ বুজে পড়ে থাকার মতো ভিতু ছিলুম না। আমার বেশিরভাগ সহকর্মীর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা উল্টো। ঘটনাগুলো আমাকে বেশ রাগিয়ে তুলত। এ নিয়ে প্রচুর লিখতে পারি। তবে লিখিনি। যা বলতে চাই—ছবিতে ধরে রেখেছি।

১৯১৬-য় মিলিটারির চাকরিটা গেল। বরং বলি, একধরনের ছুটি দেওয়া হলো। এখন ডুব মেরে থাকো—ক'মাসের ভেতরেই আবার টেনে তুলব। ধূসর, ঠা[illegible] বার্লিনে ফিরলুম। ব্যস্ত কাফে, মদের দোকান সব এখা বিষণ্ণ, কালো। বসত অঞ্চল, অনুত্তপ্ত। সৈন্যদের হুল্লোড়-নাচ-গান প্রায় আগের মতোই। নগরবনিতার হাতে জড়ানো হাত—নেশার খোয়াড়ি। দৃশ্যটা পাল্টে গেল। ক্লান্ত সৈন্যের দল—তখনো গায়ে ট্রেঞ্চের ধুলো-কাদা। পা টেনে টেনে চলেছে। পিঠের বোঝাটা নিয়ে শুধু এ জায়গা থেকে ও জায়গা। ভাবি সুয়াইডেনবুর্গ কত সঠিক। ভদ্রলোক বলেছিলেন—স্বর্গ-নরক এই পৃথিবীতেই, পাশাপাশি। ভগবানে বিশ্বাস করি না। তবু স্বর্গ-নরকবিহীন বিশ্বের ধারণাটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি।

তাহলে অল্প সময়ের জন্যে হলেও আমি এখন মুক্তপুরুষ। কোন না কোন এক সময়ে জার্মানি মুখ থুবড়ে পড়তই। সুন্দর যত চিত্রপ্রদর্শন এখন বিস্বাদ। হলুদ বালি কাগজে বাড়িগোলা সস্তা কালিতে এঁকে যাই। সুয়েডেনডের স্টুডিয়োতে বসে যা কিছু চোখে পড়ে। আমার নিজের জগতে বাস আর ছবি আঁকা।

আঁকলুম। মাতাল। বমি করছে, ঘুষি পাকিয়ে চাঁদকে গাল পাড়ছে। কফিনের ওপর তাস খেলছে ক'জন। ভেতরের নারীদেহটিকে কিছুক্ষণ আগেই খুন করা হয়েছে। মদ গিলছে কেউ, যবের সুরা গিলছে। হল্যাণ্ডের জিন ঢালছে গলায়। ক্রোধে উন্মত্ত একটা লোক হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলছে। মিলিটারি জীবনের ছবি আঁকলাম। সেখানে চাকরির সময়ই এসব ছকে রেখেছিলাম। একটা ঘরের ছবি। বাইরে থেকে দেয়াল কেটে ভেতরটা দেখালাম। জানলার আড়ালে একটা লোক বৌকে ঝাঁটাপেটা করছে। আরেকটা জানালার পাশে দুজনে যৌনক্রিয়া সারছে। আর একটার পাশে কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে ঝুলছে একটা লোক, মুখের চারদিকে ভনভন করছে মাছি।

সৈন্য আঁকলুম, নাক নেই। যুদ্ধ—ইস্পাতের কাঁকড়া খুঁড়িয়ে চলেছে। মেডিক্যাল কোরের দুটো আর্দালি ভয়ংকর এক সৈন্যকে 'ঘোড়ার কম্বলে' জড়িয়ে কাবু করছে। পোষাকে অনেক মেডেল ঝোলানো এক মহিলা। হাতকাটা সৈনিক তার ভালো হাতটা দিয়ে তাকে স্যালুট ঠুকছে। মহিলা এক্ষুনি তাকে একটা বিস্কুট দিয়েছে। কর্ণেলের পোষাকের সব বোতাম হাঁ করে খোলা—এক নার্সকে সে জাবড়ে ধরেছে। হাসপাতালের মেথর—বালতিভরা মানুষের টুকরো মাংস গর্তয় ঢালছে। সামরিক পোষাকে কংকালটা—বাহিনীতে ভর্তির আগে তার মেডিক্যাল চেক-আপ হচ্ছে।

কবিতা লিখলাম। ছাপাও হলো। নতুন পত্রিকা 'নয়্যে জুগেনডে'। সস্তা গোলাপি কাগজে ছাপা লম্বা কবিতা। আমার দ্বিতীয় কাজ 'ছোট গ্রোসের পোর্টফোলিও'-য় জুড়ে দেওয়া হলো।

স্টিফেন স্ট্রাসের সবচেয়ে ওপরতলায় আমার স্টুডিয়ো। আসবাব বলতে বাক্স, রঙ করে নিলুম। মোটা লিনেন লাগালুম। ঘর-সাজানোর আরো সব প্রকরণ তাতে জোড়া হলো। দেওয়াল বরাবর খালি বোতলের সারি। গুচ্ছের রঙিন লেবেল দেয়ালে সেঁটে দিলুম। দুর্গের ছবি, ঠিক যেন স্টিল এনগ্রেভিং—লাল মদের। মাউন্ট এডনা বা বড় বড় আঙুরের ছবি—ইতালিয়ান মদের। কালো আর সাদাগুলো পোর্ত আর মেদিরার। পোর্ত: পর্তুগালের কালচে-লাল কড়া মদ। মেদিরা—অতলান্তীয় মেদিরা দ্বীপের সাদা মদ। সিলিং থেকে গ্যাসের আলোটা ঝুলছে। তার গায়ে তারের পা নিয়ে সুতোয় দুলছে একটা মাকড়সা। একটু হাওয়া লাগলেই নড়বে। লম্বা দাঁড়া নেচে উঠবে।

এখানে ওখানে ভাঙা আয়নার টুকরো। আসবাবে সিগারের ব্যান্ড। চকচকে ধাতব পাতের 'তারা'। দেওয়ালে, সিলিংয়ে। পুরো জায়গাটা রঙে-রঙে ভরে উঠল। এক কোণে যাকে বলে 'ভদ্দরলোকের লেখার ডেস্কো'। নানারকম ফটোগ্রাফ। অথবা কোন ছবির নকল। ব্রাশের লোমের মতো খাড়া খাড়া। চাপা পোষাকের নারী। নব্বই-য়ের আনন্দগাঢ় সময়ের পুরনো সব ছবি। বিখ্যাত কিছু মানুষ—যাদের আমি গুণমুগ্ধ। যেমন হেনরি ফোর্ডের ছবির তলায় লেখা, 'শিল্পী গেয়র্গ গ্রোসকে গুণমুগ্ধ হেনরি ফোর্ড"। আমি নিজেই লিখেছিলুম। তবে ফোর্ডের সঙ্গে টেলিপ্যাথিক



☐ ছবি : দি কম্যুনিস্টস ফল এ্যাণ্ড দি এক্সচেঞ্জ রাইজেস্ ।

কথাবার্তা হওয়ার পরে, অবশ্যই। আমার স্টুডিয়ো এক রোমাঞ্চকর আশ্রয়। কোন মেলার তাঁবু। ভেতরে ঢুকতে আমার পয়সা নেওয়া উচিত। সবচেয়ে ভাল ও একমাত্র আসবাব—লোহার একটা খাট। সুবিধেমতো কিস্তিতে কিনেছিলাম। একটা ছোট লোহার স্টোভ। রোজ সকালে জ্বালতে হতো। কারণ সকালের নির্মম ঠান্ডা হাওয়া স্টুডিয়োর জানালার ফাঁক দিয়ে শিস দিত। গ্যাসকুকার। একটা দশ পিফেনিং[১] মিটারের সঙ্গে জোড়া। তো, এই আমার সম্পত্তির তালিকা।

'ডেডিকেশন্ টু ওস্কার পানিস্জা'—বিরাট ছবিটা এখানেই এঁকেছি। মৃত্যু যেন কালো কফিনে চড়ে আসছে। চারিদিকে বিধ্বস্ত মানুষের ভিড় আর মুখোশ। ভাঙা গলায় চিৎকার করছে, কাঁদছে। কিন্তু অশ্রুত। এই ঘরেই 'দি অ্যাডভেনচারার' আঁকি। খুব নাম করেছিল ছবিটা। ড্রেসডেন সিটি ম্যুজিয়ম সংগ্রহ করেছিল। পরে নাৎসিরা 'অবক্ষয়ী শিল্পের প্রদর্শনী' করে ছবিটা সেখানে রাখে। আশ্চর্য লাগে—ছবিটার যে কী হবে!

১৯১৬-১৭-য় নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেয়েছিলুম। বুঝতে পারতুম পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। আমার তেল আর জলরঙে এই কাঁপন ধরা পড়েছে।

পুরনো কাফে 'ডেস ভেসটেনসে'। এক রাতে থিয়োডোর ডবলারের সঙ্গে দেখা করলাম। 'উইসে ব্ল্যাটার'—নাক-উঁচু কাগজ। সম্পাদক অ্যালসেসিয়ান লেখক রেনে সিকেল। তিনি যুদ্ধবিরোধী রচনা প্রকাশ করতেন, গোপনে। আন্তর্জাতিক সমঝোতার সপক্ষে দাঁড়াতেন। এমনকি যুদ্ধের মধ্যেই শত্রুপক্ষের লেখক আঁরি বারবুস, রমাঁ রলাঁর রচনা, কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। অচেনা আনকোরা জার্মান লেখক লিয়নহার্ড ফ্রাঙ্ক। সুন্দর ছোট গল্প 'দি ফাদার'! আর 'দি মেটামরফসিস'-এর লেখক ফ্রানৎস কাফকা—তাঁরই আবিষ্কার। আমিও।

ডবলারের প্রবন্ধ, সঙ্গে আমার ছবি। একরাতের ভেতরেই বিখ্যাত হয়ে গেলুম। অবশ্য প্রথমে শুধুই বুদ্ধিজীবী বৃত্তে। সবাই আমার কথা বলতে লাগল। একটু আশ্চর্য, কিন্তু ভালোই লাগল। হাতেগোণা ক'টা বন্ধু ছিল। হঠাৎ দেখলাম আমার বিরাট চাহিদা। ফ্লবেয়রের—'এডুকেশন সেন্টিমেন্টালের' যুবকটিকে আর ঈর্ষণীয় মনে হচ্ছিল না। অদ্ভুত সব লোকের দেখা পেলুম। লেখক, নিরামিষ জ্যোতির্বিদ, অদ্ভুত বিপন্নতা-বিলাসী ভাস্কর, পাপ-লুকোনো পরোপকারী, মাতাল অনুবাদক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক। ন্যক্কারজনক জীবসব। যতসব গুল্ম। রাতে গোবরগাদার পাশে তাদের ফুল ফোটে। ভীষণ বিষাক্ত। বাকিরা যেন ছুঁচো—মাটির নিচে। অন্যদের ল্যাজ আছে। জলেও চলে ডাঙায়ও চলে। অথবা নতুন ল্যাজ গজাচ্ছে। নিন্দা প্রশংসায় কিস্সু হয় না।

কাফে ডেস ভেসটেনস-এর রোজকার খদ্দের হয়ে গেলাম। সন্ধ্যেবেলা সাত-

---

১. একশো পিফেনিং-এ এক মার্ক।

তাড়াতাড়ি বা শেষরাত্তিরে সেখানে আমরা আড্ডাধারী। অথচ আমাদের কোন সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না—যা আমাদের এক জায়গায় আনতে পারে। তবে যুদ্ধবাজ বা শিল্পনেতাদের আমরা অপছন্দ করতুম। বোধহয় এই মনোভাবই আলগাভাবে হলেও আমাদের এক করেছিল। আসলে ১৯১৬ নাগাদই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম—যুদ্ধ জার্মানিকে দুঃখকষ্ট ছাড়া আর কিছুই দেবে না।

থিয়োডোর ডবলার। আমার বন্ধুটির কথায় ফেরা যাক। মোটকু থিয়ো, ভূমধ্যসাগরীয় বাঙাল। দাড়ি, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, রাক্কোস—গিলতে পারে বটে। খোয়াও। তাছাড়া দুর্ধর্ষ বই—দি নদার্ন লাইটসে'র লেখক। একটা মহাকাব্য। ওর কথা শুনতে ভাল লাগে। যুবক শিল্পীলেখকদের গল্প তার পছন্দ। গুণমুগ্ধ ছোট একটা বৃত্তের প্রাণ ও মন সে। দুর্দান্ত সব গল্পের জন্য আমরা ডবলারের কাছে ঋণী।

লালচুল সোলমানের কথা ধরা যাক। বহুদিন আগে মারা গেছে। কিন্তু তার আত্মা আমাদের কাছে রয়ে গেছে। নরওয়েজিয়ান চিত্রকর এডভার্ড মুনখের সই যে ছবিগুলোর তলায় আছে—আসলে সেগুলো নাকি সোলমানের। সোলমান অদৃশ্যে পেছনে দাঁড়িয়ে মুনখের ব্রাশ চালিয়ে দিত। তাই মুনখের কাজে এত অতীন্দ্রিয় উপাদান। এবং এই কারণেই জার্মানরা তার কাজ ভাল বলত। ভেনিসে যখন সোলমান ডবলারের সঙ্গে শেষবার দেখা করে, তখন বলেছিল "আমার বয়স দেড়শোরও বেশি। আমি দীর্ঘায়ু এক পরিবারে জন্মেছি তো"। আমরা জিজ্ঞেস করলুম, বার্লিনে তার সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়েছে। "নিশ্চয়ই", থিয়োডোর বলল। "ব্যাপারটা অদ্ভুত। একটা কাফেতে বসে আছি। নভেম্বরের ঠাণ্ডা। যদ্দুর মনে পড়ে জানলায় তুষার জমেছে। তবে পুরোপুরি ঢাকেনি। পটসডাম স্ট্রাসে—এদিক ওদিক দেখা যায়। হঠাৎ একটা ট্রাম সোঁ করে চলে গেল। দেখলাম একটা ছোট্টখাট্ট লোক তার পেছনে দৌড়চ্ছে। না, বরং, ভাসতে-ভাসতে যাচ্ছে! এবং অবশ্যই সোলমান। মাথায় টুপি নেই। মাথার চারপাশে জ্বলজ্বলে লাল চুল। যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—একজোড়া প্রজাপতির মতো ডানা, তার কাঁধের দুপাশে। জানলাটা কুয়াশায় অস্পষ্ট। তবু বলব, আমার চোখ ভুল দেখেনি। বোঝো ব্যাপারখানা—" শেষকালে বলল "নভেম্বর মাসে প্রজাপতির পাখা…।"

সে আমাদের কাছে তার বিশাল তিন খণ্ডের মহাজাগতিক 'দি নর্দার্ন লাইটস' থেকে পড়তে ভালবাসত। তার গুপ্ত প্রতীক, ভবিষ্যৎবাণী—যার মানে সকলেরই অজানা। সকলের ভেতরেই একটা রহস্যের সৃষ্টি হতো। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার নিজের কথায় সে সাতকাহন। যাকে বলে নেশাগ্রস্ত হয়ে যেত। লেখকদের এরকম হয়—জানতো না কোথায় থামতে হবে। একদিন ডবলার তার এক ব্যবসাদার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করাতে চাইল। হের ফাক। বড় ব্যবসাদারটি নাকি শিল্পপ্রেমিক। ভাস্কর লেহমব্রাককে নাকি বর্ষোহারা দেয়। আমাকেও মাসে-মাসে কিছু দিতে চাইল।

লোকটি স্বৈরম্মন্য। কোন ব্যাপারে বিরোধিতা অপছন্দ। এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে 'অ্যাডলনে' রাতের খাবার সারছিলুম। কফির পর উঠতে চাইলুম। যে মেয়েটিকে বিয়ে করব, তার সঙ্গে দেখা করার কথা। "এত তাড়াতাড়ি", ও বলল। "হ্যাঁ" বললাম, "একজনে অপেক্ষা করে থাকবে।" "ফোন করে জানিয়ে দাও যাচ্ছ না। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমার বাড়িতে কিছু প্রথম সংস্করণের বই এসেছে—দুর্দান্ত—দেখাব। এতে মানহেইম যাবার ফার্স্ট ক্লাস স্লিপারের একটা টিকিট আছে।" একটা খাম আমার হাতে দিল। "দেড় ঘণ্টার ভেতরেই ট্রেন ছাড়বে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। রাতে আমার ঘুম হয় না। আমার সঙ্গী চাই।" আর কী করতে পারতুম—আমি?

বাণিজ্য জগতে তার খদ্দেরের জন্য শিল্পীকে যথেষ্ট ভাবতে হয়। কারণ তারাই তার প্রধান নির্ভর। সাবান, তোয়ালে বা ব্রাশের মতো আধুনিক শিল্পও এক ধরনের পণ্য। তার বিক্রীবাটার জন্যে বহু 'কারুকায' দরকার হয়। শিল্পী যেন এক বাহকবন্ধনী, কনভেয়র বেল্ট, কাঁচের দর্শনকক্ষে যখনি পার মাল যুগিয়ে যাও। দক্ষতা বিকাশের সময় নেই। কারণ তুমি তোমার নিজের নও। জনতার সম্পত্তি। হোমরা-চোমরার হুকুমে মাল বানাও। হয় ব্যবসাদার, নয় মজুর অথবা সৈন্যদের কোন প্রতিষ্ঠান। রাম, শ্যাম, যোদো, মোদো যে যখন চাইবে চটিজুতো যুগিয়ে যাও হে! বহু শিল্পী পুরনো দিনের কথা ভেবে কষ্ট পায়। তখন নাকি শিল্পীরা ক্রীতদাস ছিল। আরে বাবা কালকের ডাল-ভাতটা কোত্থেকে আসবে তাতো আর চিন্তা করতে হতো না।

লড়াকু শিল্পীকে এখন খদ্দেরের মর্জিমতো সব সামলাতে হয়। তার পরিচিতি কম থাকতে পারে। যত তাড়াতাড়ি হয় তার এই দোষটা মেরামত করে নিতে হবে। তাকে যতটা পারা যায় খুশি করতে, তোষামোদ করতে হবে। যদি সিগারেট ধরায় তো দেশলাইটি হাতে তৈরি রাখবে—আয়। কেউ কেউ আবার তাদের শিল্পীর মতোই রুক্ষ মেজাজের, ডাঁটিয়াল। বাজে ব্যবহার। নখের ভেতর ময়লা, একগাল না-কামানো দাড়ি, মুখে নাড়িপচা বদবু—অ্যাঃ।

আসলে এইসব গুণ তাদের ভালো লাগে। কারণ তারা অন্যদের থেকে আলাদা—'উঁচা'। আর অংশত বহু বড়লোক বদবিবেকী। উঠতির দশায়—যখন কোন ভ্যান গঘ, তাদের পাছায় কাদামাখা বুটের লাথি ঝাড়ে, তারা খুশিতে ডগমগ করে ওঠে।

হয়তো ভাঁড় হলেই রোজগারপাতি বেশি হতো। কিন্তু এই বস্তুনিচয় আর আধ-খাওয়া হাড়গুলো—যারা আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে, তাদের তো হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না। আমার খদ্দের মালিকের টেবিলে বহু সুস্বাদু বস্তুর মেলা। সবসময় একটি ভাল সিগার। দু'এক পাত্তোর ভালো মাল। হ্যাঁ যা থাকার সবসময় তাই থাকে।

১৯১৭-য় আবার ডাক এল। নতুন ছেলেদের তালিম দেওয়া। যুদ্ধবন্দীদের এধার ওধার করা। তাদের পাহারা দেওয়া। একদিন আমাকে দেখা গেল মুখ গুজড়ে কলঘরে। অর্ধচেতন পড়ে আছি··· ।

১৯১৭-য় মানুষের মধ্যে আর কোন বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল না। হাসপাতালে শুকনো সব্জি, শেকড় গুঁড়িয়ে কফি, নকল মধু দেওয়া হতো। আমাদের পাকস্থলীর আস্তরণে ক্ষয় ধরে গেল। মানুষের ঐক্যে আমার আসল বিশ্বাস কখনো ছিল না। মানুষের মাঝখানে বাস করার কোন ইচ্ছাও কখনো নয়। এমনকি আগেও—যখন যুদ্ধে বহু লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটত। আবিষ্কার করলাম, ঐক্য ভাবনা—শুধুই বিশেষ ক্ষেত্রে বন্ধুদের মধ্যে সম্ভব। জনগণকে প্রচুর সরবরাহ করা হতো—ঘেন্না, ভয়, পীড়ন, প্রতারণা, বিদ্রূপ, নোংরামি আর হত্যা। যাইহোক—দেখলাম, এই পুতুলপ্রভুদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে গলা তোলা শক্ত। যদিও আমার চিন্তা অন্যরকম। বুঝলাম নিজের বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট ভুগেছি। আর সেসব নিয়ে চেঁচামেচি নয়। "নিম্ন" শ্রেণীর ওপর ন্যস্ত আমার সব আশা বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রলেতারিয়েত জনতাকে স্বর্গসুখ সম্ভোগ পাইয়ে দেবার কাজে কখনো জড়াইনি তাই। এমনকি যখন কোন রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভণিতা করেছি তখনো নয়। আসলে যুদ্ধ একটা আয়না। মানুষের সব পাপ, গুণ প্রতিফলিত হয়। যদি কাছ থেকে দেখ—শিল্পী যেমন করে তার ছবি দেখে—দুটো বস্তুই অদ্ভুত স্বচ্ছতায় ধরা পড়ে।

আমি হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। যদি আবেগ উন্মোচনের সেফটি ভালভ্ বেয়ে—মুক্তির মন্থর কোন রাস্তা না থাকত। যখনই সময় পেয়েছি আমার যন্ত্রণা বুরুশের আঁচড়ে মূর্ত করেছি। নিজেকে—সব কিছু নিয়ে। অথবা যা কিছু ঘেন্না করেছি। কখনো জাবদা খাতায়—কখনো খোলা, ছেঁড়া ছেঁড়া কাগজে। আমার সহযোদ্ধার পাশবিক মুখ। বিশ্রীভাবে ভাঙাচোরা যুদ্ধের পঙ্গুরা, গোঁয়ার সামরিক অফিসার। কামুক সেবিকা। কোন লক্ষ্য নেই। এলোপাথারি এঁকেছি। আমার সবকিছু বিধ্বস্ত। পৃথিবী ভরা বাস্তু, ঘৃণিত ছোট ছোট লাল পিঁপড়ে।···

একদিন জানতে পারলুম, সামরিক বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে আসার জন্যে আমাকে গুলি করে মারা হবে। কাউন্ট কেসলারের কানেও কথাটা গেল। সৌভাগ্যই বলতে হবে। তিনি আমার হয়ে ব্যাপারটা জোড়াতালি দিলেন। শেষপর্যন্ত আমাকে মাফ করা হলো। মালপত্তর বাঁধাছাঁদা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। কারণ, গোলার টুকরোয় আহত হয়েছিলুম। যুদ্ধ শেষ হবার সামান্য আগে আবার ছাড়া পেলাম।—এই কড়ারে, যে আবার ডাক আসবে।

ভাবতে লাগলুম যুদ্ধ বোধহয় কখনোই শেষ হবে ··।

সম্ভবত কোনদিন শেষ হয়ও নি। শান্তি ঘোষণা হলো। কিন্তু আমরা সকলেই খুশিতে মাল টেনে মাতাল হলুম না। বা আহ্লাদে আটখানাও নয়। গোড়ার থেকে

কোন পরিবর্তন হলো না। শুধু গর্বিত জার্মান সৈন্য। আঁটি বাঁধা এক পরাজিত যন্ত্রণা। মহান জার্মান বাহিনী টুকরো হয়ে গেল। যেমন টুকরো হলো কাঠের মণ্ড থেকে তৈরি তাদের উর্দি। অথবা তাদের চামড়ার প্রতিকল্প কার্তুজ কেসগুলো। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। যুদ্ধে হেরেছি বলে নয়। আমাদের লোকগুলো যুদ্ধটাকে এতদিন অবধি টেনে নিয়ে গেল—তাই। এই গণউন্মাদনা বন্ধ করতে কোন চেষ্টা করেনি—তাই। এই গণহত্যার বিরুদ্ধে চিৎকার করে ওঠা থামিয়ে রেখেছিল—তাই।[১]□

গেয়র্গ গ্রোস : সংযোজনা : ১

# প্রেমের ছবি ঘৃণার শৈলী

বর্তমান শতকের প্রথমার্ধের জার্মানি ও সমকালীন শিল্পচর্চার ইতিহাসে গেয়র্গ গ্রোসের (১৮৯৩—১৯৫৯) নাম প্রায় অনিবার্য। ছবি পুনরুৎপাদন ও গণপ্রচারের সমস্যা নিয়ে যে ক'জন শিল্পী গভীরভাবে ভেবেছেন, নিয়ত পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং ছবিকে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রামে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, গ্রোস তাঁদের অন্যতম।

"একজন শিল্পী হিসাবে আমার অবশ্যই নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে : কারণ আমিও এই জার্মান সমাজের একজন, এবং একথা আমায় কিছু দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করে। আমার পক্ষে একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়, এবং আমি তা করছিও না। যখন আমি ড্রয়িং করছি, তখন আমি আদৌ আইন নিয়ে ভাবি না, কারণ আমার কাজ আমার যুগ, আমার ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী হিসাবে আমার অস্তিত্বের দ্বারা নির্ধারিত।"

১৯১০ সাল থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৬ থেকে ১৯৩০-৩২ পর্যন্ত তিনি দু'হাতে অজস্র ছবি এঁকেছেন, প্রকাশ করেছেন একটার পর একটা ছবির পোর্টফোলিও। ১৯১৭ সালে প্রথম ৯টি লিথোগ্রাফ প্রকাশের পর প্রকাশিত হয় 'গড উইথ আস' নামক বিখ্যাত পুস্তক। তাঁর ৫৫টি ড্রয়িং নিয়ে '২১ সালে প্রকাশিত হয় 'ফেস অফ দি রুলিং ক্লাস' ; '২৩-এ প্রকাশিত হয় 'একে হোমো' এরকম ১০০টি ড্রয়িং-এর সংকলন ; ৫৭টি ছবির আর একটি সংকলনের নাম 'দি ডে অফ রিকনিং ইজ কামিং'। ১৯৩০ সালে প্রত্যেকটি বইতে ৬০টি করে মোট ১৮০টি ছবি নিয়ে তিনটি রাজনৈতিক ছবির সংকলন প্রকাশ করেন 'মালিক ফ্যারলাগ'। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি লিথোগ্রাফ এবং ড্রয়িং-এর সংকলন এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এ সময়ের বহু পত্রপত্রিকার সাথেও গ্রোসের নিয়মিত ও গভীর যোগাযোগ ছিল। এর মধ্যে 'ডার ন্যুপেল' 'ডার প্ল্যেট', 'ডার ব্লুটিগ এর্নস্ট', 'নয় জুগেন্ড' ইত্যাদি পত্রিকায়

১. A Small Yes and a Big No—গ্রোসের আত্মজীবনীর নির্বাচিত অংশ। প্রকাশিত হয় ১৯৪৬, নিউইয়র্কে।

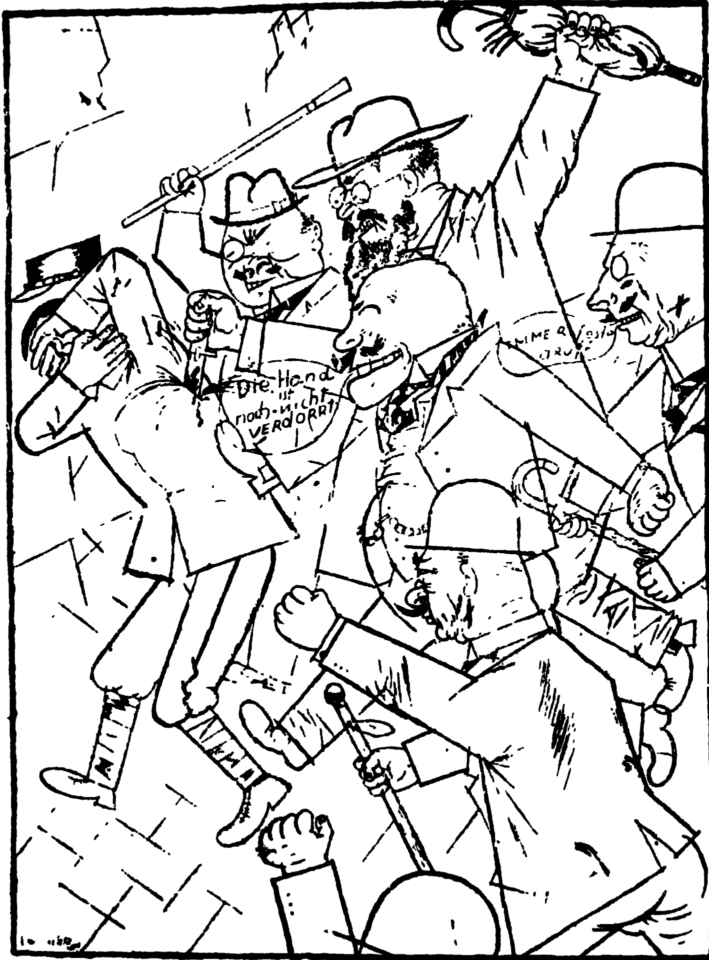
গ্রোস্ যে শুধু ছবি এঁকেছেন তাই নয়, পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজেও তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সহযোগী ছিলেন ভাইল্যান্ড ও জন হার্টফিল্ড। স্বভাবতই, এ সমস্ত পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এছাড়া তিনি '২০ থেকে '৩২ পর্যন্ত অজস্র বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন। এর মধ্যে ব্রেখটের "থিঃ সোলজাসে" ২৫টি ড্রয়িং অথবা হাইনরিষ্ মানের 'কোবেস'-এ ১০টি লিথোগ্রাফ, আপটন সিনক্লেয়ারের বইয়ের অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। আলফঁস দোদে, ইভান গল, আর্নস্ট টলার, রিচার্ড হুলসেনবাক, ভাইল্যাণ্ড হার্জফেল্ড-এর বিভিন্ন বইতে তাঁর অসংখ্য ছবি রয়েছে। বস্তুত, এই দশ বা বারো বছরের মধ্যে তাঁর কাজের পরিমাণ যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই লক্ষণীয় হলো তাঁর কাজের দার্ঢ্য ও তীব্রতা। ১৯১৯ থেকে ১৯২৮ অর্থাৎ ঐ একই সময়ে গ্রোস্ বার্লিন থিয়েটারে মোট ৭টি প্রযোজনায় সেট ও পোষাকের ডিজাইন করেছেন ; সঙ্গী ছিলেন আরভিন পিসকাটর, হার্টফিল্ড, এবং কখনো ব্রেখট্ ও ম্যাক্স ব্রড।

গ্রোসের শিল্পশিক্ষার পাঠ শুরু হয় ড্রেসডেন আকাদমিতে। তার আগে গ্রোসের ওপর তৎকালীন জার্মানিতে প্রচলিত 'যুগেণ্ডস্টিল' বা 'নতুন শৈলী'র প্রভাব দেখা যায়। ১৯১২ সালে গেয়র্গ বার্লিনে এমিল ওরলিকের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করেন। এসময় তাঁর ছবিতে কারখানার শ্রমিক, বেকার ও প্রচুর ভবঘুরে চরিত্র ভিড় করে এসেছে।

"মাঝে মাঝেই রাজনৈতিক হৈ-হল্লার রেশ আকাদমির স্টুডিওর মধ্যে এসে পেঁছিত, যদিও তার কোন সুদূরপ্রসারী ফলাফল থাকত না। সেই সময় সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা তথাকথিত শ্রেণী-ভোটাধিকারের পরিবর্তে (যা তখনও জার্মানির কিছু কিছু অংশে প্রচলিত ছিল) সার্বিক, সমান এবং গুপ্তভোটের অধিকারের জন্য আন্দোলন করছিলেন ; এবং ভোটাধিকারের জন্য যেসব বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হতো, তার একটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে···আমরা সকলেই মোটামুটিভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলাম, এবং আমাদের কারোর কাছেই কোন শ্রমিকসংগঠনের সদস্যপত্র ছিল না। তবুও সহজাত প্রেরণাবলে আমরা ছিলাম প্রতিবাদীদের দলে। কারণ আমরা, শিক্ষিত নাগরিক, উঠতি শিল্পীরা···বেয়নেটধারী পুলিশ বা সৈন্যদের বিশেষ পরোয়া করতাম না।"

একই সময়ে সমান উৎসাহে সার্কাসের জাঁকজমক আর বিচিত্র পোষাকের মানুষজন, অবাস্তব রোমাঞ্চকাহিনীর নানান চরিত্র নিয়ে গ্রোস্ অজস্র কাজ করেছেন। ১৯১৩ সালে পারির জুল পাস্যাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে ও কিছুটা আলফ্রেড কুবিনের প্রভাবে (যাঁর কাজের সঙ্গে আগেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল) গ্রোসের কাজে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হলো। পরবর্তীকালে এসম্পর্কে তিনি বলেছেন—"ধীরে ধীরে

আমার শৈলীর একটু পরিবর্তন হলো। সেটা যে কীভাবে হলো, আমি তা নিজেও সঠিক জানি না ; মনে হয় তা হলো ছবির মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদনের কৌশলগত কারণে। তখন আমি প্রথমে সাবধানে একটা ফিগারের রেখাচিত্র দৃঢ় রেখায় এঁকে নিয়ে, তারপর পুরো ড্রয়িংটাকেই যেখানে-সেখানে, কিন্তু কারিগরের মতো দক্ষভাবে, গ্রাফাইট কালিতে ধুয়ে ফেলতে শুরু করেছি···আমি একটা সূক্ষ্ম ড্রয়িং-এর কলমও ব্যবহার করছি। হাত খুলে আঁকতাম না, যেমন রেমব্রাঁ আঁকতেন—না, আমি প্রথমে




ছবি : বুর্জোয়া স্টারস আপ ট্রাবল···

সবকিছুই সতর্কভাবে পেন্সিলে এঁকে নিতাম, যাতে মূল রেখাচিত্রের বাইরে তা না যায় ⋯ ছোটবেলায় মই-এর মতো উঁচু ইজেল আর ঝাঁটার মতো তুলিতে বিশাল বিশাল পেইন্টিং করার যে উচ্চাশা ছিল, তা তখন ঝাপসা হয়ে গেছে।"

ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালের ৩রা আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কাইজার দ্বিতীয় ভিল্‌হেলম্‌ যুদ্ধ ঘোষণা করলে ক্রমশ তা বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ যুদ্ধের চেহারা নিল। গ্রোসকেও স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে পদাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে হয়—এই অভিজ্ঞতা তাঁকে যে-কোনরকম যুদ্ধ সম্পর্কেই গভীরভাবে আতঙ্কিত ক'রে তোলে।

"একথা ঠিক যে আমি যুদ্ধের বিরোধী ; অর্থাৎ আমাকে পীড়ন করে এমন যে-কোন




এ্যাণ্ড দি প্রোলেতারিয়ান মাস্ট শেড হিজ ব্লাড, ১৯২৩।

ব্যবস্থার আমি বিরোধী। অন্যদিকে, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্মানজনক বীরের মৃত্যু বরণ করে, এমন প্রতিটি জার্মানের মৃত্যুতেই আমি উল্লসিত হই। (আহা! কী নিদারুণ!) একজন জার্মান হওয়ার অর্থ হলো অবশ্যই একজন অমার্জিত, মূর্খ, কুৎসিত, স্থূলকায় এবং অনমনীয় হওয়া—এর অর্থ হলো চল্লিশ বছর বয়সে মই বেয়ে চড়তে অক্ষম হওয়া, পারিপাট্যহীনভাবে পোষাক পরা, একজন জার্মান মানে সবচেয়ে খারাপ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া।"

তিনি স্বয়ং তাঁর এসময়ের ছবিকে পরে অরাজনৈতিক বললেও একথা ঠিক যে এই যুদ্ধাভিজ্ঞতা, গভীর হতাশা ও বেদনা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানই তাঁকে ক্রমশ রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে টেনে আনে। ফলে মানবজাতির সংকট বা ধ্বংসের ছবি '১৬-১৭-র মধ্যেই আরো বৃহৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করে। ঘৃণা, প্রবল মানসিক আঘাত আর সেখানেই শেষ হচ্ছে না, হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ম শ্লেষ আর বিদ্রূপে শানিত এবং আক্রমণমুখী।

"আমার বিষয়বস্তুর ভোঁতা, অমার্জিত রূঢ়তাকে রূপ দিতে পারে, এমন উপযুক্ত শৈলী আয়ত্ত করার জন্যে আমি শৈল্পিক উদ্যমের স্থূলতম প্রকাশসমূহকেও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। গণশৌচালয়ের দেওয়ালে যে-লোকায়ত ড্রয়িং দেখা যায়, প্রয়োজনে তা নকল করেছি। কেননা, আমার মনে হয় যে, ঐসমস্ত ড্রয়িং তীব্র অনুভূতির সবচেয়ে সরাসরি আর স্পষ্টপ্রকাশ। শিশুদের ছবিও, বিশেষত তার দ্ব্যর্থহীন প্রকাশভঙ্গির কারণে আমাকে আকর্ষণ করে। এইভাবে আমার তখনকার অস্থিরতা প্রকাশের প্রয়োজনীয় অঙ্কনশৈলী আমি আয়ত্ত করেছি।"

১৯১৫ থেকে '১৮ সালের মধ্যে তাঁর ছবিতে দেখা যাচ্ছে পোষাকহীন, প্রায় নগ্ন সেই সমস্ত সুখী মানুষদের, এই যুদ্ধ ও মৃত্যুর ব্যবসায়ে যাদের মুনাফা আরো অনেক-গুণ বেড়েছে। এসময়ের মধ্যে তাঁর সমগ্র আঙ্গিকগত ও বিষয়গত ভাবনা একটা মোটামুটি সংহত রূপ নিল 'ডেডিকেশন টু ওস্কার পানিজ্জা' নামে বিশাল ছবিতে। এখন সেজান্ বা পিকাসো তাঁর কাছে ক্লান্তিকর আর আবেগপ্রবণ, "dull and tedious painters of sentimentality'। তুলনায়, তার বেশি পছন্দ ছিল অ্যাঁসর। তাঁর মতে, কল্পনা বা আবেগের সঙ্গে শিল্পের কোন একান্ত, গভীর সংযোগ নেই। ছবির সংজ্ঞা হলো—'toughness, brutality and a clarity—that hurts!' "আমার কাছে শিল্প নিছক নন্দনতত্ত্বের ব্যাপার নয়। ছবি কোন উদ্দেশ্যহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু নয়। কোন গানের লাইন শুধু, মুষ্টিমেয়, সংবেদনশীল শিক্ষিত কয়েকজনের মনে সাড়া তোলার জন্য বা শুধু তাদেরই বিচার্য নয়। ছবিকে অবশ্যই সামাজিক উদ্দেশ্যের অধীন হতে হবে···বর্বর মধ্যযুগ এবং নির্বোধ মানুষের বিপক্ষে ছবি বা যে-কোন শিল্পই একটা উপযুক্ত অস্ত্র হতে পারে, অবশ্য যদি তা প্রয়োগ করার দৃঢ় ইচ্ছা এবং দক্ষতা থাকে।"

বুর্জোয়া সমাজ ও মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণায় এর পরে পরেই গ্রোস্, জন হার্ট-ফিল্ড, রাউল হাউসমান, জোহান্স্ বাডার, হানা হখ্, ভাল্টার মেহরিং, আরভিন পিসকাটর প্রমুখ কবি ও শিল্পীদের সঙ্গে অবিলম্বে 'ডাডা' আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, যুদ্ধজাত হতাশা ও মৃত্যুভয়, ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারী বৃদ্ধি—এসমস্ত কিছুর জন্য দায়ী যে-সমাজ, যে-কাঠামো এবং এই কাঠামোয় বহুল-প্রচারিত, সযত্ন-বর্ধিত তথাকথিত 'পবিত্র শিল্পে'র বিরুদ্ধে এ হলো জোরালো তীব্র প্রতিবাদ, জমে-থাকা বিদ্বেষের চূড়ান্ত ফল। এর অব্যবহিত পরেই ১৯১৮-'১৯-র বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহের প্রভাব গ্রোসের জীবন ও কর্মে খুব গভীর ছাপ ফেলে, যা তাকে আরো সচেতন দায়িত্বগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলল।

"সর্বতো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রবঞ্চিত হয়েছি বুঝতে পারার দুর্দান্ত ক্রোধে, এবং সমস্ত পুরনো মূল্যবোধের নেতিতে আমি ও আমার অনেক বন্ধুই কোন সমাধানের সূত্র দেখতে পাইনি। ফলত, আমরা খুব স্বাভাবিক ও নিশ্চিতভাবে আরো বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম…যে-আন্দোলনে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম, তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল, ফলে রাজনৈতিক সংগ্রামে অস্ত্র হয়ে উঠতে চায় না এমন যেকোন শিল্পকেই আমি ব্যর্থ বলে ভাবলাম। আমি চাইলাম যে আমার কাজকে অবশ্যই বন্দুক এবং তরবারি হয়ে উঠতে হবে ; আমি বললাম যে, আমার আঁকার কলম যদি মুক্তির সংগ্রামে অংশ না নিতে পারে, তবে তা খড়কুটোর সমান।"

গ্রোস্ এসময়ে জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র ও পার্টি পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত পত্রিকায় নিয়মিত ছবি এঁকেছেন। ১৯১৯-এ 'Der blutige Ernst' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এপ্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তা প্রণিধানযোগ্য—'Der blutige Ernst' prints sharply drawn posters of our time in Picture and words. We do not work for a literary clique ; we address ourselves to the broad mass of people. 'Der blutige Ernst' nails down the maladies of Europe, it records the utter collapse of the continent, fights deadly ideologies and institutions which caused the war…It refrains from practicing art for art's sake, sport for mindless idlers. In a desperate collapse, there is no longer room for pretty scribblings and idolisation of form.

"এখন আর আমি মানুষকে বাছবিচারহীনভাবে ঘৃণা করি না। এখন আমি খারাপ প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং যে-সব অমোঘ শক্তি এইসব প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করে, তাদের ঘৃণা করি। এবং আমার যদি কোন আশা থাকে তবে তা, এই যে এসমস্তই একদিন অনিবার্যভাবে শেষ হবে। আমার সমস্ত ছবি এই আশার লক্ষ্যেই পরিচালিত। লক্ষ লক্ষ লোক এই একই আশার অংশীদার, আর তাঁরা কেউ শিল্পবিশেষজ্ঞ নন। অতএব,

আমার কাজকে কেউ 'শিল্প' বলবেন কি বলবেন না, তা নির্ভর করছে 'শ্রমিকশ্রেণীই ভবিষ্যতের কর্ণধার'—এসম্পর্কে তার বিশ্বাস ও আস্থা আছে কীনা, তার উপর।"

"সর্বোচ্চ শিল্প হলো তাই, জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা যার অন্তর্বস্তু। সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বিদ্রোহী শিল্পী তারাই, যারা জীবনের জটিল অস্পষ্টতা থেকে নিজেকে ছিন্ন করার জন্য নিরত সংগ্রাম করছেন এবং রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে সমকালীন বোধির সঙ্গে কঠোরভাবে নিজেদের যুক্ত রাখার চেষ্টা করছেন।"

১৯২০ সালে গ্রোসের ৯টি লিথোগ্রাফের সংকলন—'গড উইথ আস' প্রকাশিত হয়। এ বইতে জার্মান মিলিটারিজম্ ও সোশ্যাল ডেমোক্রেসির প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ প্রায় এক বিধ্বংসী চেহারা নিল। স্বয়ং লেনিন, এই সংকলনে প্রকাশিত 'দি কম্যুনিস্টস ফল অ্যান্ড দি এক্সচেঞ্জ রাইজেস' ছবিটি তাঁর লেখার টেবিলে কাঁচের নিচে রাখতেন। ( দ্র. পৃ. ৬১ )

ইতিমধ্যে গ্রোসের ছবি ও লিথোগ্রাফের জনপ্রিয়তা আশাতীতরকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২১-এ 'শাসক শ্রেণীর মুখ' 'যুদ্ধ পরবর্তী পল্লীকাব্যে'র নির্বাচিত অংশ-সহ প্রকাশিত হলে খুব অল্প সময়ে ৬০০০ কপি নিঃশেষিত হয়। এ বইয়ের সাধারণ পেপারব্যাক সংস্করণের দাম ছিল মাত্র ৩ মার্ক। এক বছরের মধ্যেই বইটির আগে চারটি সংস্করণ হয়। 'গড উইথ আস' বা 'দি ফেস অফ্ দি রুলিং ক্লাসে' গ্রোসের কাজ হয়ে ওঠে আবো তীক্ষ্ন।

"আমরা আমাদের নতুন মহৎ কর্তব্যকে দেখতে পেলাম : বিপ্লবের লক্ষ্যে দায়বদ্ধ শিল্প। একথা ঠিক যে সবসময়েই পক্ষপাতপূর্ণ শিল্পকর্মের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এইসব কাজের প্রশংসা করা হয় আঙ্গিকগত 'সম্পূর্ণত শৈল্পিক' গুণাবলীর জন্য, দায়বদ্ধতার জন্য নয়। এইসব ধারণার বশবর্তী লোকেরা বুঝতে পারেন না যে শিল্প চিরকালই প্রবণতাসম্পন্ন ছিল, এবং পরিবর্তন যা হয়েছে, তা কেবলমাত্র এই প্রবণতার চরিত্র এবং স্পষ্টতায়···এখন যখন শিল্পপ্রেমীরা নীতিগতভাবে অথবা সোরগোল তুলে একটা শিল্পকর্মের প্রবণতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাকে বর্জন করেন, তখন তাঁরা শিল্পীর কাজটিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন না, বরং শিল্পীর মতাদর্শের বিরোধিতা করেন।"

শিলার-এর নাটক অবলম্বনে আরো একটি ছবির সংকলনের নাম—'দি হাইওয়ে মেন'। এখানে নাটকের বিষয় সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে গ্রোস্ তার এক নতুন ও আধুনিক ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করে গ্রোস্ লিখেছেন—'মানুষ একটা জঘন্য ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে—ওপরতলা আর নীচতলা। গুটিকয়েক লোক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে, যখন হাজার হাজার লোক উপবাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু, এর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক কী? সংক্ষেপে তা এরকম যে, বহু শিল্পী ও লেখক বা সমস্ত তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা

স্পষ্ট অবস্থান না নিয়ে একে সহ্য করছেন। আজ যখন সমস্ত অসুস্থ আবর্জনা সাফ করা দরকার, যখন এই নীচতা, সাংস্কৃতিক শঠতা চলছেই আর এব্যাপারে অনুভূতি-শীলতার অভাব যখন ভীষণ, আর যখন এসমস্তের বিরুদ্ধেই আজ সক্রিয় হওয়া দরকার, তখন তাঁরা উন্নাসিকভাবে নিজেদের সরিয়ে রেখেছেন। তাঁদের এখনকার মনোভাব এই যে একমাত্র ব্যক্তিগত আন্তরিক তাগিদকেই বিশ্বাস করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে




□ ছবি : সাক্কো এ্যান্ড ভান্জেত্তি, ১৯২৭

এই মনোভাবকে টলানো এবং একইসঙ্গে নিপীড়িত জনগণকে তাদের 'প্রভু'দের প্রকৃত চেহারাটা দেখানো।"

K.P.D.-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'দি রেড ফ্ল্যাগ' বিভিন্ন সময়ে গ্রোসের অসংখ্য ছবি প্রকাশ করেছে। এছাড়া, শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র 'ডার ন্যুপেল'-এ তাঁর বহু বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য কাজ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। "কোন ব্যক্তি, যার কাছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ফাঁকা আওয়াজ নয়, বা 'সুন্দর, কিন্তু অবাস্তব আদর্শ' নয়, তার পক্ষে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া উন্মাদের মতো কাজ করে তৃপ্তি পাওয়া অসম্ভব। স্বভাবতই তখন সে তার কাজকে বিচার করবে সামাজিক উপযোগিতা ও কার্য-কারিতার মানদণ্ডে। জার্মান বুদ্ধিজীবীরা বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক আবর্জনা থেকে নিজেদের মস্তিষ্ককে সরিয়ে আনুন, এবং আরো অর্থপূর্ণ কম্যুনিস্ট জীবনের সংগঠনে শ্রমিকশ্রেণীর সহকর্মী হয়ে উঠতে চেষ্টা করুন।"

১৯২৪-এ গ্রোস্ 'Red Group, Association of Communist Artists'-এর সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯২৬-এর মার্চে গ্রোস্ মস্কোর বাসিন্দা হাইনরিষ ভোগ্লরের সংস্পর্শে আসেন। ভোগ্লর তাঁকে 'সিন্থেটিক রিয়্যালিজমে'র তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলে এই তত্ত্ব-প্রভাবে গ্রোস্ 'পিলারস্ অফ সোসাইটি' ছবির কাজ শুরু করেন।

১৯২৭ সালে আমেরিকান এনার্কিস্ট দলের সাক্কো ও ভাঞ্জেত্তিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে হত্যা করার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের ঢেউ গর্জে ওঠে। গ্রোস্ স্বাধীনতার প্রতীক 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টির'-র উত্তোলিত ডান হাতে মশালের বদলে ধরিয়ে দিলেন একটা বৈদ্যুতিক চেয়ার, সমস্ত পোষাক রক্তে ভেজা।

পিসকাটরের নতুন থিয়েটার সম্পর্কে গ্রোসের উৎসাহ ছিল অদম্য। ১৯২৮-এ তাঁর সঙ্গে কাজ করার নতুন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গ্রোস্ লিখলেন—"এটা ঘটনা যে, এখানে আরভিন গ্রাফিক আর্টিস্টদের পক্ষে কাজ করার একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, বিশেষত আজকের শিল্পীদের জন্য। মানুষের কাছে সহজভাবে বলতে চান যে শিল্পী, তাঁর পক্ষে কী বিচিত্র এই মাধ্যম! একটা নতুন মাধ্যম, স্বাভাবিকভাবেই নতুন কলাকৌশলও দাবি করে, শৈলীর একটা স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ দাবি করে। হতবুদ্ধি আর বিমূঢ় মস্তিষ্ককে শৃঙ্খলা শেখানোর এ এক বিরাট সুযোগ। স্বেচ্ছাচারী ইম্প্রেশনিস্ট কাজ দিয়ে এখন আর কিছু হবে না। রেখা হবে সিনেমাটোগ্রাফিক—স্পষ্ট, সরল ; কিন্তু খুব বেশি সূক্ষ্ম নয়, বরং তা হওয়া উচিত দৃঢ়, যেমন আমরা গথিক ব্লক-বইয়ের ড্রইং বা উডকাটে, কিংবা পিরামিডের বিপুল স্টোন কার্ভিং-এ দেখে থাকি।" ১৯৩০-এ তাঁর আরো তিনটি ছবির বই প্রকাশিত হয়—শাসকশ্রেণীর নতুন মুখ, এরা সব চিহ্নিত অপরাধী ও সবার উপরে প্রেম।

১৯২৭-২৮ থেকেই অবশ্য তাঁর ধ্যানধারণায় কিছুকিছু পরিবর্তনের আভাস

চোখে পড়ে। দশ বছরের বৈপ্লবিক পর্বের পর গ্রোস যেন হঠাৎই অনুভব করলেন যে সমাজতন্ত্রে কোন সমাধানের বীজ নেই। ফলে ক্রমশ তিনি বুর্জোয়া মরালিস্ট অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। এখন আর তিনি অন্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চান না, চান না যে ছবি হয়ে উঠুক সংগ্রামের হাতিয়ার। যেন বরাবরের মতো অবসর নিলেন গ্রোস্ এবং সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পও যে ফ্যাসিজমের গতিরোধ করতে পারল না তা দেখার জন্য বেঁচে রইলেন।

১৯৫৯ সালে বার্লিনে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কিছু কাজ করলেও, ক্রমশ তাঁর কাজের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। বিক্রয়যোগ্য স্টিল লাইফ, বিমূর্ত ল্যান্ডস্কেপ ও কিছু ডাডাকোলাজ ছাড়া এ সময় তাঁর কাজের আর কোন নজির নেই। যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তীকালের জার্মানির দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি সূক্ষ্ম টানাপোড়েন তাঁর ছবিতে নথিবদ্ধ হয়ে আছে। □

The more antagonistic a person is toward the traditional order, the more inexorably he will subject his private life to the norms that he wishes to elevate as legis-lators of a future soceity. It is as if these laws, nowhere yet realized, placed him under obligation to enact them in advance at least in the confines of his own existence. The man on the other hand, who knows himself to be in accord with the most ancient heritage of his class or nation will sometimes bring his private life into ostentatious contrast to the maxims that he unrelentingly asserts in public, secretly approving his own behaviour, without the slightest qualms, as the most conclusive proof of the unshakable authority of the principles he puts on display. Thus are distinguished the types of the anarcho-socialist and the conservative politician.

--Walter Benjamin, Ministry of the Interior, One Way Street and Other Writings. 1974-76.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

## পিটার সেলজ

# ফ্যাসিবিরোধী আলোর কারিগর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিক। কাইজার আর তার অন্ধ সমরস্তাবকেরা দেশপ্রেমিক জার্মানদের প্রায় কব্জা করে ফেলেছে। একে অপরকে, দেখা হলেই বলছে, "ভগবান ইংল্যাণ্ডকে শাস্তি দিক"। যুবক হেলমুট হার্জফেল্ড। চিত্রকর ও ছাপাই ছবির কারিগর। নির্বোধ এই উগ্র স্বাজাত্যবোধ তাকে ভীষণ বিরক্ত করছিল। সচেতনবোধ স্বভাবত এই অন্ধ উগ্রতার বিরোধী হয়ে উঠল। নিজের জার্মান নামটাকে পালটে ফেললেন তিনি। ঠিক করলেন জন হার্টফিল্ড নামেই এখন থেকে নিজের পরিচয় রাখবেন। কিন্তু আইনত সিদ্ধ হলো না তার ইচ্ছে। কাইজারের অফিসারকুল এই "অজার্মান" নামটি অনুমোদন করেনি। পরিবর্তনের আবেদন নাকচ হলো। অথচ মজার ব্যাপার—"হার্টফিল্ড নামটি কাইজারের সময়সীমাকে পেছনে ফেলে বহু ব্যাপ্ত হয়ে গেল"। এমনিই কিছু লিখেছিলেন ভাইলাণ্ড হার্জফেল্ড। তিনি শিল্পীর অনুজ ও সারা-জীবনের সহযোগী।

১৮৯১, বার্লিনে জন্ম। বাবা সমাজতান্ত্রিক কবি। বাপে-তাড়ানো মায়ে-খ্যাদানো ছেলে। বিভিন্ন পরিজন অথবা সেবা প্রতিষ্ঠানের কৃপায় বেড়ে ওঠা। ১৯১০—

দেখা গেল মিউনিকে। এক শিল্পশিক্ষার্থীর চরিত্রে। কিছুদিনের মধ্যেই পরিচয়ের গণ্ডি বাড়তে লাগল। মৌলিক চিন্তাবিদ ও শিল্পীকুলের বৃত্তে। এদিকে শিল্প ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাঝের চিড় বাড়তে লাগল। চওড়া হয়ে হাঁ করল এক ফাটল।

নতুন বিশ্বাসকে রূপ দিতে নতুন রূপবন্ধের অনুসন্ধান। হার্টফিল্ড ও বন্ধুরা ফটোমন্তাজ আবিষ্কার করলেন। আসলে পশ্চিম সীমান্তের ঘটনা। যুদ্ধের নৃশংসতার খবর সেন্সরের বেড়া টপকে বাইরে পাঠাতে পারত না সৈন্যরা। তাই নানা পত্রিকার ছবি বা ফটোগ্রাফ ছিঁড়ে বা কেটে তৈরি হতো ইঙ্গিতবার্তা। তাদের বাড়ি বা বন্ধুদের জন্য। 'দিশী' প্রয়োগরীতি আর কিউবিস্ট ঘরানার কোলাজপদ্ধতি একসঙ্গে মেশানো হলো। হার্টফিল্ড ও অন্তরঙ্গ গেয়র্গ গ্রোস ফটোমন্তাজ সৃষ্টি করলেন। একযুগ পরে গ্রোস আরভিন পিসকাটরের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে বলেছেন . "আমার সাউথএণ্ডের স্টুডিয়ো, ১৯১৬-র মে মাস। সকাল পাঁচটা, আমি আর জন হার্টফিল্ড। ফটোমন্তাজ আবিষ্কার করলাম। অথচ দুজনের কেউ এর সম্ভাবনার ছিটেফোঁটাও আন্দাজ করতে পারিনি। তখন ন[illegible] কাঁটাছড়ানো সাফল্যের রাস্তা বেয়ে এই নবজাতককে চলতে হবে। মাঝে মাঝে হয় না, হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়লাম। হ্যাঁ, সোজা এক সোনার খনির ভেতর। অথচ তা জানতেও পারলাম না"।

সম্ভবত গ্রোস একটু বেশিই কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন। গ্রোস, রাউল হুসমান ও হান্না হক বার্লিনে আর আলেকজান্ডার রোদশেঙ্কো মস্কোয় নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। তবু আবিষ্কারটি সম্ভবত হার্টফিল্ডর একান্ত নিজস্ব। জীবনভোর প্রয়োগরীতিটি তাঁর কাজকর্মের কেন্দ্রীয় ভাবনার স্থান অধিকার করেছিল। হয়তো চিত্রণের কাজ তেমন আসত না। অতএব নতুন এই মাধ্যম। বিশ শতকের অন্যতম রূপবন্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি ফটোমন্তাজকে।

জার্মানির রাজধানীতে বিপ্লবের হাওয়া। জার্মান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে। বার্লিন 'দাদা'পন্থীরা সক্রিয় রাজনৈতিক অবস্থানে সরে এলেন। জুরিখের আদি গোষ্ঠী বা আরো পরের পারি গোষ্ঠী থেকে এঁরা একটু আলাদা। তখনও ত্রিস্তান ৎজারা বলে চলেছেন, 'দাদার কোন অর্থ নেই, দাদা কোনকিছুই নির্দিষ্ট করে না'। হুসমান ও রিচার্ড হ্যুলসেনবেক আহ্বান জানালেন : "আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সংহতির আজ প্রয়োজন। সমস্ত সৃষ্টিশীল ও বুদ্ধিবিদ মানুষের সংহতি। সাম্যবাদের র‍্যাডিকাল ভিত্তিতে"। নতুন শিল্প ও নতুন রাজনীতি ভাবনার হাতে হাত দিয়ে চলা দরকার। "সাইমালটেনিস্ট কবিতাকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের প্রার্থনাসঙ্গীত হিসাবে স্বীকার করা হোক"। বুর্জোয়াদের সম্পদ শুধু ধ্বস্ত নীতিবোধ ও সস্তা আবেগ[illegible]তা। তাকে আঘাত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিল সমস্ত দাদাপন্থী। তারা যুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী। এবং শিল্প স্পষ্টতই নীতিচ্যুত বুর্জোয়া জগতের বিষয়। তাই তারা শিল্পেরও বিরোধী।

তাদের কার্যকলাপ নৈরাজ্যবেষ্টিত মনে হতে পারে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচণ্ড গঠনধর্মী। অতএব তা স্বাভাবিকভাবেই নৈতিকতামণ্ডিত।

বার্লিন দাদাগোষ্ঠীতে তখন হুসমান, হুয়েলসেনবেক, হার্টফিল্ড, হার্জফেল্ড গ্রোস, হুক, ভাল্টার মেহরিং আর জোহানেস বাডার। যুদ্ধান্তের জার্মানির সাধারণ বৈপ্লবিক সংগ্রামের অংশী হয়ে উঠল এই গোষ্ঠী. যদিও এঁদের অনেকেই একইসঙ্গে রাজনৈতিক ও নান্দনিক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। দাদা কিন্তু নিজের ধারণায় দৃঢ়মূল রইল। কোন গুরু বা মুরুব্বি তাঁদের ধ্যানধারণায় পাত্তা পায় না। অভিজাত বা সর্বহারা, কেউ না। 'ফলে যতই তাঁরা বৈপ্লবিক আন্দোলনের আরো গভীরে জড়িয়ে পড়লেন, ততই দাদা হিসেবে তাঁদের নিজস্বতা ক্রমশ ফিকে হতে লাগল'।[১]

হার্টফিল্ড, ভাই হার্জফেল্ড আর গেয়র্গ গ্রোসের সাথে একত্রিত হলেন। যুগান্তকারী আভাঁ-গারদ সাময়িকী 'ন্যু জুগেনড্' ( নব যুবক ) প্রকাশ হতে লাগল। পরিপূর্ণ নতুন টাইপোগ্রাফিক মুদ্রণছন্দে ছুঁড়ে দেওয়া হলো প্রাচীন তক্ষণভাবনার বহুকিছু, এক সাথে। জয়েসীয় মুক্তবন্ধে। পরবর্তী সময়ে বাউহাউসের হাতে সাফল্যে ঝকঝক করে উঠেছিল এই রীতি। ১৯১৭-র উজ্জ্বল মৌলিক এই পদ্ধতি। অথচ পরিণতি অদ্ভুত। ব্যাপক বাজারী শিল্পকলার ঝোলায় ঠাঁই পেল অবশেষে।

বিশের দশকে টাইপোগ্রাফি আর ফটোমন্তাজে প্রচ্ছদ বানাচ্ছেন জন। মালিক ফ্যেরলাগ প্রকাশন সংস্কার পক্ষে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বামপন্থী সাহিত্যের সম্পদ তখন এই সংস্থার সৃজনায়। বার্লিনে সংস্থাটির পরিচালক তাঁর ভাই। আপটন সিনক্লেয়ার থেকে ম্যাক্সিম গোর্কি, ইলিয়া এরেনবুর্গ। সেই সাথে গেয়র্গ গ্রোসের লিথোগ্রাফিক চিত্রপট। বহু মৌলিক সাময়িকীতে কাজ করছেন। কম্যুনিস্ট, 'আর্বেইটের ইল্যুসট্রিয়ের্ট-ৎসাইটুঙে' ('AIZ', সচিত্র মজদুর বার্তা) নিয়মিত নথিচিত্রণ। সুখ্যাত ম্যাক্স রেইনহার্ডটের জন্য মঞ্চসজ্জা। আরভিন পিসকাটরের পরীক্ষামূলক, প্রলেতারীয় বিপ্লবী থিয়েটারেও তাই। বের্টোল্ট ব্রেখটের বন্ধু, শিষ্য। ব্রেখটের বহু ভিত্তিমূলক ভাবনার শরিক। জার্মানি অর্থতারল্যে ভুগছে। মন্দায়। ফ্যাসিজমের আসন্ন বিপদ। হার্টফিল্ডের শিল্পবোধ রাজনৈতিক আক্রমণে ঝলসে উঠছে, "সচেতন রাজনৈতিক বিক্ষোভ-আলোড়নের প্রয়োজনে ফটোগ্রাফ সংস্থিত করছেন"। ভাইমার জার্মানির রাজনৈতিক সংকট গাঢ়তর হয়ে উঠছে। ১৯২৮-এ তৈরি হলো 'দি ফেস অফ ফ্যাসিজম'। মন্তাজটি সারা ইয়োরোপকে প্রবল নাড়া দিল। মুসোলিনির মুখ যেন করোটি। করোটির চারদিকে সুস্পষ্ট দুর্নৈতিক অনুগামীবৃন্দ। আর তার হাতে নিহত শিকারতাবৎ।

হার্টফিল্ডের কাজের বিশেষ আদল এই ফটোমন্তাজটিতে স্পষ্ট। অন্য সমস্ত ধরনের কোলাজ থেকে আলাদা। কিউবিস্ট শিল্পীরা আঠারো শতকের কোলাজের

---

১. লাসলো মহোলি-নাগি, ভিশন ইন মোশন, ১৯৪৭।

পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। বুপবন্ধের কাঠামোগত প্রয়োজনে। বাস্তবতার প্রকৃতি বিষয়ে প্রশ্ন খুঁচিয়ে তুলেছেন। যেমন কুর্ট শাইটারের মার্জ কোলাজ। বর্জ্য, অকেজো বস্তু কুড়িয়েবাড়িয়ে সভ্যতার অসহ্য ভারমুক্তির জন্য পরোক্ষ আবেদন। জাঁ দুবুফে যেমন বলেছিলেন, 'অনাদৃত মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেছেন তাঁরা, আর এভাবেই পরবর্তী কালে সভ্যতার বর্জ্য, পরিত্যক্ত বস্তুপুঞ্জের নবনির্মাণে উৎসাহী শিল্পীদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে প্রক্রিয়াটি'। হার্টফিল্ডের কাজ ঠিক উল্টো। সচেতন ও প্রয়োজনভিত্তিক। ফটোগ্রাফির চিত্রসংস্থানের প্রয়োজনে আলোকচিত্রের টুকরো-টাকরা জোড়া দিয়েছেন। তীব্র বিষয়ী আবেগ সংহতির সৃষ্টি হয়েছে দর্শকের কাছে। এদিক দিয়ে তাঁর কাজ ফিউচারিস্ট কোলাজের খুব কাছাকাছি। অগ্রবর্তী জাঁ আরপ বা ম্যাক্স এর্ন্স্টের দাদা-কোলাজ বলা যায় মূলত আকস্মিক ঘটনা। হার্টফিল্ড কিন্তু ফটোমন্তাজকে ব্যবহার করেছেন তিক্ত সামাজিক প্রতিবাদে। কিংবা রাজনৈতিক প্রচারে। ঠিক একশ বছর আগে দোমিয়ের লিথোগ্রাফের কথা মনে আসে। অথচ হার্টফিল্ডের এই মাধ্যম নবতম, নিরৈতিহ্যিক, আনকোরা। নিজ সময়ের কথা তুলে ধরেছেন তাতে। প্রচণ্ড ক্রোধ, তীব্র শৈল্পিক মেধায়। "অসহনীয় ঘটনার উপাদান তাঁর কাজ গতিময় করে তুলেছে"। লেখক ওসকার মারিয়া গ্রাফ বন্ধু হার্টফিল্ড সম্বন্ধে এই কথাগুলোই বলেছিলেন একদা। সত্যিই অসহ্য চাপে, উত্তাপে ১৯৩২-এ হিটলারকে আঁকলেন। 'অ্যাডলফ দ্য সুপারম্যান'। হিটলার স্বর্ণমুদ্রা গিলছে আর ঢেকুর তুলছে। অথবা নাৎসি সেলামের ভঙ্গিমায় উর্ধ্ববাহু হিটলার। পেছনে 'মিলিয়নস'। লক্ষ মানুষ নয়। লক্ষপতির বিশাল চেহারা। উর্ধ্ববাহুতে তুলে দিচ্ছে 'মিলিয়নস'। লক্ষ মুদ্রার ঘুষ। হিটলারের ক্ষমতালাভের বছরখানেক পরের কাজ। আরেকটিতে হিটলার শ্রমিকসভায় ভাষণরত। হাতে একটি ফলক। তাতে নাৎসি ঈগলের দুই ডানায় কাস্তে আর হাতুড়ি। পেছনে গোয়েবলস ফ্র্যাঙ্কেরাবের গালে কার্ল মার্কসের দাড়ি জড়িয়ে দিচ্ছে। অথবা ১৯৩৬, পাচকের বেশে হিটলার, ছুরি শানাচ্ছে। সামনে গ্যালিক কক। ফরাসি মোরগ। হিটলারের মুখে ধূর্ত হাসি। আমি নিষ্পাপ, আমি নিরামিষাশী। স্মারকের মতো এইসব ফটোমন্তাজ। চিত্র ও উদ্দেশ্যভাবনায় তীব্র, জমাট। ঠিক স্মারকের মতোই একটি প্রজন্মের দৃষ্টি ও মানসে দানা বেঁধে আছে।

জার্মান সংসদ রাইখস্ট্যাগ পোড়ানো হলো। গোয়েরিং ও গোয়েবলসের এই নিঃসন্দেহ পাপকৃতি। কারণ, কম্যুনিস্টদের কুক্ষিগত করা দরকার। জন হার্টফিল্ড নির্ভয় তীব্রতায় প্রকাশিত হলেন। 'গোয়েরিং দি এক্সিকিউসনার অফ থার্ড রাইখ'। রক্তস্নাত গোয়েরিং রক্তাক্ত কুড়ুল হাতে, সংসদ ভবনের সামনে। তার সামান্য পরে একই বিষয়ের আরেক মহান নথিচিত্র। 'দি এক্সিকিউসনার এণ্ড জাস্টিস'। নিষ্পেষিত আইনব্যবস্থা। মাথা ঘিরে চোখঢাকা ব্যাণ্ডেজ। দুটুকরো হাতে ন্যায়ের তুলাপাত্র অনানুভূমিক। অপর

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে তলোয়ার। রাইখস্ট্যাগ দহনকাণ্ডের বিচারকালে গোয়োরিংয়ের উক্তির অংকিত নথি বিস্তার : "আমার কাছে আইন এক রক্তাক্ত বিষয়"।

কোন মজদুর এক 'ব্রাউন শার্টের' (নাৎসিরা ব্রাউন শার্ট পরত এবং নিজেদের ব্রাউন শার্ট বলে পরিচয় দিত) পরণের উর্দি নিয়ে অপমানজনক কথা বলে। এই অপরাধে ছুরির আঘাতে নিহত হয় সে। স্বাভাবিক নিয়মেই জার্মান 'এস এ' আইনের হাতে শাস্তি পায় না। তাই নিয়ে 'ড্যাগার অফ অনর'। 'দি ওল্ড স্লোগান ইন নিউ রাইখ : ব্লাড এণ্ড আয়রন'। চারটি লিঙ্গতলহ কুড়ুল দিয়ে স্বস্তিকা রচনা করেছিলেন শিল্পী। আইজেনস্টাইনের কথা মনে পড়ে, ব্যাসবিপরীত বিম্বসমূহকে সংযুক্ত করতেন হার্টফিল্ড, তাঁর ফটোমন্তাজে। তৃতীয় এক ধারণার সংশ্লেষণ গড়ে দিতেন, তাদের আন্তঃক্রিয়ায়। দর্শক আবিষ্ট হতেন তীব্রতর, পূর্ণতর কোন বিশ্বধারণায়। বিভিন্ন অংশের যোগফলের তুলনায় প্রবলতর পূর্ণে যার উৎপত্তি, বিপরীত ধারণার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে। থরভাল্ডসেনের বিখ্যাত 'ক্রস অফ গলগোথা'র ব্যবহার, উপলক্ষ্য, 'রাষ্ট্রীয় চার্চের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা'। বীভৎসদর্শন এক নাৎসি স্ক্রু দিয়ে ক্রুসে অতিরিক্ত কাঠ জুড়ে তৈরি করেছে স্বস্তিকা। নাম দিলেন, 'দি ক্রস ইজ স্টিল নট হেভি এনাফ'। আধখোলা চোখ সৌম্য যিশুর কাঁধে ক্রস। এখনো তেমন ভারি নয়।

প্রসারিত হাতের বিশাল কঙ্কাল। পাঁচটি হাতের আঙুল থেকেই একটা করে বোমারু উড়ে আসছে আকাশে। নীচে বিধ্বস্ত শহর। ছড়ানো মৃত শিশুদেহ। স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ ১৯৩৬-এর সময় ভয়ংকর এই ভবিষ্যৎবাণী। যেন এক সতর্ক বার্তার মতো ফটোমন্তাজটি সৃষ্টি হয়েছিল। পরে জার্মান শহরে মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণের কালে পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন। শিরোনাম ছিল, 'জাতিগত নির্বাচন ও ও সামাজিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বোমাবর্ষণের সুফল'। তার সঙ্গে 'বার্লিন জার্নাল ফর বায়োলজি অ্যাণ্ড রেস রিসার্চে'র ঐ সময়ের চালু সংখ্যাটির থেকে উদ্ধৃত জঘন্য একটি অংশের সংযোজনা : "ঘনবসত শহরাঞ্চলসমূহে মারাত্মক বিমান হানা দিচ্ছে। এই সব অঞ্চলে দরিদ্র প্রলেতারিয়েতের বাস। বোমাবর্ষণেই এই আবর্জনার হাত থেকে মুক্তি পাবে সমাজ। একটন বোমা শুধু মৃত্যু নয়, প্রায়শ তাদের উন্মাদে পরিণত করে। কারণ দুর্বলস্নায়ু মানুষ এ আঘাত সইতে পারে না। সহজেই এই মানুষগুলোকে খুঁজে বার করা তাই সম্ভব। তখন একটা কাজই আর বাকি থাকে—তাদের নির্জীব নপুংসকে পরিণত করা। জাতিগত বিশুদ্ধতা এভাবেই নিশ্চিত করা যাবে'।

'দাদা বিদ্রোহে'র প্রাথমিক কার্যকলাপ থেকে এইসব ফটোমন্তাজ বহু দূরে সরে এসেছিল। তাই তীব্র সচেতনতা থেকে তীক্ষ্ম, সরল বিম্বসৃজন। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেই শুধু তার ব্যবহার। পিকাসো একসময়ে ছবির যে ভূমিকার কথা ভাবতেন, তারই পূর্ণায়ন ঘটেছিল এখানে। অর্থাৎ "শত্রুকে আঘাত করা এবং





তার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়"। হার্টফিল্ডের অস্ত্রশক্তির আন্দাজ পেয়ে নাৎসিরা তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিল। অতএব ১৯৩৩-এর বসন্তে জন প্রাগে পালালেন। এবং সেখানেও নাৎসি বিভীষিকাকে ধিক্কার দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলেন দ্রুত। সত্যি বলতে কি এই পরবাসেই শ্রেষ্ঠ পোস্টারগুলো রচিত হয়েছিল তাঁর হাতে। প্রচন্ড শক্তিশালী সব রাজনৈতিক পোস্টার।

১৯৩৪-এ নামী চেক শিল্পীদের সংস্থা প্রাগের প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ রাখলেন। সেই সময়েই আন্তর্জাতিক ঘটনাটি ঘটল। নাৎসি সরকার দাবি জানিয়ে বসল, ওখান থেকে জনের বেশ কিছু শক্তিশালী রাজনৈতিক ছবি সরিয়ে নিতে হবে। ভাই হার্জ-ফেল্ডের প্রবন্ধ সংকলনে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। চেক সরকার, তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রাখার নীতি যতদিন সম্ভব মেনে চললেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত হিটলারের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। হার্টফিল্ডের ঘটনা আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ও মতাদর্শগত সংঘাতের স্তরে জড়িয়ে পড়ল। 'ইনডিপেনডেন্ট' প্রধান পল সিয়্যাক প্রাগে তাঁর বন্ধুদের লিখলেন :

"আমাদের সহকর্মী জন হার্টফিল্ড আজ নির্যাতনের বলি। তাঁর ওপর অন্যায় ও নির্বোধ আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি তোমাদের সঙ্গে সমস্বরে তার প্রতিবাদ করছি। সারাজীবন শিল্পের মুক্তির জন্য লড়ছি। তাই মনে করি না চিৎকার করে তা শোনাতে হবে, তোমাদের সঙ্গে মনেপ্রাণে আমি এক। আমাদের বন্ধুর ফ্রান্সে একটা প্রদর্শনীর ব্যাপারে আমি সব কিছু করব। মনে হয় বহু ফরাসি শিল্পীও এগিয়ে আসবেন। চারিদিকে প্রতিক্রিয়ার ভরা জোয়ার। আমাদের সংঘ আত্মিক স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে একটা ভারসাম্যে আসতে আগ্রহী। এসো আমরা সংহত প্রাণ হয়ে নিজেদের রক্ষা করি।"

বসন্ত ১৯৩৫, প্রদর্শনী হলো। লুই আরাগঁ হার্টফিল্ড ও তাঁর অজিত রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। লেখাটি হার্জফেল্ডের সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রথমসারির কম্যুনিস্ট শিল্পী সম্পর্কে মহান কম্যুনিস্ট বুদ্ধিবিদের উজ্জ্বল সারসংক্ষেপ।

"জন হার্টফিল্ড তাঁদেরই একজন যাঁরা তেলরঙের প্রথাসিদ্ধ কাজে ঘোরতম সন্দেহ প্রকাশ করেন : বিশেষত তার প্রকরণকৌশলে। বহু ছবিই হয়তো কয়েকশ' বছর বেঁচে আছে। মনে হয় যেন ছবির ভাষা চিরকালই এমনি থাকবে। আসলে কিন্তু নতুন প্রয়োগ কৌশলের সামনে যে কোন সময় তাদের লড়াই ছেড়ে দিতে হবে। কারণ নতুন প্রকৌশল সমসাময়িক মনুষ্যজীবনের সাথে সাজুয্যে সহগামী। তৈলচিত্রের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এবাবদে অনেকেই নিঃসন্দেহ। তিনিও তাদের একজন। আমরা জানি ফটোগ্রাফির কৌশল আবিষ্কারের পর চিত্রশিল্পীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় কিউ-বিজমের সৃষ্টি। সাদৃশ্য অনুসন্ধানের আর কোন মানে হয় না, ফটোগ্রাফ ও সিনেমার পর কার্যত বাস্তবসদৃশ রূপগঠনের ধারায় কাজ করা নিছক ছেলেমানুষি। নতুন প্রযুক্তি

ও কারিগরির সাহায্যে তারা এমন এক শিল্পধারণায় পেঁছিলেন, যা স্পষ্টতই বস্তুসদৃশ-তত্ত্বের বিরুদ্ধে, ন্যাচারালিজমের প্রতি আক্রমণমুখী। আবার কেউ কেউ বাস্তবের নতুন সংজ্ঞার সন্ধানে বেরোলেন। যেমন লেজের, ক্রমশ অলঙ্কারধর্মী কাজের দিকে ঝুঁকলেন, মন্দ্রিয়ান পাড়ি দিলেন বিমূর্তজগতে, পিকাবিয়ার ক্ষেত্রে তা জগতব্যাপী সান্ধ্য মজলিশের সংগঠন প্রক্রিয়ার দিকে মোড় নিল।

"যুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানির বহু শিল্পী যেমন গ্রোস, হার্টফিল্ড, এর্নস্ট কর্ম-প্রক্রিয়ার সমালোচনার ভেতর দিয়ে এক নতুন শিল্পভাবনায় পেঁছেছেন। কিউবিস্টদের থেকে একদম অন্যরকম। দেশলাইয়ের বাক্সে হয়তো খবরের কাগজের টুকরো সেঁটে, কোন ছবির মাঝখানে লাগিয়ে দিয়েছেন। তাকে বাস্তবের শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়েছেন। ফটোগ্রাফ চিত্রশিল্পের সামনে একটা লড়াইয়ের আহবান জানিয়েছে। আজ শুধুই অনুকরণের কাজ থেকে সে মুক্ত। এবং তাঁর স্বকীয় কাব্যের প্রয়োজনে নিয়োজিত।

"আজ জন হার্টফিল্ড জানেন কীভাবে সৌন্দর্যের সম্মান দিতে হয়। তিনি জানেন আমাদের যুগোপযোগী সৌন্দর্য সৃষ্টি কীভাবে করা যায়। যাতে মানুষের কান্না ফুটে ওঠে। বাদামী ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে যাতে মানুষের সংগ্রামের প্রকাশ ঘটে। যাদের পাকস্থলী ফুলে উঠেছে স্বর্ণখন্ডে। লক্ষ মানুষের জীবনসংগ্রামের বাস্তব ছবি সৃষ্টি করেছেন তিনি, যাদের প্রত্যেকে এই জীবন ও লড়াইয়ের অংশী। এবং লেনিনের ধারণামতে সেই শিল্পই প্রকৃত যা প্রলেতারীয় বিপ্লবী সংগ্রামের হাতিয়ার।

"আজ জন হার্টফিল্ড জানেন কীভাবে সৌন্দর্যের সম্মান দিতে হয়। তাঁর শিল্প অগণন অবদমিত বিশ্বমানুষের কথা বলতে পারে। কোন ক্ষণমুহূর্তের জন্যও উদ্দাম স্বরমাধুর্যের এতটুকু অবনমন না ঘটিয়ে। তাঁর দুরন্ত কল্পনার রাজসিক কবিতায় একটুও খাদ মেশাতে হয় না। কাজের গুণমানের সামান্যতম অবনতিও কখনো ঘটে না। সম্পূর্ণ স্বকীয় প্রকৌশলের তিনি রাজা—যে পদ্ধতিতে তাঁর প্যালেটে বিস্তারিত প্রকাশের বিচিত্র চিহ্ন ব্যবহার করেন তিনি, জাগতিক বস্তুসত্যের সার সংকলন করেন। কখনো মেজাজের ওপর কোন লাগাম চাপাতে হয় না। ইচ্ছেমতো জীবাকৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যান। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ছাড়া অন্য কোন দিকসংকেত তিনি মানেন না। বাস্তবতার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য আর কিছু জানেন না। সাদা-কালোয় ভাষান্তরিত করে সে প্রক্রিয়ার অন্তর তিনি যুদ্ধের ক্রোধে ভরে দিয়েছেন।"

প্যারিতে নিজের প্রদর্শনী দেখে হার্টফিল্ড প্রাগে ফিরলেন। কয়েকটি নাটকীয় পোস্টারে স্পেনে ফাসিস্ত অনুপ্রবেশের ছবি ফুটে উঠল। চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসি দখল-অভিযান। ১৯৩৮-এ মিউনিখ সন্ধিপত্রের পর। (তাঁর ছবিতে প্রাসঙ্গিক পূর্বাভাস স্মরণীয়)। হার্টফিল্ড কোনরকমে লণ্ডনে পালাতে পারলেন। যথেষ্ট গুণগ্রাহী উষ্ণতায় তাঁকে গ্রহণ করা হলো। যুদ্ধকালে ইংল্যান্ডে নিজের প্রদর্শনী করেছিলেন। আর ফটোমন্তাজের কাজ। 'লিলিপুট' ও 'পিকচার পোস্টে'। রাজনৈতিক জনসভার

বক্তব্য রাখতেন। ফ্যাসিবিরোধী দলগঠন। শিল্প-রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে প্রবন্ধ লেখা। সঙ্গে রাজনীতির অনুষ্ঠানে সফল অংশগ্রহণ। পেঙ্গুইনের বইয়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা। কিন্তু বারো বছর ইংল্যান্ডবাস শরীরে সয়নি। কাজের সুযোগও তেমন মেলেনি। ক্ষুরধার রাজনৈতিক পোস্টারের কোন সৃজনশীল প্রেরণাও আর কখনো আসেনি।

১৯৫৩ য় পূর্ব জার্মানিতে ফিরলেন। আগের কাজকর্মের সমাহারে রেট্রোস্পেকটিভ প্রদর্শনীতে অভিনন্দিত হলেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় রয়ে গেল প্রাক্তন প্রধান ও সম্মানিত স্মরণবস্তুর মতো। বর্তমান লড়াই বা সমস্যার সঙ্গে তেমন কোন যোগাযোগ গড়ে উঠল না। শেষজীবনে মঞ্চ পরিকল্পনা, পোস্টার, প্রচ্ছদ নিয়ে হয়তো ব্যস্ত থেকেছেন। সাংস্কৃতিক নেতা হিসেবে সম্মান পেয়েছেন। স্বকীয় প্রবচনের সাংস্কৃতিক সংগঠক। গোঁড়া সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা ফটোমন্তাজকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। এমনকি ১৯৫০ সালেও। তাঁদের তরফে এই প্রকৌশলকে বিশের দশকের আভাঁ গার্দ শৈলী হিসেবে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে, অথচ মস্কো বা পেইচিং-এ তাঁর রচনা জনগণের অনুমোদন পেয়েছে। তুঁং সন্তান রচনাসম্ভারে ফ্যাসিবাদের বক্তলিপ্ত অভ্যুত্থানকে পঞ্জিভুক্ত করেছিলেন জন। যে-ফ্যাসিঅভ্যুত্থান হাজার দশেক মানুষের চিন্তা ও কাজকে দেওয়ালে দেওয়ালে ঠেসে ধরেছিল একদিন। তাঁর সেই তীক্ষ্ণ অম্লধর্মী যুদ্ধপূর্ব রচনা-সম্ভারের বিশাল প্রদর্শনী হয়েছে। ওই উভয় শহরেই।

পূর্ব জার্মানিতে কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের অভিজ্ঞতা থেকে, অদ্ভুতভাবে তা তেমন আলাদা নয়। শিল্পী হার্টফিল্ডের কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল দোষীকে চিহ্নিত করা। যথেষ্ট আক্রমণাত্মক—এবং প্রায়শই মারাত্মক ভঙ্গিতে। তাঁর দৃশ্যকল্পনায় তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতুলনীয় এক নিজস্ব ভাষাভঙ্গি। মনের মতো উপায়ে শত্রুকে ব্যঙ্গে পর্যুদস্ত করা। নৃশংসতা, দুর্নৈতিকতার বিরোধে সারাটা জীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন। সম্ভাব্য মনোমত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তিনি অন্যভাবে ভাবিত হতে পারেন কী করে?

কদাচ হয়তো শান্তির জন্য বিশাল পোস্টার করেছেন। ১৯৬০-এ 'নেভার এগেইন'। একাজেও আগের রচনাশক্তি প্রতিফলিত। বিষয়বস্তুর আবিষ্কার এবং তির্যকগুণের পূর্ণ প্রাঞ্জলতায়। সংযুক্ত বিক্রিয়ায় দর্শকমানসে এক ভয়ানক আবেগ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কাজে। উদ্যত বেয়োনেটে বিদ্ধদেহ শান্তিপারাবত। মৃত, শিথিল তার মুখে শান্তির তৃণমঞ্জরী। বেয়োনেটে রক্তের দাগ। দু'একটা ছিন্ন পালক উড়ছে। এলোমেলো। 'নেভার এগেইন'। আর যেন শান্তি নিহত না হয়। 'বিশ্বমানবতার' কাছে শিল্পীর এই শেষ দাবি। □

# ওয়ান ম্যান'স ওয়র এগেনইস্ট হিটলার

১৮৯১ : ফ্রানৎস্ হার্জফেল্ড (১৮৬২-১৯০৮, সমাজতান্ত্রিক কবিনাট্যকার ও গদ্য লেখক) ও অ্যালিসের প্রথম সন্তান হেলমুট হার্জফেল্ডের জন্ম, বার্লিনে ১৯ জুন। ১৮৯৫-এ ফ্রানৎস গ্রেফতার এড়াতে পরিবারসহ সুইজারল্যান্ডে পালান। সদ্যোজাত ভাইলান্টের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হতে পারে, এই ভয়ে বিতাড়িত ফ্রানৎস্ অস্ট্রিয়ার সালজবুর্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কুটির বানালেন, চারদিকে জঙ্গল, পাহাড়। '৯৮-এ পরিত্যক্ত হার্জফেল্ড-সন্তানেরা আশ্রয় পেলেন এক গ্রাম্য মেয়রের বাড়ি। ১৯০৫-এ স্কুলের শিক্ষা শেষ হলো। হেলমুট ও ভাইলান্ট ভাইসবাডেনে গেলেন কাজের সন্ধানে। দু'বছর এক পুস্তকবিক্রেতার দোকানে কাজ করার পর হেলমুট শিল্পী হেরমান বুফিয়েরের স্টুডিয়োয় কাজ শিখলেন। ফ্রানৎস্ পাগলাগারদে সকলের অজ্ঞাতে মারা গেলেন, ১৯০৮-এ। ১৯০৯-১২ : মিউনিখের স্কুল অফ অ্যাপ্লায়েড আর্টসে পড়াশোনা। ১৯১২ : মানহাইমে কাগজের কারখানায় ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন, ৩০শে মে বাবার ৫০তম জন্মদিনে প্রকাশিত 'নির্বাচিত রচনা'-র প্রচ্ছদ আঁকলেন, সেই প্রথম কাজ। ১৯১৩ : বার্লিনে ফিরলেন, আনর্স্ট নিউমানের সঙ্গে আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট্স স্কুলে শিক্ষালাভ। লেনার সঙ্গে দশ বছরের বিবাহিত জীবনের শুরু। 'স্টার্ম' ও 'আক্শন' শিল্পীদের সঙ্গে কাজ।

১৯১৪ : ম্যুরাল পরিকল্পনার জন্য কোলনের প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার। ছোট ভাই কবি ভাইলান্ট পশ্চিম রণাঙ্গণ থেকে মাঝে মাঝে বার্লিনে পালিয়ে এসে যুদ্ধ-বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ছেন।

১৯১৫ : পদাতিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিযুক্তি কোনমতে এড়ালেন। গেয়র্গ গ্রোসের সঙ্গে পরিচয়, নিজের সমস্ত কাজ তাৎপর্যহীন—অনুপ্রাণিত হয়ে সব নষ্ট করলেন। '১৬-য় বৃটিশবিরোধী প্রচারের প্রতিবাদস্বরূপ নিজের নাম পাল্টে করলেন জন হার্টফিল্ড, আইনসিদ্ধ হলো না এই পরিবর্তন। ভাইলান্ট 'ন্যু জ্যুগেন্ড' নামে পুরনো স্কুল ম্যাগাজিনের স্বত্ব কিনলেন, কেননা নতুন প্রকাশনা তখন আইনত নিষিদ্ধ। ১৯১৭ : নতুন প্রকাশনা সংস্থা 'মালিক ফ্যেরলাগ'-এর প্রতিষ্ঠা, দুই ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। '১৮য় গ্রোসের সঙ্গে জার্মান সেনাদলকে বিদ্রূপ করে 'ট্রিকফিলম'। ভাইলান্ট, গ্রোস, পিসকাটরের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন।

১৯১৮ : বার্লিন ডাডা গ্রুপের সহপ্রতিষ্ঠাতা। Monteur Dada (Mechanic, fitter)—দাদা গোষ্ঠীর মেকানিক। '১৯এ 'এভরিম্যান হিজ ওন্ ফুটবল'—প্রতিবাদী কাগজের সহযোগী, অচিরেই নিষিদ্ধ হলো। তখন মুখোস ও ম্যারিওনেট নিয়ে কাজ করছেন এবং কোলাজ, 'সাউন্ড অ্যান্ড স্মোক' ক্যাবারের জন্য। 'দ্য অ্যান্টাগোনিস্টে' গ্রোস-হার্টফিল্ড রচিত প্রবন্ধ : ডার ক্যুনস্টলাম্প।

১৯২০ : 'ব্যর্থতা' কাগজের সহ-সম্পাদক, এপ্রিলে রাউল হসমান ও গ্রোসের সঙ্গে ডাডা : ৩। ইন্টারন্যাশনাল ডাডা ফেয়ার। 'শিল্পের মৃত্যু হয়েছে, তাৎলিনের নতুন যন্ত্রশিল্প দীর্ঘজীবী হোক'—শ্লোগানসহ ফটোগ্রাফ। মালিক ফ্যেরলাগ-এর প্রচুর কাজ।
১৯২১-২৩ : বার্লিনে ম্যাক্স রেইনহার্ডের থিয়েটারে দৃশ্যসজ্জার প্রধান দায়িত্বে। '২১ থেকে '৩২ : অসংখ্য ফটোমন্তাজ। '২৩-২৭ : ডার নুপেল কাগজের সম্পাদক। '২৪-এ সমকালের ইতিহাস নিয়ে প্রথম ফটোমন্তাজ। স্টুটগার্টে 'ফিল্ম অ্যান্ড ফটো' আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। '২৯-এ টুশোলস্কির বইয়ের অঙ্গসজ্জা; মে · প্রথম ABRKD-র প্রদর্শনী, সেপ্টেম্বরে 'নভেম্বরগ্রুপে'র প্রদর্শনী। '৩১-৩২ : রাশিয়া গেলেন, মস্কোয় প্রদর্শনী, '৩৩-এ নাৎসিবাহিনী তছনছ করেছিল তাঁর ঘর, প্রাগে নির্বাসন। '৩৪-এ জার্মান নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হলো, ইন্টারন্যাশানাল ক্যারিকেচার এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ, জার্মান রাষ্ট্রদূতের প্রতিবাদে ফরাসি ও চেক লেখকশিল্পীরা তাঁর পক্ষে দাঁড়ালেন। '৩৫-এ ম্যাজ' দ্য লা কালত্যুর, পারিতে প্রদর্শনী। '৩৬-এর মার্চ : প্রাগে রাষ্ট্রদূতের নাছোড়বান্দা অনুরোধের চাপে হার্টফিল্ডের দুটি ফটোমন্তাজ আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী থেকে সরাতে হলো। '৩৮ : হিটলারের রাজ্যে হার্টফিল্ডের জায়গা নেই, লন্ডন গেলেন, নিউইয়র্কে ছবি দেখালেন।
১৯৩৯ : 'ফ্রি জার্মান লীগ অফ্ কালচারে'র হয়ে লন্ডনে সক্রিয়, গারট্রুড, তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, এর আগে বারবারা তাঁকে প্রাগেই ফেলে রেখে পারির পথে চলে যান। লন্ডনে 'হিটলারের বিরুদ্ধে একজনের লড়াই'—শিরোনামে প্রদর্শনী। '৪১-৫০ : লিন্ডসে ড্রামন্ড ও পেঙ্গুইনের মলাট ও অলংকরণ। '৫০-এ বার্লিনে ফিরে কিছুদিন বার্লিন এনসেম্বল ও ডয়েচার থিয়েটারের পোস্টার ও দৃশ্যসজ্জার কাজ করলেন। '৫৬-য় জার্মান আকাদমি অফ্ আর্টসে ব্রেখট কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য। জার্মান অ্যাসোসিয়েশন অফ্ গ্রাফিক আর্টিস্টস ও চেকোশ্লোভাক আর্টিস্টস্ এ্যাসোর সম্মানিক সদস্য। '৫৭ চীন ভ্রমণ, শিল্পসাহিত্যে জার্মানির জাতীয় পুরস্কার। '৫৮-য় 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সৈনিক' পদকগ্রহণ। '৫৮-৫৯ : মস্কো, পিকিং, সাংহাই, তিয়েনসিনে প্রদর্শনী. '৫৯-এ চলচ্চিত্র : জন হার্টফিল্ড, অ্যান আর্টিস্ট অফ্ দ্য পিপল। '৬১-তে শান্তি পুরস্কার, '৬২-তে ভাইমারে প্রদর্শনী, মারাত্মক অসুস্থ তখন। '৬৪-৬৫ : প্রদর্শনী : ওয়ারশ, প্রাগ, ব্রাতিশ্লাভা, বুদাপেস্ট, রোম, পশ্চিম বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট। '৬৭ : 'কার্ল মার্ক্স অর্ডারে' ভূষিত হলেন।

১৯৬৮ : জন হার্টফিল্ড মারা যান ২৬শে এপ্রিল বার্লিনে। □

# জন হার্টফিল্ড ও সচিত্র মজদুর বার্তা

১৯২৯-এর জুনের শেষসপ্তাহে ভিলি মুন্যনজেনবারের[১] পরিচালনায় বার্লিনে ন্যুয়ের ডয়চার ফ্যেরলাগ কুর্ট টুশোলস্কির[২] 'ডয়েচলান্ট ডয়েচলান্ট ইউব্যের আলেস' প্রকাশ করলেন। অজস্র ফটোগ্রাফসজ্জিত বইটির পরিকল্পনা করেছিলেন জন হার্টফিল্ড। নিঃসন্দেহে সফল প্রকাশনা—১৯৩০-এর গ্রীষ্মের মধ্যেই সংস্থার নিজের ঘোষণায় ৪৮,০০০ কপি বিক্রির হিসেব।

ঐ একই সংস্থার প্রকাশনা আর্বেইটার ইল্যুসট্রিয়েটে ৎসাইটুং (A-I-Z), মানে সচিত্র মজদুর বার্তায় '২৯-এর ২৯ ও ৩০ তম সংখ্যায় হার্টফিল্ডের ফটোমন্তাজ ছাপা হয়েছিল। স্রষ্টার নামপরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হলেও ১৯৩২ পর্যন্ত এই কাগজে প্রায়ই হার্টফিল্ডের কাজ প্রকাশিত হয়েছে। পরে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যখন তিনি নির্বাসিত, ১৯৩৫ নাগাদ, কার্ল ভানেকেরও কয়েকটি ফটোমন্তাজ এখানে ছাপা হয়।

১৯৩০-র প্রথমদিকে A-I-Z-এর সম্পাদকমণ্ডলী ঘোষণা করলেন : 'এখন থেকে প্রতিমাসে জন হার্টফিল্ডের জন্য একটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হলো'। ১৯৩০-এ প্রকাশিত হলো ১২টি স্বাক্ষরিত ছবি, ৩১-এ ৪টি ; ৩২-এ ১৮টি ; ১৯৩৩-এ ৩৫টি ; ৩৫-এ ২৭টি, ৩৬-এ ৫৪টি, ৩৭-এ ৩২টি, এবং, ৩৮-এ ১৪টির হিসেবে মোট ২৩৮টি ফটোমন্তাজ।

তার আগে ইন্টারন্যাশনাল ওয়র্কর্স এইড কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক 'ছবিতে সোভিয়েত রাশিয়া' ( প্রতিষ্ঠা : ১৯২১ ) প্রতিটি সংস্করণ এক লাখ করে ছাপা হতো। ১৯২৩-এর মাঝামাঝি নাম পাল্টে রাখা হলো 'সিকেল অ্যান্ড হ্যামার', তখন তার প্রচার সংখ্যা এক লাখ আশি হাজার। ১৯২৫-এ মুন্যনজেনবার এবং ইতিমধ্যে

১. মুন্যনজেনবার ( ১৮৮৯-১৯৪০ ) : ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগের প্রতিষ্ঠাতা। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, ফিল্ম কোম্পানী ও প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার। অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিটি, কংগ্রেস ও আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। নাৎসিরা ক্ষমতায় এলে পারিতে কম্যুনিস্ট বিক্ষোভ ও প্রচার সংগঠনের অন্যতম অধিকর্তা। '৩৮-এ পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির পর '৪০-এ ফরাসি অন্তরীণ শিবিরের কাছে রহস্যময়ভাবে তাকে দেখা যায় মৃত ; ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে তার শরীর।

২. কুর্ট টুশোলস্কি ( ১৮৯০-১৯৩৫ ) : হাইনে-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জার্মান ব্যঙ্গশিল্পী, সবচেয়ে ধারালো, ভাইমার রিপাব্লিকের সবচেয়ে ঘৃণিত স্যাটায়ারিস্ট। টুশোলস্কি সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাই লড়েছেন, ভাইমার জার্মানির অসারত্ব ঘৃণার সঙ্গে দেখিয়েছেন, এরিখ কাস্টনার যেমন বলেছেন, 'একটু পথ্যুল এই বার্লিনবাসী তাঁর টাইপরাইটার দিয়ে শেষ দুর্যোগ আটকানোর অনেক চেষ্টা করেছেন। 'ডয়েচলান্ট ডয়েচলান্ট ইউব্যের আলেস' সম্ভবত সবচেয়ে তীব্র তিরস্কার, যাবতীয় নির্বুদ্ধিতা ঔদাসীন্য ও পাশবিক যা কিছু সমসাময়িক জার্মান চরিত্রে দেখেছিলেন তিনি, এই বইয়ে আছে তার নির্মম বিবরণ। নাৎসি দুর্যোগের জন্য এসব কিছুকেই দায়ী করেছেন তিনি। হিটলারের জয়লাভ ও বই পোড়ানো শুরু হলে টুশোলস্কি চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। ৪৬তম জন্মদিনের আগে তিনি আত্মহত্যা করেন সুইডেনে।

প্রতিষ্ঠিত নুয়ের ডয়েচার ফেয়রলাগ কাগজটির প্রকাশভার গ্রহণ করল, নাম পাল্টে এবার 'ওয়র্কর্স ইলাসট্রেটেড', মাসে দু'বার বেরোত, ছাপা হতো দু'লাখ। ১৯৭২-এ প্রচার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দু'লাখ বিশ হাজার, ততদিনে নাম বদলে সহজ সংক্ষিপ্ত AIZ, এবং সাপ্তাহিক। ১৯২৯-এ তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার ছাপা ১৯৩১-৩২ নাগাদ পাঁচ লাখে গিয়ে পৌঁছল। এই কাগজের রাজনৈতিক অভিঘাত অতএব অনুমেয়। ১৯৩৩-এই ব্যাপার বুঝে নাৎসিরা বার করল আর্বেইটার বিলডার-ৎসাইটুং বা ABZ, AIZ-এর হুবহু নকল, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় প্রায় দাসসুলভ অনুকরণ।

হিটলার ক্ষমতায় আসার পর AIZ-এর শেষ সংখ্যা বেরোল বার্লিনে ৫ মার্চ, ১৯৩৩। প্রাগ থেকে ২৫ মার্চ ১১, ১২ ও ১৩তম সংখ্যা বেরোল, ততদিনে প্রচারসংখ্যা মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে, ছাপা হচ্ছে লেটারপ্রেসে। নির্বাসনে ১৯ সংখ্যা থেকে অবশ্য আগের মতোই তামার পাতে ফটোগ্রেভ্যার টেকনিকে ছাপা শুরু হলো, আকারে অনেক ছোট, প্রচার অনিয়মিত।

পার্টিমুখপত্র থেকে রাজনৈতিক অবস্থান ক্রমে নাৎসিবিরোধী জনআন্দোলনের সপক্ষে পরিবর্তিত হলো। ১৯৩৫-এর শরতে শিরোনামে সংযুক্ত হলো নতুন কথা—ইলাসট্রেটেড পিপল'স পেপার এবং ১৯৩৬-এ নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শিরোনাম পাল্টে রাখা হলো, 'দ্য পিপল'স ইলাসট্রেটটেড'—তখন বেরোত প্রাগ থেকে, ১লা আগস্ট ১৯৩৬ থেকে ১২ অক্টোবর '৩৮ পর্যন্ত প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

১০ অক্টোবর ১৯৩৮-এ জার্মান সৈন্য সুডেটেনল্যান্ড অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে আবার নির্বাসনে, '৩৯-এর ১৫ জানুয়ারি পারি থেকে আর একবার প্রকাশের চেষ্টা, সাতটা সংখ্যা বেরনোর পর বাধ্য হয়ে পরিত্যক্ত হলো।

প্রথম থেকেই চিত্রসাংবাদিকতাই পত্রিকাটির প্রাণ, তদুপরি এ কাগজে লিখেছেন খ্যাতনামা বামপন্থী লেখকেরা—অঁরি বারবুস, ইলিয়া এরেনবুর্গ, ম্যাক্সিম গর্কি, ওস্কার মারিয়া গ্রাফ, হাইনরিখ্ মান, আনা সেঘার্স, এবং আর্নল্ড ৎসাইগ। প্রাগ থেকে যখন প্রকাশিত হচ্ছে, প্রধান সম্পাদক ছিলেন ভাইসকোফ্।

১৯২৬-এ A-I-Z সম্পর্কে হাইনরিখ মান বলেছিলেন "সমসাময়িক চিত্রিত সংবাদ পত্রের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাগজ। সংবাদ পরিবেশনায় পূর্ণতার সন্ধানী, প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ, এবং সর্বোপরি চরিত্রে নতুন ও প্রথাবিরোধী। গোটা প্রলেতারীয় বিশ্বকে প্রায় চোখের সামনে তুলে আনে, আশ্চর্য যে অন্য কোন সচিত্র সাপ্তাহিকের সে ক্ষমতাই নেই, অথচ দুনিয়াটা সত্যিই বিশাল। শ্রমিকের চোখ দিয়ে দেখা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিচিত্র ছবি—অভিযোগ ও তিক্ত প্রতিবাদের সর্বহারা মনোভাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মবিশ্বাস ও নিজেদের টেনে তোলার প্রাণিত সক্রিয়তারও স্ফুলিঙ্গ। বিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে এই সর্বহারা আত্মবিশ্বাস সত্যিই হৃদয়প্লাবী।" □



## পল হোগার্থ

### চিত্রসাংবাদিকতার অল্প ইতিহাস

# দৈনন্দিনের চিত্রলিখি

সেই রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে সাময়িকপত্র কোন না কোন আচারভঙ্গিপ্রকাশে সভ্যজীবনের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। ভবঘুরে চারণকবিরা জার্মানি বা ইতালির গ্রামীণ মদের আড্ডায়, ডিউক বা অভিজাতদের সভাঘরে খবর গাইতেন। খবরের গান বা আবৃত্তি। শোনা যায় লণ্ডন ও আমস্টারডামে ব্যবসায়ী বা মহাজনদের বিশেষ প্রয়োজনে হাতে-লেখা খবরের কাগজ সরবরাহ করা হ'তো। ভিক্টোরীয় যুগের মহৎ চিত্রিত সাপ্তাহিক বা সমকালীন চটকদার জনপ্রিয় সাময়িকীর তা পূর্বসূরী। পনের শতকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঘটনার চিত্রিত বিবরণ ছাপা হতো ব্রডসাইড (একপিঠে ছাপা বড়মাপের কাগজ) বা নিউজ প্যামফ্লেটসে (পাতলা কাগজে সেলাই করা, দুপিঠেই ছাপা)। আকারে বড়মাপের, চমকপ্রদ নকশা বা ছবি। সামান্য মূলপাঠ। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় রচিত।

প্রথমদিকে নামী কারিগর দিয়ে কাঠ খোদাই করে ছবি ছাপাব চল ছিল 'চ্যাপ বুকস' (ছোট ধর্মপুস্তিকা), ক্ষুদ্র সংবাদপুস্তিকা বা ব্রডসাইডে। ১৮৪০ নাগাদ চিত্রিত সংবাদপত্র উঠতি মধ্যশ্রেণীর হাতে নতুন

চেহারায় আত্মপ্রকাশ করল। বস্তুত এসময় থেকেই মুদ্রিত সাময়িকপত্রের প্রকাশযন্ত্রে চিত্রকর নিয়োজন শুরু হলো, অবশ্যই তার স্বকীয় ভূমিকায়।

উত্তর আমেরিকা বা পশ্চিম ইয়োরোপ জুড়ে চিত্রিত সাময়িকী প্রকাশের বহুল আয়োজন, তবে তাৎক্ষণিক সাফল্য শুধু ইংলণ্ডেই এল। অন্য দেশেও অবশ্য লিখিত ও চিত্রসাংবাদিকতার প্রাণবন্ত ঐতিহ্য ক্রমে সৃষ্টি হচ্ছিল। ফ্রান্স, জার্মানি বা বিশেষত আমেরিকায়। অথচ প্রয়োজনীয় আর্থিক উৎস এবং উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা —দুয়েরই ঘাটতি সে সময়ে। যে কোন দেশের বেশিরভাগ গ্রাম, সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা অতএব ন্যূনই রয়ে গেল। আসলে এক্ষেত্রে নির্ধারক কারণ ছিল সামাজিক বিভাগ ও বিন্যাসে। এদিকে শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে ইংলন্ডে বিস্তৃত রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলো। ছোট দোকানদার থেকে কেরানীকুল ব্যবসাদার বা শিল্পপতির নব্যদল, এরাই নতুন পাঠক—প্রগতি ও আত্মউন্নতির ধারণায় আবিষ্ট পাঠকসম্প্রদায়।

ফ্রান্স, জার্মানি বা আমেরিকায় একই ধরনের প্রকাশনার পেছনে মনোরঞ্জন ও বুদ্ধিবৃত্তির আনুপাতিক সংযুক্তির নতুন ধারণা ও চেষ্টা সক্রিয় ছিল। কিন্তু আর কোথাও বৃটিশের উদার বুর্জোয়া জনগণের আশ্চর্য কর্মক্ষমতা, অনিঃশেষ পুঁজির যোগান এবং বাজারী বিক্রয়ক্ষমতার তুলনা ছিল না। আসলে, ইংলন্ড ছাড়া তৎকালে সাপ্তাহিক সচিত্র সংবাদপত্রের উন্মেষপ্রক্রিয়ায় আর কেউই এই মূল শর্তগুলির একত্র যোগাযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। যদিও ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজে'র প্রচারসংখ্যা সেই ১৮৪২-এই ছিল ৬৩,০০০। ১৮৪৮-৪৯, সারা ইয়োরোপ জুড়ে বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর দ্রুত প্রসারে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দ্বিগুণেরও বেশি, নতুন নতুন কাগজের প্রকাশ শুরু হলো, অধিকাংশই সাপ্তাহিক চিত্রসমীক্ষার চারিত্রিক বিন্যাসে।

## □ নব্য অঙ্কনরীতি, নতুন কারুকৌশল

১৮৬৩ সংবাদচিত্রের বিশিষ্টতার কারণে অত্যন্ত তাৎপর্যময় বছর। ঐ বছরই হঠাৎ একদিন তৃতীয় নাপোলেয়ঁ 'সালোঁ দ্য বোজার' পরিদর্শনে এলেন। দেখা গেল সরকারী ছবির ছড়াছড়ি, সব ঘরেই। প্রায় মধ্যযুগীয় বীরত্বে নতুন আদেশ জারি হলো, কিছুটা কৌতূহলও ছিল হয়তো। এখন থেকে সরকারী প্রদর্শনীতে প্রত্যাখ্যাত ছবি দেখানো হবে 'সালোঁ দে রেফুজে', বাতিল ছবির ঘরে। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা—দেগা, ক্লদ মনে, মানে বা রেনোয়ার—এই সুযোগে, তাঁদের কাজ, প্রায় সেই প্রথম, একটু বেশি সংখ্যায় সংগঠিত দর্শকের সামনে হাজির করলেন। ফলত উৎসাহিত, তরতাজা ছবিকথার জোয়ার এল। প্রাণিত নজরে দেখা ফরাসি জীবন ও নিসর্গের বৈভব। এবং ক্রমে বোঝা গেল একঘেয়ে আবেগাপ্লুত গতানুগতিক কাঠখোদাইয়ের দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আধুনিক জীবনের গতিশীলতা বিষয়ে প্রাগার্জিত ধারণার বশে ইম্প্রেশনিস্টদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—ছবি হলো চিত্রিত বা লিপিবদ্ধ, সংরক্ষিত মুহূর্তমাত্র এবং আশ্চর্য, এই নব্য দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রসাংবাদিকতার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার দ্রুত যোগানচাহিদার

প্রক্রিয়ায় সুন্দর খাপ খেয়ে গেল। কখনো পারি বুলেভার ঘিরে সতত জীবনপ্রবাহ, রাজপথে বসেই কলমের আঁচড়ে ফুটে ওঠা ফুটপাথের জীবন। পথচারী ও অন্যান্য গতিশীল অনুষঙ্গ, এবং সেখানেই তুলির শেষটানে তা সম্পূর্ণ হলো। পত্রিকাজগতের শেষকথা তখন ফটোমেকানিক্যাল পদ্ধতির ব্যবহারে সেইসব ক্ষণমুহূর্তের ছবি।

ইম্প্রেশনিস্টদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তখন শারপাঁতিয়ের। তাঁর পরিচালনায় প্রকাশিত হচ্ছে এধরনের প্রথম কাগজ—'লা ভি মদার্ন' (১৮৭৯-১৯০২)। কাগজটি পরে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নতুন মেজাজ, নতুন চরিত্র—তুলনীয় কোন কাগজই তখন ছিল না। নবীন শিল্পী বা নক্শাবিদের বিরাট একটি দল নাগরিকজীবনের অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিষয়ের ঘেরে সামাজিক প্রতিবিম্বনের কাজ শুরু করলেন। সূক্ষ্ম, অতি সুচারু, প্রায় অভিজাত ধরনে। যেন কবিতার মতো, পারির উদ্বায়ী জীবনের সংবেদন তীব্র হলো রেনোয়া, রাফায়েলি, রোসেগস বা তরুণ রেনুয়ার, শেরে, ফোরাঁ ও স্তেঁইলঁর হাতে। ফেত্কাবারেকাফেকনসার্ত—মেলা, নৃত্যপর মেয়েরা, কফিখানার গানবাজনা—গ্রামের পিকনিক থেকে রেসের মাঠের গুলতানি বা সৈন্যদলের বর্ণাঢ্য প্যারাড।

হাল্কা কিন্তু তথ্যবহুল পাঠ্যবস্তুর দক্ষ পরিবেশনা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল, বিশেষত নব্যযুবকদের কাছে। তৎসহ সুমিত অঙ্কনশৈলীর ঝলমলে উপস্থাপনা। তখন প্রায় প্রতিবছর নতুন নতুন সাময়িকপত্র বাজারে আসছে। ছবিতে অর্থবানদের চারিপাশের সুরক্ষাবলয়, নিরাপত্তার বিভ্রম নিয়ে তামাশা বা আলতো বিদ্রূপের ছোঁয়া। অবশ্য বাৎসরিক প্রতিবেদনে শিল্পসমালোচনা ও শিল্পানুষ্ঠানের বিবরণও থাকত। তবে তা সংবাদপত্রের স্বভাবকৃপণ সীমাবদ্ধতার চেয়েও অপ্রতুল মাপে। স্বয়ংক্রিয় হরফ বিন্যাসের পদ্ধতি, উন্নত ছাপাখানা আর সস্তাকাগজের যোগানে মুদ্রণের খরচ তখন কমতে শুরু করেছে। ক্রমে লন্ডনের জায়গা কেড়ে নিয়ে এখন পারিই নগরমনস্ক ধীমান সাংবাদিকতার কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। আধুনিক ধ্যানধারণায় আস্থা ও বিশ্বাসই তার পাথেয়। ১৮৮০ থেকে দলেদলে তরুণ শিল্পীরা ফ্রান্সের রাজধানীতে জড়ো হলেন, মুদ্রণবিস্তারের এই যুগে নতুন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা ও উন্মাদনা নিয়ে। বিখ্যাত সেইসব কাগজ—ল্য শা নোয়ার (১৮৮২-৯৭), পারি ইলাস্ত্রে (১৮৮৩-৮৯), ল্য ফিগারো ইলাসত্রে (১৮৮৩-১৯১১), ল্য ক্যুরিয়ের ফ্রাঁসে, লা রেভ্যু ইলাস্ত্রে (১৮৮৫-১৯১১), বা ল্য মিরিলিতঁ (১৮৮৫-৯১)।

এইসব পত্রিকার প্রকৃতার্থে প্রথম আধুনিক শিল্পী তুলুজ-লত্রেক (১৮৬৪-১৯০১)। 'ত্রেলো' ছদ্মনামে তাঁর কাজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫-তে ল্য মিরিলিতঁ-র একটি সংখ্যায়। আশি ও নব্বই-এর দশক জুড়ে প্রায় সমস্ত কাগজেই তাঁর কাজ প্রচুর ছাপা হয়েছে।

যদিও পারিই তখন সৃষ্টিসক্রিয় শিল্পীদের মাতৃভূমি, ইংলন্ড বা আমেরিকায়ও ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারে দ্রুত এসব দেশে জনপ্রিয় পাঠ্যবস্তুর চাহিদা বাড়ল, নতুন এক পাঠকশ্রেণীরও দেখা মিলল। গণ-সাক্ষরতা-প্রসারের অনুকূল জোয়ারে বিশ শতকের শুরু থেকেই মুদ্রণব্যবস্থার রাজা-বাদশাদের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠল, নতুন ধরনের এই জনপ্রিয় দৈনিকের প্রসারের সাথে সাথে তাঁরা হয়ে উঠলেন জনসাধারণের অবিসংবাদী নেতা।

তখনো খবরকাগজে ফটোগ্রাফের পুনর্মুদ্রণ ছিল কার্যত অসম্ভব। কার্যকরী মীমাংসায় না-পৌঁছনো পর্যন্ত লন্ডনের 'ডেইলি গ্রাফিক', নিউইয়র্কে 'সানডে' ও পারির 'ক্যুতিদিয়' ইলাস্ত্রে'র পৃষ্ঠায় কিছুদিনের জন্য সংবাদচিত্রণের এক প্রাণবন্ত ধারা ঝলমল করে উঠল। বিশেষত 'ডেইলি গ্রাফিকে'র বিপুল চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাদা-কালোয় দ্রুত অঙ্কনের এক দুরন্ত শৈলী জন্ম নিল। তীক্ষ্ন রেখানির্ভর, তার মূল কারণ অবশ্য প্রযুক্তিগত। ইস্পাতের সরু কলমের বৈখিক ঘনবুনোটে আলোছায়ার স্পর্শগুণ-সম্পন্ন এইসমস্ত ছবিতে ইম্প্রেশনিস্ট ড্রয়িং ও জাপানী শিল্পী হোকুসাই-এর প্রভাব লক্ষণীয়।

১৮৯০ থেকে ১৯০০, প্রাথমিক বিকাশপর্যায়ে 'ডেইলি গ্রাফিকে' কাজ করছিলেন হ্যাট্রিক, সুলিভান, রেনুয়ার, ম্যাকফাবসন, ফিল মে এবং এমনকি জ্যাক ইয়েটস। 'স্পেশাল আর্টিস্ট' হিসেবে নিযুক্ত প্রতিনিধিদের চেয়েও দ্রুতহারে তাঁরা সংবাদ সরবরাহ করতেন। গোটা দুনিয়া জুড়ে শিল্পী-প্রতিনিধিদের সংখ্যা সেই ১৯০৯-এই প্রায় দু'হাজার। ইয়োরোপের প্রধান প্রধান শহরে কর্মরত বিদেশী শিল্পীরাও চিত্তাকর্ষক খবর পাঠাতেন, প্রায়ই তা প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম কেড়ে নিত। একথা ঠিক যে কঠিন চাপের মধ্যেই দারুণ কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবীভাবে সাংবাদিক সততায় ঘাটতি পড়ল, কখনও নিত্য চাহিদা ও সময়ের চাপে অতি-উৎসাহী সম্পাদকের কল্পিত বুজরুকি, অথবা কখনো তা ফটোগ্রাফের হুবহু নকল, আদতে ছাপার যোগ্যই নয়।

১৮৮৯, ইস্টম্যানের কোডাক বক্সক্যামেরা বাজারে এল। চিত্রিত সংবাদপত্রের জন-প্রিয় ধারায় দৈনিক সংবাদদাতা বা বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে শিল্পীদের দায়িত্ব ফুরল। ফটোগ্রাফে ভরে উঠল সম্পাদকের টেবিল। তথ্যের উৎস হিসেবে তা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, সময়ও অনেক বাঁচে। খ্যাতনামা কোন কোন শিল্পীও ক্যামেরা তুলে নিলেন হাতে। ১৯০৫-এর মধ্যেই জনপ্রিয় দৈনিক থেকে পুরনো চিত্রিত সাপ্তা-হিকে দেখা গেল, সংবাদ পরিবেশনায় ফটোগ্রাফের উপর নির্ভরতা ক্রমেই বাড়ছে। তবুও সব শেষ হতে তখনও অনেক দেরি। পুরনো কাজের জায়গা চলে যেতে ছবি-আঁকিয়েরা পুনরায় শিল্পী-সাংবাদিক হিসেবে তাঁদের স্বভূমিকায় ফিরে এলেন আধুনিক সমাজ-আন্দোলনের হাত ধরে।

## □ পাপপুণ্যের ছবি

শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে, হাতঘড়ির বাঁকানো স্প্রিং-এর মতো টানটান এক সম্পূর্ণ নতুন পথে যাত্রা শুরু হলো। অব্রে বিয়ার্ডস্‌লের (১৮৭৩-৯৮) কাজে দেখা গেল নজরকাড়া আধুনিক ভঙ্গি, প্রায় এক কৃত্রিম অনুভূতির জগৎ। নতুন শৈলী, আর্ট ন্যুভো, জুগেন্ডস্টিল ইত্যাদি নানান নামে গোটা ইয়োরোপে এই নয়া প্রবচন আশ্চর্য অসুখের মতো ছড়িয়ে পড়ল। লন্ডন থেকে পারি, বার্সেলোনা থেকে মিউনিখ, ভিয়েনা, বার্লিন, সেন্ট পিটার্সবুর্গ—বুর্জোয়াযুগের বিচিত্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দিকে চোখ মেলে তাকাল নব প্রজন্মের শিল্পীরা। রোমসাম্রাজ্য পতনের পর এত ফলদায়ী কাজের সময় আর আগে কখনো আসেনি। নিকট-অমঙ্গলের আশঙ্কায় সংবেদনশীল শিল্পীর এক চোখ খোলা ছিল তুচ্ছ প্রমোদ-অনুষ্ঠান আর সমকালের শিথিল নীতিবোধের দিকে, অন্যচোখে জাগ্রত জনরোষের ঢেউ। অজ্ঞাত মর্মান্তিক বিষয়ের নতুন সীমানা আবিষ্কারের বিক্ষত প্রেরণা যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তাদের। কখনো সে-সীমানা উদ্দেশ্যত রাজনৈতিক। বড় বড় শহরে নতুন শ্রেণীজনতার ভিড়, অস্থির, জেহাদী। সংগঠিত শিল্পশ্রমিকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে · উন্নয়নসাফল্যের বখরা চাই, চাই ক্ষমতার ন্যায্য ভাগ। হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে সফল ধর্মঘট, পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে যথেচ্ছ সংঘর্ষ, প্রশাসন সেদিনে কার্যত অসহায়। খ্যাতনামা রাষ্ট্রনেতাদের খতম-তালিকা প্রতিমাসেই লম্বায় বাড়ছে, সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্য বিক্ষিপ্ত লড়াই শুরু হয়েছে, এমনকি ক্ষমতাদখলের রাস্তায়ও হাঁটছে কোন কোন দুঃসাহসী।

১৯০৫—জারতন্ত্রের অবসান হলো। দুঃখযন্ত্রণার দীর্ঘদগ্ধদিন পেরিয়ে জনগণের সক্রিয় প্রতিরোধ চূড়ান্তপর্যায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বৈপ্লবিক আন্দোলনে ফেটে পড়ল। রুশ শিল্পীদের প্রতিরোধের ভাষা জারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হননক্রিয়ায় মেতে উঠল, স্পষ্টতই নাটকীয় সেসব ছবি, দংশনের মুদ্রিত উল্লাস যেন। এসমস্তই শুরু হয়েছিল যখন আকাদমি অফ্‌ ফাইন আর্টসের ঝুঁকে-পড়া জানলায় ছাত্র-শিক্ষকের ভয়ার্ত চোখের সামনে উইন্টার প্যালেস-সংলগ্ন বিশাল উদ্যানে নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করা হলো। পরে, যখন শহরাঞ্চলে বিপ্লবের হাওয়া জোরদার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় শাসনতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বাধ্যত কিছুটা শিথিল হয়েছে, বাঁধ ভেঙে উপচে পড়ল সক্রিয়তার ছবিকথা। লেখকশিল্পীদের মিলিত উদ্যোগে প্রায় চারশ' বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশকার্য শুরু হলো। শয়ে শয়ে ছবি, অধিকাংশই আর্ট ন্যুভো ধরনে, কখনো বন্য প্রেরণাবেগের ছবিসংবাদ, কখনো রূপকধর্মী ব্যঙ্গে তা ক্ষুরধার। রাজসভার শিল্পীসম্মান ও আকাদমির সদস্যপদ অস্বীকার করে ভ্যালেন্তিন সেরোভ সেদিনের ঘটনাক্রমের চাক্ষুষ বিবরণ দাখিল করেছিলেন তাঁর জলরঙের ছবিতে, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬-৭-এ স্বল্পজীবী 'ঝুপেল', মানে জুজুদেখানোর কাগজে।

ফ্রান্সেও লেখকশিল্পীরা বুর্জোয়া-সমাজনীতির বিরুদ্ধে নৈতিক ভৎর্সনায় মুখর

হয়েছেন। স্যেইনের বাঁদিকে ভিড়াক্কার কাফে, শৌখিন বুলেভার থেকে মঁমার্তের ঢাল বেয়ে আভাঁ গার্দ পত্রিকা, আলোচনায় ঠাসা কাগজ আর ব্যঙ্গপত্রের অবিরল হিমপ্রপাত প্রধানত বয়ে গেছে দুটি ধারায় : এক, যারা কিছুটা দার্শনিক নির্লিপ্ততায় নৈতিক অবক্ষয় প্রকাশ করেছেন ; অন্যেরা সমাজকেই দায়ী করেছেন তার জন্য, ক্রমিক অবক্ষয়ের মধ্যে শুনেছেন অনাগত ধ্বংসের শেষবার্তা। দু'জায়গাতেই অসাধারণ সব ড্রয়িং বেরিয়েছে, কিন্তু গভীর উদ্দেশ্যজনিত কারণেই শেষোক্ত দলের কাজে আবেদন অনেক তীব্র। স্বর্ণযুগের ( লা বেল এপোক ) সমৃদ্ধি মানেই আভাঁ গার্দদের কাছে তাদের বিষয়ধারণার উপর আক্রমণ, তা নিয়ে অশ্লীল রসিকতা, ঘুরে মারার সুযোগ তারা পুরো ব্যবহার করতে ছাড়েননি অবশ্য। রাজনৈতিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাজনীতিমনস্ক স্বাধীন কাগজের নৈরাজ্যবাদী সম্পাদকরা সেসময় শুধু যে শিল্পীদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাই নয়, উপরন্তু প্রথাবিরোধী স্বরভঙ্গি খুঁজে দেখারও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। এ সুযোগ দরকার না থাকলেও কেউই উপেক্ষা করেননি, বিশেষত লত্রেক চুটিয়ে কাজ করেছেন তখন। ১৮৮৫ থেকে 'কাবারে আর্তিস্তিক', 'ল্য মির্লিতঁ', এমনকি রক্ষণশীল 'ল্য ফিগারো ইলাস্ত্রে'র সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্রে, বা বুলেভার সাপ্তাহিক 'ল্য রিইর' বা 'ল্য ক্যুরিয়ের ফ্রাঁসে'—পারির রাত নিয়ে লত্রেকের অসংখ্য ড্রয়িং এইসব কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু তাঁর নৈরাজ্যপথের বন্ধুরা, ঔপন্যাসিক জর্জ দারিও ও নকশাবিদ এচ জি ইবেল—সম্পাদিত স্বল্পায়ু 'লে'সকার-ম্যুসে'র (১৮৯৩ ৯৪) ছাপা পৃষ্ঠায় লত্রেক সমস্ত আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেললেন। বারোটি সংখ্যায় পরপর বেরোল 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি এসব'—নামে অসাধারণ এক ছবির সিরিজ। বুর্জোয়া অসারতার দৃশ্যছবি। বিরোধিতার তীব্রতা ছিল সেসব কাজে। বিয়ার্ডস্লের জৈব নান্দনিকতার সূত্র ধরে লত্রেক সৃষ্টি করলেন এমন এক গতিস্রোত, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় শিল্পীদের তা শুধু সংগঠিত করল না, পরিবর্তস্রোতে -ভাসানোর সাহসও যোগাল। তাদের মধ্যে ছিলেন মিউনিখের 'সিমপ্লিসিজিমাস' (১৮৯৬) কাগজের বারলাখ, কুবিন ও পাস্যাঁ, বার্সেলোনার 'কাতব্গাৎস্' ও 'পেল ই প্লোমা' কাগজের কাসা, নোনেল ও পিকাসো, বার্লিন 'ডার স্টুর্মে'র ( ১৯১১-৩২ ) কোকোস্কা, কিরশ্ন্যের ও পেশস্টাইন, সেন্ট পিটার্সবুর্গে 'ঝুপেল' (১৯০৬)-এর কাস্তোদিয়েভ, ল্যাঁসর ও সেরভ, পারির 'গাজেৎ দ্যু বঁ জঁ' ( ১৯১২-১৪ ) কাগজের 'নাইটস্ অফ্ দি ব্রেসলেট্' গ্রুপের শিল্পীরা, নিউইয়র্ক 'মাসেস'-র ( ১৯১১-১৭ ) জন স্লোয়ান, গ্লেন কোলমান ও মরিস বেকার।

এইসব কিছুর সংযুক্ত প্রভাবের বৃহত্তম ফসল অবশ্য জমে উঠল পারির সাপ্তাহিক 'ল্যাঁ'সিয়েৎ অ্য ব্যুরে'র ( ১৯০১-১৯১৪ ) পৃষ্ঠায়। চিত্র সাংবাদিকতার গোটা ইতিহাসে এই অদ্ভুত প্রথাবিরোধী যাত্রাপথের কোন তুলনা নেই। নামের অর্থ যদিও আমেরিকান 'গ্রাফ্ট্' দিয়ে কিছুটা বোঝানো যায়, ইংরেজিতে এর কোন প্রতিশব্দ নেই : 'দ্য বাটার-

'ভিশ' হলো প্রধানত নীতিহীন জীবনযাপনে বাধ্য বা অভ্যস্ত যাদের জীবিকার আর কোন উপায়উৎস নেই। নৈরাজ্যবাদী গুস্তাভ ব্র্যাঁশো ছিলেন এ কাগজের সম্পাদক, 'লা'সিয়েৎ অ্যা ব্যুরে'-র ষোল থেকে আটচল্লিশ পৃষ্ঠার প্রত্যেক পাতায় ছবি ছাপা হতো। সাধারণত লেটারপ্রেস বা লিথোপ্রেসে তিন-চার রঙে ছাপা, ছবির নিচে বিধ্বংসী, প্ররোচক ভাষায় সামান্য দু'এক কথা যা লেখা থাকত, অধিকাংশই ব্র্যাঁশো নিজে বা তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য কবি-বন্ধুরা লিখতেন।

প্রথম সংখ্যা থেকেই ব্র্যাঁশোর বাহিনী সমস্ত ফরাসি প্রতিষ্ঠানকে বিপন্ন সন্ত্রস্ত করে ছেড়েছিল। ফলস্বরূপ মোট জরিমানা, প্রশাসনিক চাপ আর কারাদণ্ডভোগ। গোটা দুনিয়া থেকে ব্র্যাঁশো শিল্পীদের ছেঁকে তুলেছিলেন, 'ভালো' ও 'ততো ভালো নয়'-এই দু'জাতের শিল্পীদের তিনি প্রায় গেরিলাবাহিনীর মতো ব্যবহার করতেন। তিন-চার জনের একটি দল হয়তো সদ্যস্থাপিত পারিমেট্রোর বিপদ নিয়ে কাজ করলেন, আবার কখনো একজনকেই দায়িত্ব দিলেন একটি সংখ্যার সমস্ত ছবির, বিষয় হয়তো সব বিষয়ে কিছু লোকের অতি-কৌতূহল, ধান্ধাবাজি। 'লা'সিয়েৎ অ্যা ব্যুরে'র দাম কখনো পঞ্চাশ সাঁতিমের (পাঁচ সেন্ট বা ছ'পেন্স) উপরে উঠত না, বিশেষ সংখ্যার দাম বড়জোর এক ফ্রাঁ। মধ্য ইয়োরোপ ও রাশিয়াসহ পাঠকসংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০০। এমন কোন দরকারি বিষয় ছিল না, লা'সিয়েৎ যা ছেড়ে দিত—উঁচুমহলের দুর্নীতি, সাম্রাজ্যবিস্তারের বাড়াবাড়ি, বিদেশাগত ট্যুরিস্ট, রাষ্ট্রনেতা বা রাজপুরুষদের জাতীয় চরিত্র নিয়ে সাদাসাপটা মন্তব্য থেকে 'চরিত্রহননে'র উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ সংখ্যা পর্যন্ত বেরোত। ১৯১৪-র আগে পর্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্র্যাঁশো যেভাবেই হোক এই ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। লা'সিয়েৎ শুধু যে সমসময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তাই নয়, আক্ষরিক অর্থেই তার অনমনীয় নীতিবোধের উপযোগী একদল শিল্পীকেও গড়ে নিতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই পারিতে বহিরাগত, দানিয়ুব বা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অনতি-উদার পরিবেশাগত উদ্বাস্তু, প্রত্যেকেই গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন শহরের সবকিছু, মনে হয় যে-দৃষ্টিশক্তি শুধু বহিরাগতেরই থাকা সম্ভব। অনেকেই চেয়েছিলেন পেশাদার শিল্পীর জীবন, কিন্তু কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায়। যেমন বিমূর্ত ছবির পুরোধা কুপকা, পারিতে এসেছিলেন ১৮৯৫ সালে, অথবা '৯৭-এ এসে পেঁছিন ভ্যান ডনজেন, ২০-র দশকে ফ্যাশনবিবিদের ছবি এঁকে নাম করেছিলেন। এছাড়া ১৮৯৮ নাগাদ এসেছিলেন জাক ভিঁয়ো, ১৯০১-এ জুয়ান গ্রি—নকশাবিদ বা ইলাসট্রেটর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে প্রত্যেককে। প্রত্যেকেই বিভিন্ন আভাঁ গার্দ সাপ্তাহিকে কাজ করেছেন, কিন্তু এধরনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি প্রকাশিত হয়েছে লা'সিয়েৎ-এ। কুপকার ক্রুদ্ধ চিত্রক্রম : 'লার্জ" বা 'রিলিজিয়নস', ভ্যান ডনজেনের পরিত্যক্ত মেয়েদের নিয়ে ধারালো বিবরণী : 'পেতিত ইস্তোয়ার পুর পেতিসে গ্রঁজঁফ'। কফিখানার অন্ধকার নিয়ে ভিয়েঁার

অসাধারণ প্রতিবেদন : 'লা ভি ফাসিল' অথবা গ্রি-র ক্ষুরধার 'দি সুইসাইডস'—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

স্বল্পপরিচিত হাঙ্গারিয়ান শিল্পী মিকলোস ভাদাজ্ এসে পৌঁছেছিলেন সব শেষে। তাঁর কাজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ, প্রেমের পবিত্র ও অবৈধ রকমফের নিয়ে পরিকল্পিত লা'সিয়েৎ-এর যৌথ সংখ্যায়। পুরুষের সমকামিতা বিষয়ে নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ছবিগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ, প্রকাশিত হয়েছিল 'লে পেতি জুর্নম' শীর্ষক সংখ্যায়।

একই সঙ্গে আরো কিছু কাগজের নাম করা উচিৎ—নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক 'মাসেস' (১৯১১-১৭) এবং প্রথমে ভিয়েনা ও পরে বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'ডার স্ট্রাম' (১৯১১-১২)। জন স্লোয়ান তখন শিল্প-সম্পাদক, মাসেসে'র পাতায় অ্যাশকান স্কুলের গণতান্ত্রিক বাস্তবসদৃশ ছবির ঝলমলে ঐশ্বর্য। অ্যাশকান পেইন্টাররা যেমন স্লোয়ান নিজে, বা উইলিয়াম গ্ল্যাকেনস, জর্জ লুকস্ সকলেই ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কে সাংবাদিক-চিত্রকর হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁদের কাজে সাধারণ সংবাদ-চিত্রের ধারাই প্রত্যক্ষ। বস্তুত রবার্ট হেনরি নামে এক শিল্পী নগরদৃশ্যের রূপায়ণে তাঁর নিজের উৎসাহ ক্রমে তাঁদের মধ্যে সঞ্চার করেন, তরুণ শিল্পীদের বোঝান যে সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের যোগ্য বিষয় আছে শহরজীবনেই। ক্রমে গোইয়া, মানে, দেগা ও লত্রেকের সঙ্গে পরিচয় হলো, কাগজের লোক হিসেবে এতদিনের চেনাজানা শহর এবার নতুন করে চিহ্নিত হলো তাদের হাত ধরে। নৈরাজ্যপথের দার্শনিক হেনরির আদর্শপ্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে স্লোয়ানের উপর, সিমপ্লিসিজিমাস ও লা'সিয়েৎ তাঁকে উৎসাহিত করে তোলে, সমমানের কাগজে চিত্রসাংবাদিক হিসেবে যে অন্যায় অবিচার তিনি স্বচক্ষে প্রতিদিন দেখেছেন, তার বিশ্বস্ত প্রতিবেদন বেরোতে শুরু করে। 'পান্চ'-এর নম্রবিনীত ক্লিশে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে 'মাসেসে'র পাতায় স্পষ্টত এক নতুন অঙ্কনশৈলীর জন্ম হলো, চিন্তাউদ্দীপক দূরাকাঙ্ক্ষী এই নতুন ধারায় স্লো· ·, বেকার, ও কোলম্যানের কাজ নিচুতলার নিজের ভাষায় রচিত।

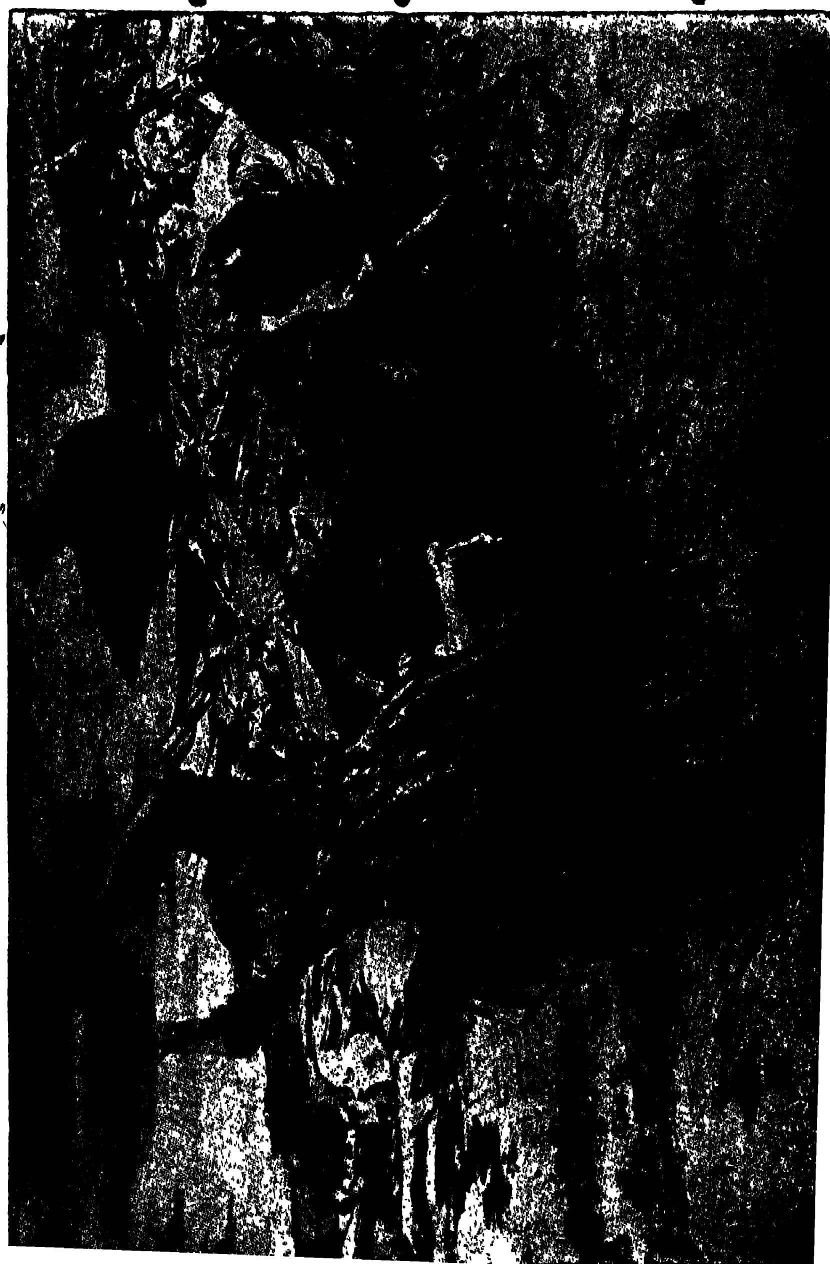
'ডার স্টার্ম' একটু অন্যধরনের কাগজ। হার্ভাট ভাল্ডেন প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকা বাছ-বিচারহীনভাবে সমস্ত আভাঁ গার্দ শিল্পীদের সাহায্য করেছে : ভাল্ডেন বলতেন, শিল্প কোন বিলাসসামগ্রী নয়, অন্যতম প্রয়োজনবিশেষ। ক্রমে নতুন কলাকৌশল প্রয়োগনিরীক্ষার কর্মশালা হয়ে দাঁড়ায় কাগজটি। প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ ১৯১১-১৩ পর্যন্ত ট্যাবলয়েড আকারে চার থেকে আট পৃষ্ঠার কাগজে প্রায় ষোলটা করে ছবি বেরোত। শাগালের রুশ গ্রামজীবনের বিখ্যাত কাজগুলি, কোকোসকার দারুণ সব পোর্ট্রেট, কিরশনারের নৈশ জীবনযাত্রার ছবি, পাস্যাঁর আঁকা বেশ্যাজীবনের আলোআঁধারি, বা নোলড, পেশস্টাইন ও বোসিওনির কাজগুলি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদকের মুখ চেয়ে তাঁর মর্জিমাফিক নয়, স্বেচ্ছায় আন্তরিক প্রেরণায় সৃষ্ট ছবিগুলি সেকারণেই মহত্তম

শৈল্পিক স্বার্থে উজ্জ্বল এবং সমসাময়িক পথচলতি দৃশ্যসংবাদের জগতে ফলত এক নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। এরপর যুদ্ধ শুরু হয়, অনতিবিলম্বে ডার স্টার্ম আরো মহত্তম, বৃহত্তর কর্তব্যে জড়িয়ে পড়ল।

## □ অশান্ত পশ্চিম রণাঙ্গন, অস্থিরতার ছবি

১৯১৪-য় গোটা দুনিয়ার সচিত্র সাপ্তাহিকে ফটোগ্রাফেরই ছড়াছড়ি। মোটা, ঝকঝকে কাগজে উৎসব-আড়ম্বরের নথিমুদ্রণে ক্যামেরার চেয়ে সস্তা আর সুবিধাজনক মাধ্যম আর নেই। কিন্তু যুদ্ধের বিষয়টা একেবারে আলাদা। মিত্রশক্তির সামরিক কর্তাদের মতো সাধারণ জনতাও ক্রমে বীরত্ব ও পৌরুষের প্রকাশ হিসেবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছিল, বিশেষত উগ্রজাতিদম্ভ ও দেশপ্রেমের অন্ধ সমর-উৎসাহের সেদিনে ধূসর গতিহীন হাফ্‌টোনে ছাপা ধ্বস্ত নিসর্গ মাড়িয়ে সেনাদলের উন্মত্ত অভিযান যেন আর যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক যোগাতে পারছিল না।

দু'পক্ষই, বিশেষত সম্পাদকেরা, 'খবর আঁকার' সেই পুরনো রীতিতে ফিরে গেলেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে ছোটখাটো খন্ডযুদ্ধের বিবরণীও ফুলিয়েফাঁপিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা হিসেবে চালানো শুরু হলো। প্রাক্তন বিশেষ শিল্পী-প্রতিনিধিদের কয়েক-জনকে আবার কাজে ফিরিয়ে আনা হলো এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁদের কাজে, বা কল্পলোকের যুদ্ধশিল্পী ক্যাটন উডভিল এবং ফরতুনিয়ো মাতানিয়ার মতো শিল্পীদের অগভীর দ্রুতটানের ছবিতে এই মনোভাবই আরো উসকে উঠল। সেই ১৮৮০-র ইজিপশিয়ান প্রচারাভিযানের সময় উডভিলেব কাজকর্মকে একজন বলেছিলেন ভালো, 'ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বহু পরাজয়ের ওপর একজন শিল্পীর বিজয়সৌধ'। ঘটনাস্রোত মিত্রবাহিনীর অনুকূলে না-ঘোরা পর্যন্ত উডভিল ও তাঁর অনুকারক শিল্পীদের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছিল। ১৯১৪ থেকে '২৪ পর্যন্ত সচিত্র সাংবাদিকতার জগতে মাতানিয়ার কাজ বিস্ময়কর। পশ্চিম রণাঙ্গনে কদাচিৎ ঝটিকাসফরের সংক্ষিপ্ত নোটসহ ইংলন্ড ফিরে মাতানিয়া স্মৃতি থেকে গড়ে তুলতেন দুপৃষ্ঠা জোড়া রোমাঞ্চকর যুদ্ধদৃশ্য—'স্ফিয়ারে'র পাতায় মুদ্রিত সেসব ছবি অদ্ভুত খুঁটিনাটিতে ভরা, যেন হুবহু ফটোগ্রাফ। ন্যূনতম অধিকারবোধ নিয়ে যুদ্ধের স্বকীয় ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দাখিল করার লক্ষ্যে শিল্পীদের ওপর প্রোটাগনিস্টদের মতোই সমান ঝুঁকি নিতে হতো। বিশেষ শিল্পীদের এক তরুণ দল সত্যিসত্যিই তাই করেছিল। 'লি'লাসত্রেসিঁও'-র জর্জ স্কট ও সাবাতিয়ের, 'ইল্যুসট্রিয়েটে ৎসাইটুং'-এর মার্টিন ফ্রস্ট, ফ্রিৎজ কথগোথা এবং থিওমাতিকোর কাজ তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। যুদ্ধের খবরাখবরের আরো নাটকীয় পরিবেশনার অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণেই সম্ভবত যুদ্ধের নথিগ্রহনে সরকারি উৎসাহে শিল্পী নিয়োগ শুরু হয়, যদিও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মনে হয় যে প্রথমদিকে এ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও উদ্যম ছিল নিছক সাংস্কৃতিক। ব্রিটিশ যুদ্ধদপ্তর যেকালে স্টিলফটোগ্রাফ ও



চলচ্চিত্রে যুদ্ধের নিখুঁত ও বাস্তব নথিভুক্তির কাজে ব্যস্ত, সরকারি ওয়র আর্টিস্টস স্কীম অনুযায়ী প্রকাশনা ও প্রদর্শনীর জন্য তখন নথিচিত্রণের কাজ শুরু হয়েছে। যদিও সেসবের অধিকাংশই খুব ভাসাভাসা, প্রথাগত। পল ও জন ন্যাশ, সি. আর নেভিনসন ও উইন্ডহ্যাম লুইস ছাড়া, যারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আবহে স্বয়ং কাজ করেছেন ও তার ক্ষতি স্বীকার করেছেন, বাদবাকি ব্রিটিশ ওয়র আর্টিস্টরা পেশাদার কারিগরিদক্ষতার বাইরে কিছুই দেখাতে পারেননি। আধুনিক সমরচর্চার সত্য নথিরক্ষামাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা নিজেরাও কোন না কোনভাবে বিষয়সম্পৃক্ত। অনাগত ধ্বংসের প্রকৃতিবিচারের জন্য চাই এক আবেগসম্পন্ন চিত্রভাষা, ফ্রান্স ও জার্মানির এক্সপ্রেশনিস্টদের হাতে যে ভাষা যাথার্থ্যের নৈপুণ্যে ঝলসে উঠেছিল। বেকমান, গ্রোস, অটো ডিক্স, লু-আলব্যের মোরো, পেশস্টাইন, সেগোনারের মতো শিল্পী-সহযোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধ মানে অঙ্গহানির যন্ত্রণা, শরীরের অপূরণীয় ক্ষত, বিবেকহীন দুঃস্বপ্নের মতো যা তাড়া করে ফেরে। সাহিত্যের প্রথমসারির সাময়িকী বা ক্ষণস্থায়ী আভাঁ-গার্দ চিত্রকোষে তার প্রচুর প্রমাণ ছড়ানো আছে—আবেগবিশ্বস্ত অঙ্গীকারের দলিল হিসেবে তার কোন তুলনা নেই। জার্মান 'ডার বিল্ডারবগেন' (১৯১৪-১৫), ক্রেইগজ্যেইৎ (১৯১৪-১৬) জ্যেইৎ-একো (১৯১৫), ডাই ন্যু জুগেন্ড (১৯১৬-১৭), এবং লা ক্রাপুইও (১৯১৬ ১৮)—ইত্যাদি সব কাগজেই দুর্বস্থ সব যুদ্ধছবির সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন উন্মত্ততার মধ্যেও এসমস্ত কাগজেই সেন্সরের বেড়া টপকে তবু কিছুদূর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সমালোচনার গদ্যছবি মুদ্রিত হয়েছে, ইংল্যান্ড, রাশিয়া বা আমেরিকায় তা ভাবাই যেত না। প্রচারনিষিদ্ধ হওয়ার আগে দু'বছর বটুর বামপন্থী কাগজ 'ন্যু জুগেন্ড' নিয়মিত যুদ্ধবিরোধিতায় সরব থেকেছে। বিশেষত জার্মান প্রকাশনার ছবিপত্র মহৎ কারিগরিগুণে উজ্জ্বল, আশ্চর্য অনুসন্ধানী জীবনমত্ততায় ক্ষিপ্র। ১৯০০-র দিনগুলি জুড়ে জার্মান শিল্পীরা যে কড়া অভিব্যক্তিক রূপকাঠামোর সন্ধান করেছেন, যেন তার [illegible] বিষয় হিসেবে সংগঠিত গণহত্যার লাগাতার অনুষ্ঠান শুরু হলো। এবং বিষয়ঘনিষ্ঠ একাজ তারা এমন পূর্ণচেতনায় সম্পন্ন করলেন যে কখনো দেহসংস্থানের ভাষায় না বিমূর্তের চিহ্নসূত্রে যুদ্ধের আশঙ্কাত্রাসের এই নথিবিবরণী ভবিষ্যতেরও অক্ষয় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকল। বস্তুত বিশ শতকের প্রথমভাগের ছবিতে যে অস্থিরতা ও দীর্ণ কালিজার বর্ণস্পন্দন দেখা যায়, তার মূল রয়েছে এখানে। অগ্রণী ম্যাক্স বেকমান ও অটো ডিক্স কখনোই সেই স্মৃতিমুক্ত হতে পারেননি। রণক্ষেত্রে ডিক্সের কাজ ছিল মেসিনগান হাতে, তাঁর এচিং-এর পোর্টফোলিও 'ডার ক্রেইগে'র (যুদ্ধ) ছবিতে রয়েছে [illegible] ক্রোধের আঁচ: গোলাবিধ্বস্ত, চাঁদ্রস্তবকের কালো হাঁমুখ, রাক্ষুসে গুহা ফাটল, কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা রক্তাক্ত ঊষর জমি, ছেঁড়া গলিত শবভূমি—প্রায় গোইয়া-র 'ডিস্যাস্টার অফ্ ওয়র' সিরিজের মতো তীব্র সে দংশনের জ্বালা। বেকমানকে চিকিৎসাবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে হয়তো নিজের হাতে খুন করতে হয়নি বেরাদর ভাইকে, কিন্তু দেখতে

হয়েছে জীবন্মৃতের স্তূপবেদি। গেয়র্গ গ্রোস, এ-শতাব্দীর মহত্তম শ্লেষকর্মী'ও একই নরকের অগ্নিসিদ্ধ।

ফরাসি শিল্পীদের অভিজ্ঞতাও কিছু আলাদা নয়, তবু তা জার্মান সম্পন্নতায় কদাচিৎ পৌঁছেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম, লুয্য-আলব্যের মোরোর 'লা ক্রাইপু'ও'র ছাপা ছবিগুলি, প্রায় ডিক্সের মতোই যুদ্ধের ইতিহাসেও নজিরবিহীন অখণ্ড রক্তস্নানের উন্মত্ত দিনলিপি। অধিকাংশই যুদ্ধের সময়ে ছাপা যায়নি, প্রকাশিত হয়েছিল যুদ্ধের-শেষে। আরেকজন শিল্পী, দুনোয়ের দ্য সেগোনার ছবি সূক্ষ্ম সংবেদনার, যুদ্ধের আগে পল পোয়ারে, ইসাডোরা ডানকান ও রুশব্যালের অভিজাত নথিরক্ষক সেগোনা পদাতিক বাহিনীর সার্জেন্ট হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে ছবি এঁকেছেন। তাঁর প্রতিপত্তিশালী ধনী মা ফ্রন্ট থেকে নিজের দায়িত্বে জাঁ গালতিয়ের বোয়াসিয়ের ও লে'ল্যা-র সম্পাদক আমেদে ওজ'ফ'-র হাতে প্রথম একগোছা ড্রয়িং তুলে দেন। যদিও বহুক্ষেত্রে বিধ্বস্ত ফ্রান্স জার্মানির আহত নষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষার শরিক, তবু ছবিতে পরিবর্ত-আদর্শগাথা ও নৈতিক প্রতিবাদের দার্ঢ্য যেন শুধু পরাজিতের জন্যই লেখা ছিল।

## □ বিশ দশকের ক্রোধগর্জন

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, যুদ্ধশেষে নীতিহীন শত্রুতা ও গণবিদ্রোহের আপাত অবসান ঘোষিত হলো, যদিও প্রকৃত অর্থে তার শেষ হতে তখনো অনেক দেরি। ইয়োরোপের বড়বড় শহরের রাস্তা ক্রোধ ও বিষাদের যুগপৎ সংক্রামে থরোথরো, ভয়ংকর মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব, দীর্ঘ অনাহারক্লিষ্ট কালরাত্রির ছায়ায় ভূতগ্রস্ত লক্ষমানুষের কান্না। মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে যুদ্ধফেরত প্রাক্তন সৈনিকেরা, দেখা গেল, আবার বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবের ব্যূহরক্ষায় তৎপর। পূর্ব থেকে পশ্চিমে খাদ্য বা কাজের তাড়নায়, লালপতাকার পক্ষে বা বিরুদ্ধে সহিংস শ্রেণীযুদ্ধ ফেটে পড়ল। খুবই দ্বিধাদীর্ণ সংশয়কাল উপস্থিত, শিল্পীদের ক্ষেত্রে বরং সে-চাপ অনেক কম, কেননা কাব্য ও দর্শনের দীর্ঘকালীন সাহচর্যে তাদের পক্ষাবলম্বনের দৃঢ়তা-অর্জনে বেশি সময় লাগেনি। সাধারণত কোন পত্রিকা ঘিরে তাদের স্বনিযুক্তির শিল্পচর্চা দানা বেঁধে উঠছিল, যুদ্ধকালীন তাদের একত্র করেছিল বিভিন্ন আভাঁ গার্দ কাগজ। উল্লেখযোগ্য সেসব কাগজের সম্পাদকেরা—হার্ভাট ভাল্ডেন বা পল কাসিরে-র মতো উদারনীতিবাদী, সমাজতন্ত্রী ভাইলান্ট হার্জফেল্ড বা নৈরাজ্যপন্থী ফ্রান্‌ৎস ফেমফ্যের ও জাঁ গালতিয়ের বোয়াসিয়ের—আক্রমক বোহেমিয়ানা ও বুর্জোয়াসমাজনীতির প্রতি সংগঠিত গাঢ় অবিশ্বাসের পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। যুদ্ধের বিশৃঙ্খলা এই মনোভাব আরো পোক্ত করেছিল। যদিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থেকেই গেছিল, তবু নৈরাজ্যের প্রতি সহানুভূতির গাঢ়তা ধীরে ধীরে কম্যুনিস্টসংঘচেতনায় উন্নীত হচ্ছিল।

সাহিত্যপ্রাণ কম্যুনিস্ট কর্মীরা শিল্পীর অখন্ডচেতনার রক্ষণাবেক্ষণে উৎসাহ ও সাহায্যের মধ্যে দিয়ে যে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ফললাভের আশা রয়েছে, সেকথা পার্টিকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। বুর্জোয়া অপকীর্তির প্রতি তীব্র নিন্দায় মুখর কাগজে প্রকাশ্য বা গোপন সার্বিক সহায়তার ফলে আবার কিছুকালের জন্য প্রকাশনায় নতুন জোয়ার এল।

বার্লিন, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেশনিস্ট, ফিউচারিস্ট ও ডাডাইস্ট গোষ্ঠীর প্রধান কর্মকেন্দ্র, ক্রমে আভাঁ-গার্দ সাংবাদিকতারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। সাধারণ-ভাবে বামপন্থী, বিশেষত সাম্যবাদের সমর্থক এইসব গোষ্ঠী আলোচনায় ঠাসা কাগজ, বুলেটিন ও সাময়িকপত্রে ছবিকথার স্রোতে জোয়ার বইয়ে দিলেন। দাদা-অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক কাগজ 'ডেডলি আর্ণস্ট' ১৯১৭ ; 'এভরি ম্যান হিজ ওন ফুটবল' ১৯১৯ , 'অ্যাডভারসাবি' ১৯১৯-২১ এবং 'ব্যাঙ্করাপ্টর্স' ১৯১৯-২৪-র মতো কাগজে সামাজিক শ্লেষবিদ্রূপের নতুন রূপবন্ধ আবিষ্কৃত হলো। যে-দ্রুততার সাথে ক্রুদ্ধ প্রশাসন এইসব কাগজের প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল, একমাত্র তা-দিয়েই এই নব্যচিত্রভাষার কার্যকরী উপযোগের পরিমাপ করা যায়।

বার্লিনের কাগজপত্রে যে-জ্বালামুখী উৎসার তার অনেকটাই গেয়র্গ গ্রোসের ড্রয়িং ও জন হার্টফিল্ডের ফটোমন্তাজে সবচেয়ে তীব্রতায় প্রকাশিত। পাতায়-পাতায় গ্রোসের অভিযুক্ত যুদ্ধব্যবসায়ী ও নির্দোষ জনগণের নথিবিবরণী তাঁকে বিশের দশকের মহত্তম চিত্রসাংবাদিকে পরিণত করেছে। গ্রোস যেখানে বিস্ফারক, প্রৌঢ়া কোলভিৎস সেখানে বেদনার্ত করুণায় স্নিগ্ধ। কম্যুনিস্ট কাগজ 'ইউল্যেনস্পিগেলে' (১৯২১-২৮) প্রকাশিত তাঁর প্রলেতারীয় জীবনের বিবরণী যন্ত্রণাবিদ্ধ—বাহুগ্রস্ত শিশুরা, বাৎসল্যপ্রেমে বিষাদগ্রস্ত মায়েরা, আর জয়পরাজয়ের দোলাচলে অবিচলিত শ্রমিকজনতার সেসব ছবি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

যুদ্ধপূর্ব ফ্রান্সের চেয়েও এখন জার্মানিতে কবি ও শিল্পীসমাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগ আভাঁ গার্দ সাংবাদিকতার সূত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধারালো ছবির পরিপূরক কবিতার ঝাঁজে সংবাদমাধ্যমের অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ল, এই সঙ্গে চিত্রকরের অধিক স্বাধীনতা ও কবিতার সক্রিয়তা আরো সুনিশ্চিত হলো। প্রতিষ্ঠিত সাময়িকী যেমন 'সিমপ্লিসিজিমাস' বা 'ডার নুয়াপেলে'ও একই ধারার ক্রমানুসরণ দেখা যায়, গ্রোস ও কোলভিৎসের অধিকাংশ নাটকীয় ছবি এভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাইমার রিপাব্লিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পোড়াঘায়ে গন্ধকচূর্ণের বিক্রিয়া শুরু হয়েছিল ডার নুয়াপেলে (১৯২২-২৮), যে-কাগজে কাজ করতেন গ্রোস, রুডলফ শ্লিশটার, হার্টফিল্ড ও ফ্রানৎস মাসেরীল। ডিক্সের ছবিতে হৃদয়হীন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা-প্রার্থী সেইসব ছায়াশরীরের আনাগোনা, নিছক বেঁচে থাকার জন্য যারা এক নির্মম লড়াইয়ে সামিল। 'ডাই আকশনে' প্রকাশিত হলো কার্ল হোলৎসের তিক্ত ছবির সিরিজ,

লুডভিগ মেড্নারের (১৮৮৩-১৯৬৬) মতো শিল্পীর ছবিতে দেখা গেল নাগরিক ঘূর্ণাবর্ত।

শিল্পী হিসেবে গ্রোসের কাজ সম্পূর্ণ স্বকীয় ধারায় বিকশিত হলো সিমপ্লিসি-জিমাস বা বার্লিনের 'ডার কোরশিনটে'র (১৯২৫-৩৫) পৃষ্ঠায়। ইতিমধ্যে যাদের তত অন্বেষণের উদ্যম নেই, তাদের হাতে প্রচারধর্মী সরলতার এক শৈলী গড়ে উঠল, দূর-প্রাচ্যে বিপ্লবের সাফল্য ও নতুন সমাজগঠনের সংবাদেই তাদের যথেষ্ট সান্ত্বনা জুটল।

তেমন কোন মায়াবিভ্রম ছিল না যাদের, বা থাকলেও গোপনে, তাদের কাছে পোষাকের রঙঢং বা সামাজিক রুচি ও প্রমোদবিতরণে যে ছদ্মবিপ্লব দেখা গেল, তারই আকর্ষণ ছিল বেশি। ভ্যান ডনজেন, দ্যুফি, ভ্যার্ত ও পাস্যার ফেনাদার ড্রয়িং ও প্রিন্টে নতুনতর আমোদসন্ধান সহর্ষে উদ্‌যাপিত হলো। লত্রেকের 'সে' এক্ষেত্রে প্রায় মডেলের কাজ করেছিল। বিশেষত ভ্যান ডনজেনের 'দ্যাভি' কুশল পর্যবেক্ষণের কারণে উল্লেখযোগ্য। ফ্যাশনের চমকদার জগতের হাতছানি টেনেছিল অনেককেই, ল্যুসিয়েন ভোগের মতো ব্যক্তিত্ব যুদ্ধের আগেই এবিষয়ে সক্রিয় ছিলেন, এবং তিনিই প্রথম ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতায় সৃষ্টিশীল কারিগর নিযুক্তির সম্ভাবনা আন্দাজ করেছিলেন। 'লা'সিয়েতে' একদা যারা অভিজাতের মুন্ডপাত করেছেন, অথবা কৃত্রিম অতিপ্রসাধিত রেখায় যারা রমণীশরীরের ছবি এঁকে নাম করেছিলেন, তাঁরাই ভোগের প্রথম শিকার হলেন।

আপাতত এই হলো উনিশশো বিশের সেই দিনগুলি; একটা গোটা দশকের ছবি-কথা যা চিন্তাশীলকে ভেতরে-ভেতরে তিক্ত অবসন্ন করে ছেড়েছে, নির্বোধকে বানিয়েছে আরো অন্তঃসারহীন; এই একটা দশক যার সময়কাল জুড়ে শিল্পীরা ধীরে ধীরে তার নথিবিবরণী প্রস্তুত করেছেন বিস্ময়কর আক্রমণের গাঢ়তায়, এবং এই সেই দশক, যেকালে নব্য সাংবাদিকতার আভাঁ গার্দ প্রবচনের তীক্ষ্ণধারঅস্ত্র শিল্পীর কার্যকরী ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে।

## ☐ ঝড়বিক্ষোভের তিরিশ

১৯৩০ ভালো করে শুরুই হয়নি, যখন উন্মত্ত ঝড়ের ধ্বংসগতি নিয়ে অর্থনৈতিক সংকট আছড়ে পড়ল। স্টক মার্কেট অচল, ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে, মানুষ উপোসে মরছে, ওদিকে ফসলের ধ্বংসযজ্ঞে চক্রান্তের ছায়া। হাজার হাজার কারখানা আর বাণিজ্যসংস্থার দরজায় তালা, শিকড়হারা বেপরোয়া মানুষের মিছিল হামলে উঠল প্রত্যেকটা বড় শহরে। পোড়া ঘা না ভালো করে শুকোতেই মনে হলো দিগন্তে আবার যুদ্ধের সংকেত। ইথিওপিয়া, চীন, স্পেন, রাইনল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ায় ছোট ছোট যুদ্ধ ক্রমশ যে সাংঘাতিক পরিণতির দিকে ঠেলে দিল, তার শেষ হলো এ শতকের নির্মম পারমাণবিক কুরুক্ষেত্রে।

ঘটনাক্রম, অনেকেরই মনে হলো মার্ক্সীয় তত্ত্বের সঠিকতার প্রমাণমাত্র। বুদ্ধি-বাদীরা ভবিষ্যত স্পষ্ট দেখলেন সোভিয়েত সংযুক্ততায়, এবং ঘোষণা করা হলো যে কাজ শুরু হয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে সেখানে। বাদবাকি লোক ভবিষ্যৎ জমা রেখেছিল হিটলার-মুসোলিনির হাতে, তাদেরও মনে হলো যে শুধু তাদেরই বিষয় ধারণা ত্রুটিহীন এবং তা যথেষ্ট কাজেরও। গভীর রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হলো এরপর।

ফ্যাসিবাদের নারকীয় বিশ্বদর্শনের আশঙ্কায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিচ্ছিন্ন বামশক্তি পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হলো। ক্রুদ্ধ বোহেমিয়ানার পুনর্জাগরণ ঘটল যখন তরুণী শিল্পী ও বুদ্ধিবাদীদের ঘরে বাইরে অপমান, বেপরোয়া ধরপাকড় শুরু হলো। বর্বর জড়বাদী নাৎসিছায়ায় 'নীতিহীন শিল্পের প্রদর্শনী' বা প্রকাশ্যে বই পোড়ানোর কটুগন্ধে শিল্পসাহিত্যের সচকিত জগত যে-সমস্ত নান্দনিক ধ্যানধারণার ভিন্নতায় এতদিন বহু বিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল, তা অন্তত কিছুকালের জন্য ভোলা গেল। পুরনো র‍্যাডিকাল ঐতিহ্যে অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে পত্রিকা, দৈনিকপত্র ও ব্রডশিট মিলে কম্যুনিস্ট ও ফ্যাসিবিরোধী সংগঠনের পক্ষে প্রতিবাদী শব্দ-অক্ষরের স্রোতোধারা বয়ে গেল।

ফ্যাসিবিরোধী ব্যাপক প্রচারকার্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল, যাতে লেখকশিল্পীরাও প্রাণবন্ত প্রভাবশালী প্রকাশনায় স্বাধীনভাবে তাদের বিকাশ ঘটিয়ে উঠতে পাবে। চাকুরিহীন শিল্পীরা এখন বিনা মাইনের শিল্প-সম্পাদক হিসেবে মুদ্রণশৈলী ও বিন্যাসে নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন। স্বৈরাচারী সরকার, অবিচার ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিশেষত চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, মেক্সিকো, স্পেন ও আমেরিকায় জঙ্গী সংগ্রামদৃশ্যে খচিত নতুন গণশিল্প গড়ে উঠল।

খ্যাতনামা বুদ্ধিবাদীরা এইসব প্রকাশনা ঘিরে জড়ো হলেন, প্রতিষ্ঠিত কবি ও লেখক সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন। অঁরি বারবুস (পারি 'মঁদ'), মাইকেল গোল্ড (নিউইয়র্কের 'নিউ মাসেস'), এড্জেল রিকউড (লন্ডন 'লেফ্ট রিভিউ') ও লুসিয়েন ভোগ (পারি 'ভু') সমসাময়িক শিল্পী গ্রোস, উইলিয়াম গ্রোপার, কোলভিৎস, আলেক দেনিকা, ফ্রানৎস মাসেরীল, যুরি প্রিমনোভ ও জেমস বসওয়েলের মতো শিল্পীদের জন্য সৃষ্টিকাজের দুয়ার খুলে দিলেন।

সাময়িকপত্রের চেহারাচরিত্রে ও কার্যকারিতার প্রাণিত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল লেখক শিল্পীদের নিহিত আদর্শবাদে। বামপন্থীরা এতকাল যা ব্যবহার করে এসেছে, এবার ব্যবসায়ী প্রকাশকদেরও তা নজরে পড়ল। ১৯২০-র সবচেয়ে বিখ্যাত আমেরিকান সাময়িকী 'দি নিউ ইয়র্কার' র‍্যাডিক্যাল কাগজ 'মাসেসে'-র মুদ্রণশৈলী ও সামাজিক শ্লেষ ও বিদ্রূপের বোধপ্রকৃতির প্রায় হুবহু অনুসরণ বলা যায়। কখনো দেখা গেল একই লোক কাজ করছেন দু'জায়গাতেই। কঁদে ন্যাশ সম্পাদিত 'ভ্যানিটি

ফেয়ার' একই কাজ করেছিল। তারপর আরো আকর্ষণীয় সব নতুন সাময়িকপত্র বেরোতে শুরু করল, লক্ষ্য আরো ব্যাপক ক্রেতাদর্শকের চাহিদা। রুজভেল্টপন্থী হেনরি ল্যুসের কাগজগুলি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাপ্তাহিক সংবাদসাময়িকী 'টাইম' ১৯২৩-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। নিজের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই কাগজে এজেন্সি মারফৎ প্রাপ্ত সংবাদসূত্র থেকে আরো পরিপূর্ণ যাথার্থ্যে সংবাদ পরিবেশনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন গ্রন্থাগার ও গবেষণাকর্মীদের এক বিরাট দল। মস্কো থেকে যে-বছরে 'ইউ. এস. এস. আর. ইন কনস্ট্রাকশন' প্রথম প্রকাশিত হয়, ল্যুসের 'ফরচুন'ও (১৯৩০) সেই থেকে প্রায় একইভাবে মনুষ্যজীবনে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রভাব-অভিঘাতের নাটকীয় বিবরণে চিত্রিত বা কখনো ফটোগ্রাফশোভিত হয়ে বেরোতে শুরু করে। প্রথম যুগের শিল্প-নির্দেশকদের মধ্যে অন্যতম টি. এম. ক্লেল্যান্ডের পরিকল্পনায় ফরচুনে অফসেট-লিথোগ্রাফির পদ্ধতিকৌশল ব্যবহার করে পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পূর্ণ রঙিন ছবি ছাপা হতো বিপুল অর্থব্যয়ে।

আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে নিউডিলের অন্তর্গত সব বিরাট বিরাট উন্নয়ন প্রকল্পের তাজা খবর সংগ্রহ ও পরিবেশনার কাজে ফরচুন প্রচুর শিল্পী নিয়োগ করেছিল, সারা দেশ জুড়ে ভ্রাম্যমান এইসব শিল্পীদের কাছে তখন ইয়োরোপের ঘটনাপ্রবাহ অনেক দূরের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এসময়ে আমেরিকায় সত্যি সত্যিই যুগোপযোগী শিল্পের সীমা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মাত্রা ও আয়তনে প্রচুর কাজ সামনে, শিল্পীদের মনোভাবও অনেক উদার। তিন হাজার শিল্পী পাবলিক ওয়র্কস অফ আর্ট প্রোজেক্ট অনুসারে সরকারী সংস্থার অন্দরবাহিরের দেওয়ালে ছবি আঁকছেন তখন, এক বছরের মধ্যেই এ কাজ সম্পন্ন হলো। উচ্চাকাঙ্ক্ষী আরো অনেকে শিল্প-দ্রব্যের বেচাকেনায় মন দিলেন নতুন উৎসাহে, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন, সর্বত্র আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হলো।

এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকান শিল্পের স্বার্থে ফরচুন মুদ্রিত পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত মাত্রা যোজনা করল। ১৯৩০-র প্রতিটি সংখ্যা চার্লস বার্টফিল্ড, আরন বোহর্ড, টমাস হার্ট বেনটন, জন স্টুয়ার্ট কারি, এডওয়ার্ড হোপার, রেগিনাল্ড মার্স, দিয়েগো রিভেরা, অ্যালেন সালবর্গের মতো শিল্পীদের উত্তেজক প্রতিবেদনে ভরা। ফরচুন তাদের আবারো স্টুডিয়োর বাইরে সক্রিয় শিল্পচর্চায় উৎসাহ যোগাল, আধুনিক শিল্প বিষয়ে ব্যাপক জনতার অজ্ঞতাজনিত সংশয় যাতে অন্তত কিছুটা কমে। ফলত নব্য মার্কিনী সাংবাদিকতার জ্ঞানালোকে শিল্পীদের স্থান অনেকটা সুনিশ্চিত হলো। ফরচুনের সাফল্যে খুশি হয়ে ল্যুস এ শতাব্দীর অন্যতম সচিত্র সাপ্তাহিক প্রকাশের তোড়জোড় করলেন। 'লাইফ' (১৯৩৬—) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুগের 'ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজে'র মতো পাঠকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ফরচুনের তাজা নমনীয় গদ্যের পাশাপাশি মেদবর্জিত ছবির সুত্রবিন্যাসে উৎসাহিত হয়ে ল্যুস-

সাম্রাজ্যের বাইরেও কেউ কেউ নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর কথা ভাবতে শুরু করলেন। 'এস্কোয়্যার' বেরোল ১৯৩৪-এ, আকারে ও বিন্যাসে স্পষ্ট অনুসরণ সত্ত্বেও তা পাঠকের সমর্থন পেল। লন্ডনের যুবক গ্রাহাম গ্রীন একই পথে যথেষ্ট অর্থের যোগান নিশ্চিত করে বার করলেন সাপ্তাহিক 'দিনরাত্রি' (১৯৩৬-৩৯)। তার লক্ষ্য ছিল শুধু পুরুষ পাঠক, সম্পাদক ও শিল্পীরা সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেন, যুদ্ধ বা রাজনীতির আবহ তখন ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে।

## □ রণাঙ্গন থেকে হেনরি ল্যুসের প্রতিবেদন

বিধ্বস্ত জাপান, ধর্ষিত যুগোশ্লাভিয়া এবং আহত ও বিভক্ত জার্মানির বুকের উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, লাইফের তিনজন শিল্পী তখন তাদের ছবিতে শেষ টান দিতে ব্যস্ত। কোন পত্রিকায় এতাবৎ প্রকাশিত যুদ্ধবিবরণীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল সেইসব কাজ। সেই ১৯৪৩ থেকেই তারা মিত্র-বাহিনীর ছোট ছোট সামরিক দলের সঙ্গে কাজ করেছেন, যুদ্ধের শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তারা এক রণাঙ্গন থেকে আরেক রণসীমান্তে উড়ে গেছেন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। জীবনের মরণান্তিক ঝুঁকি আদৌ তাদের অজ্ঞাত ছিল না। বস্তুত এযাবৎকালের যে কোন প্রতিবেদক শিল্পীর চেয়ে তারা অনেক বেশি অন্তরঙ্গতায়, প্রায় সাক্ষাৎ যোদ্ধার বেশে, এই কালান্তক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

গ্রীসের মুক্তিসংগ্রাম সফল হওয়ার আগেই ইজিয়ান সাগরের আশেপাশে বিক্ষিপ্ত লড়াই শুরু হয়েছিল। সাহসী, সহিষ্ণু ছোট ছোট লড়াকু গোষ্ঠী জার্মানদের যখন-তখন চকিত আক্রমণে পর্যুদস্ত করে তুলছিল। ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই বা কখনো কোথায় শত্রু তা বুঝে ওঠার আগেই তারা নিখোঁজ। গোটা একটা সেনাশিবির ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছিল মাত্র জনা-বারোর ছোট ছোট স্কোয়াড। লর্ড পারলিন লাইফের পক্ষ থেকে সেখানে পৌঁছে তা চাক্ষুষ করেন। এমনকি প্রত্যক্ষ আক্রমণে হানাদার বাহিনীর সঙ্গী ছিলেন দুবার—প্রথমবারে সামোস দ্বীপে, পরে গ্রীসের মূলভূমি লক্ষ করে আক্রমণকালে। এক গ্রীক-ব্রিটিশ কম্যান্ডোবাহিনী, যারা নিজেদের বলত 'পরিশ্রান্ত বিশ্বাসীর দল' শেষপর্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আকস্মিক জার্মান আক্রমণে। দুই সঙ্গীসহ পারলিন প্রায় দু'দিন পর্বতগুহায় লুকিয়ে থেকে কোনগতিকে জাহাজে ফিরে আসেন। নৈশ দুঃস্বপ্নখচিত বিভীষিকার ছবিতে পারলিন ধারাবাহিকভাবে নথিবদ্ধ করেন তাঁর এই অভিজ্ঞতা। শত্রুপক্ষের মনোবলে ভাঙন ধরাতে আবশ্যিক আত্মত্যাগের বর্ণনায় পারলিন তাঁর সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে দিলেন লাইফের পৃষ্ঠায়, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪।

আরেক শিল্পী ডেভিড ফ্রেডেনথাল নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীদের শক্ত ঘাঁটি এক অধিকৃত দ্বীপে নৈশ-আক্রমণে অংশ নিয়ে

'৪৪-এর ২১ অগাস্ট লাইফের পৃষ্ঠায় রিপোর্ট পাঠালেন, 'নাইট ল্যান্ডিং অন নিউ ব্রিটেন'। সাদা-কালোর অজস্র ড্রয়িংয়ে ফ্রিডেনথাল বর্ণনা করেছেন প্রচন্ড আক্রমণের শুরুতেই কীভাবে ষোলটার মধ্যে এগারোটা নৌকা তলিয়ে গেল, আধঘন্টার মধ্যেই বোঝা গেল তার মধ্যে কেউ আর ফিরবে না। ঐ বছরেই তিনি যুগোশ্লাভিয়ায় টিটোর অনুগামীদলে যোগ দিয়ে দেখেছিলেন মুক্ত গ্রামবাসীদের সহর্ষ অভিনন্দন। যুদ্ধের মধ্যে আনন্দিত ক্ষণবিরামের পরই ফ্রিডেনথাল জার্মানি গেলেন হয়তো তার শোকাকুল পরিশিষ্ট রচনা করার জন্যই।

তৃতীয় আরেকজন শিল্পী আরন বোহর্ড, নরম্যান্ডির উপকূলে আমেরিকান বাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় পদাতিকবাহিনীর তিক্ত যুদ্ধ চাক্ষুষ করেছিলেন, এমনকি দেখেছিলেন সামান্য কয়েকগজ তফাতে উপস্থিত সাক্ষাৎ মৃত্যু। লাইফের আটাশজন সমর-প্রতিবেদকের মধ্যে সেরা এই তিন শিল্পী এরকম গণপ্রচারিত কাগজের পৃষ্ঠায় যুদ্ধসংক্রান্ত প্রতিবেদনে সম্পূর্ণ নতুন ধারা সৃষ্টি করলেন। সেইঅর্থে যুদ্ধের কোন বাস্তব দৃশ্যেরচনার চেষ্টাই করেননি তাঁরা, ভয়ংকর ধ্বংসপ্রবৃত্তির অমানবিক ছায়াদৃশ্যে তাঁরা একধরনের হৃদয়াবেগ সঞ্চার করতে জানতেন, আর বৃহত্তম ও সফলতম সচিত্র বাজারী পত্রিকায় মানবিক স্পর্শে উজ্জ্বল এসব ছবি দেখা সত্যিই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

কিন্তু তার কারণ প্রথম-প্রথম যতটা দুর্বোধ্য ও আশ্চর্যজনক মনে হতো আদৌ তা নয়। সেই ১৯৩৬ থেকেই লাইফ এক নতুন চরিত্রের চিত্রসাংবাদিকতা প্রবর্তনের সাফল্য উপভোগ করছিল, যুদ্ধ শুরুর সংকেত পাওয়া মাত্রই কিন্তু তার আচারভঙ্গি পাল্টাল। একটার পর একটা সংকটের ক্রমবর্ধমান চাপ প্রতিহত করার জন্যই যেন সকলে তখন রেডিওয় কান পেতে বসে, ঘন্টায়-ঘন্টায় সংবাদতথ্য পরিবেশনে সিদ্ধ এই নতুন গণমাধ্যমের প্রবল জনপ্রিয়তায় লাইফ কঠিন প্রতিযোগিতার আভাস পেল। যুদ্ধ যখন সত্যিই এসে পড়ল, ইয়োরোপের প্রতিটি যুযুধান শহর থেকে একযোগে সরাসরি ঘটনাস্থলের প্রত্যক্ষ নাটকীয় উত্তেজনার বেতার সম্প্রচার আরম্ভ হলো, সম্ভবত তখনই লাইফ সাপ্তাহিক ঘটনাসংক্ষেপের সঙ্গে পরোক্ষ ও রঙিন আলোকচিত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাভাবিকভাবেই সচিত্র পত্রিকার দৃষ্টিগত আবেদন আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য তখন দরকার আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রসম্ভার, দরকার আরো কুশল শিল্পী ও আলোকচিত্রীর সক্রিয়তা। মার্কিন দৃশ্যপট ও যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সাংবাদিক হিসেবে চিত্রকর-নিয়োজনে সফল 'ফরচুন' সৃষ্টিশীল শিল্পীদের কার্যকরী ভূমিকায় নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

১৯৪২-এর শেষে যুদ্ধনথিরক্ষার অসম্পূর্ণ সরকারী কর্মসূচির দায়িত্ব হাতে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে সরাসরি প্রতিবেদনের কাজে লাইফ অনেকবেশি শিল্পী নিয়োগ করল। কখনো তারা টাইম ও লাইফের অন্যান্য প্রতিবেদকের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন, কখনো একাই ছবির সঙ্গে প্রয়োজনমাফিক জুড়ে দিয়েছেন প্রাথমিক টীকাভাষ্য।

সাধারণত ঘটনাস্থলেই কাজ করতেন তারা, পরে প্রাথমিক স্কেচ থেকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতেন সম্পূর্ণ চিত্রভাষ্য, ছাপা হতো দু'তিন সংখ্যা পরপর, কয়েকপৃষ্ঠা জুড়ে রঙিন ফিচারের আদলে।

লাইফের যুদ্ধপ্রতিবেদন আরো তীক্ষ্ণ জোরালো হয়ে উঠল ফরচুনের বৃহত্তর শিল্পীদের হাতে, যারা এই মরণাত্মক দ্বন্দ্বের স্বরূপসন্ধান করেছিলেন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বিসংবাদের গভীরে। ফ্রান্সিস ব্রেনানের নির্দেশনায় ফরচুনের পৃষ্ঠায় কারিগরির আরো পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক সদ্ব্যবহাব সম্ভব হয়েছিল। নির্বাসিত শিল্পীদেরই একাজে প্রায়শ নিয়োগ করা হয়েছে। পোলিশ চিত্রকর চেরমানস্কি আট পৃষ্ঠার পরিসরে দাখিল করেছিলেন ইয়োরোপ থেকে আমেরিকা পৌঁছনোর দীর্ঘ পথযন্ত্রণার ইতিবৃত্ত, 'দি ইউরোপিয়ানস্' স্পর্শ করে আশ্চর্য নাটকীয় গভীবতাব কারণে। স্যুররিয়ালিস্ট চিত্রকর রিচার্ড লিন্ডনারের পোর্টফোলিও 'লেট'স বিগিন উইথ প্যুয়ের্তো রিকো' প্রকাশিত হয়েছিল '৪৪-র এপ্রিলে। মার্কিন যুদ্ধসীমান্তের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে এইসব কাজে: কান্দিদে পোর্তিনারিব 'ব্রাজিল . দি নিউ এ্যালি' (নভে.'৪২) বিকো লেব্রানের 'দি ডিপ সাউথ লুকস আপ' (জুলাই' ৪৩); অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট ফিলিপ গাস্ত'র তিনটি পোর্টফোলিও তো অসাধারণ . 'ব্রেভ নিউ ওয়ল্ড' (অগস্ট'৪৩), 'ট্রুপ কেরিয়ার কমান্ড' (অক্টো.'৪৩) এবং 'এয়ার টেনিং প্রোগ্রাম', প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি,'৪৪-এ।

অবশ্য লাইফের প্রতিবেদনই শেষ কথা নয়, শিকাগো সান সিন্ডিকেট নামে এক ফিচার এজেন্সি জন গ্রোথ নামে এক অক্লান্ত কর্মীকে নিয়োগ করেছিল নাৎসি-অধিকৃত ও আক্রান্ত ইয়োরোপ থেকে সরাসরি প্রতিবেদনের কাজে। গ্রোথ আগে স্পেশাল আর্টিস্ট হিসেবে এস্কোয়ারে কাজ করেছেন, ক্রোয়া দ্য ফ্য এবং কম্যুনিস্টদের আন্তঃ-সংঘর্ষের বিবরণ দাখিল করেছেন, দেখেছেন ভিয়েনার গৃহযুদ্ধ অথবা ১৯৩০-র সোভিয়েত তৎপরতা।

ইতিমধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে, অনাগত আক্রমণের আবহে ব্রিটিশ সরকারি নথিচিত্রীরা আবেগবর্জিত চিত্রভাষায় রচনা করছিলেন ব্রিটেনের আত্মরক্ষার শোকাবহ প্রস্তুতি। এডগার এনসওয়র্থের মতো কেউ কেউ আবেগহীন স্তব্ধতার এই ভাষায় এমন-কিছু গুণ আবিষ্কার করেছিলেন, যার ফলে তাদের কাজ নিয়মিত প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দিল। যদিও হেনরি ল্যুসের মতো তার আকাশচুম্বী ক্ষমতা ছিল না, তবু তিনি ফেলিক্স টোপোলস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্তত একবার পাঠাতে পেরে-ছিলেন। ফলস্বরূপ '৪২-এ প্রকাশিত হয় 'রাশিয়া অ্যাট ওয়র'—রাশিয়ার বাইরে আর কোন শিল্পী যে-সুযোগ প্রায় পাননি, টোপোলস্কির রাশিয়ান যুদ্ধ সীমান্তের প্রস্তুতি বিবরণ তা ব্যতিরেকেই অসাধারণ কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে। ১৯৪১-এ প্রকাশিত তার 'ব্রিটেন ইন পিস অ্যান্ড ওয়র' একইরকম আকর্ষণীয়। এনসওয়র্থের নিজের কাজ

বেলসেনের মুক্তিসংগ্রামের চিত্রভাষ্য 'ভিকটিম এ্যান্ড প্রিজনার' ( সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ ) এই দীর্ঘ স্মরণীয় ইতিহাসের যেন ক্ষোভে দীর্ণ অন্ধকার পরিশিষ্ট। রোনাল্ড সার্লের কাজও তাই, জাপানী শ্রমশিবিরে তার দীর্ঘ চার বছরের অভিজ্ঞতা প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডন ইলাসট্রেটেডে।

## □ দুই বিরোধী বিশ্বেই কাজ চলছে

যুদ্ধ শেষের ঠিক পরের বছরগুলি শিল্পীদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসময়—সমর প্রতিবেদনের কর্মসূচি অকস্মাৎ পরিত্যক্ত হলো, তার জায়গায় তুলনীয় কোন কাজের দিশা নেই। প্রায় যুদ্ধফেরৎ সৈনিকের মতো প্রাক্তন নথিচিত্রীরা ফিরে গেলেন স্টুডিয়োর চার দেওয়ালের মধ্যে, পুনর্বাসনের জরুরী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা তাদের সম্পন্ন চিত্রকোষ ও অকৃপণ উদারতায় ছাপা ফিচারধর্মী কাজ দেখে বিস্ময়মুগ্ধ, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাজকর্মের সুলুকসন্ধানে মরিয়া হয়ে দেখলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপে তার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। পরবর্তী দশবছরে কাগজের নিয়ন্ত্রিত বন্টনব্যবস্থায় শুধু যে পৃষ্ঠাসংখ্যা কমল তাই নয়, আকারও অনেক ছোট হয়ে এল, আর নতুন কোন পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন তখন কল্পনার বাইরে। সব কাগজেই ফটোগ্রাফের রমরমা, ছবি যেটুকু না থাকলে নয়।

এই ধূসরকঠিন বাজারে বাধ্য হয়ে বহু ছবি-আঁকিয়ে হয় ক্যামেরা ধরলেন, অথবা শিল্পনির্দেশক বা গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে বহাল হলেন। প্রতিষ্ঠিত দু'একজন বা নিতান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যারা, তাদের ক্ষেত্রে হয় পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত বিশেষ ধরনের দু'একটি কাগজের সাময়িক চুক্তি বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগ্রামে নিয়োজিত গণপ্রচারের লক্ষ্যে পরিচালিত কাগজপত্রই একমাত্র ভরসা। সুতরাং চল্লিশের শেষ বা পঞ্চাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত দৈনন্দিনের নথিচিত্রণ হয় যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ও অগ্রগতি বা যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবী ও পুনর্বাসনের সমস্যা ঘিরে আবর্তিত হলো, নয়তো অন্যদিকে আরো একবার জঙ্গী গণশিল্পের লক্ষ্যে পরিচালিত হলো, যার শিকড় ছিল তিরিশের তিক্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতায়।

শ্রেষ্ঠ কাজগুলি তখনো 'ফরচুনে'ই প্রকাশিত হচ্ছে। লিও লিওনির আনুকূল্যে এমনকি ভয়ানক সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীরও উত্তেজিত বোধ করার কারণ ছিল। আন্তন রেফ্রিজিয়ের 'সান ফ্রান্সিসকো অ্যালবাম' ( সেপ্টে '৪৭ ), রেনি বেনেটের 'দি গোল্ডেন কোস্ট' ( অক্টো '৪৯ ), ফিলিপ এভারগুডের 'এন্টার দি রোড বিল্ডার্স' ( নভেম্বর '৪৯ ) : উল্লেখযোগ্য সমস্ত কাজেই লক্ষণীয় মানুষের গঠনকর্মের প্রতি ক্রমান্বিত উৎসাহ। '৪৬-৫০-এ 'কনট্যাক্ট' ও '৪৫-৫৪ পর্যন্ত 'ফিউচার' একই কাজ করেছিল। এ সমস্তই অবশ্য নিছক শারীরসুখের জন্য গণউন্মত্ততার ঠিক আগের কথা, প্রায় ভবিষ্যৎবাণীর আদলে তা রচিত হচ্ছিল।

পঞ্চাশের শেষদিকে যখন কাগজের যোগান অনেক নিয়মিত, নানাবিধ নতুন সাময়িক-পত্র বাজারে এল হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা কখনো রাষ্ট্রীয় পরিচালনায়। কিন্তু 'ফরচুনে'র উদারনীতি বা সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রতিলিপি গোটা ইয়োরোপীয় মহাদেশের নবপ্রজন্মের তরুণ শিল্পীদের র‍্যাডিকাল উন্মত্ততা থেকে বহু দূরের বিষয়, যারা যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ধারণ করে ক্রমে বামপন্থায় আস্থা ফিরে পাচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন পত্রিকা ও দৈনিকপত্রে তাদের কাজে তার ক্রমবিস্তার চোখে পড়ছিল। তার একটা কারণ হলো নাৎসিবিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের নেতৃভূমিকা। গোপন কাজকর্মের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে অসংখ্য বেআইনী প্রকাশনা ক্রমে গণপ্রচারের লক্ষ্যে বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক, লেখক এবং শিল্পী হিসাবে পিকাসো, মাতিস, ফার্দিনান্দ লেজের-এর সম্পাদকীয় পরামর্শে দৈনিক, সাময়িকী ও সাহিত্যপত্রের প্রভাবশালী মতশৃঙ্খলায় পরিণত হলো। লেখকশিল্পীদের সঙ্গে একযোগে প্রতিরোধযুদ্ধে লড়াই করে এই সমস্ত কাগজের তরুণ সম্পাদকের সহানুভূতি এবাবদে কিছু বেড়েছিল, ৩০-র সমাজবাস্তব ঐতিহ্যেরই ক্রমানুসরণ চেয়েছিলেন তারা, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা তখন অনেক বেশি লোককে তারা শুধু যে জায়গাই বেশি দিচ্ছে তাই নয়, কিছু পয়সাও দিতে পারছে। ফলে পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হলো, কিন্তু '৫৬-য় হাঙ্গেরি বিদ্রোহে সোভিয়েতের নির্মম দমনপীড়ন ও স্তালিনজমানার অতিকথা নিয়ে সবব ক্রুশ্চেভ লেখকশিল্পীদের একটা গোটা প্রজন্মের অচিরেই মোহনাশ করল।

কম্যুনিস্ট দৈনিকপত্রের মধ্যে তখন কোপেনহেগেন 'ল্যান্ড অফ ফোক', পারির 'ল্যুমানিতে', মিলানের 'লুনিতা'র সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র বা পারির সাপ্তাহিক 'লা'কশিয়ঁ'য় এমন বহু ছবি ছাপা হয়েছে যা ঐতিহাসিক ও সমালোচকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে। উদাহরণস্বরূপ 'ল্যান্ড অফ ফোক' ট্যাবলয়েড সাইজের দু'পৃষ্ঠা জুড়ে প্রতি সপ্তাহে নানা বিষয়ে প্রধানত বিদেশী শিল্পীর ছবি ছাপত। আমার নিজের প্রথম দিকের কাজ, যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যান্ডের গঠন ব'র ছবি বা আমার চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের ইতিবৃত্ত এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। রোনাল্ড সার্ল, বেন শান, জন মিনটন বা আঁদ্রে ফ্রাঁসোয়ার কাজও ছাপা হয় এভাবে। যদিও দোমিয়েব, ডিক্স, গোইয়া, গ্রোস, কোলভিৎস, হোকুসাই, মাসেরিল, পিকাসোর ড্রয়িং ব্যবহার করে সাজানো পৃষ্ঠারই কার্যকারিতা অনেক বেশি ছিল বলে আমার মনে হয়।

রবিবারের ল্যু'মানিতের পৃষ্ঠায় বেরিয়েছিল আঁদ্রে ফুগেরোঁর বা বোরিস তাজলিৎস্কির কাজ, সবচেয়ে বিশিষ্ট অবশ্য দক্ষিণ ইতালির গ্রামে ভূমিসংস্কার আন্দোলনের উপর রেনাতো গুত্তুসোর কুশলী চিত্রক্রম।

ব্রিটেনে কবি এডজেল রিকউড ও র‍্যান্ডাল সুইন্সলার প্রকাশ করতেন 'আওয়ার টাইম' (১৯৪০-৫২) এবং ত্রৈমাসিক 'সেভেন' (৪০-৫২)। এছাড়া যে সমস্ত কাগজপত্রের নাম করা যায়, তার মধ্যে ৫০-৫১ র সার্কাস, লন্ডন লিলিপুট (৩৮-৫২) এবং

সাপ্তাহিক লীডার ( ৪৯-৫১ ) বিশিষ্ট। লিলিপুটের জেমস বসওয়েল নিয়মিত নিজেও ছবি আঁকতেন, '৩০-'৪০-র এই প্রধান নকশাবিদ, ক্রমে শিল্পসম্পাদনার কাজ ছেড়ে সম্পূর্ণ তেলরঙের কাজে ফিরে যান, যদিও তাঁর কাজের প্রভাব তারপরেও বহুদিন সক্রিয় ছিল।

তারপর দু'তিন বছরের মধ্যে হঠাৎ কনট্যাক্ট, ফিউচারসহ সব কাগজ দুম করে উঠে গেল, সাংবাদিকতার জগতে এ এক বিস্ময়। একমাত্র ব্যতিক্রম টোপোলস্কির ক্রনিকল, তারপরেও কিছুদিন চলেছিল।

## □ দোলাচলের ষাট

চাক্ষুষ সংযোগের প্রধান মাধ্যম এখন টেলিভিশন। আমজনতার উপভোগ্য কার্যকরী মোড়কে মন্তব্য ও তথ্যাবিবরণীসহ সেখানে প্রাত্যহিক এমন সস্তা আমোদ বিতরিত হয় যে সে এখন প্রতিদিনের জীবনসঙ্গী। ক্যামেরাচক্ষুর এমন সর্বব্যাপী জয়জয়কারের মধ্যে এও একটা মির‍্যাকল যে স্রষ্টাশিল্পীরা তবু যে বেঁচে আছেন তাই নয়, বরং আরো সম্পন্ন হয়ে উঠছেন।

শব্দ বা ছবির শত্রু না হয়ে বরং দেখা যাচ্ছে টেলিভিশন বন্ধু হিসেবেও খারাপ নয়। গণজাগরণের নতুন রাস্তা খুলে গেছে, লোকে গ্রন্থপাঠের পুরনো অভ্যাসে পুনরায় ফিরে যাচ্ছে, ছবিছাবার প্রতি উদ্দীপনা বাড়ার সংকেত মিলছে। কমিক বুক থেকে যে কোন ছবির বইয়ের নতুন ক্রেতা আসছে সব শ্রেণী থেকে। নতুন বা পুনঃপ্রকাশিত একগাদা কাগজের পৃষ্ঠায় টিভির স্পষ্ট অভিঘাত চোখে পড়বে, মৌলিক বিষয়দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন এসব কাগজের পাঠক অপ্রচলিত চিত্রকল্পেই সাড়া দেয় বেশি।

নতুন জনতার একটা বড় অংশ যুবক, হয় শ্রমিকশ্রেণী অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। ইংল্যান্ডে লোকে বলে 'মড', উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্জনেচ্ছু এই নব্য সম্প্রদায় ঠিক যেন একশো বছর আগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিলিপি, যারা ক্রমে ঈর্ষণীয় জীবনযাত্রার রীতিরুচি বুঝে নিয়েছিল। এখন সাধারণ জনতার দিন, কোনক্রমে উত্তম জীবনের কায়দাকানুন বুঝতে তারা শুধু একটা টিকিটের আশায় রয়েছে। চকচকে মাসিক বা সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্রের পছন্দসই গোটাকয়েক কেচ্ছা না পড়া থাকলে ষাটের দোলাচল, তার স্নায়ুস্পন্দন বোঝার কোন আশা নেই তোমার। উপলব্ধ কাজের পরিমাণ খুব বেশি না হলেও পুরস্কার অর্থ মোটাসোটা, বস্তুত অনেক নথিশিল্পীই এখন এলিট পর্যটকে পরিণত হয়েছেন। ফ্রিল্যান্স ফটো রিপোর্টারের মতো নয়, বিরাট খ্যাতিপ্রতিপত্তি থাকলে তবেই কোন শিল্পীকে কাজের বরাৎ দেওয়া হয়। অন্যদের ধৈর্য ধরতে হয়, ধৈর্য হারাতে হয়, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নিজেদের কাজ ছাপছে। রাজনৈতিক ভূদৃশ্য যদিও আর একবারও সেভাবে তেতে উঠল না, কিন্তু শিল্পীদের

সহানুভূতির ধরনধারণ দেখে মনে হয় না যে তারা এত সরল বিশ্বাসে আর উন্মুক্ত করবে নিজেদের। আন্তর্জাতিক নিউ লেফট, বীটনিক বা এ্যানার্কিস্ট কাগজপত্রের চেয়ে যা কিছু কড়া মন্তব্য বরং বড় কাগজেই চোখে পড়ে বেশি। শিল্পীদের প্রাণশক্তি হরণ করেছে পপদৃশ্য, যেভাবে লোকে এখন দেখছে জীবনকে। ১৭৬০-র ভিক্টোরিয়ান যুগে আইনী শৈথিল্যের সুযোগে আমূল দৃশ্য পরিবর্তনের কথা মনে পড়ে। পার্থক্যও আছে : ছোটখাটো অপরাধের জায়গায় এখন সংগঠিত অপরাধ অনেক বেড়েছে, ভিড়াক্কার স্ট্রিপ ক্লাবে পরিশ্রমী সফল শিক্ষানবিশ যুবকই এখন তাকিয়ে থাকে নারীশরীরের উত্তেজনায়, চিরদিনের সেই ধিক্কৃত অলস প্রাণীরা অবশ্য এখনো রেসের মাঠ বা জুয়ার টেবিল চুড়ে ফেলছে।

অতলান্তিকের ওপারে রোমসাম্রাজ্যের দিনগুলি ফিরে এসেছে, মোটর রেসের উত্তেজনায় বিরাট দর্শকজনতা হাঙ্গামায় ফেটে পড়ছে, অন্যদিকে পরিচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা ও মৃত্যুব হাত থেকে বাঁচার প্রার্থনা চলছে। স্পোর্টস ইলাসট্রেটেডের ববান্দ সাপ্তাহিক পৃষ্ঠায তার বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে।

বিদেশী শিল্পীদের চোখে আমেরিকা নতুন আকর্ষণ, বিশেষত ব্রিটিশ অ্যালবাম কয়েকটা উল্লেখযোগ্য. পিটার ব্লেকের 'ইন হলিউড' (১৯৬৩, সানডে টাইমস), জেরাল্ড স্কার্ফের 'লাইন অফ্ ক্যামপেন' ('৬৪) রোনাল্ড সার্লের 'অফ ইন দি সান এগেইন' (স্পোর্টস ইলাস '৬৪) টোপোলস্কিব 'নিউইয়র্ক' এ সিটি ডেস্ট্রয়িং ইটসেলফ্' (ফরচুন '৬৪) ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক পর্যটন এখন আরেক জনপ্রিয় ধুম। ট্র্যাভেল বুক বা অ্যালবামের সম্ভাবনা এতদিন অবহেলিত ছিল, এখন সৃষ্টিশীল লেখকশিল্পীদের তার বৈধতা স্বীকার কবার সময় এসেছে।

বৈচিত্র্যেব শেষ নেই, এমনকি মাপেও বড়ো '৬০ ব -ই লোকদৃশ্যে। বষয়বস্তুরও শেষ নেই। আরো অনেক তরুণ শিল্পীকে এ কাজে নিয়োগ করা উচিত, তা অবশ্য নির্ভর কবেছে সেই শিল্পী আর সম্পাদকের উদ্যোগ ও কল্পনারুচিব উপর। আমার উপদেশ যে কাজ করো, যে কোন বিষয় বেছে নিয়ে শুরু কবে দাও, কোন পত্রিকা স্বয়ং তোমার কাছে ববে এসে কাজ চাইবে, তাব প্রতীক্ষা না করাই ভালো। আজকের প্রতিবেদক শিল্পীরা আব খুঁটিনাটি আক্ষরিক বর্ণনায উৎসাহ পাচ্ছে না, সম্ভাব্য গ্রাহকের প্রতি লক্ষ বেখে তারা সূক্ষ্ম বিষয়ীগত মানসতরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। নতুনদের কাজ খুবই উঁচুদরের, বিষয় বৈচিত্র্যেরও তুলনা নেই।

ব্র্যুগেল, লত্রেক বা গ্রোসের বহির্মুখী দৃষ্টি যেন প্রতিস্থাপিত হয়েছে একটা দ্বিতীয় অন্তর্মুখী দৃষ্টিপ্রয়োগে, অনেকটা হিয়েবোনিমাস ব- শ স্যুররিয়ালিস্ট যাত্রাপথে। প্রথম পদ্ধতিটি একরৈখিক, দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের দ্রুত চাক্ষুষ নিষ্কাশনের উপযোগী। অন্যধারায় অ্যাপেল, বেকন, দ্যবুফের কাজের পীড়াদায়ক বস্তুসত্য

সম্ভবত কোন ক্যামেরার চোখে কোনদিনই ধরা পড়বে না। সন্দেহ নেই যে অতীতের অনেক বিশেষ শিল্পীই যেমন মেল্টন প্রায়র, ফ্রেডেরিক ভিলিয়ের বা মাতানিয়া আজ হয়তো ছবিই তুলতেন। গভীর ও ব্যক্তিগত কোন ছায়াচিত্রের বদলে অবশ্য যাদের রোমাঞ্চকর অভিযানে উৎসাহ বেশি, তাদের পক্ষে ফটোগ্রাফির চেয়ে ভালো মাধ্যম আর কিছু হয় না।[১] □

# রুশবিপ্লবের প্রতিবেদন

## দৈনন্দিনের নথিচিত্র

১৯০৫-এর বিপ্লবকালীন ঘটনার ঘূর্ণিঝড় বহু রুশশিল্পীকে রাজনৈতিক চেতনায় দীক্ষিত করে ছিল। ভি. ই. মাকোভাস্কির কাজ: '৯ জানুয়ারি ১৯০৫'। রক্তাক্ত রবিবারের স্মারকচিহ্ন। সেদিনের এ ঘটনায় শিল্পীরা প্রথম বৈদ্যুতিক শারীরসক্রিয়তায় জেগে উঠলেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গে নির্দোষ শ্রমিকজনতার সমাবেশে অকাতরে গুলিবর্ষণের নৃশংসতায় ক্ষিপ্ত গর্কি প্রকাশ্যে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় আহ্বান জানালেন প্রতিবাদী ঐক্যের, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেফ্তার করা হলো। রেপিন, ভি. এ. সেরভ ও ভি. ডি. পোলেনভের মতো প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা আকাদমি অফ আর্টসের ছাত্রদের সঙ্গে একযোগে প্রতিবাদ করলেন এবং যখন দেখা গেল আকাদমি এ ঘটনার পরেও নিরপেক্ষ নিশ্চেষ্টতায় অসাড়, সেরভ পদত্যাগ করলেন। শরতে আবার আন্দোলনের জোয়ার এল। এদিকে যুদ্ধে জাপানের হাতে শেষ মার খেল রাশিয়া। জাতীয় রেল-সড়ক ধর্মঘট ক্রমে বৃহত্তর সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হলো। অক্টোবর ইশতেহারে নাগরিক অধিকার ও নির্বাচিত সংসদের প্রতিশ্রুতিও আর এ অবস্থাকে সামাল দিতে পারল না। ডিসেম্বরে মস্কোর রাস্তায়-রাস্তায় সশস্ত্র সন্ত্রাসের প্রস্তুতি। এই গোটা সময়কালে শিল্পীরা গণপ্রতিবাদ সংগঠিত করলেন, গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘটে অংশ নিলেন, আর কেউ কেউ ঠিক করলেন তাঁদের ছবিপত্রের কাজ বিপ্লবের দায়-প্রয়োজনে উৎসর্গ করবেন।

অজস্র ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হলো। ১৯০৫/৬-এর রাশিয়ায় বিপ্লবের কাজে শিল্পীদের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কসূত্র খুঁজে পাওয়ার এ এক নিশ্চিত প্রমাণ। অধিকাংশই সামান্য কয়েকপৃষ্ঠার, লিফলেটের চেয়ে কিছুটা উন্নত বলা যায়, কিছু কাগজের আর্থিক অবস্থা অবশ্য তুলনায় খারাপ ছিল না, চেহারায় জৌলুষও ছিল। শুধু প্রতিবাদপত্র

---

১. **Artist as Reporter,** নির্বাচিত অধ্যায়।

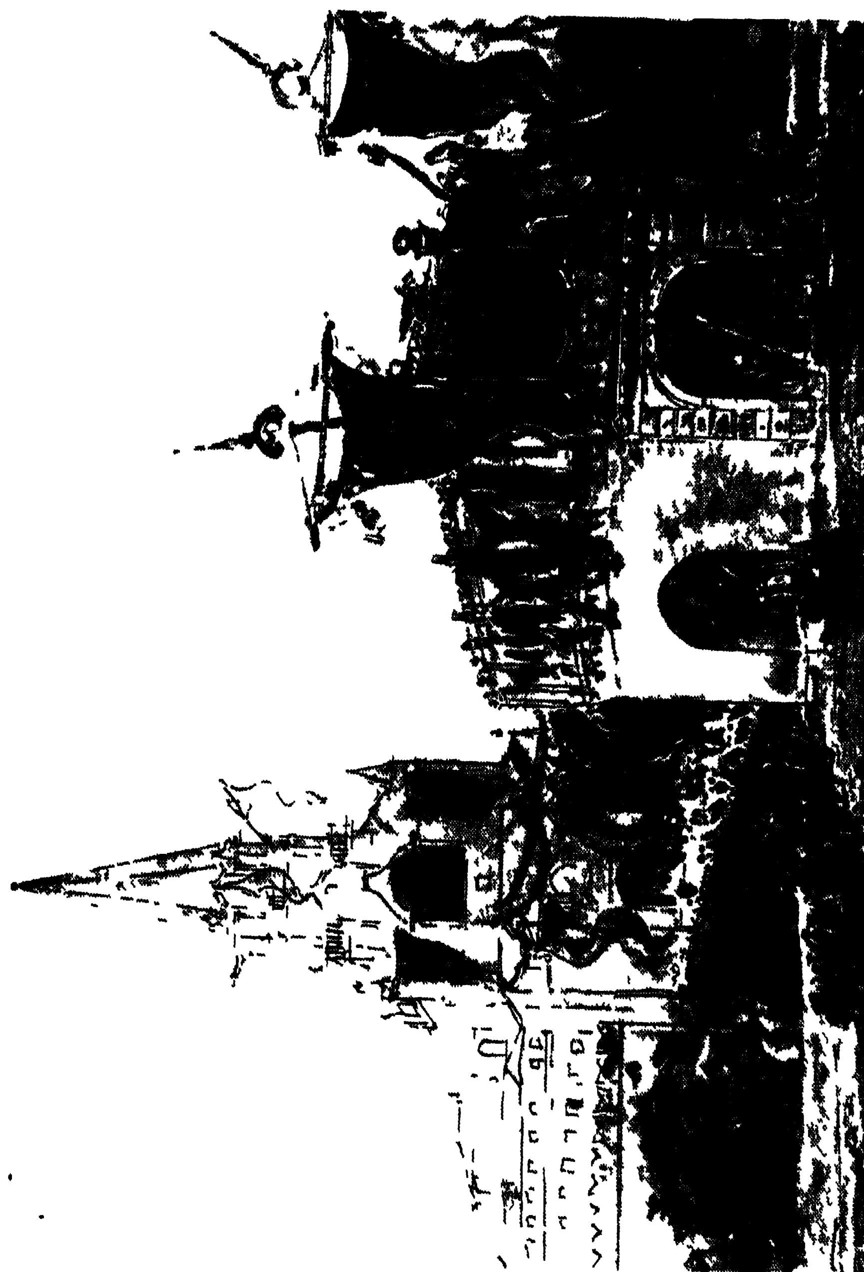
নয়, নিছক বিক্ষোভ প্রকাশই নয়। অথবা শুধু রাজনৈতিক চিত্রভাবনার স্তরেও সীমাবদ্ধ থাকেনি, গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে। নিছক বিরোধিতার লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি কখনো। বস্তুত আমজনতার কাছে বোধগম্য কার্যকরী ভাষায় ব্যবহারযোগ্যতার সীমায় পৌঁছনোর আগ্রহ কাজ করে গেছে সবসময়। তাদের উদ্বুদ্ধ, সক্রিয় করে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। প্রথমদিকের একটা কাগজ 'ঝিটেল', মানে দর্শক। প্রচ্ছদে চোখ বাঁধা ক্রন্দনশীলা এক নারী, হাতে ন্যায়ের তুলাদন্ড। আরেকটায় সমাবিষ্ট জনগণের হাতে একতার লাল পতাকা। অন্যত্র সরকারী মন্ত্রীবর্গ বা দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক যেন হাতের পুতুল, ইচ্ছেমতো নাচানো যায় তাদের। সংবিধানের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম যেন তাসের ঘর। 'সিগন্যাল' পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে একদল মন্ত্রী খেলাধুলোয় ব্যস্ত। 'মাসকি'তে তালিকাভুক্ত হতভাগ্যের দল—ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। চারিদিকে মৃত্যু আর নিপীড়নের লোনাস্বাদ। অন্যদিকে মুদ্রিত ছবিপত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান।

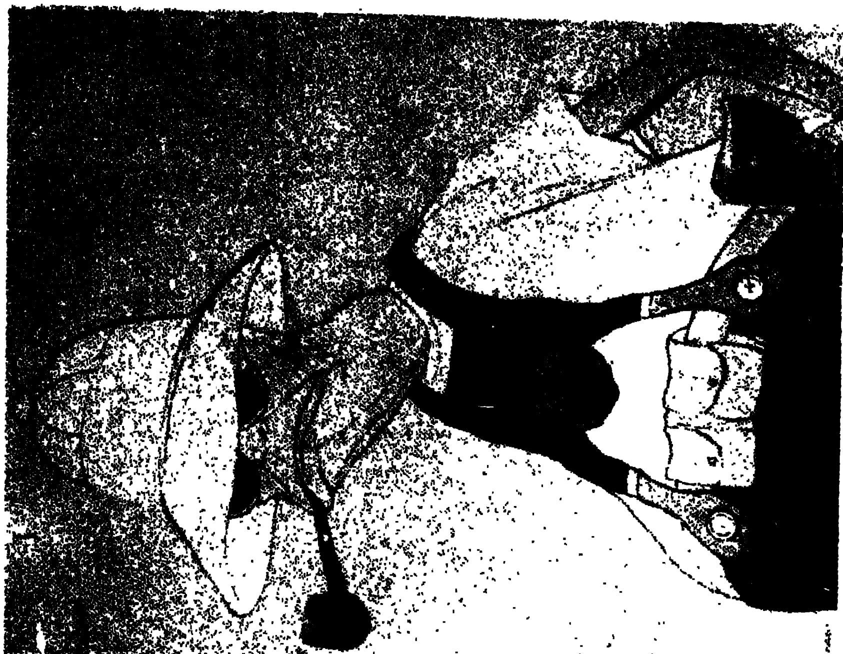
১৯০৫-এর শ্রেষ্ঠ কাজগুলি একদল তরুণ রুশশিল্পীর, মিউনিখে শিক্ষিত, 'সিমপ্লিসিজিমাসে'র শৈলী ও সাহসিকতার অনুরাগী তাঁরা। আরো অনেক কাগজই বেরোত, স্বল্পপরিচিত শিল্পীদের পরিচালনায়। অংশত বুর্জোয়া ঘরানায়। কিন্তু ব্যঙ্গচিত্রের প্রকৃতিবিন্যাস ঘটে চলেছিল তরুণ চিত্রকরদের হাতে, সিমপ্লিসিজিমাসের আদলে। 'সিম্পল' নিজেই জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় নিয়ে ক্ষোভে টিটকিরি দিয়েছে। অথবা আসন্ন বিপ্লবের মুখে দ্বিতীয় নিকোলাসের স্বৈরতন্ত্ররক্ষার হীন প্রচেষ্টায় ঠাট্টা করেছে। 'রক্তাক্ত রবিবারের' এক সপ্তাহের মধ্যেই গরঝোবিন নতুন কাগজ প্রকাশের আয়োজন করলেন। নাম ঠিক হলো 'ঝুপেল'। সেইসঙ্গে তাঁর শিল্পীবন্ধু-সমর্থকের দ্রুত একটা তালিকা তৈরি হলো। দোবুঝিনস্কি, বিলিবিন, ল্যানসের আর বরিস কুসতোদিয়েভ। বিভিন্ন কৌশলগত প্রশ্নে দলের অনেকগুলি বৈঠক হলো। কিন্তু সতর্ক কঠিন সেন্সর আর পয়সার অভাব ভেদ করে আশু সাফল্যের কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

দোবুঝিনস্কি ও তাঁর বন্ধুরা ১৯০৫-এ গর্কির সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সমর্থন আদায় হলো। গর্কি নিজেও তখন 'নোভাইয়াঝিন' বার করার পরিকল্পনা করছেন। আইনসিদ্ধ প্রথম বলশেভিক কাগজ। শ্রমিকদের জন্য সস্তায় বই প্রকাশের আয়োজনও চলছে পুরোদমে। জায়গাটা পিটার্সবুর্গের উত্তরে ফিনল্যান্ডের কুয়োকালা অঞ্চল। গর্কির গ্রীষ্মাবাস। ১৯০৫-এর ১০ই জুলাই। প্রায় জনা চল্লিশেক শিল্পীলেখকের সম্মিলিত উৎসাহে নতুন পত্রিকার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হলো। (এই বৈঠকে শুধু সাহিত্যিক আর শৈল্পিক বিষয় নিয়েই আলাপ-আলোচনা চলে।—পুলিসি রিপোর্ট) বৈঠকে নতুন পত্রিকা 'ঝুপেল'কে আর্থিক সাহায্য দিতে রাজি হন গর্কি। গরঝোবিন সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। অক্টোবর ইশতেহার অনুযায়ী সেন্সর উঠে গেল। তার ফলে, অধিকতর উদার কিছু পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হলো। গন্ডি ছাড়িয়ে যেতেও

তাদের সময় লাগেনি। অতএব ২রা ডিসেম্বর সেন্সর 'নোভাইয়াঝিনে'র প্রচার নিষিদ্ধ করল। 'ঝুপেলে'র প্রথম সংখ্যাটি আবার ঐদিনই বিতরিত হয়। বাকি সংখ্যা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। দ্বিতীয় নিকোলাসকে নিয়ে রগড় করে কবিতা ছিল তাতে। আর 'দুমাথাওয়ালা এক ঈগলে'র ব্যঙ্গচিত্র—। গরঝেবিন এঁকেছিলেন। সেরভের ছবি একদল কসাক—বিক্ষোভরত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর ছিল দোবুঝিনস্কির আঁকা 'অক্টোবর আইডল'।—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা পুতুল। এসবও যদি যথেষ্ট না মনে হয়, তার জন্য আরো উস্কানি ছিল—"ঝুপেলের' শুভানুধ্যায়ী, সমর্থকরা ইচ্ছে করলে, রাশিয়ান পুলিস প্রধানের মারফত, তাঁদের 'সির্মাপ্রিসিজিমাসে'র কমরেডদের অভিনন্দন পাঠাতে পারেন। সেন্সর এখনও তাকে রাশিয়ায় ঢোকার অনুমতি দেয়নি"।

প্রথম সংখ্যার পরিণতি এবং পুলিসি তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও, সেন্সর 'ঝুপেলের' দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের অনুমতি দিল। চব্বিশে ডিসেম্বর পত্রিকা বেরোল। তাতে দোবুঝিনস্কির ছবি 'প্যাসিফিকেশন'। রক্তসাগরে ভাসছে ক্রেমলিন। পরে 'সিমপ্লি-সিজিমাসে' ছবিটি পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রথম সংখ্যার মতো দ্বিতীয়টিও দ্রুত বাজেয়াপ্ত হলো। তৃতীয়টিও তাই। এবং সেটিই শেষ সংখ্যা। জানুয়ারি ১৯০৬-এ প্রকাশিত। তাতে বিলিবিনের আঁকা ছবি। রাজকীয় ঝলমলে সীমানার ভেতরে একটা গাধা। গরঝেবিন ও বিলিবিন গ্রেপ্তার হলেন। ক'মাস পরে এই একই দল আরও একটি পত্রিকা বার করলেন। 'নরকের চিঠি'। সাহায্য করলেন গর্কি। সেন্সরের ছাড়পত্রের জন্য ল্যানসুরেকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু আসল অধিকর্তা গরঝেবিন। বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত পত্রিকাটির চারটি সংখ্যা তাঁরা বার করতে পেরেছিলেন। ১৯০৬-এ বিপ্লবী স্রোতে ভাঁটা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গপত্রিকাগুলোও পিছু হটতে বাধ্য হলো। গ্রীষ্মের মধ্যেই বেশিরভাগ অদৃশ্য। ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেল রাজনৈতিক ব্যঙ্গের পথনির্দেশিকা, নতুন দৃষ্টান্ত। ১৯০৮-এর বসন্তে নতুন একটা রাশিয়ান ঠাট্টার কাগজ নজরে পড়ল। 'স্যাটিরিকন'। ১৯১৭-র বিপ্লব পর্যন্ত টিঁকে ছিল। ১৯০৫-এ স্বল্পায়ু পূর্বসূরীদের মতো, সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার আর বস্তাপচা সবকিছুর বিরুদ্ধেই তার লড়াই। গড়ে উঠছিল 'সিমপ্লিসিজিমাসের' আদলে। অতএব কিছুদিনের মধ্যেই 'স্যাটিরিকন'কে বলা হতে লাগল রাশিয়ার 'সিমপ্লি-সিজিমাস'। পরে এল 'বুদিলনিক', অ্যালার্ম ঘড়ি। প্রধান ব্যঙ্গচিত্রী ডি. মুর। আসলে ডি. এস. ওরলভ। দোবুঝিনস্কিও যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিলেন। ১৯০৫-র দুঃসাহসিক কুখ্যাত রাজনৈতিক ছবিপর্বের পর এই নতুন সাফল্য। ১৯০৫ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তাঁর কাজের প্রধান বিষয় মৃত্যু। তাঁর সৃজনশীল রাজনৈতিক কাজে ছিল মৃত্যুর অমানবিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রবল জেহাদ। বরং বিপ্লবের আহ্বান তত জোরালো নয়। 'অক্টোবর আইডিল' বা 'প্যাসিফিকেশনে' কোন মনুষ্য আকৃতি নেই।







একটা পুতুল পড়ে আছে রাস্তায় আর ক্রেমলিনের চারিদিকে জমে ওঠা রক্তের দাগ। মনে পড়িয়ে দেয় ১৯০৫-এ মানুষের জীবনের দাম কী দাঁড়িয়েছিল। লুনাচারাস্কি লিখেছেন, "দোবুঝিনস্কি আমাদের চিৎকার করে জানিয়ে গিয়েছেন, 'মানুষকে ভুলে যাওয়া হয়েছে'। তাঁর চিৎকার শুনে সত্যিই ভয়ে কেঁপে উঠতে হয়"। অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ, প্রচলিত সমাজের ব্যবস্থাবিচার নিয়ে কড়া মন্তব্যে শাণিত। কিন্তু তার সমাধানের কোন উপায়নির্দেশ নেই সেখানে।

নতুন মুদ্রণকৌশলের ব্যবহারে রাজনৈতিক ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে ১৯০৫-এর কাজ ১৯১৭-র ভূমিকাপর্ব হিসেবে ধরা যায়। ১৯০৫-এ শত্রু ছিল সম্রাটের শাসনতন্ত্র আর বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা। কিন্তু ১৯১৮-১৯২১-এ রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় শত্রু শ্বেতসৈন্য আর তাদের মিত্রপক্ষীয়রা। এবং তখন ক্রমক্ষীয়মান লোকবল আর সীমিত সামরিক সরবরাহ নিয়ে ১৯১৭-য় বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করলেন। তারপর টিঁকে থাকার কঠিন সংগ্রাম। অতএব উপলব্ধ গণ-উদ্দীপনা বিস্তারের যাবতীয় উপায়পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হলো। ১৯০৫-এর ব্যঙ্গপত্রিকাগুলি গণ-উদ্দীপনা জাগরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু কাগজের ঘাটতি, অথচ প্রয়োজনের দুর্দান্ত তাগিদ। অতএব প্রতিবাদ আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে বলশেভিকরা আরো বেশি করে দেয়াল-পোস্টারের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হলো। খবরের কাগজ বা পত্রিকার চেয়ে অন্তত সস্তা, একটা বাতিল কাগজের টুকরোই এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট। টেলিগ্রাফের সংকেতবার্তার মতো শিরোনাম, আকস্মিকভাবে পথচলতি শিক্ষিত দর্শক তা দেখে চমকে উঠত। কিন্তু অশিক্ষিত মানুষেব কাছে তার চাক্ষুষ অভিঘাত অন্যরকম। অশুভের বিরুদ্ধে শুভ কীভাবে জয়লাভ করবে বিজ্ঞাপিত সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। আবার বিপ্লবী শিল্পীরা এইসব পোস্টার পরিকল্পনা করে নতুন বাজারও খুঁজে পেলেন। তবে, ১৯০৫-এর পরেই পোস্টার, ব্যঙ্গচিত্রের মতো গ্র্যাফিক শিল্পকৃতি হিসেবে বিকশিত হতে পেরেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাঠখোদাই পদ্ধতি 'লুবক'। এই পদ্ধতিই সাধারণভাবে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের পোস্টারে ব্যবহার করা হতো। 'রোস্টা'র পোস্টার 'উইনডো'ও এভাবেই তৈরি।

### □ দিমিত্রি মুর ও বৈপ্লবিক পোস্টার

রাশিয়ায় বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের দুর্দান্ত পোস্টারশিল্পী দিমিত্রি স্তাকোভিচ ওরলভ। পোস্টারের নীচে সই করতেন 'ডি. মুর'। সেই নামেই পরিচিত। ১৯১৮-১৯২১-এর মধ্যে কয়েক ডজন শিল্পী কয়েক হাজার পোস্টার তৈরি করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডি. মুরের কাজ। ১৯২০-এর জুন মাসের এক বিকেলে তৈরি পোস্টারে লালবাহিনীর এক সৈন্য রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে, প্রেক্ষাপটে অনেক ফ্যাক্টরি। দর্শককে সরাসরি প্রশ্ন করছে সে, "তুমি কি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাহিনীতে নাম লিখিয়েছ?" একটা জাতি বিপর্যয়ের মুখে। বীর সৈনিক তার কর্তব্যে রত। এবং শিল্পী দর্শককে নিজের কাছেই

মানুষের নজরে পড়ে সহজে।

১৯২০ সাল। রাশিয়ায় পোস্টার জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। সেই বছরের উৎপাদন ১৭১৯টা পোস্টার। ১৯১৯-এর ৫ গুণ বেশি। দৃষ্টান্ত হিসেবে নাম করা যায় মুরের পোস্টার 'র‍্যাংগেল স্টিল লিভস!' জুনে আঁকা। বিতরণ ৬৫,০০০। ১৯২০-এর গ্রীষ্মে, বেশিরভাগ পোস্টার বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলের সাহিত্য সম্পাদনা বিভাগের উৎপাদন। এই সংস্থার হয়েই মুর তখন কাজ করছেন। ১৯২০-এ দক্ষিণ রাশিয়ায় এবং তারও পরবর্তী সময়ে মুরের পোস্টারের প্রচন্ড অভিঘাত। প্রায় ৪৭,৪৫৫টি পোস্টার নিঃশেষ হয়ে গেল। এবং শব্দার্থেই অন্তিম বিজয়ের দিনগুলোতে লালবাহিনীর দৃশ্যগ্রাহ্য প্রতীক হয়ে দাঁড়াল তা। ১৯২১-এর পর "নতুন অর্থনৈতিক নীতির" প্রচলন হলো। তার সুযোগে এক নাগরিক ভদ্রলোক নতুন পত্রিকা গড়ে তুলতে সাহায্য করলেন। প্রহসনের পত্রিকা। 'ক্রোকোডিল'। সেটা ১৯২২ সাল। ভদ্রলোক তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন। তাঁর সাহায্যে অপর পত্রিকাটি 'বেজবোঝনিক'—অধার্মিক। ধর্মবিরোধী পত্রিকাটি প্রথমটির এক বছর বাদে বেরোয়। এইসব পত্রিকায় এবং 'প্রাভদা' আর 'ইজভেস্তিয়ায়' নিজেকে তখন প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন মুর। সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবে। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত। শেষ জীবনে অন্যদের পোস্টার আর ছবি ছাপার কৌশল শিখিয়ে গেছেন। হায়ার আর্ট ওয়ার্কশপ ও মস্কো পলিগ্র্যাফি ইনস্টিটিউটে। শিক্ষাদানের কাজ চলেছিল ১৯৪৬-এ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।[১] □

# কুক্রিনিক্সি

# আমাদের যৌথদৃষ্টি : শিল্পজীবন

প্রায়ই আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে কী করে আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাজ করি।

আমরাও ঠাট্টা করে উত্তর দিই, 'তিনজন নই, আমরা চারজন—কুপ্রিয়ানোভ, ক্রিলোভ, সোকোলোভ এবং ··· কুক্রিনিক্সি। ও আমাদের দলটাকে ঠিক রাখে। ওকে ছাড়া আমরা কী করে কাজ করব ভাবতেই পারি না'।

কিন্তু ঠাট্টা ঠাট্টাই, যদি সত্যিসত্যি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাহলে আমাদের আঁকা 'দ্য এন্ড' ছবিটাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। ক্যানভাসে রং চড়াবার ইচ্ছে আমাদের প্রথম হয় ১৯৪৫-এ বার্লিনে, হিটলারের অন্ধকার মাটির তলায় আশ্রয়স্থল রাইখ্ চ্যান্সেলারিতে গিয়ে। হিটলার জীবিত কিনা তাই তখন অজানা ছিল। ১৯৪৭-এ প্রাভদা'য় একজন জার্মান অফিসারের নোট প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা

১. Robert C. Williams : Artists in Revolution.

ইচ্ছেটাকে পূরণ করার কাজে নামি।

আমাদের সব ছবির মতো এ কাজও তথ্যনির্ভর। শাস্তি ঘোষিত হওয়ার প্রথম কয়েকঘন্টার মধ্যেই আমরা তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিই।

এই অন্ধকার ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে হিটলার ও তার সঙ্গীরা নৈতিক ভয়ে ইঁদুরের মতো লুকিয়েছিল। পলায়ন? কিন্তু কোথায়? সোভিয়েত সৈন্যরা তখন বার্লিন আক্রমণ করেছে। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধকারীদের হিসেব নেওয়ার দিন এসে গেছে।

ছবিটির আকারপ্রকৃতি সম্বন্ধে তখনও আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। ডক্যুমেন্টারি ছবি ও অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে আমরা শুধু আসল বিষয় ঘিরে বিভিন্ন স্কেচ ও স্টাডি করছিলাম। হিটলারী পরিকল্পনার বিধ্বস্ত অবস্থা, নাৎসিবাদের ওপর সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং ন্যায় ও মানবতার জয়—এই সমস্ত বিষয় সহজভাবে প্রকাশ করতে পারে এমন সব ডিটেল বেছে নিতে হচ্ছিল। তারপর আমরা ভবিষ্যৎ ছবিটির বিভিন্ন স্কেচ প্রথমে পেনসিলে ও পরে কালো জলরঙে আঁকতে শুরু করলাম। যখন আমরা পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নিলাম তখন তার ওপর রঙের কাজ শুরু হলো। তিনজনেই কাজ শুরু করলাম, কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে। প্রত্যেকের নিজস্ব ভঙ্গিতে। কখনো আমাদের কেউ একজন স্কেচ শুরু করত, অন্যরাও বসে না থেকে নতুন করে রং বুলিয়ে কিংবা প্রয়োজনীয় কোনও অনুষঙ্গ যোগ করত। কখনো কিছু ডিটেল একেবারে বাদ পড়ত, আবার কখনো প্রচুর সময় আর উৎসাহে অর্জিত কোন কিছুকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছেঁটে ফেলতাম।

আমাদের প্রথম দিকের স্কেচগুলো হয় খুবই জমকালো হতো নয়তো বিষয়বাহুল্যে নুয়ে পড়ত। বিষয়ের যৌক্তিক গঠনও স্পষ্ট হতো না। আমরা কাজ করতে-করতে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে যতক্ষণ না পুরো দলটার পছন্দমতো কোন জায়গায় পেঁছচ্ছি, ততক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতাম।

শেষে যে স্কেচটি পছন্দ হতো তা ক্যানভাসে তুলে নিতাম। প্রতিটি ছোটখাটো ডিটেলকেও নিজের কথা স্পষ্ট বলতে হবে এবং দেখার সঙ্গেসঙ্গেই দর্শকের মননে তার কাজ শুরু করে দিতে হবে।

শিল্প অবিরাম, নিয়ত—যা ভীষণ জরুরি, শুধু তাই রাখা চলবে। যেমন, প্রথম স্কেচটিতে দরজায় সান্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছে বলে বাদ পড়ল। বার বার প্রতিটি ডিটেলকে পরীক্ষা করে দেখলাম। যখন দেখা গেল টেলিফোন রিসিভার পর্যন্ত সবই সন্তোষজনক হয়েছে, তখন তা ক্যানভাসে তুলে নিলাম।

কিন্তু ক্যানভাস তো কোন তথ্যচিত্র নয়। ছবির নিয়ন্ত্রক শিল্পী, তাঁর সৃজনশীলতা ও তাঁর দুটি হাত।

আমরা স্টুডিয়োতে ছবিটির পরিবেশ আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। স্টুডিয়োর জানলাগুলো ঢেকে দিলাম, দেওয়ালে ধূসর রং করে সোনালি ফ্রেমের ছবি টাঙিয়ে দিলাম। উপরন্তু অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করার জন্য একটা ছবি একটু কাত করে রাখলাম। টেবিলের ঢাকা একদিকে ঝুলে পড়েছে, তার ওপর কিছু বোতল ছড়ানো রয়েছে—শেষ ভোজের উচ্ছিষ্টাদি, মাটির ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজের টুকরো, টেলিফোনের রিসিভারটা অবহেলায় ঝুলছে—বিশাল দরজার ওপর হিটলারের ছায়া—এসবই আসল পরিবেশের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (যেন আমরা মূল দৃশ্য থেকেই ছবি আঁকছি) আসলে এসবই করা হয়েছিল নাৎসিবাদ খতম হওয়ার আগে সে ঘরে যে সতর্কতা ও হতাশার পরিবেশ ছিল, তা ঠিকমতো প্রকাশ করার জন্যে।

সব কিছু ঠিক আসলের মতো করার জন্যে আমরা যুদ্ধের সময়ে পাওয়া নাৎসি জেনারেল ও একটি এস. এস.-এর পোষাকও জোগাড় করছিলাম।

এদিকে আমাদের জন্যে বসবার মতো কেউ কখনোই ছিল না। কারণ আমরা ক্বচিৎ কখনো মডেল ব্যবহার করি। বরং যে দৃশ্য ক্যানভাস বা কাবর্টুনে আঁকতে চাই সেই দৃশ্যে নিজেরাই পাকা অভিনেতার মতো অভিনয় করি। তারপর চরিত্রটির সঠিক মুখভঙ্গি বা বিশিষ্ট শরীর ভঙ্গি খুঁজে পাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে চেষ্টা করতে থাকি।

এমনকি অভিনয় করার সময়েও আমরা প্রত্যেকে বিষয়টার ওপর নিজেদের সৃষ্টির ক্রিয়াকাজ চালিয়ে যাই। একেক সময়ে মনে হয় সবকিছু ঠিকঠাক হওয়া সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তখন আবার সবচেয়ে জীবনভিত্তিক সমাধানটা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হয়।

এবার আমরা প্ল্যাস্টিসীন দিয়ে হিটলারের মাথার একটা মডেল তৈরি করলাম। আর তারপর নিজেরা তার মতো মেক-আপ নিলাম। এরপর একজন পোজ দেয়, দুজনে আঁকে, তারপর জায়গা পরিবর্তন করে নিজেদের স্টাডিগুলোকে নিয়ে বিস্তৃত তুলনা, আলোচনা আর তর্কাতর্কি চলে। কারণ আমরা জানতাম যে আমরা শুধু উন্মত্ত ফ্যুরহেরের বাইবের চেহারাই আঁকতে চাই না, আসলে তার মানসিকতার একটা শরীর আঁকতে চাই।

কিছু লোকের ধারণার প্রতিকূলেই বলছি যে আমাদের মধ্যে কোন শ্রমবিভাগ নেই। যেমন, একজন হাত আঁকে, একজন মাথা, আরেকজন শরীর ও অন্যান্য অনুষঙ্গ আঁকায় বিশেষজ্ঞ, ব্যাপারটা এরকম নয়। আমাদের প্রত্যেককেই কখনো অভিনেতা, কখনো স্টেজ ম্যানেজার আর মুখ্যত দক্ষ পেন্টার ও গ্র্যাফিক শিল্পী হতে হয়েছে।

প্রথমে আমরা ক্যানভাসে গাঢ় রঙ দিলাম, একপাশের উজ্জ্বল আলো গোটা পরিবেশ থমথমে করে তুলল। এ কথা কখনোই ভোলা উচিৎ নয় যে ছবির মুখ্য ব্যাপার হলো তার বিষয়। তার ওপরই বাকি সমস্ত কিছু নির্ভর করে। বক্তব্য যে

সরাসরি সব সময়ে কাজ করবে তা নয়, কিন্তু সবসময় জোর আর মনোযোগ তার ওপরই ন্যস্ত রাখতে হবে।

সুতরাং এক্ষেত্রে হিটলারের ওপরই সমস্ত মনোযোগ এসে পড়তে বাধ্য। কাত করা ছবির কোনা, টেবিলের অবস্থা, দেওয়ালের পাইপ বা একপাশের চেয়ার সমস্ত কিছুই তার মানসিকতা নির্দেশ করে।

ছবির অন্যান্য শরীবে রঙ ও আলো গৌণ বিষয়। দৃশ্যত, তারা প্রধান চরিত্রের মধ্যে নাক গলাতে বা তার সঙ্গে কোন ঝঞ্ঝাট বাধাতে পারে না। কিছু ডিটেল, যেমন হাত, বক্তব্যের তীব্রতা এবং চরিত্রের মানসিকতাকে সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ করে। আমরা মনে করি যে কোন শরীরের হাত তার মুখের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রতিটি ফিগার আঁকার সময়ে আমরা হিটলারের সঙ্গে তার নিম্নতনদের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কারণ সেই সময়ে তারা তাদের 'মহান জাতি'র উদ্ধারের কথা আদৌ ভাবছিল না, বরং নিজেদের চামড়া বাঁচানোটাই তখন বেশি জরুরি। যদি তারা কোনরকমে এই মাটির তলার আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারত! কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। সোভিয়েত ট্যাঙ্কের শেলগুলো যেখানে সেখানে ফাটছে, সোভিয়েত গোলন্দাজরা মাথার ওপর তান্ডব চালাচ্ছে। ছবিটাতে অবশ্য সোভিয়েত বাহিনীর জয় সরাসরি দেখানো হয়নি, বরং সমস্ত কিছুর ওপরই তার ছাপ ছিল প্রচ্ছন্ন। কয়েক বছর আগে, প্রাভদা'র জন্যে গত তিরিশবছর ধরে আঁকা আমাদের রাজনৈতিক কারটুনগুলোর একটা প্রদর্শনী মস্কোর 'রাইটার্স ক্লাবে' হয়েছিল। সেখানে আমাদের আঁকা কিছু পোস্টার আর ব্যঙ্গচিত্রও ছিল। প্রদর্শিত সমস্ত ছবিই আমাদের দীর্ঘ বন্ধুত্ব আর যৌথ সৃজনশীলতার ফসল। সমস্ত সাফল্য-অসাফল্য জয়-পরাজয়কে ভাগ করে নিই বলে আমাদের কাজে দম্ভ একটা প্রশ্নাতীত প্রশ্ন।

এইভাবেই আমরা আমাদের দীর্ঘ যৌথ শিল্পীজীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছি। দীর্ঘ বন্ধুত্ব—সেই যখন মস্কোর হায়ার আর্ট এ্যান্ড টেকনিক্যাল স্কুলে প্রথম আমাদের আলাপ হয়। প্রথমে ছিলাম 'কুক্রি' (কুপ্রিয়ানোভ আর ক্রিলোভ)। তারপর এল নিক্স (এন. সোকোলভ)। হস্টেলের ছোট্ট ঘরে স্কুলের দেওয়ালপত্রিকা Arap-otdel-এর জন্যে বড় বড় রঙিন কারটুন আঁকা নিয়ে দিনের পর দিন তখন উত্তপ্ত আলোচনায় সময় কাটত।

তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের চল্লিশ বছরের যৌথ কাজকর্ম। প্রাভদা'র জন্য কারটুন আঁকাটাকেই আমরা সবচেয়ে সম্মান আর দায়িত্বের কাজ বলে মনে করি। প্রাভদা আমাদের অনেক শিখিয়েছে। খবরের কাগজে কাজ করতে গিয়ে আমরা সব সময়ই জটিল বিষয়গুলোকে সবচেয়ে সরল ভঙ্গিতে ও অত্যন্ত কম জায়গা ও সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছি।

লক্ষ লক্ষ লোককে আকৃষ্ট করার তাগিদে রাজনৈতিক কারটুন আমাদের প্রত্যেককে ভীষণ খাটিয়ে নেয়।

দৈনন্দিন জীবনের থেকে নিয়ে বা প্রচলিত গল্পকথার চরিত্রগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক কারটুন তৈরি করা যায়। এই রীতিকে আমরা 'দেয়ার ইজ নো হোয়্যার টু গো' ছবিতে প্রয়োগ করেছিলাম। ছবিটাতে ছিল মাছ আর একটা ছুঁচো জনতার হয়ে ক্রমবর্ধমান সামরিক সংগঠনকে ভয় পাচ্ছে। আসলে কারো কারো মাছ কিংবা ছুঁচোর চেয়েও কম বুদ্ধি, যার ফলে তারা অদূর-ভবিষ্যৎকেও ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারে না।

জীবজন্তুর স্বভাবচরিত্রের ভেতরেই জনচরিত্রের অনেক উপাদান আছে। দেশীয় প্রবাদ, সংক্ষিপ্ত উক্তি কিংবা শব্দের চাতুরীও আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করি।

'দি প্রেসিডেন্সিয়াল ফেস' নামে আমাদের যে ছবিটা আছে, তাতে আমরা মূল বিষয়ধারণার সঙ্গে শবাহারী কাক সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা আছে তা মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

'হিটলার এ্যান্ড গোয়েবল্‌স্‌—এ গ্রামোফোন'-কারটুনটায় আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের দু বছরে তাদের মানসিকতার কী পরিবর্তন হয়েছিল, তাকেই উপজীব্য করেছিলাম। 'ফ্রিডম টু আফ্রিকা'য় গতানুগতিকতার সঙ্গে সভ্যতার মিলন ঘটিয়েছি। ছবিটায় কালো মহাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে একটি কৃষ্ণাঙ্গ উপনিবেশবাদের প্রতীক জেলখানাকে ভাঙছে এবং দেওয়ালের ফুটিফাটা রূপবন্ধে আফ্রিকার স্বাধীন সীমারেখা দেখছে।

কোন বইয়ের ইলাস্ট্রেশন আঁকার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা রকমই। ছবি এঁকে লেখকের সমস্ত মননটুকুকে তুলে ধরতে বিষয়ের গভীরতম জায়গায় পেঁছনো দরকার। কারণ, তার ভঙ্গিটাকে বোঝা এব" লেখার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্যে হলো চরিত্রগুলোর অন্তর্জগত এবং সেই সময়কার ইতিহাস ও সামাজিকতা সম্বন্ধে পাঠককে ঠিকঠাক ওয়াকিবহাল করে তোলা এবং সেটা খুব সোজা কাজ নয়।

আমাদের যৌথজীবনের প্রথমদিন থেকেই আমরা একসঙ্গে থাকার সুবিধেগুলোকে বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা কি আর তর্ক করি না? নিশ্চয়ই করি, কিন্তু তা সবসময়েই গঠনমূলক বিতর্ক।

প্রতিদিন আমরা প্রত্যেকে স্টুডিয়োতে ঢুকে অন্যদের নিজের নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন ধারণা আর গতরাতে একা একা করা নকশা বা খসড়াগুলো দেখাই। কখনো আমরা সব থেকে ইন্টারেস্টিং স্কেচটা বেছে নিই, কখনো সবার স্কেচগুলোকে মিলিয়ে একজায়গায় এসে পেঁছই। ছবিগুলো বহুক্ষণ ধরেই হাতে-হাতে ঘোরে। কখনো একজন নতুন কিছু একটা যোগ করল, কখনো বা কেউ অপ্রয়োজনীয় কোন অংশ



বাদ দিল, এবং যতক্ষণ না ছবিটা পুরো দলকে সন্তুষ্ট করছে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

যখন কোন লোককে আমরা রাজনৈতিক কারটুনে আঁকি, তার আগে ডকুমেন্টারি ছবি দেখে তার বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্ন স্কেচ তৈরি করে বহুদিন ধরে স্টাডি করি। কিছুদিন ধরে দেখছি কিছু বিদেশী পত্রপত্রিকায়, কতকগুলো নীরস, তাৎপর্য-হীন স্কেচের নিচে সরস মন্তব্য দিয়ে সেগুলোকে কারটুন বলে চালানো হচ্ছে। এটা একেবারেই ভুল। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে কোন ধারালো কারটুনে যদি তাৎপর্যপূর্ণ প্রকরণের সঙ্গে গভীর বিষয়ের মিল হয়, তবেই সেটাকে শিল্প বলে দাবি করা যেতে পারে।

কারটুন গ্রাফিক শিল্পের একটি বিশেষ রীতি। যা জটিল ও স্বাধীন। কারণ তীব্র স্যাটায়ারই হোক বা হাল্কা হাসিই হোক দর্শকের মনে কারটুনেব কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমত কারটুনকে হতে হয় প্রকাশক্ষম, মূলত বস্তুভিত্তিক এবং কখনো কখনো অতিবক্তা। সুতরাং কারটুনিস্টকে বাস্তবজীবন থেকে তার বক্তব্য ছেঁকে নিতে হয়, নয়তো কল্পনায় কাজ সারতে গেলে তার প্রতিক্রিয়া তত তীব্র হবে না। কারটুনিস্টকে সবসময় সঙ্গে একটা ছোট্ট খাতা রাখতে হয়, যাতে সে তার চারপাশের সত্যিকারের মানুষের ছবি ও বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র চটপট এঁকে ফেলতে পারে। আমাদের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মজুত বাড়ানো অবিরাম একটা পদ্ধতি। একেকটা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো তার মুখ, অস্বাভাবিক হাঁটার ভঙ্গি, পোষাক, শারীরভঙ্গি ইত্যাদি, আর এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষই আলাদা। এইসব মালমশলা সংগ্রহ করে না রাখলে দরকারের সময় নির্ঘাৎ অসুবিধেয় পড়তে হয়। আঁকা ছাড়াও আমরা খাতায় বিভিন্ন ধরনের প্রবাদ, প্রবচন বা দু'তিন লাইন কবিতার ভাঁড়াব বানিয়েছি।

গর্কি বলেছিলেন যে আমাদের নির্দয়ভাবে মুখোশ ছিঁড়তে হবে, আর যা কিছু চালাকি করে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে, সেসব টেনেহিঁচড়ে আলোর সামনে নিয়ে আসতে হবে। গর্কি কারটুনকে যা কিছু সমাজবাদবিরোধী তাকেই গুঁড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে খুব দরকারি শিল্পমাধ্যম বলে মনে করতেন। একজন কারটুনিস্টের কাজ শক্ত হতে পারে, কিন্তু সম্মানের এবং একাজ তার শিল্প-চেষ্টায় সবচেয়ে সময়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। □ ১৯৬২

কুক্রিনিক্সি—মিখাইল কুপ্রিয়ানোভ পরফিরি ক্রিলোভ এবং নিকোলাই সোকোলোভের যৌথছদ্মনামে স্বাক্ষরিত প্রথম কাজটি প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এ 'কমসোমোলিয়া'র পৃষ্ঠায়—বিস্ময়কর যৌথজীবন ও শিল্পচর্চার সেই শুরু—দেশজুড়ে বৈপ্লবিক কর্ম-কান্ডের বিস্তারিত আবিষ্ক্রিয়া ও আশ্চর্য মিথষ্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটেই শুধু তার ব্যাখ্যা করা চলে। 'প্রোজেকটর' 'ক্রোকোডিল', 'রেডস্টার', অথবা 'প্রাভদা'র পৃষ্ঠায় তারপরে চল্লিশ বছর ধরে কুক্রিনিক্সির লোকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন ছিল রাজনৈতিক যাথার্থ্য ও আধুনিক শিল্পচিন্তার সংযোগসূত্রে। ১৯৬৫ সালে এই যৌথতা পুরস্কৃত হয় লেনিনের নামে।



ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি

ROSTA-কর্মীদের প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসে

# শিল্পপ্রচার সম্পর্কে প্রতিবেদন

কমরেডস্, আমি বক্তব্য সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি। যা কিনা সচরাচর কয়েক মাস জুড়ে স্থায়ী বিতর্কের বিষয়, আমাকে বলতে হবে মাত্র কুড়ি মিনিটে। খুবই কম সময়, কেননা বিষয়টা হচ্ছে শিল্প এবং রাজনৈতিক প্রচারকার্যে তার প্রয়োগবিধি সংক্রান্ত।

একটি আর্ট ফটোগ্রাফি দপ্তর গঠন করা হবে কিনা এই প্রসঙ্গটি, বাস্তবিক, দু'টি প্রশ্নকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথমটি সাধারণ এবং তাত্ত্বিক—শিল্প-প্রচার আদৌ দরকারি কিনা, এবং যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে কোন্ শৈল্পিক নীতির ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে যদি আমরা দুটোই মেনে নিই, যে শিল্প-প্রচার দরকারি এবং এর নীতিসমূহ পরিষ্কার হয়েছে, তবে প্রশ্ন কেন্দ্রীয় শিল্প মহাবিদ্যায়তন এতদিন কী করেছে এবং এই দায়িত্ব নিষ্পন্ন করতে প্রাদেশিক শিল্পদপ্তরেরই বা করণীয় কী?

শিল্প-ফটোগ্রাফি দপ্তরের প্রয়োজনীয় সমস্যাটা, কমরেড, এখন পরিষ্কার: শিল্পদপ্তর দরকার, এবং পোস্টার ইত্যাদির সাহায্যেই সবসময়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবার যখন একটা হিসাব দেওয়া হয়, পোস্টার ইত্যাদি ছাপার খরচের প্রশ্ন ওঠে:

তখনই কেউ না কেউ ঠিক জিগ্যেস করে বসে যে ছবির পেছনে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খরচ করা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কিনা এবং এ সমস্ত ছবির বদলে সংবাদপত্রে সাধারণ হরফে ছোট-বড় নিবন্ধ প্রকাশ করে এর তুলনায় ভালো ফল মিলতে পারে কিনা ?

আমাদের সংবাদপত্রের কর্মশৈলী সম্পর্কে এক চিঠিতে কমরেড লেনিন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের একটি সাংঘাতিক ত্রুটি হচ্ছে আঁটসাঁট, দৃঢ়বদ্ধ শৈলীর অভাব ; যা পাঁচ কি দশ মিনিটে বলা যেতে পারত সহজেই, সচরাচর খবরের কাগজে কয়েক কলম জুড়ে তা ছড়িয়ে থাকে।

ফলস্বরূপ, আমাদের ছাপাখানায় কর্মরত সমস্ত শক্তিকে সঠিক কোন এক উপায় উদ্ভাবনে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে, যাতে অঙ্গিকের ধাঁধায় ও দ্বিধায় আমাদের ধ্যানধারণা, বক্তব্যের আক্রমণক্ষমতা, বা আঘাত করার শক্তি দুর্বল না হয়ে পড়ে।

এটা পরিষ্কার কমরেড, যে যদি নিবন্ধ ইত্যাদিতে আমাদের শ্লোগানগুলির প্রভাব বরাবর বজায় রাখতে হয়, যদি সর্বদা মানুষের নজর কাড়তে হয়, যদি প্রত্যেক রাস্তার দেওয়াল এবং প্রত্যেক দোকানের জানলা থেকে কথা বলতে হয়, তবে যে কোন ভাবে এ সমস্তই এমন এক আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো জরুরি, যা নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী তাৎপর্যের চেয়ে বেশি। অবশ্যই একাজ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আরো মৌলিক রূপকল্প ব্যবহার করে প্রচারের জন্য আরো তীক্ষ্ণ কৌশল প্রয়োগ করা। কমরেডস্, শিল্পের প্রতি, পোস্টার তৈরির জন্য বিদ্রূপাত্মক ছবি ইত্যাদির প্রতি ROSTA-র[১] পক্ষপাতিত্বের এই হলো একমাত্র কারণ। একবার ROSTA-র কাছে শিল্পকর্মের অস্তিত্বের কারণ পরিষ্কার হলে প্রশ্ন ওঠে, কেমনভাবে আমরা এ কাজ করব ? কোন্ নীতিসমূহের ভিত্তিতে আমাদের কাজ করা উচিৎ ? বিপ্লবের শুরুতে শিল্পকর্ম ছিল সরলতম প্রকৃতির : পূর্ববর্তী শৈল্পিক অবদানগুলিকে সেক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছিল এবং নীচে শুধু একটি নতুন, বিপ্লবী শিরোনাম যোগ করেই কর্তব্যের ইতি ঘটেছিল। নজিরস্বরূপ, পাস্তের-নাক-এর পোস্টারটির কথাই বলা যায়, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, যেখানে একজন সৈনিক তাঁর রাইফেলের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন—তাঁর কাঁধের ফলকগুলি ভাগ্যক্রমে চোখে পড়ছে না—এবং সেখানে শিরোনাম 'স্বাধীনতার ঋণে দান করুন'। বিপ্লবের পরে সেই একই পোস্টার পুনরাবির্ভূত হলো ; পাঠ্যাংশ বদলে গেছে শুধু : 'মেহনতী বোনেরা, লাল ফৌজকে সাহায্য করুন'।

অর্থাৎ কাজের শুরুতেই পাঠগত পরিবর্তন সাপেক্ষে শুধু আগের অর্জিত শৈল্পিক দক্ষতা ও প্রচারশৈলীর হুবহু অনুসরণ এবং কমরেডস্, এটাই সবচেয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা। যদি আমাদের কাজ আগের সেই পুরনো নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে, তা-হলে তা কখনই নতুন দর্শকের নজর কাড়বে না, অথচ এসব তাদের জন্যই তৈরি হচ্ছে।

---

১. ROSTA—রাশিয়ান টেলিগ্রাফ এজেন্সির সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯১৯-র হেমন্ত থেকে মায়াকোভস্কির নেতৃত্বে এই সংগঠনে বহু লেখকশিল্পী জড়ো হন। পরে নাম পাল্টে রাখা হয় 'TASS'।

যদি কমরেডস্, আমরা প্নরনো পোস্টারগ্নলির দিকে একটু খ্নটিয়ে দেখি, তো দেখব সেগ্নলো সচরাচর অফিসঘরে টাঙানোর জন্যেই ব্যবহার করা চলে, যেখানে আপনি দিনের অধিকাংশ সময় আটকে থাকেন, এবং তাই সেসমস্ত পোস্টারে কী লেখা আছে না আছে তা আপনি সারাদিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খ্নটিয়ে দেখতে পারেন।

আমাদের বিপ্লবী প্রচারকর্মের নীতি অবশ্যই সম্প্নর্ণ অন্যরকম হবে। আমাদের প্রথম ও মৌলিক কর্মভার হলো নজর কাড়া, ব্যস্ত জনতাকে ছলেবলে কৌশলে, তাদের পছন্দ হোক চাই না হোক, এক ম্নহ্নর্ত আমাদের পোস্টারের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য করা, হ্যাঁ আমরা তাদের সেখানে দাঁড় করাতে চাই। আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশ, যেখানে নগরজীবনও যথোচিত উন্নত, আজকের এই সাধারণ ছাপা পোস্টারকে বহ্ন আগেই বাতিল করেছে, অথবা সে জায়গায় সম্প্নর্ণ ভিন্ন কোন টেকনিক প্রয়োগ করেছে। নজিরস্বর্নপ, কমরেড কারজেনেৎসেভ, মনে হয় আমাদের বলেছিলেন যে শহরের রাস্তা দিয়ে একটা বোতল গড়িয়ে নামছিল, আর তার থেকে ক্রমাগত কালি বেরোচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই, যে কারোর কৌত্নহল হবে, দাঁড়িয়ে পড়বে সে, আচ্ছা, কালি বের্নচ্ছে কেন, আশ্চর্য!

কমরেডস্ এটাই আসল জিনিস যা আমাদের করতে হবে। আমরা বিষয়গ্নলিকে অবশ্যই সেভাবে সাজাব, যাতে শ্লোগান তার তীক্ষ্ন ধার না হারায়। □

১৯ মে ১৯২০

# শুনুন, মায়াকোভস্কি বলছেন

এগ্নলি নিছক কবিতা নয়।

নিছক ছাপা কার্নকাজ নয়, জ্যান্ত ছবি।

রঙের ছোপ আর শ্লোগানের ধ্বনিতে অভিব্যক্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামের খ্নব কঠিন তিনটি বছরের দলিল।

এসবই হচ্ছে এক বিশাল প্রচার প্রকল্পে আমার অংশগ্রহণ।

ROSTA-র বিদ্র্নপের জান্‌লা, অবিরাম ছবির প্রদর্শনী।

গীতিকবিদের মনে করতে দিন সেই ছোট ছোট সাদাসিধে গানের কথা, তাঁরা যার প্রেমে পড়েছিলেন। আমরা সেই পংক্তিগ্নলো স্মরণ করে আনন্দিত, ওরিওলের কাছ থেকে পালিয়ে দেনিকিন যার শরণ নিয়েছিলেন।

গ্নহয্নদ্ধ ঘটে যাওয়ার পরে 'কন্সট্রাক্টিভিস্ট' শৈলীতে তার উচ্চমাত্রার রোমান্টিক বর্ণনা যাঁদের পছন্দ তাঁরা য্নদ্ধের বছরগ্নলোর প্রকৃত তথ্য থেকে, সেই সময়ের প্রকৃত সাহিত্য থেকে শিক্ষা নিতে পারেননি। কিছ্ন নব্য র্নশীয় প্রাচীন গ্রীক আছেন যাঁরা সব কিছ্নতে চিনি মেশান ও নান্দনিক করে তোলেন।

যেমন ভি. পোলোনস্কি, যিনি বিপ্লবী পোস্টার সম্পর্কে এক বইতে পোলিশ প্যানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়কার একটি ROSTA প্রচার-বিদ্রূপের বিষয়ে বলতে গেছেন। যার মূল বক্তব্য ছিল :

সুতরাং তাদের সবাইকে খাওয়াও, / সেই লাল যোদ্ধাদের, / তর্ক না করে / তাদের রুটি দাও। / নাহলে সকলেই / দরাদরি করে হারাবে তাদের মাথা / এবং সমস্ত রুটি।

অর্থাৎ তিনি একটি পুরো লেখাকে মাঝখান থেকে টুকরো করেছেন এবং বলেছেন 'খন্ডাংশ'। ব্যাপারটা কেমন ?

যেন এক সাহিত্যবিষয়ক ঐতিহাসিক 'খন্ডাংশ' শিরোনাম দিয়ে "এক হও" কথাটিকে উদ্ধৃত করেছেন যাতে সবাই অনুমান করে উৎফুল্ল হতে পারে যে এটি "দুনিয়ার মজদুর, এক হও" শ্লোগানের 'খন্ডাংশ'। পোলোনস্কি শুধু পোস্টার আক্রমণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বোঝার ও রীতিবদ্ধ করার কোন চেষ্টা করেননি তাই নয়, তিনি স্রেফ উৎসাহের বশে প্রচারপাঠ্যের ওপর ভাসাভাসা আলোচনা করে দায় সেরেছেন।

এখন ROSTA-র দশম বার্ষিকীতে, তেত্রিয়াকফ্ গ্যালারি, সমস্ত সংবাদপত্র, অন্যান্য পত্রপত্রিকা, কৌতূহলে ও পরমানন্দে বাছাই করছে, একসঙ্গে আঠা লাগাচ্ছে আর খুঁটিয়ে পড়ছে সেই সমস্ত হাতে ছাপা কাগজের ছাঁট, আজকের কয়েক হাজার বিদ্রূপাত্মক পত্রিকার যা পথপ্রদর্শক। বিদ্রূপের প্রথম প্রদর্শ-জানালাগুলির জন্য একটা করে আলাদা কাজ করা হয়েছিল এবং শোকেসে ও দোকানের খালি জানালায় টাঙানোর পর তৎক্ষণাৎ পথচলতি মানুষের নজর কেড়েছিল ; পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রচারস্থানের জানালায় বিতরণের উদ্দেশ্যে একটা কাজ একশো বা দেড়শো কপি পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। সব মিলিয়ে শুধু মস্কোর জন্যেই প্রায় নশো পোস্টার তৈরি হয়েছিল। লেনিনগ্রাদ, বাকু ও সারাতোভে ROSTA-র কাজ শুরু হয় পরে।

আমাদের বিষয়ের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল :

কমিন্টার্নের পক্ষে বিক্ষোভ এবং বুভুক্ষুদের জন্যে ব্যাঙের ছাতা যোগাড়, র‍্যাঙ্গেল এবং টাইফাস উকুন-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে শুরু করে পুরনো সংবাদপত্র সংরক্ষণ ও বৈদ্যুতিকীকরণের বিষয়েও পোস্টার লেখা হয়েছে। আমি বিপ্লবের মিউজিয়াম, তেত্রিয়াকফ গ্যালারি এবং যে সমস্ত ROSTA-কর্মী একাজে অংশ নিয়েছিলেন তাদের নিজস্ব সংগ্রহ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, সব মিলিয়ে মোটে শতখানেকের কিছু বেশি পোস্টার যথাযথ অবস্থায় টিঁকে আছে। আমরা ইতিহাস ও যশের কথা চিন্তা না করে কাজ করেছি। গতকালের পোস্টার নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হয়েছে। বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই সুতরাং পোস্টারগুলি আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে এবং ছাপতে হবে। সৌভাগ্যবশত এম. চেরেমনিখ-এর কাছে একটা পুরনো এ্যালবাম হঠাৎ আবিষ্কৃত

হওয়ার হারিয়ে যাওয়া পাঠ ও আরও কয়েকটি ফটোগ্রাফের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ROSTA-র জন্যে আমার কাজ শুরু হয়েছিল এইভাবে : মোজেলপ্রমের কাছে কুজনেৎস্কি মোস্ত এবং পেত্রোভ্‌কা স্ট্রীটের কোণে ঝোলানো অবস্থায় প্রথম দু'মিটার লম্বা পোস্টারটি দেখে আমি তক্ষুনি ROSTA-র ম্যানেজার কমরেড কারজেনেৎসেভ-কাছে আবেদন করি। তিনি আমায় এক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী এম. এম. চেরেমনিখ-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা দ্বিতীয় জানলায় কাজ শুরু করি একসঙ্গে। তারপর আসেন মালয়ুতিন, শিল্পী লাভিন্‌স্কি, লেভিন, ব্রিক, মুর, নুরেনবার্গ এবং অন্যরা ; তারপর স্টেনসিল খোদাইকার শিমান, মিখাইলোভ, কুশনার এবং আরো অনেকে, এবং সেই সঙ্গে ফটো-গ্রাফার নিকিতিন। প্রথমে কমরেড গ্রামেন শ্লোগান বা পাঠ্যাংশ তৈরি করতেন, কিন্তু শেষে প্রায় সমস্ত বিষয় ও পাঠ ছিল আমার ; ও. ব্রিক, আর. রাইত এবং ভোলপিনও এক্ষেত্রে কাজ করেছেন। আর দুটি ক্ষেত্রে আমি স্পষ্টভাবে পাঠের লেখাগুলো মনে করতে পারিনি।

এখন দেখছি যে অন্তত শ'চারেক কাজ আমার নিজের করা। একটা কাজ মানে একটা বিদ্রুপ-জানলায় এককালীন চার থেকে বারোটি বিভিন্ন পোস্টারের সমন্বয় ; এর অর্থ মোটামুটি হিসেবে অন্তত তিন হাজার দু'শো পোস্টার আমি একাই করেছি।

এত কাজ কী করে করেছিলাম ?

আমি স্পষ্টই মনে করতে পারি যে তখন কোন কুঁড়েমির অবকাশ ছিল না। আমরা নিদারুণ তাপহীন, কনকনে ঠান্ডা ROSTA স্টুডিয়োয় কাজ করেছি (শেষের দিকে আমাদের ধোঁয়া-ওগরানো, পেটমোটা একটা লোহার স্টোভ দেওয়া হয়েছিল, যার ধোঁয়ায় চোখ উপ্‌চে জল আসে)।

বাড়ি ফিরে আমি আবার আঁকতে বসতাম, এবং বিশেষ তাড়া থাকলে বিশ্রামের সময় মাথার নিচে বালিশের বদলে থাকত কাঠের গুঁড়ি, কেননা জানতাম তার ওপরে বেশিক্ষণ ঘুমনো যাবে না। ঠিক তাই হতো, যতটা ঘুম দরকার ততটা ঘুমোলেই আমি জেগে উঠতাম এবং আবার কাজে লেগে যেতাম।

ক্রমে আমাদের হাত এত কুশলী হয়ে গিয়েছিল যে আমরা একজন শ্রমিকের আপাদ-মস্তক জটিল স্কেচ চোখ বুজে একটিমাত্র, একটানা রেখায় আঁকতে পারতাম।

সুখারেভ্‌কা ঘড়ির ধারে গিয়ে, যে-ঘড়িটা আমরা জানলা থেকে দেখতে পেতাম, তিনজন কাগজের কাছে দৌড়ে যেতাম, ও এমন চকিত গতিতে স্কেচ করার প্রতি-যোগিতায় মেতে উঠতাম যা জন রীড, হোলিট্‌সৃখার ও অন্যান্য কমরেড ও পর্যটক, যাঁরা এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন ও আমাদের দেখতে আসতেন তাঁদের স্তম্ভিত করেছিল। আমাদের কাছে কাম্য ছিল যন্ত্রের মতো গতিতে কাজ : ফ্রন্টে বিজয়লাভের পর চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যেই বাইরে একটা রঙিন পোস্টার ঝোলানো হয়ে

যেত। 'রঙিন' অবশ্য এক্ষেত্রে অতিবিবৃতি ; কদাচিৎ আমরা রঙ পেতাম, বদলে যেটুকু যা পাওয়া যেত তাই ব্যবহার করতাম, কোনরকমে সেসব আমাদের থুতু দিয়ে মেশানোর সময় থাকত হাতে। কাজের ধরনই কাজের তৎপরতা দাবি করত, বিপদ অথবা বিজয় সম্পর্কে খবরের চটপট প্রদর্শনীর ওপর নতুন ফৌজি বাহিনীর সংখ্যা নির্ভর করত। সাধারণ প্রচারকার্যের মধ্যে ফ্রন্টে নতুন নিয়োগের জন্য প্রচার-অভিযানও এর অংশ ছিল।

টেলিগ্রাফ বা মেশিনগানের মতো ক্ষিপ্রতা না থাকলে এই কাজ সম্ভব হতো না। কিন্তু আমরা শুধু যে আমাদের কর্মক্ষমতার পুরো সীমা ও ঐকান্তিকতা পর্যন্ত খেটেছি তাই নয়, আমরা রুচির বিপ্লব ঘটিয়েছি এবং পোস্টারের, সামগ্রিকভাবে প্রচারকর্মের, শিল্পের মানকে উন্নত করেছি। 'বিপ্লবী শৈলী' বলে কোন কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে আমাদের ROSTA-র জান্‌লায় করা ছবিগুলি।

এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে এ সমস্ত পোস্টারের অনেকগুলিই, মাত্র একদিনের জন্যে যা স্থায়ী হবার কথা, তেত্রিয়াকফ গ্যালারি এবং বার্লিন ও প্যারিতে প্রদর্শনীর পর দশবছর বাদে সত্যিকারের তথাকথিত শিল্পসামগ্রী হয়ে উঠেছে।

এ বইতে সেই সব সামগ্রীর ভগ্নাংশই মাত্র উদ্ধৃত করছি, যেটুকু সংরক্ষণ করা গেছে। দু'টি ছাড়া, আগেই উল্লেখ করেছি, এখানে সম্পূর্ণ দেওয়া রইল—'বর্ণমালা' এবং 'বুবলিক্‌স্‌'-এর পাঠ্যাংশ—বাদবাকি কোনকিছুই আগে প্রকাশিত হয়নি এবং এই বইয়ে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হচ্ছে না।

আমার কাছে এ বই মানে এক বিরাট সাহিত্যিক তাৎপর্য, এমন এক কর্মকান্ড যা আমাদের ভাষার কাব্যিক ভূষি ছাড়িয়ে দিয়েছে এবং এমন বিষয়ের উপর রচিত যেখানে বাগাড়ম্বরের সুযোগ নেই। চিরায়ত রচনা নয়, বরং সেই সময়ের জন্য নির্দেশিকা গ্রন্থ যখন আবার চিৎকার করার দরকার হবে :

তোমরা কখনোই খালি হাতে / আমাদের পাবে না! / দেনিকিনের দিন / ফুরিয়ে এসেছে। / এক লাল সজারু, / লাল ফৌজ দাঁড়িয়ে / আমাদের / চিরকালীন রক্ষক যেন। / তোমরা কখনোই খালি হাতে / আমাদের পাবে না! / কোলচাকের দিন ফুরিয়ে এসেছে। / এক লাল সজারু, / লাল ফৌজ দাঁড়িয়ে যেন / আমাদের / শ্রেষ্ঠ বন্ধু / প্রাণের রক্ষক। / তোমরা কখনোই খালি হাতে / আমাদের পাবে না! / কমরেড্‌স, / মহান লক্ষ্যে ধরো হাতিয়ার / এক লাল সজারু, / লাল ফৌজ দাঁড়িয়ে যেন / ঐক্যের লোহ-দৃঢ় শৌর্য।[১] □

---

১. Ominous Laughter নামক কবিতা / পোস্টার সংকলনের মুখবন্ধ।

# শিল্পের গণতন্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ফতোয়া

**সাহিত্য ও মুক্ত শিল্পকর্মের বিজ্ঞাপন**

**কমরেড ও নাগরিকবৃন্দ !**

আমরা, তারুণ্যের বিপ্লবী শিল্পচেতনাসম্পন্ন রুশী ফিউচারিজমের নেতারা, ঘোষণা করছি :

১. এখন থেকে, জারতন্ত্রের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে সঙ্গে, শিল্প আর মানবচিন্তার এই সব গুদামে জমা থাকবে না—রাজপ্রাসাদ, গ্যালারি, সালঁ, গ্রন্থাগার বা রঙ্গমঞ্চে।

২. সংস্কৃতির সামনে সকলের সমানাধিকারের নামে, সৃষ্টিশীল ব্যক্তির স্বাধীন উচ্চারণ এখন থেকে রাস্তার মোড়ে, বাড়ির দেওয়ালে, পাঁচিলে, ছাদে, আমাদের গ্রাম ও শহরের পথে পথে, গাড়ির পেছনে, মালটানা গাড়ি, ট্রামে ও আমাদের পোষাকে চিত্রিত হতে থাকবে।

৩. রাস্তায় আর মোড়ে, বাড়ি থেকে বাড়িতে আন্দোলিত ছবি ( আর রঙ ) বিপুল বর্ণচ্ছটায় পথিকের চোখ (অথবা রুচির) শুদ্ধতা আনুক, তাকে আনন্দ দিক।

লেখক ও শিল্পীদের অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে প্রতিভার রঙ ও তুলি ব্যবহার করতে হবে যাতে প্রতিটি পথনির্দেশিকাসহ শহরের ললাট ও বুক, স্টেশন ও নিয়ত ধাবমান রেলওয়ে ওয়াগনগুলি আলোকিত হয়।

এখন থেকে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে—সে, কোন নাগরিক, প্রতিমুহূর্তে তাঁর মহৎ সহজীবীদের চিন্তায় তৃপ্ত পাক; আজকের আনন্দমুখরতা ও কুসুমিত দীপ্তি অনুধ্যান করুক আর যেখানেই সে থাকুক, গুণী রচয়িতাদের কড়ি ও কোমলের গান শুনুক।

রাস্তাগুলি পরিণত হোক সর্বসাধারণের শিল্পিত উৎসবে।

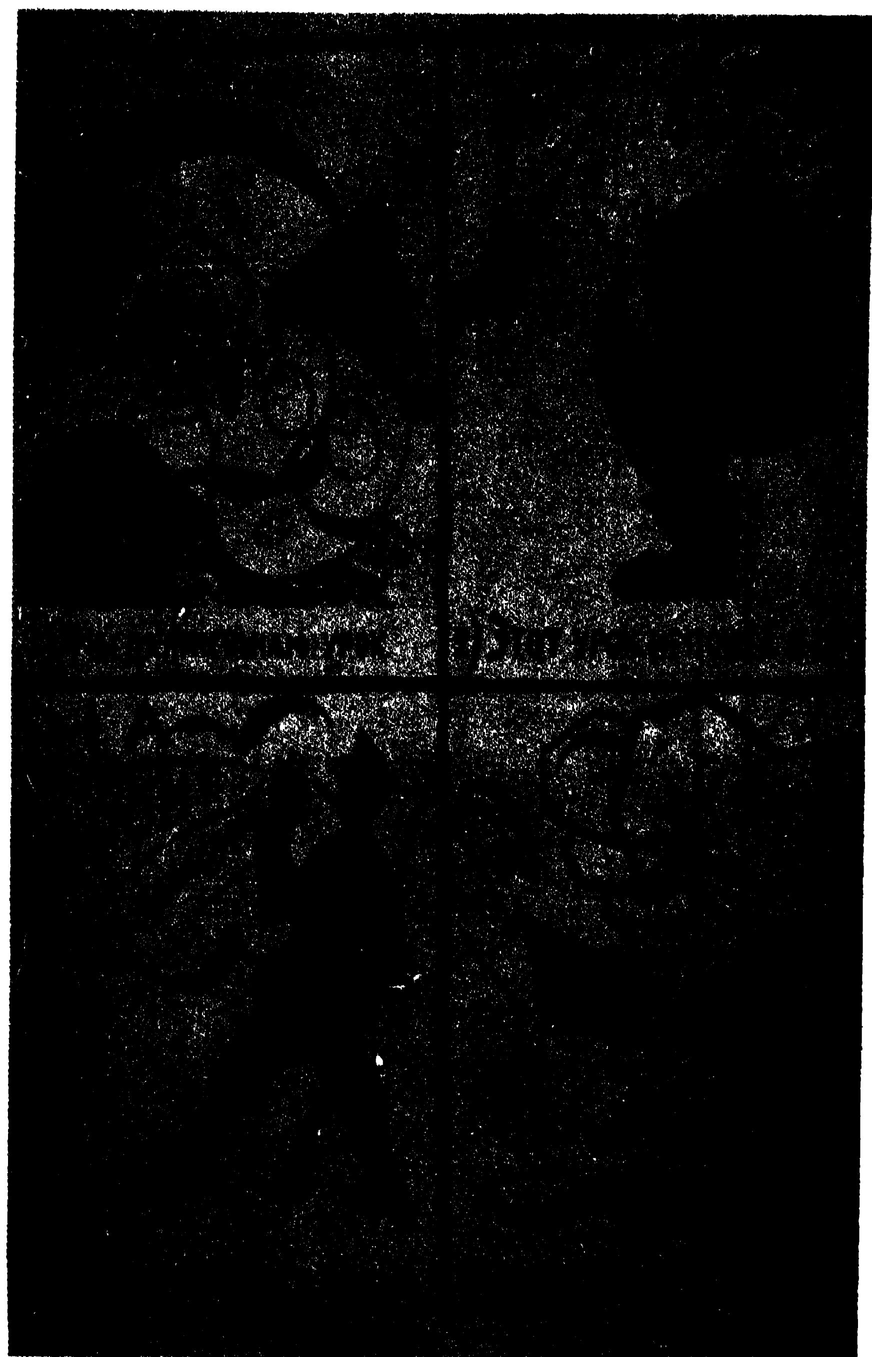
১৮ই মার্চ ১৯১৮

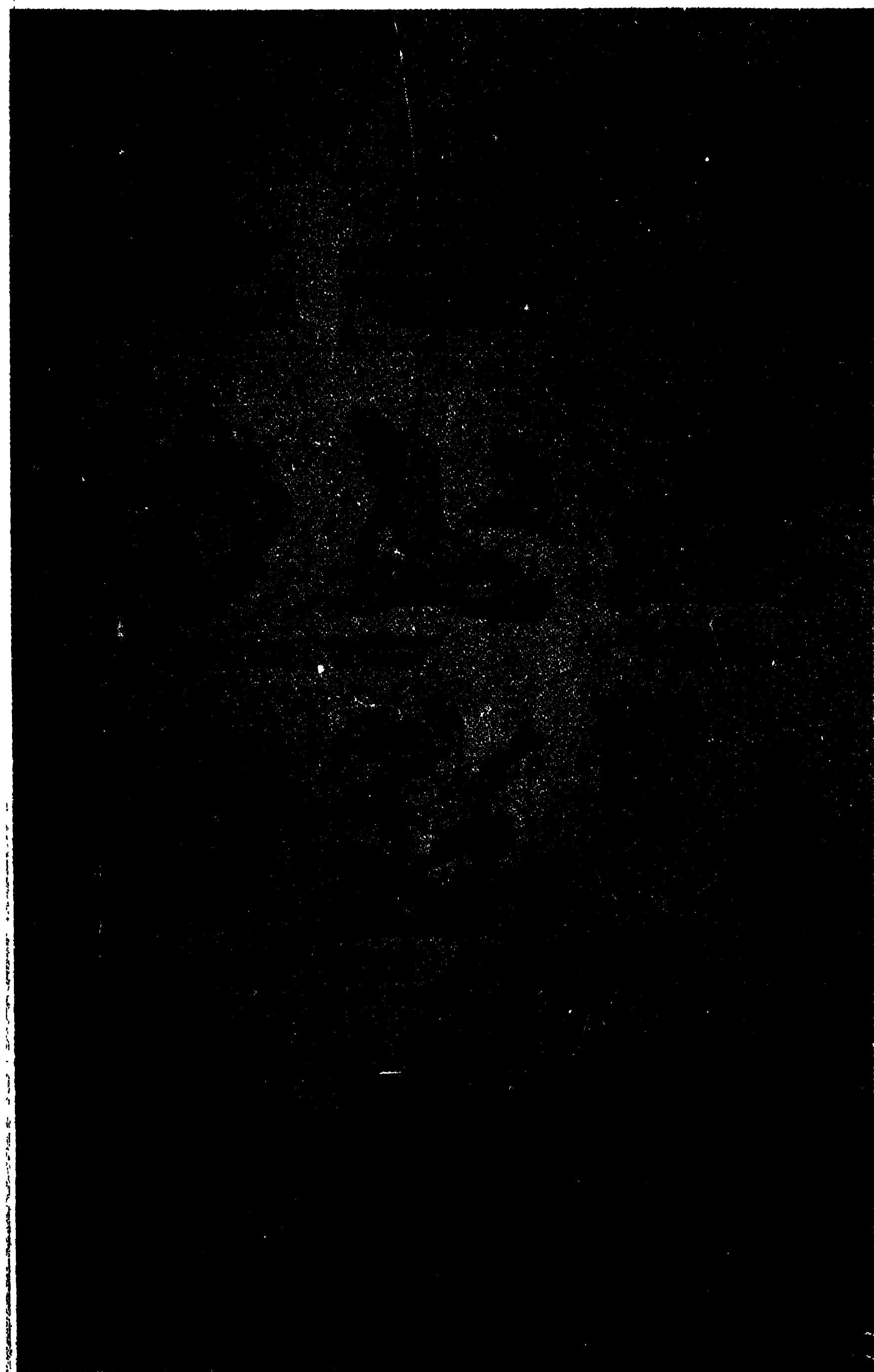
**স্বাক্ষর / ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, ভাসিলি কামেনস্কি, ডেভিড বারলিউক**

# মায়াকোভস্কির আপন খবর

বারলিউক বলত : মায়াকোভস্কির স্মৃতি যেন পলতাভার রাস্তা, প্রত্যেকের জুতোই সেখানে আটকে যায়। কিন্তু আশ্চর্য, মুখ আর দিনতারিখ আমার কিছুতেই মনে থাকে না। জন্ম হয়েছিল জুলাইয়ের ৭, ১৮৯৪ (৯৩-ও হতে পারে)। হালসাকিন বাগদাদির গাঁ, জর্জিয়া।

প্রথম যে-বাড়িটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে : দোতলা, নিচের তলায় মদের কারখানা, বছরে একবার গাড়িবোঝাই আঙুর আসত। এসবই বাগদাদির কাছে,





প্রাচীন দুর্গের সীমানায়, চারদিকে উঁচু পাঁচিল, কোণে-কোণে কামান সাজানো। পাঁচিলের বাইরে দীর্ঘ খাড়ি, তা পেরিয়ে জঙ্গল আর শিয়ালের দল। গাছের মাথা ছাড়িয়ে পাহাড়। আমিও বড় হচ্ছি, সবচেয়ে উঁচুটায় চড়তে শিখেছি। উত্তরের দিকে পাহাড় নেমে গেছে, ঐখানে একটা ফাঁক, সেখানেই রাশিয়া, মনে মনে ভাবতাম। রোমান্টিকতার সেই শুরু।

সাত বছর থেকেই বাবার[১] সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে জঙ্গল পরিদর্শনে গিয়েছি। একদিন রাত্রিবেলা, পাহাড়ি রাস্তায় কুয়াশা ছেয়ে আছে। হঠাৎ কুয়াশা সরে যেতে নিচে দেখি আকাশের চেয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো। পুরো জালি ব্যাপার। সেই থেকে প্রকৃতির প্রতি সমস্ত উৎসাহ হারিয়েছি। একটু অদ্ভুত, তাই না?

পড়তে শেখাটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার। সৌভাগ্যত দ্বিতীয় বইটাই ছিল ডন কুইক্সোট। ঢাল-তলোয়ার বানিয়ে চারদিকে খুঁচিয়ে বেড়ালাম কিছুদিন।

বাগদাদি থেকে কুতাইশি এলাম, স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় এক পুরোহিত প্রশ্ন করেছিল, 'ওকো' মানে কী? জর্জিয়ানে তার মানে তিন পাউন্ড। পুরনো চার্চ-স্লাভনিক ভাষায় তার মানে নাকি চোখ। সেই থেকে যা কিছু পুরনো, যা কিছুই চার্চসংক্রান্ত, যা কিছু স্লাভনিক—গভীরভাবে ঘেন্না করেছি। আমার নাস্তিকতা, আন্তর্জাতিকতাবোধ বা আমার ফিউচারিজম—সম্ভবত এই তার উৎস।

বাড়িতে অনেক কাগজ আসত, সব পড়তাম। টানটান হয়ে থাকতাম উত্তেজনায়। যুদ্ধজাহাজের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড তখন প্রিয়—বড় করে আঁকতাম। সেই 'ঘোষণা' শব্দটা প্রথম শুনি। জর্জিয়ানরা ঘোষণাপত্র টাঙাচ্ছে, কশাকরা ধরে তাদের টাঙাচ্ছে। আমার বন্ধুরা সব জর্জিয়ান, কশাকদের শত্রুই মনে হতো। রুশ-জাপান যুদ্ধ। মস্কো থেকে বোন গোপনে কয়েকটা লম্বা ছাপাকাগজ এনেছিল। পছন্দসই, কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। স্পষ্ট মনে আছে এখনও, সমস্তই বিপ্লবসংক্রান্ত। কখনো কবিতায় লেখা। কবিতা আর বিপ্লব কীভাবে যেন এক হয়ে গেল মনেমজ্জায়। বক্তৃতা আর খবরকাগজ—অপরিচিত কত শব্দ, কত আইডিয়া। দোকানের জানলায় সাঁটা ইস্তাহার। সব কিছুই কিনি, সকাল ছ'টায় উঠে পড়তে বসি। 'সমাজগণতন্ত্রীর দল দূর হটো', 'অর্থনীতি বিষয়ক কথিকা'। সমাজতন্ত্রীদের বিশ্লেষণরীতি আর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এখনও মুগ্ধ করে। রুবাকিনের পাঠ্যতালিকা দেখে সব পড়ে ফেললাম, অনেকটাই বুঝলাম না হয়তো, আমার জিজ্ঞাসাই টেনে নিয়ে এল মার্কসবাদী পাঠচক্রে।

রাস্তায় দেখলাম বাকুর মতো জায়গা নেই, সবচেয়ে ভালো বিস্তৃত মরুভূমি, স্তেপ অঞ্চল। মস্কোয় ব্রনায়া স্ট্রীটে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হলো। খাওয়ার পয়সা নেই। দশ রুবলে মাস চলে? মা আরো ভাড়াটে রাখল—গরিব ছাত্রসব, সাম্যবাদী প্রায় সকলেই। ভাস্যাকে মনে আছে—আমার দেখা প্রথম বলশেভিক।

১. বাগদাদির জঙ্গল কর্তৃপক্ষ ছিলেন।

বাড়িতেও আর নেই। দশ-পনেরো কোপেকে ডিমের খোলসে ছবি এঁকে বিক্রি করছি। সেই থেকে হাতের কাজেও ঘেন্না ধরে গেছে।

উঁচু ক্লাসে ডেস্কের নিচে এ্যান্টি ড্যুরিং। দর্শন, হেগেল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। সবচেয়ে বেশি পড়ছি মার্কসবাদ। মার্ক্সের 'ইন্ট্রোডাকশন'-এর মতো কোন ছবিকবিতাই অত টানেনি। ছাত্রদের ঘর থেকেই যত বেআইনী পাঠ্যবস্তুর আমদানি হতো— রাস্তায় ঝাড়পিটের কায়দাকানুন বা ঐ জাতীয় সব। লেনিনের 'টু ট্যাকটিকস'-এর কথা মনে আছে। নীল রঙের দেখে ভালো লাগল। পাঠ্যের ধার ঘেঁষে ছাঁটা পৃষ্ঠা, কোন মার্জিন নেই। বেআইনী প্রচারের জন্যই ছাপা। চূড়ান্ত মিতব্যয়িতার নন্দনতত্ত্ব।

১৯০৮। রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টিতে (বলশেভিক) যোগ দিলাম। প্রচারবিদ হিসেবে। দু'এক জায়গা ঘুরে ছাপাখানার কর্মীদের মধ্যে। মস্কো পার্টি কমিটির নির্বাচিত সদস্য...পার্টির নাম 'কমরেড কনস্তানতিন'। গ্রেপ্তারপর্ব।

মার্চের ২৯, ১৯০৮। আমাদের বেআইনী ছাপাখানায় ধরা পড়লাম। ঠিকানা লেখা একটা বাঁধানো খাতা পুরো চিবিয়েই খেয়ে ফেললাম। থানা, গোপন পুলিশ। ঘোষণাপত্র লিখে দেওয়ার অভিযোগ ছিল। ভুলভাল বানান লিখে কোনমতে জামিনে ছাড়া পেলাম।

এক বছরের জন্য পার্টির কাজ। তারপর আবার কিছুদিনের জেল।

তৃতীয়বার ধরা পড়লাম অন্য ব্যাপারে। নারী-বন্দীদের মুক্তির জন্য ছাত্রেরা তখন জেল পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল, এর আগেই পরিকল্পনামতো নোভিনস্কায়া জেল ভেঙে পালিয়েছিল তারা। আমি প্রতিবাদ করতে লাথি মেরে লাইনে ভিড়িয়ে দিল। পুলিসপ্রধান। তারপর জেল থেকে জেল। শেষে একেবারে একা, একটা ঘরে পুরে দিল, ১০৩ নম্বর সেল।

ভয়ানক অস্থির লাগছে। যাদের লেখা পড়েছি সব্বাই মহৎ লোক। কিন্তু তাদের চেয়ে ভালো লেখা কত সহজ। দুনিয়ার প্রতি ঠিকঠাক দৃষ্টিভঙ্গি তখনই আমার আয়ত্তে। এখন শুধু দরকার অভিজ্ঞতা। কোথায় যে তা পাওয়া যাবে? কিছুই তো জানি না। দরকার কঠিন শিক্ষানবিশী। কিন্তু উঁচু ক্লাস থেকে আমায় তাড়িয়ে ছেড়েছে, এমনকি স্ত্রোগানোভ কলেজ থেকেও। যদি পার্টির কাজই করতাম, তাহলে আত্মগোপন ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মনে হলো ওভাবে পড়াশোনা হয় না। সারা-জীবনই তার মানে ইস্তাহার লিখে যেতে হবে। অন্য লোকের লেখা থেকে প্রচার করাটাই যেন আমার নিয়তি। কিন্তু যা কিছু পড়েছি সব ঝেড়ে ফাঁক করে দিলে নিজের বলতে আর থাকল কী? হায় মার্কসীয় পদ্ধতি! কিন্তু সে-অস্ত্র কি শেষে একটা বাচ্চা ছেলের হাতে পড়ল! নিজের বেশ কাছাকাছি চিন্তার লেখাপত্তর ব্যবহার করা বরং সোজা। কিন্তু হঠাৎ যদি শত্রুর সামনে পড়ে যাই?

খোঁটিয়ে-ফেলা বস্তাপচা নন্দনতত্ত্বের বিরুদ্ধে ঠিক কী করব, বুঝতে পারছি না। বিপ্লব কি আমার কাছ থেকে আরো সিরিয়াস শিক্ষানবিশি দাবি করে না? এক পার্টি কমরেডের কাছে গিয়ে বললাম, সমাজতান্ত্রিক শিল্প সৃষ্টি করতে চাই। প্রাণভরে হাসল খুব খানিকটা, তারপর বলল: তোমার সে ক্ষমতাই নেই।

মনে হলো আমার ক্ষমতাকে কম করে দেখা হলো।

পার্টির কাজ ছেড়ে পড়তে বসলাম। কবিতা লেখার চেষ্টা ছেড়ে ছবির দিকে ফিরলাম। কেলিনের কাছে গেলাম, সে এক রিয়্যালিস্ট, দারুণ কারিগর। আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, দৃঢ়মনা, বহুদর্শী।

উজ্জ্বল কারিগরি—এই ছিল তার দাবি। হলবেইনের মতো। চিনি মেশানো দু'চোখে দেখতে পারেন না।

সারা বছর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মানুষের মাথার গঠন এঁকে গেলাম। কলেজ অফ্ পেইন্টিং, স্কাল্পচার এ্যান্ড আর্কিটেকচারে ভর্তি হলাম, একমাত্র জায়গা যেখানে সুবোধ বালকের সার্টিফিকেট ছাড়াই কাজ হলো।

আশ্চর্য যে তারা অনুকারকদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে, লারিওনভ, মাসকভের মতো নিজের বুদ্ধিতেই যারা চলে, চেষ্টা করে বরং তাদের তাড়াতে। বিপ্লবের প্রতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে আমি মৌলিক চিন্তাবিদদের সপক্ষে লড়েছি। বারলিউক কলেজে ঢুকল, খুব দাম্ভিক।

নোবিলিটি ক্লাসে রাসমানিনভের কনসার্ট। মৃতের দ্বীপ যেন। অসহ্য ন্যাকা সুরের বিরক্তি থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। বারলিউক একটু পরেই বেরোল। দেখা হতে হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা। রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম দুজনে।

রাসমানিনভ থেকে কলেজ করার বিরক্তি, সেখান থেকে গোটা ক্লাসিসিজম ব্যাপারটাই যে বিরক্তিকর—এ বিষয়ে কথা হলো অনেক।

বারলিউক দক্ষ শিক্ষকের মতোই রেগে উঠছিল। সে তার সমসাময়িকদের বহু পিছনে ফেলে এসেছে। আমি—সমাজতান্ত্রিক সচেতনায় যাবৎপুরনোর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু স্বচক্ষে দেখলাম। রুশী ফিউচারিজমের জন্ম হলো। স্মরণীয় সেই রাত্রি।

বারলিউকের কথা মনে পড়ে, অদ্ভুত টান অনুভব করব আজীবন। দারুণ বন্ধু, আমার সত্যিকারের শিক্ষক। ও-ই আমাকে কবি বানিয়েছে, বই তুলে দিয়েছে হাতে, ফরাসি থেকে, জার্মান থেকে কবিতা পড়ে শুনিয়েছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে, আর কথা বলে গেছে সারাক্ষণ। নজরে রাখত আমাকে, প্রতিদিন ৫০ কোপেক করে দিত তখন, যাতে বিনা উপোসেই লিখে যেতে পারি।

খ্লেবনিকভকে দেখা গেল মস্কোয়, তাছাড়া সেখানে তখন ছিল ক্রুশেনিখ, শব্দের ফিউচারিস্ট পাদ্রি। কয়েক রাত্রি জাগরণের পর যুগ্ম ইস্তাহার লেখা হলো—ডেভিড সব এক করে সব আবার নতুন করে লিখল। দুজনে মিলে নাম ঠিক করলাম—'জনতার রুচির গালে এক থাপ্পড়'।

'জ্যাক অফ ডায়মন্ড'—প্রদর্শনী। বিতর্ক। ডেভিড আর আমার আগুনছড়ানো বক্তৃতা। খবরকাগজগুলো ফিউচারিজমে ভরে উঠল—সুর মোটেই নরম ছিল না। আমাকে তো বলা হয়েছিল 'কুত্তীর বাচ্চা'।

শিল্পের উঁচুমহল বিলক্ষণ চটল। কলেজের ডিরেক্টর আমাদের যাবতীয় সমালোচনা আর রাজনৈতিক বিক্ষোভে অংশ নিতে বারণ করলে আমরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলাম সে-উপদেশ। শিল্পীদের 'কাউন্সিল' কলেজ থেকে বিতাড়িত হলো।

রাশিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। বক্তৃতা দিচ্ছি, কখনো মুখ খোলার আগেই পুলিস এসে হাজির। প্রকাশকরা আমাদের কাজ ছুঁয়েও দেখছে না। পুঁজিতন্ত্রের নাক ডিনামাইটের গন্ধ শুঁকছে। একটা লাইনও আমার কাছ থেকে কিনবে না কোনদিন···

১৯১৪-র শুরুতে কারিগরির প্রতি নজর গেছে। 'প্যান্ট পরা মেঘেরা' নিয়ে ভাবছি তখন।

যুদ্ধের খবরে উত্তেজনা ছড়াল। অর্ডারমাফিক পোস্টার লিখছি—সব অবশ্য সৈন্য-বাহিনীর বিষয়আশয় নিয়ে।

যুদ্ধের আশঙ্কাভয় ক্রমশ ধরাছোঁয়ার ভেতরে এসে পড়ছে। ফ্রন্টে যেতে হলেও বিশ্রীবিস্বাদ, দূরে থেকে তো আরও খারাপ। যুদ্ধ নিয়ে বলতে গেলে মুখোমুখি দেখতে হবে ব্যাপারটা। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লেখানোর চেষ্টা করলাম, খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, ফলে বাতিল।

শীতের মধ্যে যুদ্ধ আরো বিস্বাদ লাগছে, ঘেন্না করছে। শিল্পের প্রতি যাবতীয় উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। ৬৫ রুবল জিতলাম একবার।

অনাগত বিপ্লব সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। গোর্কিকে 'মেঘেরা' থেকে অংশ-বিশেষ পড়ে শোনালাম।

৬৫ রুবল খুব সহজে কোন ব্যথা না দিয়েই হাপিশ হয়ে গেল। কী খাব কী করব, ভাবতে-ভাবতে 'নিউ স্যাটায়ারিকনে' লিখতে শুরু করলাম।

'মেরুদণ্ডের বাঁশি' আর 'প্যান্টপরা মেঘেরা' প্রকাশিত হলো। পালকের মতো 'মেঘের' ওপর সেন্সরের কাঁচি চলল। কেটেকুটে ছ'পৃষ্ঠার মতো কাগজে শুধু ডটস্। সেই থেকে ডট আর কমা-ফমা ঘেন্না করে এসেছি।

অক্টোবর ১৯১৭। গ্রহণ করব, না করব না? আমার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নই ওঠেনি। (মস্কোর অন্যান্য ফিউচারিস্টদেরও তাই)। আমার বিপ্লব। স্মোলনিতে গেলাম। কাজ করলাম, যা কিছুই করার ছিল।

জানুয়ারিতে আবার মস্কো। রাত্রে 'পোয়েটস' কাফে'-তে কবিতা পড়লাম। আজকের কবিদের কাফিখানার বিপ্লবী ঠাকুমা সেই দোকানটা।

জুনে পিটার্সবুর্গে ফিরে এলাম।

১৯১৮, অক্টোবর ২৫। মিস্ট্রি বুফে শেষ হলো। পড়ে শোনালাম। মায়ারহোল্ড, কে. মালভিচের সঙ্গে একযোগে মঞ্চে নামাল নাটকটা।

১৯১৯-এ এই নাটকটা ও আরো কিছু কাজ নিয়ে বহু ফ্যাক্টরিতে ঘুরে বেড়ালাম। সর্বত্র উষ্ণ অভ্যর্থনা। ভাইবর্গ জেলায় ওরা অনেকে একটা কম্যুনিস্ট গ্রুপ করেছিল। প্রকাশিত হলো 'আর্ট অফ দ্য কম্যুন'। ROSTA-র হয়ে প্রচারকার্যে হাত লাগালাম। সেখানে ১৯২০-র রাত্রিদিন এক হয়ে গেল। ৩০০০ পোস্টার, ৬০০০ শ্লোগান।

'২৩-এ LEF তৈরি হলো। উদ্দেশ্য ছিল ফিউচারিজমের জানা সমস্ত উপায়ে বিশাল সমাজসত্তাকে ধরতে চেষ্টা করা, প্রকাশ করা।

নিজেকে স্বেচ্ছায় খবরকাগজের লোক করে তুলেছিলাম—ইস্তাহার, শ্লোগান। অনেক কাগজে নিয়মিত লিখেছি। পরের কাজটা ভবঘুরে চারণকবির মতো, দেশ জুড়ে কবিতা পড়ে বেড়ালাম, এমনকি বিদেশী শহরেও কবিতা পড়েছি।

'২৭-এ LEF সামান্য বিরতির পর আবার বেরোল। এখন New LEF। আবিষ্কার, অতিনান্দনিকতা. ফালতু মনস্তত্ত্ব কপচানোর বিরোধিতা করাই লক্ষ্য ; প্রচার করতে হবে, পেশাদার সাংবাদিক লেখা ও তথ্যভিত্তিক রচনার সপক্ষে ছিলাম।

অনেকেই বলেছে, 'তোমার আত্মজীবনীটা খুব একটা সিরিয়াস নয়'। ঠিক কথা—শুকিয়ে ছিবড়ে হয়ে যাইনি তো এখনো, নিজেকে নিয়ে বাগাড়ম্বরের মানে হয় না কোন, তাছাড়া মজা থাকলে তবেই না ভালো লাগে।[১] □ ১৯২২-২৮

ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি : সংযোজনা : ১

# রেমব্রাণ্টের পুনর্বাসন

১৯১৩-র বসন্তে তিনজন তরুণ শিল্পী—তখন মস্কো কলেজ অফ স্কাল্পচার এ্যান্ড আর্কিটেকচারের ছাত্র—তাদের একজনের লেখা কবিতার সংকলন ছাপার কাজে ব্যস্ত। "মায়াকোভস্কি কিছু লিথোগ্রাফের কাগজ এনেছিল, তার স্বকন্ঠের আবৃত্তি শুনতে শুনতে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে বিশেষ এক ধরনের কালি দিয়ে শেচোক্রিগিন তা লিখে নিচ্ছিল। এমনিতে শেচোক্রিগিনের সেই চারটে ড্রয়িং দারুণ, কিন্তু তা শুধুই মায়াকোভস্কির কবিতার বহিরঙ্গের রূপরেখা। 'ওঃ ভাস্যা আবার একটা পরী এঁকেছো, কেন একটা মাছি আঁকতে পারছো না ? কতদিন তুমি তা আঁকোনি বলো তো' !"—লেভ জেগিন, সেই তিন জনের অন্যতম, এভাবেই স্মৃতিচারণ করেছিলেন পরে।

অনেক চেষ্টার পর, শেষপর্যন্ত মায়াকোভস্কি নিজেই তার প্রচ্ছদ আঁকেন—একটা বিরাট কালো ছোপ—আপাতদুর্বোধ্য, কিন্তু জোরালো, প্রকাশোন্মুখ। ছোট্ট একটা লিথোপ্রেসে 'আমি !' —ছেপে বেরোল ১৯১৩-র মে মাসে ; মাত্র ৩০০ কপি।

১. I about myself—অংশ। মায়াকোভস্কি নিজেকে হত্যা করেন, ১৯৩০-এ।

হাতে-লেখা পাথরছাপের প্রযুক্তি, ইচ্ছাকৃত অসতর্কতা, ড্রয়িং-এর ধরন, বইয়ের নাম—স্পষ্টতই এসব পাঠককে আঘাত করার জন্য। আর সেকালে একদিকে স্করপিয়ন পাবলিশার্সের সিম্বলিস্ট কবিতার দারুণ অভিজাত সংকলনের বিরুদ্ধে সে ছিল স্পষ্ট প্রতিবাদ, প্রচলিত রীতিপদ্ধতির তোয়াক্কাহীন পরিকল্পনা। অবশ্য এই প্রথম নয়; ১৯১২-র শেষার্ধ থেকেই মস্কোয় কবিতার অজস্র চিত্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হতে শুরু করে। ভেলিমির খ্লেবনিকভ ও আলেক্সেই ক্রুশেনিখ ছিলেন তার লেখক, ছবি আঁকতেন মিখাইল লারিওনভ ও নাতালিয়া গনশ্চারোভা। পৃষ্ঠার একদিকে ছবি, অন্যদিকে কবিতা, পৃষ্ঠাগুলিও সমানভাবে ছাঁটা নয়, এঁদের প্রাণশক্তির সঙ্গে অন্যান্য ধারার শিল্পীদের সূক্ষ্ম ক্যালিগ্রাফিক ছাঁদের কোন তুলনাই চলে না।

এ ছিল নব্যরুচিগঠনের সংগ্রাম, কবিতার শব্দের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, মায়াকোভস্কি পরে যেমন বলেছিলেন, কবিতার শব্দ হবে 'ওজনদার, অমসৃণ এবং চিত্রগুণসম্পন্ন'। কবিতার স্পর্শগুণময় বুনোট ও চিত্রগুণসম্পন্নতার এই সংগ্রামে ফিউচারিস্ট কবিরা তাদের শরিক ও সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন সমমতের শিল্পীদের।

১৯১৩-য় ভ্লাদিমির তাৎলিন 'প্রেয়ার বুক অফ্ দ্য থ্রি' নামের এক সংকলনে মায়াকোভস্কির কবিতার সঙ্গে ছবি এঁকেছিলেন নজরকাড়া তীব্র রেখায়।

মায়াকোভস্কি নিজে অবশ্য শিল্পশিক্ষার পাঠ শেষ করেননি, পেশাদার শিল্পী হিসেবেও কখনো সেভাবে কাজ করেননি, কিন্তু তাঁর কবিতার পরবর্তী বিকাশ ছবির হাত ধরে এগিয়েছিল। নব্য সম্ভাবনার অবিষ্কারে তৎপর বহু শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব কখনো নষ্ট হয়নি, বিশ শতকের শিল্পের ধারাপ্রকৃতি বিষয়ে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল এবং তাঁর নিজের ধারণা ও লক্ষ্যের নিকটবর্তী শিল্পীদের কাজ তিনি বরাবর সমর্থন করেছেন এবং প্রয়োজনে তার প্রচারে বিমুখ হননি।

প্রায়শ তিনি নিজেই তাঁর বইয়ের জন্য ছবি এঁকেছেন, উৎপাদন-পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছেন, নিজের নাটকের দৃশ্যপট রঞ্জিত করেছেন, পোষাকের ধরন ছাঁদ ও রঙ নির্বাচন করেছেন, নাটক ও ফিল্মের পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড এঁকেছেন, এবং বিশেষভাবে পোস্টারের বিপ্লবী সম্ভাবনার বাণী প্রচার ও তার নীতিনির্ধারণ করেছেন।

১৯১৪-য় মায়াকোভস্কির দ্বিতীয় বই 'ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি' প্রকাশিত হয়। এবার ছাপা হলো লেটারপ্রেসে, ধাতব হরফের সাহায্যে। কিন্তু কবিতার প্রবাহ এখানে বারবার খণ্ডিত হয় নানাছাঁদের হরফবিন্যাসে। কখনো বাঁকা হরফ, বা একই ছাঁদের ঈষৎ স্থূল হরফ, কখনো বা সম্পূর্ণ অন্য ছাঁদের ব্যবহারে কোন কোন শব্দ হঠাৎ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। কখনো শব্দের একাংশ প্রয়োগদক্ষতায় ভিন্ন অর্থে ঝলসে ওঠে, অথবা কখনো পংক্তির মাঝখানে, অথবা শব্দের প্রথম বা শেষ অক্ষর বড়ো হরফের—এসমস্তই নিঃসন্দেহে পৃষ্ঠার দ্বিমাত্রায় এক অদ্ভুত টানাপোড়েন ও উত্তেজনার সঞ্চার করল। লিথোয় ছাপা বইগুলোর মতো এখানেও শব্দের চিত্রিত বুনোটের দিকে

নজর ছিল, এর ফলে শব্দের ধ্বনিগত প্রকাশেও আশ্চর্য মাত্রা এসেছে, কবিতার আবেগের চাপ ক্রমশ বেড়েছে, ঘোষণাপত্রের গুণ এসেছে ছাপা পৃষ্ঠায়। আর ছবিও একইরকম তীক্ষ্ণ—ডেভিড বারলিউক, মায়াকোভস্কির বন্ধু, আর ডেভিডের ভাই ভ্লাদিমির তার অধিকাংশ এঁকেছিলেন।

এসমস্ত সংস্করণের চোখকাড়া, প্রায় বিজ্ঞাপনী মেজাজ শুধু নতুন উপস্থাপনার প্রয়োজনেই সৃষ্ট হয়নি, একই সাথে তা নতুন কবির প্রতি এক সক্রিয় সমর্থন—ভিড়ের একটা লোক, পথচারী, জনতার কবি সে, মঞ্চের কবি,—আজকের কবি আর বৈঠকখানার আবৃত্তিকার নয়। এই বইয়ের নাট্যরূপে স্বয়ং মায়াকোভস্কি নিজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কবিকে এখন যে কোন জায়গায় দেখা যায়, তার সমস্ত আবেগ, প্রতিক্রিয়া জনতার চোখের সামনেই ঘটে, এভাবে তার কবিতারও এক চাক্ষুষ ভিত্তি তৈরি হয়। অচিরেই স্বরভঙ্গির এই তীব্রতা বা এই বিশেষ 'ভোকাল জেসচার' নতুন কবিদের বইয়েও দেখা গেল। ভাসিলি কামেনস্কি, যিনি মায়াকোভস্কির সঙ্গে মঞ্চেও উঠেছেন, একসময় বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন একধরনের সক্রিয় হরফবিন্যাসের, যাতে করে কবিতার কালানৌচিত্য সম্পূর্ণ ভেঙে যায়, বদলে শব্দগুলি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে পড়ে নতুন চিত্রিত আয়োজনে।

ইতিমধ্যে মায়াকোভস্কির নিজের লেখা বইয়ের সংস্করণগুলি অন্যরকম—১৯২০-র শেষার্ধ থেকে তিনি হরফবিন্যাসের নতুন এক শৈলীর সন্ধানে ছিলেন : অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভারমুক্ত, এক প্রান্ত থেকে পৃষ্ঠার আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তীব্র কৌণিক বিন্যাসে লেখকের নাম, সবচেয়ে বড়ো পয়েন্টের হরফ—কখনো অক্ষরগুলি পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদে লম্বভাবে বা অনুভূমিক মুদ্রিত, অথবা 'ক্লাউড ইন প্যান্টস'-এর ১৯১৫-র সংস্করণে যেমন ছোট হরফ ব্যবহারই করা হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে মায়াকোভস্কির পোস্টারে হাতেখড়ি, উজ্জ্বল রঙের লোকপ্রিয় প্রিন্টের ঐতিহ্য এসময় ব্যবহার করেছেন প্রচুর। বিপ্লবের পরে 'লিভিং অ্যান্ড ফলেন হিরোস অফ অক্টোবর' নামে এক ছবির বইয়ের জন্য মায়াকোভস্কি ছবির পরিচয় লিখেছিলেন কবিতার ভাষায়। 'দ্য রাই ওয়র্ড : রিভলিউশনারি অ্যানথোলজি অফ ফিউচারিজম'-এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তিনি। 'মিস্ট্রি বুফো'র প্রথম অভিনয়ের দিনে (৭-৮ নভে., ১৯১৮) ছাপানো বিলে 'পুরনো পৃথিবী' লেখা ভূগোলককে বাতিল করে দিচ্ছে একটি লাল ক্রুশ, নাটকটির ছাপা সংস্করণে একই ছবি প্রচ্ছদেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

'রোস্টা'র জানালায় এর পরবর্তী পর্যায়ে মায়াকোভস্কির ড্রয়িং আরো তির্যক, অমসৃণ ও সহজ। কোন নির্দিষ্ট চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খের বদলে গ্রাফিক প্রতীকগুলি এখানে দুই বিরোধী শক্তির ব্যক্তিরূপ। এ ছবির ভাষায় এমন কোন ভাবনা নেই যা চিত্রিত করা যায় না, এমন কোন বিষয় নেই যা প্রকাশ করা অসম্ভব,—অর্থনৈতিক

অঙ্কবদল থেকে দুর্ভিক্ষ, জয়-পরাজয়ের সমাকর্ষ থেকে শ্রমিক বা বুর্জোয়া—এ সমস্তই চিহ্ন বা সংকেতের মতো পোস্টার থেকে পোস্টারে বাহিত হয়ে দর্শকের কাছে আগেই পরিচিত এক প্রতীকি ভাষায় পরিণত হলো। নির্দেশরত রক্ত-অনামিকার প্রতীকটি ছিল তাঁর প্রিয়, কেননা এসমস্ত ছবি স্পষ্টতই নির্দেশমূলক, বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে শিক্ষার বিস্তার ও পরিচালনাই তার কাজ—'এটা করো' অথবা 'এটা কোরো না'। মায়াকোভস্কির ড্রয়িং-এর বিশেষ এই তির্যক ছাঁদ অনেক আগে থেকেই লক্ষ করা যায়, 'মিস্ট্রি বুফে'র' দৃশ্যপট বা পোষাকের নির্দেশে বা 'মেরুদন্ডের বাঁশি' নামের কবিতার জন্য ছবির পরিকল্পনায় অথবা লিথোয় ছাপা হাতে রঙ করা ব্যঙ্গচিত্রের কাগজ 'সোভিয়েত এবিসি'র জন্য আঁকা ছবিতে। ১৯২০-এ তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন কনস্ট্রাকটিভিস্টরা, বিশশতকের বইয়ের ডিজাইন ও প্রস্তুতিতে তাদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

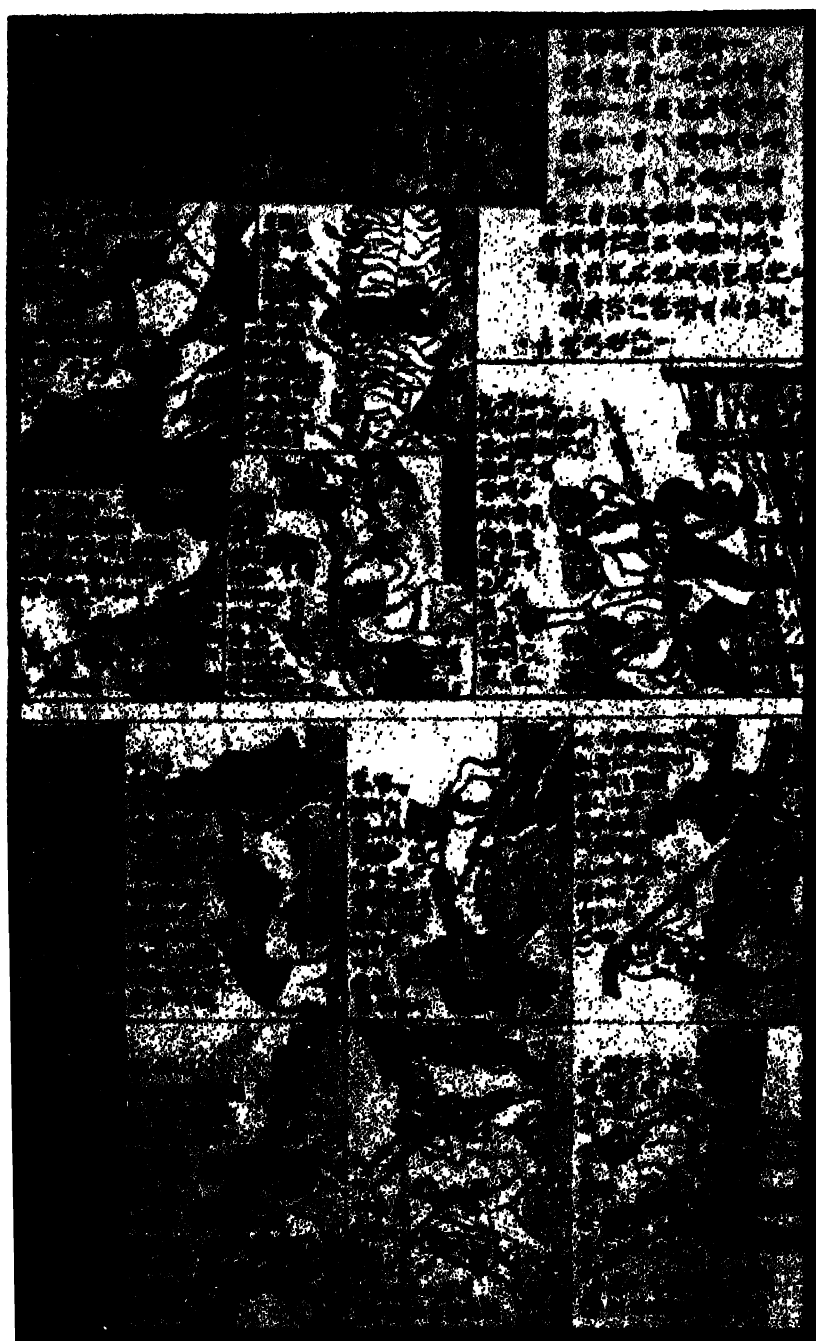
এই পর্যায়ের প্রথম বইটি ছাপা হয়েছিল বার্লিনে, ১৯২২-এ, নাম 'আবৃত্তির জন্য মায়াকোভস্কি'। বইটির ডিজাইনার ছিলেন লিসিৎস্কি। প্রতিটি পংক্তির বিন্যাসের ধরন, বড় হরফ, মোটা রেখা ও অন্যান্য সংকেতচিহ্নের জোরালো ব্যবহার, এমনকি নৌকা, নোঙর বা মনুষ্যশরীরের পিক্টোগ্রাফ এখানে শুধুমাত্র কবিতার থিম নয়, তার অন্তর্গত ধ্বনিছন্দের চিত্রিত রূপ। প্রায় কবিতার ধ্বনিগত কাঠামোচিত্রণ। দ্বিতীয় বর্ণ লালের ব্যবহার এখানে রচনাকাঠামোর অন্যতম উপাদান, কখনো তা প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

১৯৩৩-এ 'এই বিষয়ে' মায়াকোভস্কির নতুন কবিতার বইয়ের কাজ করেছিলেন আলেকজান্ডার রোদশেংকো—নতুন গ্রাফিকপ্রযুক্তির অন্যতম প্রচারক, কবিতার বইয়ে তিনি ফোটোগ্রাফের ব্যবহার শুরু করেছিলেন, নিছক তথ্যমূলক বিবৃতির জন্য নয়, সুসংহত নতুন চিত্রভাষার প্রয়োজনে।

দ্রুত ও স্থির নিশ্চয়তার সঙ্গে সময়ের চাহিদা মেটায় যে-ছবি, প্রকাশ্যে দ্বিধাহীন ঘোষণায় মায়াকোভস্কি তার পক্ষ সমর্থন করেছেন। কনস্ট্রাকটিভিস্ট বন্ধুদের মতো তিনি ইজেল-পেইন্টিং-এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, বস্তাপচা, অপ্রয়োজনীয়, বুর্জোয়া বলে পরিত্যাগ করেছেন। অন্যান্য ধারার শিল্পীরা তাতে বিলক্ষণ চটেছিলেন। 'তুমি কি ইজেল-পেইন্টিং নিষিদ্ধ করতে চাও?'—'হ্যাঁ কমরেড, আমি তাই চাই'—আসলে পুরনো নির্দিষ্ট আঙ্গিকের খোলস ছেড়ে তিনি স্পষ্টতই যুগের নতুন চাহিদার সঙ্গে একই ছন্দতালে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে চান। বিজ্ঞাপনের কাজে অনিচ্ছুক এক শিল্পীকে বলেছিলেন একবার, 'দাঁড়াও দাঁড়াও—তোমার গায়ের চাদরটা খোলো তো, নিজের নাম সই করো, আমি নিশ্চিত বলছি তোমার যাবতীয় কাজের তুলনায় বস্তুটা অনেক মূল্যবান হবে'। তথাকথিত পেইন্টিং সম্পর্কে তিনি ক্রমেই আরো আপোসহীন হয়ে ওঠেন, তাঁর নিজের ভাষায় তিনি রেমব্রান্টকে এযুগে 'পুনর্বাসিত' করেছেন।[১] □

১. Mayakovosky and Art : Yuri Gerchuk.





# ডেভিড শাপিরো

# সমাজবাস্তব শিল্পের ধারাপ্রকৃতি ঃ পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব

সমাজবাস্তব ভাবাদর্শ ও তার নন্দনভাবনার বহুবিধ সমস্যা ও যুক্তিতর্কের বিন্যাস নিয়ে আমেরিকার যে-সমস্ত শিল্পীগোষ্ঠী বা সংগঠন নিয়মিত মৌখিক ও কখনো লিখিত রচনার সাহায্যে আলোচনা জারি রেখেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জন রীড ক্লাব, আমেরিকান আর্টিস্টস্ কংগ্রেস, আর্টিস্টস্' ইউনিয়ন, দি ইউনাইটেড আমেরিকান আর্টিস্টস্ এবং দি ইয়ং আমেরিকান আর্টিস্টস্। সেই ১৮৪৮-এর আর্তিস্ত রিপাবলিক্যান বা ১৮৭০-এর পারি কম্যুনের আর্টিস্টস্ ফেডারেশনের বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে শিল্পীভাস্করদের মধ্যে এমন তীব্র রাজনৈতিক আলোড়ন ও সংঘচিন্তার প্রণালী প্রণয়নের উৎসাহ আর আগে কখনো দেখা যায়নি। নিজেদের শিল্পকাজ ও সরাসরি রাজনৈতিক সক্রিয়তা—সমাজবাস্তববাদী শিল্পীরা এই উভয় উপায়েই তাঁদের নিজেদের ও দর্শকশ্রোতার দায়প্রয়োজনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছিলেন। এবং সর্বদাই তা সাংগঠনিক লক্ষ্যে বা সংঘচিন্তায় প্রাণিত ছিল, ব্যক্তিগত খ্যাতিপ্রতিপত্তি অর্জন-উপার্জনের কোন প্রশ্নই তখন ছিল না। তাঁরা গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মনে করতেন যে শিল্প নীতিসংগ্রামের কঠিন হাতিয়ার-

বিশেষ—সমাবিষ্ট প্রতিবাদীধর্মের এই ঐতিহাসিক প্রবচনে তাঁরা আস্থা রাখতেন, মনে করতেন যে শিল্প হলো এক আদর্শসম্মত যোগাযোগের ভাষা, যা এমনকি চিন্তা-প্রণালীরও পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম এবং শিল্পচর্চার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসাবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মুক্তি ঘটে কল্পনার, শেষাবধি যা মনুষ্যজাতির অশেষ উপকার সাধন করে।

জন রীডের নামে চিহ্নিত সব শিল্পীসমিতিই আমেরিকায় প্রথম এই সমস্ত আদর্শ-ধারণা প্রসারের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিল। ১৯২০ সালে খারকভে অনুষ্ঠিত লেখকশিল্পী সম্মেলনে 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস্'-এর সাংগঠনিক যাত্রাপথ প্রথম নির্ধারিত হয়, বস্তুত সেই অনুপ্রেরণায় তার শাখাসংগঠন হিসেবে জন রীড ক্লাবসমূহ স্থাপিত হয় এখানে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয় যে "দুই চিরবিবদমান শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক ও ধনিকসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তহীন সংগ্রামের তত্ত্ব" তাঁরা স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে "সমস্ত লেখকশিল্পীর স্বার্থ শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের সহগামী"। নিউইয়র্ক, শিকাগো, বস্টন, ওয়াশিংটন ডি. সি., ফিলাডেলফিয়া, ডেট্রয়েট, নেওয়ার্ক, সিয়াটল, পোর্টল্যান্ড (ওরেগন) এবং হলিউডের আশেপাশে বিভিন্ন সময়ে জন রীডের নামে একাধিক শিল্পীসমিতি স্থাপিত হয়, সব মিলিয়ে ১৯৩২ সালের মধ্যেই অন্তত ১৮টি সমিতির হদিশ পাওয়া যায়। শিল্প ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক ও অন্যান্য জরুরি বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনার জায়গা সংগঠিত করা ছাড়াও তারা প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন, 'পার্টিজান রিভিউ'-এর মতো কাগজ বের করতেন, এমনকি কোথাও তারা শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তও করেছিলেন।[১] এসমস্ত কাজই 'ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সংগ্রামের কঠিন হাতিয়ার' হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল এবং তৎসহ 'ধনতন্ত্রের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট হিসেবে সামাজিক ফ্যাসিবাদে'র আগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে।

প্রথম থেকেই সদস্যপদের যোগ্যতা নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয় সেখানে; একদল মনে করতেন শুধু দায়বন্ধ বিপ্লবীকর্মীরাই সদস্যনামের যোগ্য, অন্যেরা বন্ধুভাবাপন্ন সমস্ত বুদ্ধিজীবীরই অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই মতভেদ কোনদিনই সম্পূর্ণ মেটেনি, কিন্তু ঘটনা হলো, সমিতি তাদেরই সন্ধানে থাকত যারা লেখালেখি বা ছবিছাবার ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা নাম করেছিল, এবং তাদের জন্য সমিতির দ্বার বরাবর উন্মুক্ত ছিল। অনেকেই সমিতিতেযোগ দিয়েছিলেন বা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন তীব্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, কিন্তু পরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দায়ভাবনা থেকে সমিতির নীতি-পরিবর্তনের কারণে অনেকে

১. নিউইয়র্কের জন রীড ক্লাব আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৫-এ, পরে নাম পাল্টে রাখা হয় আমেরিকান আর্টিস্টস্ স্কুল, ১৯৩৯ পর্যন্ত তা সক্রিয় ছিল।

তা ছেড়ে বেরিয়েও এসেছিলেন। '১৯৩৫-এ পপ্‌লার ফ্রন্টের ধারণা বস্তুত অপেক্ষাকৃত উদার ও ব্যাপক সংগঠনের সপক্ষে' এইপ্রশ্নের নীতিগত নিষ্পত্তি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। জন রীড ক্লাবের কাজকর্ম তখনকার মতো মাটিচাপা পড়ল, পরিবর্তিত রাজনৈতিক দিশায় আমেরিকান রাইটার্স লীগ এবং আমেরিকান আর্টিস্টস্‌' কংগ্রেসের মতো কিছু দোআঁশলা শিল্পসংগঠনের জন্ম হয়, এবং একই লোকজন সমান দায়বদ্ধতায় তার পুষ্টি যোগায়।

১৯৩২-এ নিউইয়র্কে জন রীড ক্লাবের প্রথম শিল্পপ্রদর্শনীর সমালোচনা করতে গিয়ে এক প্রতিবেদকের মনেই হয়নি যে এ-প্রদর্শনী আদৌ সফল হয়েছে। প্রদর্শনীর শিরোনাম—'শিল্পকলায় সামাজিক দৃষ্টিকোণ'—তার মনে হয়েছিল 'বৈপ্লবিক শিল্পকর্মের অনিবার্য অনিশ্চয়তা'র ধারণার সঙ্গে এক স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা। 'নিউ মাসেসে'র পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন, অর্ধেকেরও বেশি প্রদর্শিত কাজে আদৌ কোন বৈপ্লবিক ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটেনি। বদলে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনচর্যার কিছু সরল প্রতিচ্ছবিই দেখা গেছে মাত্র। এমনকি এসমস্ত কাজ যথেষ্ট পরিমাণে জঙ্গীও নয়, বিষয়-বস্তুর নির্বাচনে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া অধিকাংশই প্রচলিত দৈনন্দিনতার প্রতিচ্ছবি। সমালোচক জন কোয়াট যতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন তাতে করে শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃত বিষয়আশয় বা কর্মসূচি সম্পর্কে উপস্থিত শিল্পীদের কোন স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে করেননি।

দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর প্রতিবেদনে লুইস লোজোউইক অবশ্য কিছু উন্নতির স্বাক্ষর দেখেছিলেন। নিয়মিত সদস্যরা ছাড়াও সেখানে অংশ নিয়েছিলেন সংগঠনের বাইরের কিছু শিল্পী। উপলব্ধি ও প্রয়োগকর্মের মধ্যে স্পষ্টতর সংযোগ লক্ষ করেছিলেন লুইস, দেখেছিলেন এক জঙ্গী শ্রেণীচেতনার প্রকাশ, খুঁজে ফিরছে রূপ-গঠনের আরো স্পষ্ট কোন দেহধর্ম, দর্শকমানসে জোরালো আবেগ-অভিঘাত সঞ্চারের জন্য যা অবশ্য প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে শ্রেণীদৃষ্টির নিরিখে কিছু কাজ 'ক্ষুধা, ফ্যাসিবাদ এবং যুদ্ধ'—প্রদর্শনীর এই শিরোনামের 'জীবন্ত চলিষ্ণু প্রক্রিয়া'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এতই কঠিন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই লক্ষ্য যে, লোজোউইক লিখেছেন, 'সেকারণেই আমাদের গুণমানের বিচারে আরো কঠোর হতে হবে'। তিনি দেখিয়েছেন স্পষ্টতই কিছু কাজ তাই জড়িয়ে গেছে, কিছু কাজ বেশ অপরিণত, এবং কোন কোন কাজ 'বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার অসাযুজ্যে' ক্লিষ্ট।

কোয়াট এবং লোজোউইক যে-সমস্ত দুর্বলতা এক্ষেত্রে লক্ষ করেছিলেন, প্রথম প্রদর্শনীর সময় থেকে শুরু করে আমেরিকান শিল্পের অন্যতম প্রধান ঘরানা হিসেবে সমাজবাস্তবধারায় শেষপর্যন্ত তাই মৌলিক সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। শ্রমিকশ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনচর্যার দৃশ্যস্থাপনাই বরাবর এধারার প্রাণবস্তু ছিল, কিন্তু 'বিপ্লবী শিল্প' বলতে শব্দার্থে যা-কিছুই আমরা বুঝিনা কেন, শেষবিচারে তা আর অর্জিত হয়নি।

বামপন্থী সমালোচকেরা সম্ভবত একটু বেশিই দাবি করেছিলেন, তার একটা কারণ বোধহয় যে তাঁরাও একই অভীষ্টের অংশীদার ছিলেন। অন্যদিকে, কেউ কেউ তো যথেষ্ট খুশি হয়েছিলেন। যেমন, 'দি নেশন'-এর প্রতিবেদক মনে করেছিলেন যে প্রথম প্রদর্শনীটি প্রায় "ঐতিহাসিক আর্মারি শো-র মতোই তাৎপর্যময়, যা বিশ শতকের প্রথাবিরোধী নন্দনতত্ত্বের ইউরোপীয় ঘরানার চাক্ষুষ অভিঘাত প্রথমবারের মতো আমেরিকায় এনে হাজির করেছিল"। তিনি লক্ষ করেছিলেন, "বস্তুজগৎ থেকে মনুষ্য-জীবনের দিকে যাত্রা এখানে আক্রমকভাষায় চিহ্নিত, নিছক অলংকরণ থেকে তা আবেগদীর্ণ অভিজ্ঞতায় উত্তরিত, শারীরসুখের জড়দর্শন থেকে প্রকৃত মানবিক ক্রোধ ও বেদনায় অধ্যুষিত ··এবং এসমস্ত ঘটনাই এই প্রদর্শনীতে এনে দিয়েছে জীবনের স্পন্দন"। 'ক্রিয়েটিভ আর্টসে'র লেখকেরও মনে হয়েছিল এই প্রদর্শনী যথেষ্ট 'তাৎপর্যময়'। যদিও তিনি "দোমিয়ে, গোইয়া, নোল্‌ড্‌ এবং রুয়োর সঙ্গে কিছু কিছু কাজের আত্মিক যোগাযোগ" আবিষ্কার করেছিলেন, তবু নিছক নীতিপ্রচারের লক্ষ্যে পরিকল্পিত রঙরেখার বদলে, তিনি লিখেছেন, "শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকজনতার বর্ণহীন নিবাশার জগৎ ও বিরুদ্ধ-পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষই অধিকাংশ ক্যানভাসের অনু-প্রেবণা"। প্রদর্শনীটি শুধু যে "প্রলেতারীয় ভাবাদর্শের প্রস্থচ্ছেদের কাবণেই আকর্ষণীয় তা নয়, শিল্পের প্রকাশভঙ্গিতেও সর্বহারার গাঢ় প্রভাবে রঞ্জিত, এমনকি প্রয়োগচিন্তার দক্ষতার কারণেও তা সমান উল্লেখযোগ্য"।

তিরিশের দশকে যে-সমস্ত তরুণ শিল্পী সাধারণভাবে বামপন্থার আদর্শচিন্তা বা সমিতির কার্যক্রমে আকৃষ্ট হযেছিলেন, অধিকাংশই এসেছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত পবিবাব থেকে, কেউ কেউ শ্রমিকশ্রেণীর উত্তরপুরুষ, আবাব জর্জ বিড্‌ল্‌-এব মতো অল্প কয়েকজন এসেছিলেন ধনী প্রতিপত্তিশালী পবিবার থেকে। বৃহত্তব সাংস্কৃতিক স্রোতোধারায় তাঁবা বিচ্ছিন্নতাব অভিশাপ ধাবণ কবেছিলেন, তাব কাবণ কখনো সংকীর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষার দারিদ্র্য বা অর্থের ক্ষীণ ও অনিশ্চিত যোগান। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই শ্বেতাঙ্গ পুরুষশিল্পীরা স্বয়ং অথবা তাদের পূর্ব-পুরুষগণ ছিন্নমূল, প্রায়শ বহিবাগত। বিপ্লবী মতাদর্শ বা সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট তত্ত্বের সংস্পর্শে তাঁবা এসেছিলেন স্কুলে থাকতেই, অনেকেরই উচ্চশিক্ষার সুযোগ ঘটেনি, কেউ কেউ নতুন রাজনৈতিক চিন্তায় দীক্ষিত হন বড় শহরে শিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করার প্রাক্কালে। মার্ক্সীয় নির্যাসতত্ত্বের তাৎক্ষণিক আকর্ষণের একটা বড় কারণ ছিল তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মারাত্মক বিপর্যয়ের গভীরে। সে তত্ত্বে কফনের গাঢ় আচ্ছাদন থেকে পালিয়ে বাঁচার আশা ছিল তবু, নীতিহীন আসন্ন ধ্বংস-প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় প্রাণ ছিল। মার্কিনী স্বপ্নের পুরাণসৌধ ধ্বসে পড়ছে তখন, তরুণ শিল্পীরা তার নতুন ভাষ্যরচনায় মন দিলেন, সমন্বয়ানুগ ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠলেন।

এ ধরনের শিল্পীদের কাছে জন রীড ক্লাব প্রায় অর্থনৈতিক মন্দাজনিত হতাশার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার সবুজ ভূখন্ড, এমন একটা আশ্রয় যেখানে তাঁরা বিষয়-ভাবনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণস্পন্দনে ভরে তুলতে পারেন। জন রীড ক্লাবের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আকস্মিকভাবে যে-সময়ে (অর্থাৎ ১৯২৯) প্রথম ঘোষিত ও সংগঠিত হলো, সে এক সঠিক মনস্তাত্ত্বিক সন্ধিক্ষণ প্রায়। ঘোর দুর্যোগের মধ্যেও সেখানে ছিল সমাধানের আশা এবং ক্রমেই তা বুদ্ধিবাদী লোকজনদের যোগাযোগকেন্দ্রে উন্নীত হলো। আজ হয়তো তার অনেক মূল্যবিচার আমাদের কাছে সীমাবদ্ধ ও নিছক উপযোগীচিন্তা বলে মনে হবে, কিন্তু সেসময়ে তাই ছিল অনেক ঋজু ও বলিষ্ঠ, এমনকি যথেষ্ট ব্যাপক চরিত্রের। সমগ্র সমাজপ্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীকে স্থাপন করে তারা তার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন সেই চাবিকাঠি, যা সমাজ-পরিবর্তনের কর্মযজ্ঞে তার প্রান্তিক ভূমিকার চেয়ে অনেক বেশিকিছু।

সমাজবাস্তব শিল্পের এই ধারা বস্তুত আমেরিকান ছবির পরম্পরাজাত, সেখানে এখন যোগ হলো শুধু নতুন রাজনীতিভাবনা। শিল্পীরা সকলেই ছিলেন নীতি-দীক্ষিত, নিজেদের মনে করতেন রাজনীতিসম্পৃক্ত, যে-ছবি তাঁরা এঁকেছেন তাও স্পষ্টত রাজনৈতিক, বিশ্বব্যাপী রাজনীতিশিক্ষার শাখাপ্রসারের সংবৃত্ত অংশী তাঁরা। সমিতির অধিকাংশ সদস্যই নিজেদের মার্কসবাদী মনে করতেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁদের কাছে ছিল মার্কসবাদে আস্থাপ্রাণ মানবজাতিগোষ্ঠীর উদাহরণস্বরূপ। স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের সমর্থন কখনো গোপন ছিল না। সুতরাং, যে-শিল্প সংগঠন তাঁরা মনে করতেন বৌদ্ধিক ও নান্দনিকভাবে সেই ক্রমক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রশাসিত সমাজ-পরিবর্তনে কোন না কোনভাবে সহায়ক, তার বিকাশের নীতিসূত্র প্রণয়নে মস্কো থেকে কোন আদেশের দরকার ছিল না। এই একই নীতিসূত্র সোভিয়েতের রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমান সত্য ছিল।

আমেরিকান আর্টিস্টস্' কংগ্রেসের আহ্বান একইসঙ্গে রাজনৈতিক এবং শিল্পের ক্ষেত্রে সামনে এক পা এগোনোর প্রস্তাব—প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস ও নিউ মাসেসে। প্রথম আমেরিকান আর্টিস্টস্' কংগ্রেস, ১৯৩৬-এর এক রিপোর্টে এই কংগ্রেস যে আকস্মিক কোন স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ নয়, সে কথা মুখবন্ধে জানানো হয়েছিল। প্রায় এক বছরের 'পরিকল্পিত চেষ্টা ও আলোচনার' ফল এই কংগ্রেস। যে-অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জড়তাবেদনা আক্রমণ করছে প্রায় সকল শিল্পীকে, সেখান থেকে বেরনোর কোন পথসন্ধানে যারা প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জর্জ অল্ট, আর্নল্ড ব্লুশ, হেনরি বিলিংস, পিটার ব্লুম, মরিস বেকার, নিকোলাই সিকোভস্কি, আরন ডগলাস, স্টুয়ার্ট ডেভিস, আডল্‌ফ্ ডেহ্ন্, উইলিয়াম গ্রোপার, উগো গেলার, হ্যারি গটলিয়েব, জাঁ মাতুলকা, সল স্কারি, উইলিয়াম সিগেল, নীল স্পেন্সার, হ্যারি স্টার্নবার্গ এবং মোজেস্ সোয়ের। সে আহ্বানে কার না সই ছিল—

তিরিশের যত শিল্পী, সমালোচক, ফটোগ্রাফার, ডিজাইনার থেকে এমনকি শিল্প-সংগ্রহালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ পর্যন্ত সে এক বিশাল তালিকা—ম্যাক্স ভেবের, বেন শান, জেমস্ জনসন স্যুইনী, ইউজিন হিগিনস, আলেকজান্ডার ক্যাল্ডার, নরমান বেল গেডেস, বেরেনিস অ্যাবট, মিল্টন আভেরি, ফিলিপ এভারগুড, লুইস মামফোর্ড, ইসামু নোগুচি, ফেয়্যারফিল্ড পোর্টার, মেয়্যের শাপিরো, ডেভিড স্মিথ, জোসেফ স্টেলা—এঁরাই তখন গোটা শিল্পবিশ্বের শিরোমণি, গোটা চালচিত্রের প্রতিনিধি সকলে।

ফেব্রুয়ারির ১৪, ১৯৩৬, নিউইয়র্কের টাউন হলে উন্মুক্ত জনসভা উদ্বোধন করে লুইস মামফোর্ড স্বাগত ভাষণেই যেন সভার তার বেঁধে দিলেন : বন্ধু কমরেডরা, উপস্থিত ভদ্রমন্ডলী, এই কংগ্রেসের সংগঠন দরকারি ছিল কেননা, তিনি বললেন, এমনও কেউ কেউ আছেন যারা উপস্থিত গভীর সংকটের সমাধান দেখছেন যুদ্ধ আর ফ্যাসিবাদের 'প্রতিদুর্যোগে', "সময় এসেছে, যারা জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসায় উত্তীর্ণ, এখন যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তমোর্চা গড়ে তুলতে হবে তাদের, আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে সব রক্ষা করতে হবে, প্রয়োজনে যে মহান মানবিক ঐতিহ্যপরম্পরা আমরা শিল্পীরা ধারণ করছি, তার জন্য অস্ত্রও ধরতে হবে"।

প্রতিনিধি সম্মেলনের চারদিনে এইসমস্ত বিষয়ের ওপর গবেষণাপত্র পড়া হয়—সমাজকাঠামোয় শিল্পীর অবস্থান, আমেরিকান শিল্পীদের সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ ও শিল্পীরা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শিল্প-ঐতিহাসিক মেয়্যের শাপিরো, শিল্পী ম্যাক্স ভেবের, হেনরি বিলিংস, আর্নল্ড ব্লুশ এবং মেক্সিকোর খ্যাতনামা দেওয়ালচিত্রী ওরোজকো ও সিকেরাস। যে উত্তেজনার সঞ্চার ঘটল অতঃপরে, তার কাঁপন শোনা গেল গোটা মার্কিনী শিল্পজগতে, যদিও সকলেই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য, নীতিসূত্র ও প্রয়োগচিন্তার সঙ্গে একমত হতে পারলেন, তা নয়।

'শিল্পী কোন গোষ্ঠীবদ্ধ জীব নয়', হেউড ব্রাউনের বক্তৃতায় শিল্পীদের আপন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব এই বলে নাকচ করলেন প্যেটন বসওয়েল; 'আর্ট ডাইজেস্ট-এর সম্পাদকের মতে, "যে স্বভাববৈশিষ্ট্য তাঁকে শিল্পের পথে চালনা করে, তা ক্রমশ তাকে আত্মগত করে তোলে, তার কাছে সমিতিগঠনের কথা ভাবাটাই রীতিমতো বিরক্তির। শিল্পীরা তো আর কয়লাখনির শ্রমিক নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষয় মানে এক্ষেত্রে সৃষ্টিচেতনার লয়"। রকওয়েল কেন্ট উত্তরে বললেন রেনেসাঁর সব শিল্পীই ছিলেন গিল্ডের সদস্য, 'আমি আগেই বলেছি লিওনার্দো স্বয়ং ফ্লোরেন্সের এক শিল্পসমিতির সদস্য ছিলেন'। শিল্পজগতের শক্তিশালী রক্ষণশীল দলগুলিকে উপদেশ দিলেন তিনি, "'আর্টিস্টস' কংগ্রেস যে-দরকারি কথাটা চেঁচিয়ে বলছে, একটু কান করে শুনুন, এ-আন্দোলনের সমর্থনে একটু মাথা খরচ করুন"। তিনি লিখলেন, "যোগ দিন, তাহলেই দেখতে পাবেন এই আন্দোলন আজ ধর্মকে সময়ের ঘেরে পুনঃ-

সংস্থাপিত করেছে, আমেরিকায় তারই আজ সবচেয়ে বেশি দরকার"। শিকাগোর এক শিল্পসমালোচক সেখানে কংগ্রেস-আয়োজিত প্রদর্শনীর প্রতিবেদনে লিখলেন, "আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি রকমের একাত্মতা, শিকাগো বা আমেরিকার শিল্পের ক্ষেত্রে মুক্তিপথের নেতা হিসেবে কংগ্রেসকে বিশ্বাস করা শক্ত"। লস এঞ্জেলসে কংগ্রেসের প্রদর্শনী দেখে আর্থার মিলিয়ের যেমন লিখেছিলেন 'লাল-প্ররোচক', সে-ঝোঁক থেকেই গেছিল অবশ্য। যদিও মিলিয়ের উল্লেখ করতে ভোলেননি, কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে এই সংঘ হয়ে উঠতে পারে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় যন্ত্রপ্রকরণ। আরো বললেন, শিল্পী-সদস্য নির্বিশেষে সকলেই 'প্ররোচিত উদারপন্থীর দল—চতুর শ্লোগানের মায়ায় বাঁধা পড়েছেন মাত্র'। এফ. গার্ডনার ক্লাও, নিউইয়র্ক উডস্টকের সংবাদপত্রের প্রাক্তন সম্পাদক সরাসরি আক্রমণ করলেন, অধিকাংশেরই মূল আপত্তির যেন সারমর্ম সাজিয়ে লিখলেন তিনি : "শিল্প ও রাজনীতির এই নির্বোধ সংযোগ ছিন্ন করে এই দম্ভ-প্রবঞ্চনার অবসান ঘোষিত হোক"।

পক্ষেই হোক বা বিপক্ষে আমেরিকার শিল্পধারায় এ এক নতুন অদ্বিতীয় দার্শনিক ধারণা : সৃষ্টিসক্রিয় লোকজনের নতুন এই সংঘ—সকলেই সাংস্কৃতিক কর্মীজন, প্রায়ই যে-নামে তখন ডাকা হতো তাদের—শুধু বছর-বছর প্রদর্শনী বা কেনাবেচার হাট বসানোই লক্ষ্য ছিল না তাদের, শিল্পী হিসেবে নিজেদের কাজ এবং নাগরিক কর্তব্যকর্মে এক নতুন নন্দনভাবনা ও রাজনীতির প্রসার পরিকল্পনাই সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। বক্তব্যের উতোরচাপানে ছবিছাবার পত্রিকা জমে উঠল, উন্মুক্ত ফোরামে ক্লাওয়ের উপযুক্ত জবাব দিলেন ইয়াসুয়ো কুনিয়োশি, সল স্কারি এবং উগো গেলার। গার্ডনার ক্লাওয়ের কথা পুরোপুরি বিকৃত। "লাল হেরিং-এর এলোমেলো পথচিহ্ন চোখে পড়ছে···ঠিক একইরকম বর্বর মানসিকতার ছায়া পড়েছে তাঁর কথায়, যা আমাদের বিশ্বাসকেই উল্টে আরো দৃঢ় করল, কংগ্রেস আমাদের চাই, উপরন্তু যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, বুঝতে পারছি কাজ আমাদের আরো দ্বিগুণ গতিতে করতে হবে"। কংগ্রেসের লস এঞ্জেলস্ শাখা মিলিয়েরের জবাবে বলল, শিল্পীরা বঞ্চিত না প্ররোচিত সে ব্যাপারে নাকটা না-গলিয়ে তাদের কাজকর্মের প্রতি নজর দিলেই তা শোভা পাবে বেশি। ঠাট্টা করেই জিগ্যেস করা হলো, "কী আপনার এত রাজনীতি নিয়ে প্রয়োজন শুনি বাবু মিলিয়ের, মনে আছে তো আপনি একজন শিল্প-সমালোচক মাত্র"।

এই সমস্ত উত্তেজনাই প্রকারান্তরে রাজনীতিপ্রাণ শিল্পীদের নিজ লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল—ছবিকে স্টুডিয়োর বাইরে আনতে হবে, জনতার মধ্যে, সরাসরি রাস্তায়। ১৯৩০-এই এক শিক্ষিত সমালোচক বলেছিলেন, প্রচারলক্ষ্য ও গভীর আস্থা—এই দুইয়ের সংযুক্ত প্রভাবে এই ধারাপরিণতির প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। "গত দশক জুড়ে আমেরিকায় তার নিজস্ব ছন্দে প্রচারকার্যের প্রকৃতি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে,

নিজের চতুঃস্পার্শ্বের পরিস্থিতি-বিচারই ক্রমে ছবি বা ভাস্কর্যের বিষয় হয়ে উঠেছে ; বিশেষত সংকটকালেই তা সমধিক লক্ষণীয় ··যে মানুষ ক্ষুধা কাকে বলে জেনেছে, সে শারীরিক বা আত্মিক যাই হোক না কেন, নিজেকে প্রকাশের তাড়না তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। যদি তার ভাষায় টান পড়ে, সে রুটির দোকানে দাঁড়ায় ; কিন্তু যদি থাকে সৃষ্টির আগুন, তাহলে সে প্রতিবাদ করবে, করবে সেই বাস্তবোচিত সুবোধ্য ভাষায়···সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ছবির বন্ধ্যাজমিতে নতুন ফসলের সংকেত শোনা যাচ্ছে"।

রাজনৈতিক তত্ত্বদর্শী ছবির বাহুল্য তখন এমনকি মিউজিয়াম, গ্যালারি বা অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান আয়োজিত প্রদর্শনীতেও চোখে পড়ার মতো। সংগঠিত আন্দোলনের অংশী সেই সব শিল্পীদের কাজের দৃষ্টান্ত ও সুস্থ আলোচনার আবহ জীইয়ে রাখার ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় অধিকাংশ শিল্পীর কাজে ব্যাপক পরিবর্তন এল। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে গভীর আস্থাই তাদের সামাজিক প্রতিবাদীধর্মের ঘেরাটোপে এনে ফেলেছিল, কার্যত কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়েছিলেন নব্যরীতিতে নিতান্ত হুজুগের বশে, তবু সেই তিরিশেই, সমাজবাস্তবতার ধারা আর অজ্ঞাত কোন বিষয় নয়, শিল্পের মুক্ত প্রান্তরে সে-ধারা প্রতিষ্ঠিত।

তদুপরি, বিশেষত কংগ্রেস-আয়োজিত এমনকি ইউনিয়নের প্রদর্শনী সুযোগ ও চরিত্রে প্রায় অন্তর্জাতীয়, সারা দেশের শিল্পী ও সাধারণ একই বিষয়ভাবনায় আক্রান্ত তখন, সংক্রমিত। যুক্তরাষ্ট্রের আটটি প্রধান শহরে কংগ্রেসের প্রথম প্রদর্শনী একইসাথে শুরু হলো—নিউইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, লস এঞ্জেলস, ডেট্রয়েট, ক্লিভল্যান্ড নিউ অর্লিন্স এবং পোর্টল্যান্ডে ( ওরেগন )—সমাবিষ্ট শিল্পীরা কেউ সমাজবাস্তববাদী, দৃশ্যচিত্রকর, কেউ বা স্যাটায়ারিস্ট, কেউ কেতাবী ঘরানার শিল্পী—অনেকেই স্বনামধন্য যেমন লিয়ঁ ক্রোল, পল ম্যানশিপ, আলেকজান্ডার ব্রুক, পেগি বেকন, ফিলিপ এভারগুড, হ্যারি গটলিয়েব, ইয়াসুও কুনিয়োশি, ম্যাক্স ভেবের, জর্জ বিডল্, রাফায়েল সয়্যার, রুফিনো তামাইও, আর্ট ইয়ং এবং তৎসহ উইলিয়াম গ্রোপার, জো জোনস্ এবং আরন বোহর্ড। বহুদৃষ্ট ছবিগুলির মধ্যে হেনরি বিলিং-এর 'গ্রেফতার' বহু পত্রিকায় ছাপা হলো—সেখানে এক শ্রমিককে চার গোয়েন্দাপুলিশ মাটিতে ফেলে মারছে ভীষণ, দূরে সরকারী ভবনের গ্রীক স্তম্ভ আর সিঁড়ি পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে মহান এক রাষ্ট্রনেতা ডানহাতের তর্জনী তুলে এই পাশবিক অত্যাচারের দিকে নির্দেশ করছে, তাতেও শান্তি নেই, এবার শ্রমিকটিকে পুলিশ গ্রেফতার করছে। থিওডোর জি. হাউপ্টের ছবি 'মে ডে'-র মিছিলে তিনজন শ্রমিক লাল পতাকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, 'স্পিরিট অফ '৭৬' নামের সেই বিখ্যাত ছবিটির আদলে।

আর্টিস্টস' কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রদর্শনী সংগঠিত হতো নির্দিষ্ট বিষয়ধারণার ঘেরে—যেমন 'আজকের আমেরিকা' শিরোনামে ছাপাই ছবির এক প্রদর্শনী একই সাথে

তিরিশটি বিভিন্ন শহরে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলো ১৯৩৬-এর পয়লা ডিসেম্বর। আমেরিকার শিল্প-ইতিহাসে এরকম কোন ঘটনা প্রায় নজিরবিহীন। 'বিমূর্ত প্রয়োগচিন্তা ও প্রত্যক্ষ সমাজভাবনা যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্বে নিরত' এখানে, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি আর গ্যালারির দেওয়ালে-দেওয়ালে টাঙানো ছবির প্রকৃতি-পসরায়। 'প্রিন্ট' নামের এক শিল্পপত্রে এ-প্রদর্শনীর অন্তঃশীল সুর শোনা গেল যখন মেরভিন জুলের 'দি ডাস্ট বোল'—ওকলাহোমার কৃষকদের সংকট নিয়ে চিত্রিত মন্তব্য মুদ্রিত হলো সেখানে।

শিকাগোয় আর্টিস্টস' ইউনিয়নের নিজস্ব গ্যালারিতে প্রায়ই নতুন নতুন প্রদর্শনীর আয়োজনে গোটা শিল্পজগতের নজর পড়েছে ততদিনে, শোনা যাচ্ছে আশ্চর্য আশাবাদের অবাধ উড়াল : শিকাগোয় আর্টিস্টস' ইউনিয়নের নিজস্ব গ্যালারি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এক অর্থে সমাপ্তি ঘোষিত হলো পুরনো দিনের, শুরু হলো নতুন আশার দিন। ফেডারেল আর্ট প্রোজেক্ট পৃষ্ঠপোষকের মর্জিমেজাজের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত করেছিল শিল্পীদের, এখন আর ছবির ব্যবসায়ীদের দরকার নেই, প্রতিক্রিয়াশীল বিচারকের হাতে যন্ত্রণা পাওয়ার দিন শেষ হলো। এখন সরাসরি জনসাধারণের মধ্যেই চলে যেতে পারে তারা, নিজেরাই, ভ্যান গঘের বিশ্বাসে উপনীত হওয়ার পথে এ হলো প্রথম পদক্ষেপ—'শিল্পীদের নিজস্ব সংঘারাম—প্রত্যেকের জীবন ও কাজ যেখানে সুনিশ্চিত'। যদিও নিউ ইয়র্কে ইউনিয়নের নিজস্ব কোন গ্যালারি ছিল না, তবু ACA-র গ্যালারিতে প্রায়শ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। ১৯৩৬-এর কোন এক প্রদর্শনী দেখে এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে 'নিজের ঘরেই প্রথম বিপ্লব শুরু করার' নীতিসূত্রে বিশ্বাসী আর্টিস্টস্' ইউনিয়ন। যদিও এক 'নগ্নিকার ছবি দেখে একথা বোঝার উপায় নেই যে এই নারী কোনদিন ঘাম ঝরিয়ে কাজ করেছে বা অংশ নিয়েছে প্রতিরোধ সমাবেশে', তবু অধিকাংশ ছবিই 'ঘরে কারখানায় বা খনির অন্ধকারে নিয়োজিত শ্রমজীবনের কথাসূত্রেই আবর্তিত হয়েছে'। তিনি আরো লক্ষ করেছিলেন অনেক ছবিতেই রয়েছে 'ধারালো ব্যঙ্গ, কখনো হাস্যকর তা এবং সর্বদাই বুর্জোয়া-বিরোধী'। ACA-র একটা প্রদর্শনী থেকেই বোঝা যায় গোটা দেশ জুড়ে বিভিন্ন গ্যালারির দেওয়ালে-দেওয়ালে সে সময়ে ঠিক কী গোত্রের ছবি টাঙানো হয়েছে, আরো ভালো করে বোঝার জন্য একবার ক্যাটালগগুলোয় চোখ বোলানো যেতে পারে।

১৯৩৯-এ রুশ-জার্মান চুক্তিস্বাক্ষরের কাছাকাছি সময় থেকেই বামপন্থী শিল্পীদের মেজাজপ্রকৃতি ক্রুদ্ধ, কিন্তু আশাবাদী চিন্তা-উচ্ছ্বাস থেকে ক্রমে মোহভঙ্গের বেদনায় বদলে যাচ্ছিল। ছবি-আঁকিয়ে ও ভাস্কর, যাঁরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন, তিরিশের মিছিল-প্রতিরোধ পথযাত্রায় যারা পা মিলিয়ে হেঁটেছিলেন একদা—মে দিবসে বা স্পেনের জনগণসমর্থনে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে, জবর-দখলের বিরুদ্ধে বা ধর্মঘটী শ্রমিকের স্বার্থচিন্তায় অথবা এরকমই আরো অনেক প্রধান

ও প্রান্তীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যভাবনায়—আস্তে আস্তে সবকিছু আবার গুছিয়ে ভাবার প্রয়োজনে স্টুডিয়োর নিভৃতে ফিরতে শুরু করলেন। কিছুদিন আগেই যা ছিল অনিবার্য ও স্থিরনিশ্চিত, সেইসমস্ত উপায়পদ্ধতি এবং তার পরিণতিকল্পে তারা ক্রমে সংশয়ী হয়ে পড়ছিলেন। সর্বহারা শ্রমসংস্কৃতি নির্মাণের সম্ভাবনা যেন আরো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, এমনকি সে আকাঙ্ক্ষাও যেন আর সরল নেই, বরং হয়ে পড়ছে সমস্যায় আকুল।

এই অবস্থানাংক বদলের কারণও বহু: অর্থনীতির মন্দ হাওয়া ঠিক যেমন বামপন্থার পক্ষে আগুন জ্বলে ওঠার ইন্ধন যুগিয়েছিল, তেমনিভাবেই তার ধারণ-সংগঠনে ঢিলেমি তা প্রশমিত করে। মোটাদাগের সামাজিক অসাম্য চাপা দিতে সরকারি নানাবিধ ফেডারেল প্রোজেক্টই বিক্ষুব্ধ অনেককে শান্ত করতে যথেষ্ট ছিল। একই সময়ে শিল্পসংগঠনসমূহে কমিউনিস্টদের সোভিয়েতের রাষ্ট্রীয় প্রয়োগকল্পনা অনুসরণের ক্ষুদ্রচিন্তা বামমোর্চার অন্যান্য শরিকের শুধু যে বিশ্বাস নষ্ট করল তাই নয়, উপরন্তু এমন শত্রুও বাড়াল যারা কমবেশি সক্রিয়। তার ওপর এমনকি শুধু শিল্পকর্মীদের জন্য যে-সব পাবলিক ওয়র্কস প্রোজেক্ট বা গণনিযুক্তি প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল তাও ক্রমে পরিত্যক্ত হলো, যেহেতু যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণে ততদিনে নতুন চাকরির সংস্থান তৈরি হচ্ছে। অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল বলেই এই ব্যবস্থাপদ্ধতি যে শিল্পীদের কাছে অধিক কাম্য ও মনঃপূত বৈষয়িকতা ছিল তা নয়, বরং সরকারি সংস্থাগুলির ক্রমমৃত্যু শিল্পীদের গোষ্ঠীসক্রিয়তার ভিত্তিতে কার্যকরী আঘাত হানল। শেষপর্যন্ত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধদৃশ্যে আমেরিকার প্রবেশ একটা গোটা যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করল।

সে-যুগের সাহিত্য-আন্দোলনের ওপর লিখতে গিয়ে লিওনেল ট্রিলিং বলেছিলেন, বামপন্থী রাজনৈতিক দিশা ও মূল্যবোধ "বুদ্ধিবাদী মধ্যবিত্তের একটা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাছে ছিল এমনকিছু…যার জন্য বেঁচে থাকা যায়"। যদিও তা হয়তো নিছকই "দেখার একটা ভঙ্গি, ঘৃণা বা করুণা প্রকাশের একটা উপলক্ষ্য, মানবিক ক্রোধ-সংগঠনের দিশা অথবা উদ্বোধিত মানবতাবোধের একটা সাংকেতিক ভাষা মাত্র"। এই একই কথা ছবি-আঁকিয়ে বা ভাস্করদের ক্ষেত্রেও সমান সত্যি। যুদ্ধকান্ড অবশ্য এসমস্ত পুরনো উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের বদল ঘটাল, ক্রমে যুদ্ধে জেতাটাই প্রাথমিক উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল, হয়ে দাঁড়াল সেইরকম কিছু 'যার জন্য বেঁচে থাকা যায়'। সমাজবাস্তব এই ধারাপ্রকৃতি যুদ্ধের পরেও চল্লিশের শেষার্ধ পর্যন্ত অন্যতম প্রধান শক্তিস্রোত হিসেবে টিঁকে ছিল, এমনকি নতুন মুখও ক্কচিৎ চোখে পড়ছিল। কিন্তু মন্দহাওয়ার প্রশমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান এবং শিল্পীদের জন্য সরকারি চাকুরিপ্রকল্পের পরিত্যক্ত নীতি বামপন্থী আন্দোলনের এতদূর ক্ষতিসাধন করল যে তা আর সেই আকর্ষক উত্তেজনার সঞ্চারে ব্যর্থ, দক্ষ শিল্পীরা বা দর্শকসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ বৃহদাংশই তাদের নৈতিক সমর্থন হারাল। পঞ্চাশে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের অভ্যুদয় ছিল এযাত্রার শেষতম চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

আমেরিকায় এখনো অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের কাজের ভিত্তিতে রয়েছে সামাজিক আকরচিন্তা—কেউ কেউ এখনো তিরিশেরই তত্ত্বভাবনায় নিয়োজিত, এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা একই ভূমিকা সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো বা দর্শনভূমিতে স্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ পপ আর্টিস্টদের কথা বলা যায়, যাঁদের কাজে আছে আকর্ষণীয় সামাজিক অভিব্যক্তি। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না যে সমাজবাস্তব চিত্রপ্রণালীর সবটাই আজ নিছক ইতিহাস বা আমেরিকার ঐতিহ্যধারায় তা আর একটা অধ্যায় মাত্র। ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবাস্তবতার এই মত ও আদর্শ আমরা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বা সহযোগী শক্তি হিসেবে গ্রহণ করব কি না তা অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের রাজনৈতিক ও নান্দনিক দৃষ্টিধারণার ওপর এবং বিশেষত একজন শিল্পীর সঙ্গে উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত সংযোগপ্রণালী বিষয়ে আমরা কী ভাবি তার ওপর। হতে পারে যে সমাজবাস্তববাদ সেই অর্থে কখনোই ফলপ্রসূ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি কেননা তার ভিত্তি ছিল ভুল যুক্তিবিশ্লেষণের পরম্পরায়, হতে পারে প্রকৃত বৈপ্লবিক শিল্প যে গড়েই উঠল না তার কারণ প্রকৃত বিপ্লবই কখনো সংগঠিত হলো না সেভাবে। হয়তো সেই প্রতিজ্ঞাকৃত্য সম্পন্ন হলো না কেননা তা নিজের দর্শক বা আরো সঠিক অর্থে তার সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষক সংগঠিত করে উঠতে পারল না কখনো, প্রায়শ সেই আদি-অকৃত্রিম বুর্জোয়াসিই তার শিল্পকর্মের ক্রেতা, আর তার মানে কোন না কোনভাবে তা তাদের রুচির পক্ষেও আরামপ্রদ। সংগঠিত শ্রমিকজনতার মনোতুষ্টি শেষপর্যন্ত অধরাই থেকে গেল, তারা ছবিতেও তাদের দুঃখদুর্যোগের রূপকাঠামোয় পুনরায় আর বেঁচে উঠতে চায়নি হয়তো সঙ্গত কারণেই।

নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থাসজ্জায় সর্বদাই শিল্পের এক স্বকীয় ক্ষেত্রভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু আজ, আমাদের এই অদ্ভুত সময়ে আর বোধহয় কোন সামাজিক প্রেক্ষিত-সজ্জার জন্য কোন বিশেষ শিল্পের চর্চা সম্ভব নয়। আজ হয়তো ছবিতে তাকেই প্রিয় সম্বোধনে অভিষিক্ত করা যায়, যার জীবনচর্যার সঙ্গে তা সম্পর্কিত, যার কাছে তা প্রয়োজনীয়। হয়তো আরো অন্যান্য পণ্যবস্তুর মতো শিল্পও আজ পণ্যবিশেষ, উৎপাদিত বস্তু, যা বাজারে আসে, অপেক্ষা করে থাকে ক্রেতার জন্য। সামাজিক প্রবাহক্রম বা সামাজিক ব্যবহারপদ্ধতির সঙ্গে শিল্পবস্তুর বিচ্ছিন্নতাই হয়তো আজকের সমাজপ্রেক্ষিত। সমাজবাস্তব ধারার সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে এখনই কোন শেষকথা বলা সম্ভব নয়, উল্টে মনে হয় উভয়েরই কিছু কিছু উপাদান এখানে দেখা যাবে। তার চেয়ে বরং দেখা ভালো যে-ঐতিহাসিক ও সমাজসম্মত কারণে আমেরিকায় এই আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল, আমেরিকার শিল্পভান্ডারে যে-সমস্ত শিল্পকর্ম ও চিত্রকল্পনার স্বাধীন বীজ তা রোপণ করেছিল। এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমূহের মতো যতই তা আরো অতীতের দিকে সরে যাবে, সম্ভবত তার কোন কোন অংশ আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। □

# জন রীড ক্লাবের খসড়া ইস্তাহার

মানবজাতি ইতিহাসের গভীরতম সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। পুরনো এক পৃথিবী ক্রমে ধ্বসে পড়ছে, নতুন এক জগতের সৃষ্টি হচ্ছে। ধনিক সভ্যতা, এতদিন যা মহাদেশের আর্থরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে, আজ তা ক্রমক্ষয়িষ্ণু প্রক্রিয়ার শিকার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালেই সবচেয়ে মারাত্মক ও তীব্র আঘাতের স্বরূপ বোঝা গেছে, বলা বাহুল্য তার জন্ম ও লালন এই সভ্যতারই গর্ভে। প্রতিদিন আরো নতুন নতুন, আরো ভয়ংকর, বিধ্বংসী সব যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রসূত হচ্ছে। এই মুহূর্তে দূর প্রাচ্য সামরিক সংঘাত ও যুদ্ধপ্রস্তুতির মন্দ হাওয়ায় সিদ্ধ হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

ইতিমধ্যে ক্রমান্বিত আর্থসংকট সারা পৃথিবীর জনসাধারণের কাঁধে গুরুভার বোঝার ওপর বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে, জীবিকার জন্য যাদের আপন হাত বা মস্তিষ্কের ওপর নির্ভর করতে হয়। পৃথিবীর ছ'ভাগের পাঁচভাগ শহরেই লক্ষকোটি শ্রমিক-জনতা পথে-পথে ঘুরে মরছে, হায় কোথাও কোন কাজ খালি নেই। গ্রামাঞ্চলে অযুত কৃষক আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। ঔপনিবেশিক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিবাদে-প্রতিরোধে দলিত জনতার বৈপ্লবিক সংগ্রামে মুখর হয়ে উঠছে। ধনতান্ত্রিক দেশেও শ্রেণীসংগ্রাম আরো তীক্ষ্ণমুখ, প্রতিদিন তা আরো প্রসারিত হচ্ছে।

ধনতন্ত্রের বর্তমান সংকট তাকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে। আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে যে এই সমাজপদ্ধতি দস্যুবৃত্তি ও মিথ্যাচারিতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, কর্মহীনতা ও সন্ত্রাসের আবহাওয়ায়, ক্রমায়ত অনশন ও যুদ্ধসংকটই তার ভবিতব্য।

ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের ছায়া পড়েছে সংস্কৃতিচিন্তায়। বুর্জোয়াসির আর্থ-রাজনৈতিক যন্ত্রপ্রকরণে মরচে পড়েছে, তার দর্শন, সাহিত্য বা ছবি আজ পুরো দেউলিয়া। এমনকি বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশই আজ তার উত্থানপর্বের প্রগতিচিন্তায় আস্থা হারাতে শুরু করেছেন, আজ আর সে আদৌ শ্রেণী হিসেবে প্রগতিশীল নয়, তার জাগতিক ধারণাদৃষ্টিও আর প্রগতিপন্থার সহযোগী নয়। বরং উল্টে, বুর্জোয়াজগৎ

নিউ ইয়র্কের জন রীড ক্লাব আমেরিকায় জন রীডের স্মৃতিচিহ্নিত সমস্ত শিল্পীসমিতির তরফে এই খসড়া ইস্তাহার প্রণয়ন করেন শিকাগোয় ১৯৩২-এ মে মাসের ৩০শে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ্ রিভলিউশনারি রাইটার্সের প্রস্তাব অনুযায়ী এই সম্মেলন আহূত হয় এবং যতদিন না যথার্থ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় কার্যকরী সমিতি গঠন করা যায়, ততদিন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নের পরামর্শক্রমে নিউ ইয়র্কের জন রীড ক্লাবকেই জাতীয় সংগঠনী সমিতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়। পরে, নিউ মাসেস-এর জুন সংখ্যায় ( '৩২ ) ইস্তাহারটি প্রথম ছাপা হয়।



১১

যত গভীর অতলের দিকে চলেছে, ততই তা মধ্যযুগীয় রহস্যচিন্তায় ফিরে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে নব্যক্যাথলিক আচারবুদ্ধি। ধনিকতন্ত্র আজ আর মানবজাতির মুখে রুটি যোগাতে পারছে না, সৃজনভাবনার বিকাশেও তার অক্ষমতা পরিষ্কার।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সংকট অন্যান্য ধনিক দেশগুলির মতোই আমেরিকাকেও তার শক্ত ধাতব মুঠিতে চেপে ধরেছে। চতুর্দিকে বেকারী, উপবাস, সন্ত্রাস আর যুদ্ধের প্রস্তুতি। কেন্দ্রীয় সবকার, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সব সবকার গণতন্ত্রের ছদ্মমুখোস খুলে ফেলেছে, ফ্যাসিবাদ প্রকাশ্যে মুখ ভেঙাচ্ছে। কাজ বা রুটির জন্য জনতার দাবি মঞ্জুর করা হচ্ছে মেশিনগানেব বুলেটবৃষ্টিতে। ধর্মঘটী অঞ্চলে আর যাওয়ার উপায় নেই, সব তদন্ত নিষিদ্ধ, নেতৃস্থানীয় লোকজনকে ঠান্ডামাথায় খুন করা হচ্ছে। সংবিধানের ভণিতা ছেড়ে পাশব শক্তি যখন উন্নত জীবনযাপনের লক্ষ্যে সংগ্রামী শ্রমিক-জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, অনুসন্ধানীর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ছে চরম দুর্নীতি আর সরকারি তরফে ক্ষমতাব অপব্যবহার, সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলি আর সংগঠিত অপরাধতন্ত্রেব মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

আমেরিকায় বুর্জোয়া সংস্কৃতি আজ অন্ধগলিতে ঘুরে মরছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর বুর্জোয়া সাহিত্যশিল্পের যাঁবা পুরোধাপুরুষ, দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রতিভাধর যাঁদের মধ্যে কল্পনাশক্তির সূক্ষ্মচিকন আভা আর দুবন্ত কারিগবিবুদ্ধির সম্মিলন ঘটেছে, মানবজাতিকে আরো উন্নতস্তরে নিযে যাওয়ার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বন্ধ্যাদশা, তার নপুংসকতা বছব বছব তাঁরাই প্রকাশ কবে চলেছেন। তারা স্পষ্ট করে তুলেছেন যে যদিও বুর্জোয়াসির হাতেই রয়েছে সংস্কৃতির যাবতীয় ক্রিয়াপ্রকরণের একচেটিয়া অধিকার, তবু তা আজ ধ্বংসের পথে। গত পনেরো বছরে যে সমস্ত লেখকেরা তৈরি হয়েছেন তার অধিকাংশ উন্নাসিকতা ও হতাশার ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদিকে চলচ্চিত্র এক বিশাল দুর্নৈতিক বাণিজ্যকান্ড, হয় বালসুলভ মনোরঞ্জনের পসরা সাজিয়ে বসেছে নতুবা স্টকহোল্ডারদের লাভলোভের কাঁচা বিজ্ঞাপন সেখানে। দর্শনচিন্তা হয়ে উঠেছে অতীন্দ্রিয় ভাববাদের শিকার। বিজ্ঞান বেরিয়েছে হায়, ঈশ্বরের সন্ধানে। ছবিছাবা বিমূর্ত তুচ্ছতায় পথ হারিয়েছে।

গত দুবছরে, তাসত্ত্বেও আমেরিকার বুদ্ধিবাদীবৃত্তে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সংস্কৃতির শ্রেণীসংগ্রাম তীক্ষ্ণ শরীর নিয়েছে। সম্প্রতি আমরা যেমন বুদ্ধিবাদী মহলে একাধিক আন্দোলনের প্রভাব দেখেছি: প্রথমত ধরা যাক মানবতাবাদী আন্দোলন, যার ভাবধারণা পরিষ্কার প্রতিক্রিয়াশীল, তাছাড়া আছে উদারনৈতিক বুদ্ধিবাদীদের বামপন্থার প্রতি একধরনের নতুন আকর্ষণ।

বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ খুঁজে বার করা অবশ্য দুরূহ নয়। আমেরিকার নবপ্রজন্মের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অধিকাংশই কমবেশি মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন। যুদ্ধের

ঠিক পরেপরেই অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের কালে তাদের আয় আশাতীত বেড়েছিল, স্টক মার্কেটে লাভালাভের খেলায় মত্ত তারা নতুন যুগের সুযোগ্য সন্তান। ১৯২৯-এর শরতে হঠাৎই তাদের মাথায় বাজ পড়ল। এদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম স্বত্ব-নিরসনের কালে দেখা গেল তারাই বলির পাঁঠা। মধ্যশ্রেণীর মুখর সদস্য যত লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশ আস্থা হারিয়ে বসলেন, বিশের দশকে যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপীয় সংস্কৃতির চোরাবালিতে যারা দিবাস্বপ্নের ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন। এইসব বুদ্ধিজীবীরা হঠাৎই আবিষ্কার করলেন যে আমরা বাস করছি সাম্রাজ্যবাদ ও বিপ্লবের মরণপণ বিরোধিতার কালে : দুই ভিন্ন দর্শন, ভিন্ন সভ্যতায় তাদের অবশ্যই কোন একটা পক্ষে নাম লেখানো জরুরি।

বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের সত্যাসত্যের প্রতি তাদের সচেতনতা নিবিড় হয়ে এল আরো নানান কারণে। বুদ্ধিবাদীদের মনচেতনায় এই সংকটের যে প্রভাব পড়ল তার একটা কারণ নিহিত আছে তাদের স্বোপার্জনের সংকটে। হাজার হাজার স্কুলশিক্ষক, যন্ত্রবিদ, রসায়নবিদ, খবরকাগজের লোক বা অন্যান্য জীবিকার মানুষ তখন বেকার। প্রকাশন-ব্যবসা প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। আগের মতো মধ্যবিত্ত আর ছবি কিনছে না। চলচ্চিত্র বা নাট্যব্যবসা থেকে লেখক-অভিনেতা-শিল্পীরা রাতারাতি বিতাড়িত হলেন। এবং এই আর্থিক মহাসংকটে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা গতযুদ্ধের বমনস্মৃতির মধ্যেই দেখলেন দিগন্তে আরো এক বর্বর যুদ্ধের প্রস্তুতি। তাঁরা দেখলেন সভ্যতার যে নীতিধারণায় তাঁদের লালন ঘটেছিল তা খন্ড খন্ড হয়ে যাচ্ছে।

আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন এক সভ্যতার জন্ম হচ্ছে। তাঁরা দেখলেন ষোলকোটি মানুষের দেশ, ভূগোলার্ধের ছ'ভাগের একভাগে কৃষিকর্মীদের সহযোগিতায় শাসনকার্য পরিচালনা করছে শ্রমিকশ্রেণী। এত বড় দেশে বেকারী নেই, এদিকে ধনতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে, কিন্তু সে দেশে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে প্রতিবছর উৎপাদনের হার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদের নৈরাজ্যের বিপরীতে তাঁরা দেখলেন পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থা—এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার গুণে পুষ্ট যত পরগাছা শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটেছে, দেখলেন এমন এক জগৎ যেখানে কলকারখানা, জমিজায়গা, খনির অতলবা নদীস্রোত, জনগণের কর্মঠ হাত ও মস্তিষ্ক মুষ্টিমেয় ধনিকের জন্য নয়, গোটা জাতির জন্য সম্পদসৃষ্টি করে চলেছে। ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, তথাকথিত নিগ্রোদের ওপর শারীরিক অত্যাচার বা স্কটসবোরোর ঘটনার বিপরীতে এমন এক দেশ যেখানে ১৩২টা জাতি ও জাতিসত্তা সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের লক্ষ্যে হাত মিলিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা দেখলেন এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা, ইতিহাসে যার কোন উদাহরণ নেই, আজকের পৃথিবীতেও যার কোন তুলনা নেই। সংস্কৃতিক্ষেত্রেও স্বরাটশাসন ভেঙে পড়ছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের তত্ত্বদৃষ্টি আজ সংগঠিত

শ্রমিককৃষকের কাছেও সহজলভ্য, তাঁরা নিজেরাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রণালীর অন্যতম অংশভাক। এসব দেখে তাঁদের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সোভিয়েত ইউনিয়নই আজ নব্যসাম্যবাদী সমাজের পুরোধাশক্তি যা একদিন যাবতপুরনোর জায়গা কেড়ে নেবে।

পৃথিবীব্যাপী সংকট, আবার এক যুদ্ধের ত্রাস এবং সোভিয়েতের আশ্চর্য জাগতিক অর্জন বিষয়ে যারা গভীরভাবে ভেবেছিলেন, তাঁরা যুক্তিপথে আরো এক পা এগোলেন। কেউ কেউ আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কেনটুকি ও পেনসিলভানিয়ার ধর্মঘটী এলাকায় গেলেন, এবং শ্রমিকস্বার্থে তাঁদের প্রতিভা নিয়োজিত করলেন। নষ্টমোহ মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিবাদী শরিকদের স্বাগত। কিন্তু এই-মুহূর্তে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শ্রমিকশ্রেণীর স্বসৃষ্ট বিপ্লবী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। সর্বহারা বিপ্লবের স্বকীয় দার্শনিক কাঠামো রচনা করে গেছেন মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিন। তার আপন বিপ্লবী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদসাময়িকী ও পত্রপত্রিকার ঘরানা বিকশিত হয়ে উঠছে। শ্রমিক-সাংবাদিকরা রয়েছেন, তার আছে আপন শিল্পসাহিত্যের ইতিবৃত্ত। গত দু'দশকে অনেক উন্নত লেখকশিল্পী-সমালোচকের দেখা পাওয়া গেছে যারা বিপ্লবী শ্রমিকসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমেরিকার নতুন এক ভূদৃশ্য গঠনের চেষ্টা করছেন।

শিল্পসাহিত্যের এই নব্য আন্দোলনে আরো বিস্তৃত অবসর ও শক্তিসঞ্চারের প্রয়োজনে, শ্রমিকশ্রেণীর দৈনন্দিন সংগ্রামের সাথে সংযোগসাধনে জন রীড ক্লাব সংগঠিত হয়েছে '২৯-এর শরৎকালে। গত আড়াই বছরে এই সংগঠনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সারাদেশে মোট ১৩টি সমিতি রয়েছে। এই সংগঠনের দরজা সমস্ত লেখকশিল্পীদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। যে কোন শ্রেণীতেই তার জন্ম ও লালন হোক না কেন, যে কেউ খারকভে অনুষ্ঠিত বিপ্লবী লেখকশিল্পীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মৌলিক কার্যক্রমের সঙ্গে একমত, তিনিই এ সংগঠনের সদস্য হতে পারেন। কর্মসূচির ছ'টি ধারার সঙ্গে একমত সমস্ত সৎ বুদ্ধিবাদীগণ, যাই হোক না কেন তাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন।

(১) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হোন। ধনিকতন্ত্রের আগ্রাসন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করুন।

(২) সামাজিক ফ্যাসিবাদের মতো গুপ্ত বা প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

(৩) বিপ্লবী-শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ও শক্তিঅর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম জারি রাখুন।

(৪) শ্বেতাধিপত্যের বিরুদ্ধে, নিগ্রোদের বিষয়ে যাবতীয় ভেদচিন্তার ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে, বিদেশজাত মানুষজনের নিগ্রহের বিরুদ্ধে লড়াই থামাবেন না।

(৫) বিপ্লবী লেখকশিল্পীর কাছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর দৃষ্টিধারণার যাবতীয় প্রভাবের বিরোধিতায় ক্লান্তিহীন লড়াই জারি রাখুন।

(৬) বিপ্লবী লেখকশিল্পীদের কারারুদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে, গোটা পৃথিবীতে শ্রেণীসংগ্রামের কর্মীদের বন্দীদশার বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

এই সামান্য কর্মসূচির ভিত্তিতে, সমস্ত সৎ বুদ্ধিবাদী, সমস্ত সৎ লেখকশিল্পীদের কাছে আহ্বান : আসুন, শিল্পের জন্যই শিল্প—এই বিশ্বাসঘাতকের মায়াবিভ্রম আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পরিত্যাগ করি ; আসুন, এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বপ্রযোজনায় যেখানে সমস্ত মানুষকেই কোন না কোন পক্ষ গ্রহণ করতে হবে, তার থেকে শিল্পীরা দূরে থাকতে পারেন—এই ধারণা স্থিরসিদ্ধান্তে ত্যাগ করি। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে ধনিক-সভ্যতার ক্ষয় ও দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নষ্টামিকে যা ঢেকে রাখে সেইসব বুর্জোয়া ধারণাপাশ ছিন্ন করুন। আমরা সকলকে বলছি, আসুন ধনিকতন্ত্রের শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে হাত মেলান। নতুন ও আরো উন্নত পৃথিবীর লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে যা যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত হবে, তেমন এক নব্যশিল্পের উদ্বোধনে আসুন তাদের শিল্পসাহিত্য আন্দোলনে যোগ দিন, আমরা আন্তরিকভাবে সকলকেই একথা বলছি। □

# আমেরিকান আর্টিস্টস্ কংগ্রেসের ঘোষণা

এই আহ্বান তাঁদের প্রতি, যে সব শিল্পীরা নিজ নিজ পেশাকে সমস্ত অবস্থান্তরের মধ্যেও আঁকড়ে ধরে রয়েছেন এবং একই সাথে যাঁরা সমগ্র বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং বিশেষত শিল্পক্ষেত্রে পরিস্ফুট সাম্প্রতিক জটিলতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও প্রসারের স্বার্থে যথার্থ কর্মসক্রিয়তাই যাঁরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করেন, যাঁরা কর্মক্ষেত্রে যৌথ আলোচনা ও যৌথ পরিকল্পনাই একমাত্র উপায়—একথা উপলব্ধি করেছেন এবং সাংস্কৃতিক এই সংকট যাঁরা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করেন না, তাঁদের সকলের কাছেই এই আহ্বান প্রেরিত হচ্ছে।

আমেরিকান ফ্যাসিবাদ প্রসারের যেসব প্রমাণ রোজই ক্রমতালিকার দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের রাষ্ট্রানুগত্যের শপথ, কলেজগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের দৌরাত্ম্য এবং রাজদ্রোহিতা বিষয়ক বিলগুলি যা নিশ্চিতভাবেই নাগরিক অধিকার খর্ব করার সক্রিয় প্রচেষ্টা বলে আমাদের প্রত্যয় হয়। এর সাথে রয়েছে বিদেশজাত আর নিগ্রোদের প্রতি বিভেদমূলক নীতি, লিবার্টি লীগের মতো প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির উত্থান এবং নীতিহীন সাংবাদিকতা।

ইতালি ও জার্মানির ইদানীংকার ঘটনাবলীর মধ্যে জীবনযাত্রার মান, নাগরিক

স্বাধীনতা, শ্রমিকসংগঠনগুলি এবং ব্যাপকঅর্থে শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ছবি স্বচক্ষে দেখে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান শিল্পীর কর্তব্য এর বিরুদ্ধে জোরদার আওয়াজ তোলা। ফ্যাসিবাদ সারা পৃথিবীর শান্তি-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

অবশ্যই আমাদের কিছু করা উচিত। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে এককভাবে কিছু করে ওঠা একেবারেই অসম্ভব। একমাত্র যৌথকর্মের ভিত্তিতেই আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারি। এজন্য যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের অংশীদার সমস্ত দলগুলির সাথে আমাদের কাজের যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

সুতরাং এই মুহূর্তে আশুকর্তব্য হলো বিশ্বের সমস্ত সহমর্মী সংগঠনগুলির অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয়স্তরে আমাদের, শিল্পীদের এক স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলা, যা আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে নিয়ত কাজ করে যাবে।

নিউইয়র্ক শহরে ডিসেম্বরের গোড়ায় অনুষ্ঠিতব্য শিল্পীসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হবে এই ধরনের একটি সংগঠনের জন্মদান। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ : ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ ; জাতিবৈষম্য ; নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ; বিপ্লবী লেখকশিল্পীদের কারামুক্তি ; সরকারি (কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং পৌর) শিল্পপ্রস্তাবনাগুলি ; পৌর শিল্পপ্রদর্শনকেন্দ্র ; কেন্দ্রীয় শিল্পবিল ; ছবিছাবার ভাড়াব্যবস্থা ; বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে শিল্পবিদ্যালয়গুলির অবস্থা ; সংরক্ষণ-নীতি ; শিল্পের বিষয়বস্তু ; নন্দনতাত্ত্বিক নির্দেশনা ; শিল্পের বিষয়বস্তুর সাথে উপাদান ও প্রচারমাধ্যমগুলির সম্পর্ক এবং শিল্পসমালোচনা।

নিম্নস্বাক্ষরকারী শিল্পীরা, যাঁরা আমেরিকার প্রায় সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন আহ্বানপত্রে স্বাক্ষর এবং সম্মেলনে সক্রিয় যোগদানের মাধ্যমে পারস্পরিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এবং যোগাযোগ আরও দৃঢ় করে তোলার জন্য।

**অভিনন্দনসহ**

| | | |
|---|---|---|
| মরিস বেকার | পিটার ব্লুম | আরন বোহর্ড |
| স্টুয়ার্ট ডেভিস | অরি ডগলাস | নিকোলাই সিকোভস্কি |
| হ্যারি গটলিয়েব | উইলিয়াম গ্রোপার | সল স্কারি |
| বেট্রাম হার্টম্যান | জো জোনস | জর্জ অল্ট |
| ল্যুইস মামফোর্ড | বেন শান | আর্নল্ড ব্লুশ |
| ক্যাথরিন শ্মিট | ডেভিড স্মিথ | এবং আরো ৮৯ জন |

পয়লা অক্টোবর, উনিশশো পঁয়ত্রিশ।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

## দাভিদ আলফ্যেরো সিক্যেরাস

# এক নতুন ও অখণ্ড শিল্পধর্মের সন্ধানে

সব যুগে যেখানেই শিল্পচর্চায় জোয়ার এসেছে, দেখা যায় সেই স্রোতোধারা অখণ্ড। চীন, ইজিপ্ট, গ্রীস, বা রোমে, খৃষ্টীয় মধ্যযুগ, আরবস্থনিয়ায়, রেনেসাঁর আগে, ভারতবর্ষে, প্রাক্‌-হিস্পানিক বা এমনকি ঔপনিবেশিক আমেরিকাতেও একই অখণ্ডচেতনার প্রকাশ। স্পষ্ট করে বলা যায় এক অখণ্ডশিল্পধর্ম— স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ছবি বা বর্ণচিত্রণের কাজে যা একই মর্মে প্রকাশিত।

এই গুণগত ঐক্য বস্তুত কার্যকরী ঐক্যধর্মের ফলাফল। ভৌগোলিক, আঞ্চলিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, তৎসহ উপাদান ও সমকালীন কারিগরিজ্ঞানের সুলক্ষণা যোগাযোগেই কার্যকরিতার উৎপত্তি। সেই সময়ের সমাজ-নান্দনিক উদ্দেশ্যপ্রকৃতির প্রতিও তা দায়বদ্ধ। সমকালীন শিল্পজগতে, যেখানে নবজাগরণ সবে শুরু হয়েছে, ছবি ও স্থাপত্যের কাজে উজ্জ্বল সম্ভাবনা চোখে পড়ছে, সংগঠিত ঐক্যের নতুন কোন সূত্র অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি, কেননা কার্যকরিতা সম্পর্কে সামাজিক ও নান্দনিক ধারণা আমাদের এখনও অসম্পূর্ণ অথবা তাৎপর্যহীন।

মেক্সিকোর ম্যুরাল আন্দোলন, আমাদের আন্দোলন,-

শুরু হয়েছিল স্পষ্টতই কার্যকরী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে—এক্ষেত্রে বিশ্বশিল্পের সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম, ইতিহাসসম্মত কারণেই সুতরাং তা গুরুত্বপূর্ণ।

মেক্সিকোর প্রথমদিকের দেওয়ালছবি সব আঁকা হয়েছিল স্থাপত্যের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যহীন, অদ্ভুত যত বাড়িতে—ন্যাশনাল প্রিপারেটরি স্কুল অফ্ এগ্রিকালচার, ন্যাশনাল প্যালেস বা সেক্রেটারিয়েট অফ পাবলিক এডুকেশনের দেওয়ালে।

নতুন কোন কোন বাড়িতেও কাজ হয়েছে, সেক্ষেত্রে ছবি ও স্থাপত্যের সামগ্রিক ঐক্যপ্রস্তুতির অভাব ছিল। হেলথ মিনিস্ট্রি বা সুপ্রিম কোর্টস অফ্ জাস্টিসের বাড়িতে করা কাজগুলি দেখলেই তা বোঝা যায়।

শেষপর্যন্ত আমাদের মধ্যে যারা ততদিনে প্রথম-প্রথম কাজের ভুলত্রুটি অসন্তোষের সঠিক কারণগুলি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন, ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ঘটিয়ে নিয়েছিলেন। পুরনো কাস্টমস বিল্ডিং, এখনকার ন্যাশনাল ট্রেজারিতে আমি নিজেই এ কাজ করেছি। সত্যিসত্যি আমরা দেওয়ালে স্থাপত্যসম্মত সেই ছবিই আঁকতে চাই, যা পারস্পরিক অখন্ড সহযোগিতায় গড়ে উঠবে। আলঙ্কারিক নকশার ঘেরে খন্ড খন্ড আলাদা ছবি শুধু জুড়ে দিলেই হলো না।

এই সত্যিকথাটা সুতরাং এখানে বলা যায় যে আমাদের আন্দোলন কার্যকরিতার ভিত্তি স্পর্শ করেছে, গোটা বাড়িটার সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু তবু আমরা আজ যে-অখন্ড কারুতন্ত্রের কথা বলছি, অখন্ডশিল্পের যে উদ্দেশ্যপ্রকৃতির কথা বলছি, তার ধারেকাছেও তা পৌঁছতে পারেনি। এখনো, ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের যত বাড়ির দেওয়ালে আমরা কাজ করেছি, আসল বাড়িটাই আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, স্থপতিরা জানেনই না কীভাবে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সংযুক্তি ঘটাতে হয়। পুরনো বাড়ি বলেই আমরা পুরনো রীতিপ্রকরণ বেছে নিয়েছি। ফ্রেস্কো বা এনকস্টিক পদ্ধতির সঙ্গে এ ধরনের স্থাপত্যরীতির একটা জৈব সম্পর্ক আছে।

যাবতীয় সৃজনপ্রকল্পে, বিশেষত যা চাক্ষুষ, যার একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য আকার-আয়তন আছে, তার গড়ন বা শৈলী, এবং শেষপর্যন্ত যে-শিল্পধর্ম সেখানে প্রকাশিত হয়, সেসবই অখন্ড কার্যকরিতা ও তুলনীয় কারিগরির ফলাফল। ভুলে গেলে চলবে না যে উপাদান ও যন্ত্রসাধনী এক্ষেত্রে প্রকৃতিগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শ গড়ন ও শৈলীর নির্ধারক।

এতক্ষণ আমি কিছু ঐতিহাসিক তথ্যই দিয়েছি, আর সেবিষয়ে কিছু মতামত। কিন্তু যে-পথে সমাজের পরিবর্তন ঘটছে তাতে কি আমরা আদৌ মনে করতে পারি যে শিল্প আবার কোনদিন এক অখন্ডচর্চার বিষয় হয়ে উঠবে? অর্থাৎ ছবি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা বর্ণচিত্রণ আবার একদিন এক সৃষ্টিসমগ্রে পরিণত হবে?

আমার মতে, যারা এই বিংশ শতাব্দীতে, মনে করেন যে স্বাধীন স্বক্রিয় স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পের প্রকাশমুক্তি ঘটেছে, তারা ভুল করছেন। যুগ যুগ

থারে যদি অখণ্ডশিল্পকৃতিই সৃষ্টিধর্মের মহত্তম প্রকাশ হয়ে থাকে, তবে এই মুক্তি নিতান্তই অঙ্গচ্ছেদের সমার্থক, এক্ষেত্রে নান্দনিক বিষয়ধর্মের সম্ভাব্য অবক্ষয় ছাড়া কিছুই নয়।

স্থাপত্য থেকে ছবি, ভাস্কর্য, স্টেইনড গ্লাস ইত্যাদির বিচ্ছিন্নতা, রেনেসাঁ-পরবর্তী উদারনৈতিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। নতুন সমাজ, যে-সমাজ আজ আমাদের চোখের ওপর বেড়ে উঠছে, ক্রমেই আরো যৌথ সমাজভিত্তিতে প্রসারিত হবে, এবং আমাদের ঐতিহ্যের জন্ম হয়েছে যে-সমস্ত সমাজের গর্ভে, তার থেকে অনেক অনেক বেশি উদার উন্মুক্ত হবে। কারণ অতীতের সমাজ ছিল অধ্যাত্ম-শাসিত, সংগঠিত ধর্মীয় সমাজ, জনগণ যেখানে অঙ্গুলিমেয় শাসকপ্রতিনিধির দাসত্বে বাধ্য ছিল।

আজকের পৃথিবী, যা ভবিষ্যৎ দুনিয়ারই ইঙ্গিতে ভরা, এখনই আরো বহু মানবিক বিষয়ের মতো, সংযুক্ত শিল্পধারণার গণতান্ত্রিক দুয়ার খুলে দিয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যৎ নাগরিক স্থাপত্যধারণায় স্বশাসিত স্বাধীন বাস্তু-নির্মাণের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, গড়ে উঠবে বিশাল স্টেডিয়াম, থিয়েটার ও সিনেমার উন্মুক্ত প্রাঙ্গন ও অডিটোরিয়াম, অনেক স্কুল, হাসপাতাল, আর যাদুঘর, আধুনিক সমাজকর্মী ও শিল্প ও বিজ্ঞানের সপ্রতিভ নতুন কর্মীদের নামে স্মৃতিসৌধ হবে। এসমস্ত বাস্তুগৃহ শুধু যে বড় বড় শহরের কাছাকাছি নির্মিত হবে তাই নয়, অতীতের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়গুলির মতো অখণ্ড শিল্পচেতনায় ভবিষ্যতের নয়া-গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সাযুজ্যে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এই স্থাপত্যশৈলী স্থির বা যন্ত্রসচল দেওয়ালচিত্র, নতুন ধরনের স্টেইনড গ্লাস ও সামগ্রিক বর্ণচিত্রণে সজ্জিত হবে—সামগ্রিক অর্থে এক অনাড়ষ্ট সামাজিক বাচনভঙ্গি, কেননা এই শৈলী কোন অবস্থাতেই শব্দার্থে আরামদায়ক হবে না, হয়ে উঠবে শিক্ষা-মূলক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও নান্দনিক অর্থে হয়ে উঠবে প্রীতিপ্রদ, চিৎপ্রকর্ষ-সাধনী।

এই সংযুক্ত শিল্পশৈলী সম্ভব হতে পারে নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপ্রযুক্তির সাহায্যে। অতীতের প্রযুক্তি অধিকাংশক্ষেত্রেই নিছক প্রায়োগিক ও কারিগরসুলভ। আধুনিক স্থাপত্যনির্মাণের ক্ষেত্রে অথচ বিশাল প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছে, খুবই আশ্চর্য যে তা প্রায় সমস্ত ছবি-আঁকিয়ে ও ভাস্কর বা নকশাবিদের চোখ এড়িয়ে গেছে।

এই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা সিমেন্ট, স্টিল, গ্লাস ও প্লাস্টিকসহ আধুনিক জৈব রসায়নের আবিষ্কৃত যাবতীয় পদার্থই ব্যবহার করে, যেমন সেলুলয়েড, কৃত্রিম অয়েলক্লথ, বেকলাইট, ভাইলিন, যাবতীয় সিলিকন ও পাইরোক্সিলিন, উজ্জ্বল বর্ণসমূহ, কৃত্রিম আলোক-উৎসের সমস্ত কৌশল, বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যার প্রয়োগকৌশলে বর্ণের দ্রুত, প্রায় বৈদ্যুতিক গ্রহণীয়তা তৈরি হয়। ঠিক যেমন আজ বর্ণসংবেদ্য

ফটোগ্রাফিক কাগজ আমাদের হাতে আছে, তেমনই আরো যেসব পদার্থ প্রতিদিন বিজ্ঞান আবিষ্কার করে চলেছে, তার সব ব্যবহার করতে হবে। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে নতুনতর যন্ত্রসাধনী, যেমন স্প্রেগান, লিনিওগ্রাফ, এ্যারোগ্রাফ, ম্যুরালের জন্য পেন্টোগ্রাফ, স্টিল ক্যামেরা, বা ম্যুভি ক্যামেরা ইত্যাদি, এবং ইলেকট্রিক প্রোজেক্টর এবং অন্য আর যাকিছুই আকৃতিনির্ভর শিল্পকার্যের উপযোগী ও সাহায্যকারী।

নতুন উপাদানের প্রয়োগকৌশল নতুন রচনাবিন্যাস ও দৃষ্টিকোণের সাযুজ্যে গঠনকাঠামোরও নতুন প্রয়োগ দাবি করে। যেহেতু পুরনো গঠনকাঠামোর সমস্তই খুব জড়, দার্শনিক নিষ্ক্রিয়তার ছলে খুবই যান্ত্রিক, সক্রিয় আবহমণ্ডলে তা নিতান্ত বেমানান। সেই স্থাপত্যশৈলী যেখানে জ্যামিতিক সমস্ত কাঠামোবিন্যাসই গতিধর্মী, কখনোই স্থিরনিশ্চল নয়, আয়ত বা বর্গাকার যাবতীয় গড়নই আর নিশ্চল থাকতে পারে না, কল্পনাসাধ্য যে কোন পথেই তা ক্রমাগত রূপান্তরিত হতে থাকবে। দর্শককে আর কোন মূর্তি বা নিজের অক্ষে ঘূর্ণমান কোন অটোমেটন হিসেবে ভাবলে চলবে না, তাকে সর্বোপরি মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যে নির্দিষ্ট জায়গার ঘেরে তার ইচ্ছেমতো চলেফিরে বেড়াতে পারে।

স্থাপত্যের তলবিন্যাসে ছবি ও ভাস্কর্যের টেকনিক গ্রহণ করে উত্তল ও অবতল দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে, এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে দৃশ্যত পৃথক চিত্র ও ভাস্কর্যক্ষেত্রে তা ভেঙে দিতে হবে।

যদি এই অখণ্ডধর্ম প্রকৃতই কার্যকরি হয় তাহলে এই মনস্তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক প্রযুক্তিবিদ্যা সুব্যবদ্ধ নয়া বাস্তববাদী কাঠামোয় এক উজ্জ্বল সমাজ-রাজনৈতিক পরিপূরকধর্ম হয়ে উঠবে। আধুনিক স্থাপত্যে ইদানিং আমরা যেসব শুদ্ধ আলংকারিক প্রয়োগ দেখে থাকি, সে সব খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ছবি ও ভাস্কর্যের যত পুরনো প্রয়োগরীতি, যে রীতিপদ্ধতি এখনও আমার অধিকাংশ মেক্সিকান কমরেডরা ব্যবহার করে চলেছেন, অচিরেই আমরা যে নতুন স্থাপত্য ও অখণ্ডশিল্পধর্মের কথা বলছি, সেখানে স্বধর্ম-বিরোধী বলে চিহ্নিত হবে। শুধু একবার ভাবুন সেইসব ম্লান ভাস্কর্যখণ্ডের কথা, যা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত নয়, একবার ভাবুন সেই দেওয়ালছবির কথা, যা ইজেল-পেইন্টিং-এরই কোন বর্ধিত রূপ, ফ্রেস্কো বা এনকাস্টিকের প্রয়োগরীতি, একক একখণ্ড দেওয়ালছবির কঠিন বিন্যাস, বা যে-পদ্ধতিতে একটা ভাস্কর্য বা ছবি আলোকিত করা হয়, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এর কোনকিছুই সঠিক নয়। প্রাচীন গৃহস্থাপত্যে হয়তো আধুনিক ছবিভাস্কর্য বেমানান, কিন্তু তার চেয়েও বাজে হলো নতুন বাড়িতে পুরনো রীতির কাজ। নতুন কন্ঠস্বর, অখণ্ড শিল্পচেতনার নতুন কোন স্বরযন্ত্র থেকেই উচ্চারিত হতে পারে।

দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পকর্মের প্রতি সমাজের সহযোগধর্মের প্রধান সমস্যাগুলি, এবং এক্ষেত্রে কীভাবে একত্রচিন্তা ও কাজ করা যায়, তা বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে চর্চারত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একসাথে বসে যথার্থ তাত্ত্বিক বাস্তব প্রয়োগের ভিত্তিতে তার যথাযথ সমাধানের দিকে এগোতে হবে।[১] □

# সিকেরাসের ভাষণ

## মেক্সিকোর সমকালীন শিল্প-অভিজ্ঞতার আলোয়

# লাতিন আমেরিকার বিপ্লব ও তার দৃশ্যকল্প

আমি নিশ্চিত যে আপনারা সকলেই দিয়েগো রিভেরার সঙ্গে 'হোটেল দেল প্রাদো'-র সংঘাতের খবরটা শুনেছেন। এই পর্যটককেন্দ্রে তাঁকে একটা দেওয়ালছবি গড়ে তোলার কাজ দেওয়া হয় এবং বলা হয় এমন কিছু একটা আঁকতে যা মেক্সিকো শহরের প্রধান কেন্দ্র আলামেদা অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্ভবত যাঁরা তাঁকে একাজের ভার দিয়েছিলেন, মনে মনে ভেবেছিলেন রিভেরা তাঁদের নিশ্চয়ই কোন বিমূর্ত আলামেদা এঁকে উপহার দেবেন, অথবা হয়তো কোন পুষ্পিত তরুলতা হায়! অথচ, রিভেরার চোখে মেক্সিকোর রাজধানী শহরের বহুরঙ্গী কেন্দ্র এই আলামেদার তাৎপর্য একেবারেই ভিন্ন —এ হলো সেই ঐতিহাসিক পাদভূমি, যার উপর দিয়ে তাঁর স্বদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ মিছিল করে এগিয়েছে। আলামেদা দেখেছে দেশপ্রেমের জোয়ারী সংগ্রাম, দেখেছে বিশ্বাসঘাতকের সংকীর্ণ চলাফেরা ; সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু ও শত্রুরা তার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে, কখনো দাপিয়ে ফিরেছে প্রতিক্রিয়াশীল চরদুর্জন অথবা বিপ্লবী নীতিকর্মী-শিক্ষকেরা। তাই রিভেরা যা আঁকলেন, তা হলো মেক্সিকোর ইতিহাস, আলামেদাকে ব্যবহার করলেন সময়ানুক্রমের সাযুজ্যে। কিন্তু মেক্সিকোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ততদিনে পাল্টেছে : বিপ্লব পরিষ্কার নতমুখ, রাষ্ট্রক্ষমতা মুষ্টিমেয় নব্য-ধনিকের নতুন স্বার্থান্বেষী সংগঠনের দখলে, একদল 'বালকে'র জয় হয়েছে, বিপ্লবের সময়ে যারা আখের গুছিয়েছিল, তাদের সন্তানেরাই এখন প্রভু। আর জনগণ নয়, ক্যানানিয়া বা রিও ব্লনকোর ধর্মঘটী মজদুর বা তাদের উত্তরপুরুষেরা নয়, এমনকি ফেডারেল আর্মির বিরুদ্ধে বিপ্লবের অগ্রদূত সেইসব শ্রমিকযোদ্ধারাও নয়, দেশ এখন এক নতুন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর দখলে। এবং যদিও 'হোটেল দেল প্রাদো' সরকার-পরিচালিত জাতীয় সম্পত্তি, তবু দেখা গেল নষ্টপ্রেরণায় একদল প্রতিক্রিয়াপন্থী ছাত্র সহজেই সেখানে ঢুকে ছবিটার রীতিমতো ক্ষতি করে এল। রিভেরার ছবিতে ইগনাশিও রামিরেজের সেই বিখ্যাত প্রবচনটি উদ্ধৃত ছিল : 'ঈশ্বর আদৌ নেই ; বিশ্ব-

১. Towards a New Integral Art, সেপ্টেম্বর ১৯৪৮।

প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই চলে'। রিভেরা ছবির অন্য অংশে কিছু ধর্মীয় শ্লোকও ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত 'আদিম সন্তানে'রা আসলে প্রথম কথাটাই সহ্য করতে পারেনি। ঘটনার পর সংগঠিত দেওয়ালচিত্রী ও তাদের সমর্থকেরা কালা-পাহাড়ী ছাত্রদলের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে নামল, সরকারের কাছে দাবি জানাল অবিলম্বে ছবির যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। তারপরও আদর্শের লড়াই থামেনি। হোটেল দেল প্রাদো আসলে ইয়াঙ্কি ট্যুরিস্টদের জায়গা, সেকারণেই এ-ছবি সেখানে থাকতে পারে না। একের পর এক সমাগত মার্কিন রাষ্ট্রদূতেরা বারংবার অনুরোধ করে গেছেন, ছবিটা ধ্বংস করা হোক। মার্কিন সরকারের যত আমলা মেক্সিকোয় বেড়াতে এসেছেন, সকলেই একতরফা ছবিটার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। এমনকি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মার্কিনী দূতের বাড়ির মেয়ে-বউরাও যখনই কোন উচ্চ সরকারি আমলা বা রাষ্ট্রপতির দেখা পেয়েছেন, এ প্রশ্ন শুধিয়ে নিতে ছাড়েননি—"সরকারি বাড়ির দেওয়ালে বলশেভিক ম্যুরাল আঁকার অনুমতিটা দিল কে?" অতএব …অতএব সে ছবি শেষপর্যন্ত ঢাকা পড়ল, বছরের পর বছর ধরে লোকচক্ষুর আড়ালেই পড়ে থাকল।

তো, আপানারা দেখলেন সরকারের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভেদপ্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ। আজ আর মেক্সিকোর সরকার আমাদের দেওয়ালছবির আন্দোলনে উৎসাহী নয়। রাজনৈতিক ছবির বিস্তার তারা চায় না, গত কুড়ি বছরে তাদের সে-ইচ্ছে কখনো হয়নি। এই প্রতিবিপ্লবী সরকার চায় না মেক্সিকোর জনগণ জাপাতা-র কর্মসূচির কথা মনে রাখুক, চায় না যে রিকার্দো ফ্লোরেস ম্যাগান গ্রুপের কর্মসূচির কথা আর একবার স্মরণ করুক—মেক্সিকোর বিপ্লবে সামান্য শিক্ষানুশীলনের ছোঁয়াও যারা দিয়েছিল একদা। পরফিরিও দিয়াজের আমলে আমাদের দেওয়ালছবির আন্দোলন তারা সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। আজ রাষ্ট্রের আদর্শদৃষ্টিই অন্যরকম। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টসের পরিকল্পনায় কিছুদিনের জন্যও দেওয়াল-ছবির আন্দোলনে কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল না, বদলে ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে। এ জাতীয় শিল্পসম্মত উৎপাদনপ্রকল্প যাতে বানচাল হয়ে যায় বরং তার জন্যই সব কিছু করা হয়েছে। ঘরেবাইরে সরকারের মৌল রাজনৈতিক নীতিসূত্রেরই যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি এই প্রবণতা। অথচ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল স্পষ্টত লোকপ্রিয় কর্মসূচির বিকাশসঞ্চারে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল শিল্পের লোকপ্রিয় ধারার পুনর্জাগরণ, এবং এইভাবে পরফিরিও দিয়াজের আমলে শিল্প-আন্দোলনের যে-অভিজাত চরিত্র, তার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা। কিন্তু আজ আর লোকপ্রিয় সংস্কৃতিনিষ্ঠায় তারা উৎসাহী নয়, সেই সংস্কৃতি—জনগণের হৃদয়েই যা পুনরায় ঠাঁই করে নেয়। কী হলো শেষপর্যন্ত? জনগণের শুশ্রূষায় যে শিল্পের প্রাণ, আইন করে যে-প্রাণসম্পদ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, কেন আজ তা উল্টোমুখ? বলা বাহুল্য

এ হলো এক মহাদুর্যোগের ফলাফল মাত্র—শুধু মেক্সিকো নয়, গোটা লাতিন আমেরিকাতেই তা আজ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সামাজিক বিপ্লব যদি কখনো সম্পূর্ণ না-হয়ে থেমে যায় মাঝপথে, তবে ক্রমেই তা পেছনে হড়কাতে বাধ্য, যেমন ঘটেছে মেক্সিকোর ক্ষেত্রেও। আমরা যারা যৌবনে মরণপণ লড়েছি তার জন্য, আমাদের কাছে এ পরিস্থিতি দুঃখের, যন্ত্রণার। সাম্রাজ্যবাদীরাই জিতেছে, তাদের সাহায্য করার জন্য খিদমতগারেরও অভাব হয়নি মেক্সিকোয়। ভাবা যায় না যে তার সংখ্যাও কত বেশি এদেশে।

ভেনেজুয়েলার বন্ধুরা, শিল্পী, বুদ্ধিবাদী, শ্রমিকসাথীরা, তোমাদের ভালোবাসার মেক্সিকো আর তা নেই, গত কুড়ি বছর ধরে ছদ্মবিপ্লবী সরকারের একতরফা প্রচার যে-কথা হয়তো তোমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছে তা সত্যি নয়। একথা আমি পরিষ্কার স্পষ্টভাবেই বলতে চাই যাতে তা এমনকি মেক্সিকো পর্যন্ত শোনা যায়। কিন্তু একই সাথে একথাও যদি আমি আজ না বলি যে তবু সব শেষ হয়ে যায়নি, নতুন এক সমাজ-বিপ্লব আসন্নপ্রায়, তবে সত্যের গোটা শরীর অধরা থেকে যাবে। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, শেষ হয়েছে নিদারুণ মৃত্যুশোকে, বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন দেড় মিলিয়ন মেক্সিকোর মানুষ।

কিন্তু এখন, এই নতুন পরিস্থিতিতে, আমরা, মেক্সিকোর শিল্পীকারুকর্মীরা, কী আমাদের করা উচিত? আমাদের কাজ, আমাদের সংগ্রামী মনচেতনা নিয়ে কী ভূমিকা রাখতে পারি আজ? আমি খুশি হব যদি আপনারা এ নিয়ে আপন হৃদয়বুদ্ধির সঙ্গে কথা বলে দেখেন একবার। হয়তো আপনারা আমাকে বলবেন: "তুমি তো এ পর্যন্ত দেওয়ালে-প্রাচীরে অনেক বিপ্লবী ছবির কাজই শেষ করেছ, আর কী দরকার, না হয় বিশ্রাম নিলে কিছুদিন। জনগণের জীবনসমস্যাই যে সব ছবির প্রাণবস্তু—কতদিন ধরেই না সে সব তুমি আঁকছ, আর না হয় একাজ না-ই করলে। এখন তোমার নির্দোষ কিছু পবিত্র ছবিই আঁকা উচিত, বা ধরো সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে ভাবলে, বেশির বেশি আঁকতে পারো কাব্যিক কিছু ছবি। কেন তুমি এখনও রাজনীতিভাবনার ছবিই শুধু এঁকে যাচ্ছ, যখন তুমি নিজেই বলছ যে দেশ এখন ঠিক তা গ্রহণ করার অবস্থায় নেই, কেন আর দেওয়ালে ছবি আঁকা যখন সরকার তার ওপর আঘাত হানছে কেবল, পারলে ধ্বংস করে দিচ্ছে?" আমি হয়তো তার জবাবে বলতে পারি: "না আমরা তা করতে পারি না। বিপ্লবের ক্রোড়েগর্ভে আজন্মলালিত এই আমাদের অভিযান যে কোন মূল্যে জারি রাখতেই হবে। আমাদের ছবির কাজ সর্বদাই জন-গণের জন্য উন্মুক্ত, সেই মুক্তির হাওয়াবাতাস রুদ্ধ হতে পারে না, জনগণের সমস্যা-দুর্যোগ ঘিরেই তা আবর্তিত হতে থাকবে। আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষ্যে, রাজনৈতিক স্তরে এখনই তার ঘোষণা শোনা যাচ্ছে।"

দিয়েগো রিভেরা যে-কাজ করে যেতে পারেননি, একবার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন

অফ অ্যাকটরস্‌ আমাকে সে-ছবি আঁকার কথা বলেছিল। মেক্সিকোর থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের ইতিহাস হচ্ছে তার উপজীব্য। বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, আমার মনে হচ্ছিল যেন খুব বেশি ছড়ানো প্রচল বিষয়, ঠিক কোন কেন্দ্রীয় ধারণাবিন্দু নেই যেন, তাদেরও বললাম সেকথা। বদলে মনে হলো বিষয় হওয়া উচিত মেক্সিকোর বর্তমান চালচিত্র, যেখানে থিয়েটারের ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করা হবে সময়ক্রমের ঘেরবন্ধন হিসেবে। তারা রাজি হলো। কিন্তু তারপর কী হলো ? প্রথম থেকেই আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি মেক্সিকোর দেওয়ালচিত্র আন্দোলনের পুরোধা ও ও প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, আমি হয়তো থিয়েটার-কর্মী-অভিনেতাদের সরাসরি, পরোক্ষে লেখকদের বলব তাদেরও তা-ই করা উচিত, যা আমরা ছবির ক্ষেত্রে করেছি। আমি তো সাধারণ কোন বিষয়, খুশি-উচ্ছ্বাসের কিছুই বেছে নিতে পারতাম ; তাহলে তো কোন সমস্যাই হতো না। কিন্তু সে কাজের অর্থ হলো ওরোজকো, রিভেরা, ড. অ্যাট্‌ল্‌ এবং এই আন্দোলনের জীবিত বা মৃত সমস্ত কর্মীসদস্যের সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাস-ঘাতকতা। তার অর্থ গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এদেশের জন্য রাজনৈতিক কারণে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সকলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা। দুঃখিত, আমার কাছে কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।

আমি ছবিটা দুভাগে ভাগ করে নিলাম : এক অংশে মেক্সিকোর থিয়েটার, তার অতীত ইতিহাস, আর এক অংশে আমি আঁকলাম আজকের ও ভবিষ্যতের মেক্সিকোর থিয়েটার-সিনেমা-টেলিভিশনের ভূমিকা যা হওয়া উচিত বলে মনে করি। লেখকবন্ধু আর্মান্দো দি মারিয়া ই কাম্পোসের সহায়তায় আমি মেক্সিকোর থিয়েটার বিষয়ে একটা আকর্ষণীয় আবিষ্কার করেছিলাম। আমি দেখলাম অতীতে মেক্সিকোয় একটা চমৎকার রাজনৈতিক থিয়েটারের ঐতিহ্য ছিল, যদিও অধিকাংশ লোকেই তা জানে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিপ্লবের সময়ে প্রথম কয়েকবছরে বহু নাট্যকার, তাদের মধ্যে রোদোলফো উসিলি-ও আছেন, এমন অনেক নাটক লিখেছেন যা ফেডারেল ও আঞ্চলিক শাসকপ্রভুদের মধ্যে উদ্ভূত স্থানীয় ‘caudillo’ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় আপোসহীন। এমনকি এই ব্যবস্থায় সায় ছিল কৃষকনেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরও। এ সময়ের নাটকে নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী, যা আসলে এখনকার স্বার্থান্বেষী চক্রেরই ভ্রূণাকার, তার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা হলো। রোদোলফো উসিলির ‘দি গেসটি-কুলেটার’-এর কথা তো এক্ষুনি মনে পড়ছে, তাছাড়াও অনেক কাজ হয়েছে। আমি আরো আবিষ্কার করলাম জেনারেল দিয়াজের স্বৈরাচারী শাসনকালেও রাজনৈতিক থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল, বস্তুত সেসময়ে এই ধরনের থিয়েটারেই শ্রোতাদর্শকের সমাগম হতো বেশি। রিকার্দো ফ্লোরেস ম্যাগানের লেখা ‘ল্যান্ড অ্যান্ড লিবার্টি’-র মতো নাটক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং কৃষিবিপ্লব ত্বরান্বিত করার সংগ্রামে খুবই কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছিল। মেক্সিকোর সাহিত্য নিয়ে যারা চর্চা করছেন, ভালো করবেন যদি তারা

এ সময়ের নাটক নিয়ে একটু পড়াশোনা করেন এবং পারলে যদি সেই ধারা আজ পুনঃসংস্থাপিত করেন। সে সময়ে থিয়েটার ছিল প্রায়শ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের মোড়কে সর্বনাশা সংকেতের মতো।

সংস্কারচিন্তার রাজনীতিকালে আমি দেখেছি দারুণ কিছু ব্যঙ্গনাট্য লেখা হয়েছে : অপেক্ষাকৃত উদারপন্থীরা যেখানে তাদের রক্ষণশীল শত্রুদের আক্রমণ করেছে তীক্ষ্ণ-ভাষায়, পরে ফরাসি আগ্রাসনের সময়ে অথবা যখন মেক্সিকোকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক জালে জড়ানোর চেষ্টা চলেছে, তখনও এবিষয়ে ভালো কাজ হয়েছে। ছোট একটা নাটক, নাম 'দি পেইন্টার শিনাকো', প্রায় শ্লীল-অশ্লীলের ধার ঘেঁষে তীব্র ব্যঙ্গের একক মূকাভিনয়, মনে পড়ে কী দারুণ কার্যকরি ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। আরো সব অসংখ্য ছোট ছোট নাটকের কথা মনে পড়ছে, বেশ বাজে ছাপা, যেহেতু গোপনেই ছাপা হয়েছিল অধিকাংশ। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় আঁতাত, প্রায় এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক বাহিনীই বলা চলে যাকে, তার বিরুদ্ধে এসব নাটক বিস্তর ঠাট্টায় ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আরো পেছিয়ে যদি আমরা ঔপনিবেশিক শাসনকালে চলে যাই, দেখব মেক্সিকোর থিয়েটার তার দেশজ ঐতিহ্য এবং ইন্ডিয়ান সংস্কৃতিকে বরাবর রক্ষা করেছে, ঔপনিবেশিক যুগের সঙ্গে প্রাক-হিস্পানীয় শিল্পের সাংস্কৃতিক ফসলসম্ভার তুলনা করে দেখলে বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে তা নতুন স্পেনের অধিবাসীদের মনে আকুল দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল। ১৮১০ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের দীর্ঘ চৌদ্দ বছরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দেখা গেছে পরিষ্কার বিনাশ-সংঘাতের লক্ষ্যে একধরনের থিয়েটার সারা দেশময় ছুটে বেড়াচ্ছে, অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে নাটক করছে। একক অভিনয় ও সমবেত ভাষ্যের এই থিয়েটার স্প্যানিশ অত্যাচার ও ঔপনেবেশিক শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের হৃদয় জাগিয়ে তুলেছে।

মেক্সিকোর প্রাক-হিস্পানীয় থিয়েটার সম্পর্কে আমি অবশ্য খুব একটা কিছু জানতে পারিনি, কিন্তু নিশ্চয়ই সেখানেও প্রচল সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ইঙ্গিত-উপাদান আছে।

তো, এই হলো আমার আবিষ্কারের তালিকা আর মেক্সিকান থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে যা আমি এঁকেছি তার সারাৎসার, এবং ভবিষ্যতের কাজ ও করণপ্রণালী বিষয়ে এ সবই আমার মতামত গঠনে সাহায্য করেছে। মনের এই অবস্থায়, আমি কার্যকরি সমিতির সদস্যদের বললাম : তোমরা, অভিনেতা বা নাট্যকর্মী যারা, একবার দেশের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ, দেখ তার পরিবর্তনসাধনে কোন সাহায্য করতে পারো কিনা। মেক্সিকোর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পরে আজ আমাদের জানা উচিত যে রাজধানী থেকে মাত্র একশো কিলোমিটারের মধ্যেই মেজকিটালের অনুর্বর অঞ্চলে বসবাসকারী ইন্ডিয়ানরা জলের বদলে সন্তানের মুখে তুলে দেয় 'পালকে', কেননা

জলের চেয়ে সুরা সেখানে অনেক সস্তা। নিজের দেশ, তার ভালোমন্দ, মনুষ্যপ্রকৃতি এসব আরো ভালোভাবে দেখতে হবে, জানতেই হবে আরো, তার পরিবর্তন-লক্ষ্যে তোমার কাজকে ব্যবহার করতে হবে। দুনিয়ার বড় বড় সব রাজধানী শহরের 'ফতো'বাবু প্রযোজনার প্রাদেশিক অনুকরণ করে কোন লাভ নেই। তোমার দেশ ও মানুষজনের দৈনন্দিন সমস্যায় মন দাও, যে-দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কাজ করছো, তার ভাষা শেখ, ভাষাসৌকর্যের সন্ধানী হও, মেক্সিকোর জন্য মেক্সিকোরই নাটক সৃষ্টি করো। এবছর, ১৯৬০, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের পক্ষেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর, লাতিন আমেরিকার জনগণের কাছে তার গুরুত্ব আরো বেশি। এবছর মেক্সিকোর মহিমাময় বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর হলো, সে-বিপ্লব হয়তো ব্যর্থ হয়েছিল, হয়তো এক নদী রক্ত ঝরেছিল বিনাকারণেই, হায়, আজ তা গণতন্ত্রের ভনিতাসর্বস্ব এক সরকারের হাতে পড়ে নিছক গপ্পোকথায় পরিণত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই আমার কাজ শুরু করেছি, দেওয়ালের বাঁদিক থেকে ডানদিকে এক এক করে আঁকলাম দৃশ্যচিত্রে বাস্তবানুপ্রাণিত ধারা ও বিমূর্ত ধারণার প্রকাশ; প্রকৃত দৃশ্যচিত্রের লোকপ্রিয় সারাৎসার—আধুনিক দৃষ্টান্তসমূহের পাশাপাশি ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত ছিল সেখানে, থিয়েটার, সিনেমা ও টেলিভিশনের প্রায় সমানুবর্তী প্রকাশচিন্তা; এবং মেক্সিকোর আমজনতার ক্রমে প্রলেতারীয় অস্তিত্বে রূপান্তর এবং সেই মহাকাব্যিক রূপান্তরপ্রক্রিয়ার পথে জনগণের ঐতিহাসিক প্রগতিযাত্রা।

এপর্যন্ত আমার কমরেড-পেট্রন সকলের দারুণ সহযোগ-উৎসাহে কাজ করেছি। আমার পরবর্তী বিষয় ছিল: ট্র্যাজেডি। আর ঠিক এই সময়ে মেক্সিকোর সরকার এযাবৎকালের মধ্যে কোন দেশের সংগঠিত শ্রমিকজনতার ওপর কোন 'বিপ্লবী' সরকার কর্তৃক নৃশংসতম আক্রমণের নজির স্থাপন করল। পাঁচহাজারেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হলো, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। বহু রেলশ্রমিকের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হলো, কেউ কেউ মারা গেল। কিন্তু গোটা পৃথিবীর লোক এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানল না, কেননা বিদেশী প্রেস এজেন্সি বা স্থানীয় দৈনিক ও সাময়িকপত্রগুলির কন্ঠনালী ততদিনে খুব কার্যকরি হাতে চেপে ধরা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ গোটা ব্যাপারটার পেছনে কমিউনিস্টদের কুমন্ত্রণা আবিষ্কার করা হলো, আর তা আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কোনরকম সরকারি ব্যাখ্যা ছাড়াই সোভিয়েত দূতাবাসের দুজন সাংস্কৃতিক মন্ত্রণাদাতাকে দেশ থেকে তাড়ানো হলো। গোটা দেশ জুড়ে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি বুদ্ধিবাদীরাও তার বাইরে ছিলেন না। মজদুর-শ্রমিকরা অলিগলিতে বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লেন। কমিউনিস্ট ইন্ধনের পুরো গল্পটাই কিন্তু ডাহা মিথ্যে, বানিয়েছিল যত পুলিস আর তাদের প্রভুরা। অথচ, এ সংগ্রামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টত মজুরীবৃদ্ধির দাবি, সেইসময়ে, যখন জনগণ উপোসে মরছে।

এ অবস্থায় কী করতে পারতাম আমি? ট্যাজেডির একটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে এ-ঘটনাটাই আমার ছবির বিষয় হয়ে উঠল। মেক্সিকোর শ্রমিক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশ-মিলিটারির আগ্রাসী আক্রমণের ভয়াবহ ছবি আঁকলাম। রচিত হলো সেনাপুলিসের নৃশংস আক্রমণধারা, অন্ধভাবে যারা সেনাধ্যক্ষের আদেশ পালন করছিল মাত্র, সঠিক অর্থে যে-আদেশ আবার আসছিল আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে, আর মেক্সিকো ও লাতিন আমেরিকাসহ গোটা পৃথিবী যাদের অন্যায় শোষণ-ব্যবস্থার শিকার, সেই বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায়-অধিকারীরা আড়াল থেকে পুরো ব্যাপারটাই পরিচালনা করছিল। আর কী হলো তারপরে? কার্যকরি সমিতির একাংশ, হয় সরকারি আদেশে, নতুবা নিছক শ্রমিকবিরোধী প্ররোচনায় ঠিক করল আমার এ ছবি সরকারের বিরুদ্ধে পরোক্ষ আক্রমণ। আমি ভেবেছিলাম যে-সমস্ত ভদ্রলোকেরা মেক্সিকোয় দেওয়ালছবির আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তারা রাজনৈতিক ছবির ঐতিহাসিক গুরুত্বহীনতা বিষয়ে নিশ্চিত, তাহলে হঠাৎ এখন কেন আমার কাজ দেখে তাদের টনক নড়ল, কেন মনে হলো যে ছবিটা বিপজ্জনক সম্ভাবনায় আক্রমণমুখী? আশ্চর্য! তারা বললেন, ছবিটা ঘিরে জর্জ নেগ্রেত থিয়েটারে নাকি অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা আছে, হয়তো ছাত্ররা থিয়েটারে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে, যে-কোন সময়ে লড়াই শুরু হতে পারে বিভিন্ন আদর্শবাদী ছোট ছোট দলের মধ্যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ছবিটা ঢেকে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো, পরে গোটা বিষয়টা আদালতে উঠল।

আমি জানি ভেনেজুয়েলাব সাথীরা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের লোকের মতোই আমাদের বন্ধু; ড্রাইভার, ওয়েটার, লিফ্‌ট অপারেটার থেকে শুরু করে বেকার ভবঘুরেরা, যাদের সঙ্গে আমি বিভিন্ন জনসভায় কথা বলেছি, ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা সকলেই আমাকে একথা বলেছেন। তাসত্ত্বেও আমার প্রিয় বন্ধুরা, দুর্ভাগ্যজনক এ-সত্য আমি গোপন করে রাখতে পারি না যে মেক্সিকো যা ছিল, আজ আর তা নেই। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা ছেড়ে আজ তা সরাসরি প্রকাশ্যেই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কাজ করছে, মেক্সিকো আজ বদলে গেছে। আমেরিকায় বিপ্লবের সম্মুখসারি থেকে আমার স্বদেশ আজ প্রতিবিপ্লবী ভণ্ডে পরিণত হয়েছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ধামাধরা লেজুড়।

ভেনেজুয়েলার শিল্পীরা, শেষপর্যন্ত তোমাদের আমি হয়তো বলতে চাই যে তোমরা সকলে, যাই হোক না কেন তোমাদের কাজের ঘরানা, এসো তোমার দেশের আপামর মানুষের সমর্থনে কাজ করো, গোটা লাতিন আমেরিকার জনসাধারণের জন্য কাজ করো। মেক্সিকোর মতো তোমাদের এমন কোন আশু সমস্যা নেই যা তোমাদের ছবির কাজে বাধা দিচ্ছে। অবশ্যই সকলের তাঁর পছন্দসই ঘরানায় কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে, অথচ মেক্সিকোয় এ নিয়ে আমাদের মিথ্যে বদনাম কুড়োতে হয়েছে যে আমরা নাকি বিমূর্তধারার শিল্পীদের অন্যায় বিরোধিতা করেছি। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

মেক্সিকোয় কান্দিনস্কির ছবির প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজক ছিল দেওয়ালচিত্রী আর তক্ষণশিল্পীরা। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিধারণা থেকে যদিও আমরা এসমস্ত ঘরানাদর্শনের সঙ্গে সর্বদা একমত হতে পারিনি, কিন্তু একথা সবসময় ব্যাখ্যা করে বলেছি যে কীভাবে অগ্রণী ভাবনাচিন্তার ধারা-উপধারা এক নতুন আধুনিক বাস্তবতার নির্মাণে সহযোগী শক্তি হতে পারে। আমরা সবসময়েই প্রকৃত অগ্রণী শিল্পকর্মের কথা বলেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছি স্বদেশের প্রকৃত অবস্থাবাস্তবতার সাযুজ্যেই তা বেড়ে উঠুক—উৎসভূমির প্রকৃত অবস্থা ও কার্যকরি উপযোগিতার মানদণ্ডেই তার বিচার হোক।

সে-শিল্পের রূপগঠন কী হওয়া উচিত তা আমি বলতে পারব না, বলার চেষ্টাও করব না। তোমরা নিজেরাই আপন দেশের মাটিতে তার পদ্ধতিপ্রণালীধর্ম আবিষ্কার করো। অবশ্যই তার একটা উপযোগিতা থাকা চাই, যে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে তোমরাও কাজ করছো সেই ভেনেজুয়েলার বিপ্লবের ডাকে তা যেন সাড়া দিতে পারে। তোমাদের ঐতিহ্যশালী অতীত, তোমাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং চমৎকার সংগ্রামীজীবনের যেন তা সহগামী হয়। মূলিভাবে, তোমরা এমন কোন কাজ করতে পারো না, যার কোন সামাজিক সারাৎসার নেই। যে ভাবে ইচ্ছে সেই বস্তুসার প্রকাশ করে বলো, আঙ্গিকসাধনার পথে তা বলা চলে, বলা চলে বিমূর্তভাষায়—যদি সেভাবেই বলতে চাও তোমরা। কিন্তু বলো, নিজেকে প্রকাশ করে বলো—তোমরা যদি মনুষ্যাকারে গঠিত ছবি না-আঁকতে চাও, তাহলে অন্য কোন পথের সন্ধান করো, তোমার শৈল্পিক আদর্শচিন্তা যে-পথে চালনা করে তোমায়। তোমার পছন্দসই গড়ন ও প্রতীকের মধ্যে দিয়েই বলো, বলো তোমার জনগণজীবনের অতীত ইতিহাসের কথা, বলো ভবিষ্যতের ছবি ভাবনা আকাঙ্ক্ষার কথা, বড় বড় স্মারকস্তম্ভসৌধ নির্মাণ করো, যা লোকে বুঝবে, যদি এমনকি আবেগ দিয়েও তারা বুঝতে পারে, তাহলেও হবে। যদি তোমার ভাষা ঈষৎ জটিল হয়ে পড়ে, তবে সেই জটিলতার ভাষাও ব্যাখ্যা করে বলো।

না বন্ধুরা, আমি মেক্সিকোর শিল্পীদের নামে তোমাদের শুধু অস্থিশরীর, তোমাদের কাজ বা জঙ্গী রাজনৈতিক চেতনার সর্বস্বই দিতে বলছি না, শুধু তোমার মন ও আত্মার সর্বাংশই দিতে বলছি না। আমি তোমাদের একযোগে শরীরমনের সর্বস্ব দিতে বলছি, তোমার কাজ তোমার শিল্পবিবেক সবকিছু নিয়ে তোমার দেশের প্রসারিত সমস্যাবলী, আমজনতার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য তোমার সর্বস্ব প্রতিজ্ঞা করো।[১] □

১. সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ ক্যারাকাস, ভেনেজুয়েলার প্রদত্ত ভাষণ, জানুয়ারি ৯, ১৯৬০। The Story of a Trap. Who are the Traitors ? My Answer ( Mexico, 1960 ) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

# সিক্যেরাসের ইস্তাহার

# ছবি ও ভাস্কর্যের বৈপ্লবিক রূপান্তর দিশা

ছবি-আঁকিয়ে, ভাস্কর, তক্ষণশিল্পী, খবরকাগজের সচিত্রকর, আলোকচিত্রশিল্পী স্থপতি—সবাই মিলে দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পকর্মের রূপান্তরক্রিয়ার সপক্ষে এক আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তুলব ঠিক করেছি।

আমাদের আন্দোলনের ভিত্তিস্বরূপ রয়েছে সমকালীন শিল্প-অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিশ্লেষণভূমি: পারির আন্দোলন এবং আধুনিক মেক্সিকান আন্দোলনের আলোই আমাদের পথ দেখাবে। যদিও আজ সে আন্দোলনে ভাঙন ধরেছে।

সিক্যেরাসের নেতৃত্বে লস এঞ্জেলসের ম্যুরাল পেইন্টারস গ্রুপ এবং বুয়েনস এয়ার্সের পলিগ্রাফিক টীম এক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রয়োগপদ্ধতির ব্যবহারে আমাদের পূর্বসূরী।

## কী চাই আমরা?

আমরা এমন এক শিল্পকর্মের উৎপাদনপ্রকল্পে অংশ নিতে চাই, যা প্রত্যক্ষ শারীরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে জনতার সেবায় লাগবে। জড় রূপগঠনই যদি উপযোগিতার ভাষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে তা অবিলম্বে দিকে দিকে পৌঁছে যাবে। ইউরোপীয় শিল্পের বুর্জোয়া অভিজাততন্ত্র এবং মেক্সিকান শিল্পের পর্যটকমুখী আমলাতন্ত্রের হাত এড়াতে অবশ্যই উৎপাদিত শিল্পকর্মের ভিত্তিতে প্রতিটি দেশের আন্তর-সম্ভাবনা বিচার করে কিছুদূর বিক্রয়যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। 'শিল্পের জন্য শিল্প'তত্ত্বের ইউরোপীয় অসার-ইউটোপিয়া এবং মেক্সিকোর ক্ষমতালোভী সুবিধাবাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে হবে। তথাকথিত অসার লোকশিল্প, ইদানীং যা 'মেক্সিকান কিউরিও'র নামে বাজার দখল করেছে, তার মৃত্যু ঘোষণা করে পরিবর্তে এমন এক উৎপাদনপ্রকল্পনার স্বপ্ন দেখতে হবে যা স্থানীয় ঐতিহ্য ও উপযোগিতার উপাদাননির্যাসে প্রকৃতই আন্তর্জাতিক চেতনায় জেগে উঠবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতার সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনের পথে প্রয়োগবিদ্ সংঘারামে একসাথে কাজ করার শিক্ষা অর্জন করতে হবে। আধুনিক ইউরোপের আত্ম-কেন্দ্রিকতা এবং সমাজতন্ত্রের নামে সরকারি মেক্সিকান শিল্পের মিথ্যে যৌথতার অবসান ঘটাতে হবে। উৎপাদনের কর্মকান্ডে অংশ নিতে নিতে আমরা একই সাথে নিজেরা শিখব, অন্যদেরও শেখাব: তত্ত্ব ও অনুশীলন হাতে হাত ধরে এগোবে। মৌখিক নীতি-শিক্ষাপ্রণালীর অন্তঃসারশূন্যতা দূর হোক—কেতাবী শিক্ষাধারার চারশো বছরের ইতিহাসে যা মূল্যবান কোনকিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি, অথচ এখনও মেক্সিকোসহ সারা বিশ্বে যা একমাত্র শিল্পপদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মেলে, এমন সমস্ত আধুনিক যন্ত্রসাধনী ও বস্তু-উপাদান ব্যবহার করতে হবে, এবং এইভাবে মেক্সিকো বা ইউরোপের অসহ্য প্রয়োগিক অতীত-চারিতার অবসান ঘটাতে হবে। বদলে, আমাদের এই প্রাথমিক ভিত্তি থেকে শুরু করতে হবে যে যুগের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়েই শিল্প-আন্দোলন বিকশিত হয় এবং সে-ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আধুনিক প্রয়োগপদ্ধতি এবং যন্ত্রসাধনার এতদূর উন্নতি হয়েছে যে আমাদের সুদূরতম কল্পনাতেও আসবে না তার ফলে আমাদের সৃজনক্ষমতাও কতদূর উপকৃত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত আজকের শিল্পীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রায় কিছুই জানেন না, অথচ তার কাজের জিনিসপত্র তৈরি করছে কারা? অবশ্য তারা এটুকু জানেন যে কোন্ দোকানে তা পাওয়া যাবে। বর্ণদানার রসায়নে আধুনিক শিল্পকারখানা যে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, আধুনিক শিল্পীরা তার কিছুই জানেন না।

এমন এক বহুবিচিত্রায়তন শিল্পভাষা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ত্রিমাত্রিক গড়ন ও দ্বিমাত্রিক রূপের সংযোগসূত্র স্থাপিত হবে, এবং এভাবে প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার আকাশ খুলে যাবে।

এই হলো বিশুদ্ধ ছবি আর এই নাও বিশুদ্ধ ভাস্কর্য —এরকম ছোট ছোট এককে আর ভাগ করা চলবে না, আমাদের চাই নতুন, আরো শক্তিশালী আধুনিক ভাষা, শিল্পের ভাষা হিসেবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির শক্তি ও উপযোগিতা যার অনেক বেশি।

নতুন দ্বান্দ্বিক কোন গঠনকাঠামোই ব্যবহার করতে হবে। মৃত, যান্ত্রিক, কেতাবী শিল্পের বদলে দুনিয়ার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের সম্ভব করে তুলতে হবে এক সজীব রূপশিল্পের স্বপ্ন, ইউরোপ বা মেক্সিকোর আধুনিক শিল্পের রহস্য-ধর্মিতা, রক্তশূন্য পুরাতাত্ত্বিকতা, বা অন্যান্য বিচ্যুতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি চাই কাজের। অভিজ্ঞতাসর্বস্বতা বা আবেগসর্বস্বতার কব্জা থেকে মুক্তি পেতে হবে, আজ পর্যন্ত সমস্ত শিল্প-আন্দোলনগুলির যা বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসে এই প্রথম, আমরা প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক সত্যভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করছি। শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে আরো দৃঢ় যোগাযোগসাধনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

বাহিরানা দেওয়ালছবির শিক্ষা উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে—আমজনতার ছবি, রাস্তার ওপর, সূর্যস্নাত শহরে, লম্বা-লম্বা বাড়িগুলোর পাশের দেওয়ালে—যেখানে এখন তোমার চোখে পড়ে শুধু কুচ্ছিত বিজ্ঞাপন, এমন সমস্ত জায়গা কৌশলে বাছতে হবে যাতে লোকের নজরে পড়ে, আধুনিক নির্মাণশৈলীর সঙ্গে মানানসই, যন্ত্রোৎপাদিত ও উপাদানসম্ভব নতুন এক বাস্তবতা। পর্যটকের মনকাড়া, আমলাতন্ত্রের ফাঁস পেরিয়ে প্রাচীন ঘরানার যে মেক্সিকান দেওয়ালছবির মোচ্ছব শুরু হয়েছে, অবিলম্বে তার

অবসান ঘটাতে হবে। লোকচক্ষুর আড়ালে আঁকা এসব ছবি শুধু ছাপা হয় আনাড়ি বিদেশীদের জন্য সাজানো রাজকীয় মনোগ্রাফে। ভবিষ্যত সমাজপ্রস্তুতির কর্মী আমরা, শেষপর্যন্ত আমাদের কাজই লোকে দেখতে চাইবে, কেননা গণশিল্পের প্রাত্যহিক কার্যকরি প্রকাশভঙ্গি সেখানেই প্রতিদিন আবিষ্কৃত হবে।

আমরা অন্যান্য শিল্প-আন্দোলনের শিক্ষা অবশ্যই রক্ষা করব, কেননা আমরা মনে করি ঐতিহ্য মানবাভিজ্ঞতার যোগফল, এবং তার ভিত্তিতেই আমাদের কাজ করতে হবে। এ কথাটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমাদের আন্দোলন আসলে ধ্রুপদীচরিত্রের, একই সাথে অস্তিত্বের প্রতিমুহূর্তে সামাজিক ও প্রায়োগিক বাস্তবতায় তা সাড়া দিয়ে ওঠে।

তত্ত্বচিন্তার একটা বাস্তবোচিত গড়নের সন্ধানে আমাদের কর্মশালা ও পাঠশালা-স্থাপন করতে হবে। সমস্ত প্রাচীন একদেশদর্শী গড়ন ও বিন্যাসপদ্ধতি, যেমন ইজেল পেইন্টিং একদম বাদ। যা কিছুই পুনরুৎপাদনযোগ্য নয়, সব বাদ। গুচ্ছের আনাড়ি দর্শক-সমালোচকের লাভের জন্য 'প্রতিষ্ঠিত' গ্যালারিতে কোন প্রদর্শনী হবে না। দামী সীমিত সংস্করণ বলে কিছু চালানো যাবে না, মানে এককথায় এমন সমস্ত কিছুই বাদ যাবে যা ব্যক্তিগত সংগ্রাহক বা সুবিধাভোগী অভিজাতের ভোগে লাগে। এই পথে আমাদের ঐতিহাসিক সময়ের সহগামী আমরা, আমরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। এইভাবে আমরা মহান জনগণের আশুপ্রয়োজনীয় শুশ্রূষায় লাগব, সেবা করব মানবজাতির।

আমাদের কর্মপাঠশালায় চিত্রিত তক্ষণশিল্পের বিকাশ ঘটবে, বহুবর্ণ লিথোগ্রাফি, বহুবর্ণ বিশাল পোস্টার ছাপা হবে, পরীক্ষামূলক আলোকতক্ষণ, দৃশ্যচিত্রের উন্নতি হবে, পর্দা পতাকা কাপড়ে বিজ্ঞাপনে ফলিত চিত্রণ, পুনরুৎপাদনযোগ্য বহুবর্ণ ভাস্কর্য, আলোকসম্ভব ছবি, ফটোমন্তাজ, ক্রিশেমন্তাজ, ডক্যুমেন্টারি ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ হবে, ডক্যুমেন্টারি সিনেমা, হাতে বা যন্ত্রে ছাপার প্রযুক্তি, আধুনিক দেওয়ালছবির বিকাশ হবে, বর্ণদানা বা অন্যান্য শিল্প-উপাদানের রসায়নধর্ম ও প্রয়োগবিধি, বর্ণনামূলক জ্যামিতি ও শিল্পকারখানার নকশা থেকে শিল্পের সামাজিক ইতিহাস পর্যন্ত পড়ানো হবে।

প্রচারের জন্য কোন সমিতি বা সংগঠনের ঘরে বা রাস্তাঘাটে, এদেশে বা বাইরে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমান্বিত চিত্রমালা বা আলোকসম্ভব ছবির জন্য সংযুক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

কমদামে আমরা লোকপ্রিয় ছবির বই প্রকাশ করব। শহরে গঞ্জে বা কারখানায় স্থায়ী দোকান থাকবে, চেষ্টা করব যাতে নিজেদের কাজ ব্যক্তিগতভাবে নিজেরাই সরাসরি বিক্রি করতে পারি। কর্মপাঠশালায় একটা প্রচারদপ্তর থাকবে, তারাই বিক্রয় পদ্ধতি নিয়ে ভাববে বা আরো কিছু কিছু বাণিজ্যিক উদ্যম নেবে, কেননা জনগণের



রুচিসম্ভাবনা বিচার করে আমাদের উৎপাদিত শিল্পবস্তু বিক্রয়ের কোন একটা পথ অবশ্যই খুঁজে নিতে হবে, কেননা তার ওপরই আমাদের আর্থিক সঙ্গতি নির্ভর করছে।[১] □

# সিক্যেরাসের ভাষণ

## আধুনিক মেক্সিকান ছবিপত্রের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া

মেক্সিকোর শিল্পকাজে রাজনৈতিক প্রগতিভাবনা এবং প্রায়োগিক ও প্রাযুক্তিক প্রগতি-সাধনার কোন্ পরিচয় আছে?

মেক্সিকোর আধুনিক ছবিই লাতিন আমেরিকার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি, যা গোটা বিশ্বসংস্কৃতির অংশ।

পরফিরিও দিয়াজের স্বৈরাচারী শাসনের শেষপর্যায়, মেক্সিকোর অর্থনীতি রাজনীতি মায় মানসভূমি পর্যন্ত তখন ঔপনিবেশিক ছাঁচে ঢালা। লোকের নজর পড়ে রয়েছে ইউরোপের দিকে, বিশেষত প্যারিসে কী হচ্ছে-না হচ্ছে তার দিকে। শিল্পের এই রাজধানীর বিরুদ্ধে কোথাও কোন বিদ্রোহের চিহ্ন নেই, জাতীয় ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অধিকার যে আমাদেরও আছে, তার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষার ছায়াও নেই।

১৯০৪/০৬ নাগাদ কিছু কিছু আশাব্যঞ্জনা চোখে পড়ল। ইউরোপ থেকে ফিরে ডক্টর অ্যাট্ল দেওয়ালছবির সমর্থনে এবং শিল্পের প্রতি আরো দেশগতপ্রাণ দৃষ্টির সমর্থনে সাংগঠনিক প্রচার শুরু করলেন। তাত্ত্বিক কাঠামো তখনো জমাট বাঁধেনি। সে সময়ে অ্যাট্ল ছিলেন স্প্যানিশ-ইতালিয়ান ধরনের সমাজতন্ত্রী—মানে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট। পরফিরিও দিয়াজের স্বৈরাচারী চক্রের বিরুদ্ধে ঠিক সে সময়ে হাউস অফ ইন্টারন্যাশানাল ওয়র্ক'র রাজনৈতিক সক্রিয়তায় জেগে উঠছে, অ্যাট্লের সেসময়ে নন্দনতত্ত্বের দিকে চোখে পড়ল। জাতীয় বিষয়ধারণার প্রথম ছবিগুলো দেখা গেল আরো পরে, ১৯০৮/১০-এ। সাধারণত দেখা যায় কোন নব্য শিল্প-আন্দোলন সংঘটনের প্রাক্কালে লোকপ্রিয় শিল্পের বহতা এক অস্তিত্বধারা থাকে, যা আসলে জনসাধারণের সমবেত সৃষ্টি।

১৯১১ সালে, ইউরোপে নব্য সংবেদনবাদী ( impressionist ) আন্দোলনের যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হিসেবে আমরা, স্কুল অফ ফাইন আর্টসের ছাত্র সব, ধর্মঘটের ডাক দিলাম। কেতাবী প্রকরণপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলোপের দাবি ছিল, আর মুক্ত বাতাসের

১. স্টুডিও স্কুলস অফ পেইন্টিং অ্যান্ড স্কাল্পচারের ইস্তাহার ও শিক্ষা-কর্মসূচির খসড়া। সিক্যেরাস লিখেছিলেন নিউইয়র্কে, ১৯৩৪ সালে।

স্বাধীনতার বিদ্যালয় স্থাপনার। স্বৈরাচারী দিয়াজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকায় ছিল যারা, তারাই নেতৃত্ব দিল—জোসে দ্য জেসাস ইবারা, মিগ্যুয়েল অ্যাঞ্জেল ফার্নান্দেজ ইত্যাদি।

ধর্মঘট সফল হলো—মুক্তিপথের প্রথম এরকম স্কুল স্থাপিত হলো সান্তা অনিতার গ্রামে—আলফ্রেদো রামোস মার্টিনেজ একজন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী—তার অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯১৩-য় সান্তা অনিতা স্কুলের ছাত্ররা ব্যস্ত ছিল দুটো কাজে—অনধিকারী ভিকতোরিয়ানো উয়ের্তার রাজ্যপাটের বিরুদ্ধে রাজনীতিকল্পনা, আর সংবেদনবাদী করণকৌশল ও গড়নের সমস্যা চিন্তা।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগে খুব হেনস্থা গেল, অধিকাংশের মতো আমিও কনস্টিটিউশনালিস্ট পদাতিক বাহিনীর বিপ্লবী হিসেবে যোগ দিলাম।

এ পথেই মেক্সিকোর আপামর জনসাধারণের সংযোগসূত্রে বাঁধা পড়লাম। মেক্সিকোর কৃষক, মেক্সিকান ইন্ডিয়ান জাতিগোষ্ঠী, প্রকৃত মেক্সিকোর জনমানুষ—আর সেই সময়, যখন দেশে গৃহযুদ্ধ আর সামাজিক উৎপীড়ন চলছে। শিল্পের মানবাভিমুখী ধারাপ্রকৃতির তৎকালীন বীজস্বরূপ ধারণা পরে অনেক বিকশিত হয়েছে।

মানুষজনের সংস্পর্শেই শুধু যে এলাম তাই নয়, দেখলাম তাদের বিচিত্র ব্যবহারিকতা, অদ্ভুত মনোসংবিধান, মেক্সিকোর ভৌগোলিক ও পুরাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের মুখোমুখি আমরা শিল্পকর্মের গোটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে নিজেদের দেখলাম, লোকপ্রিয় শিল্পের সঙ্গে পরিচয় হলো, মেক্সিকান সংস্কৃতির গাঢ় বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। ফলে, আমাদের আর পারির বোহেমিয়ান সাজার কোন সুযোগই জুটল না।

ক্রমে বোঝা গেল, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসপর্যায়েই শিল্পের মহৎ সামাজিক উপযোগিতা ছিল, কখনো বিধিসম্মত রাষ্ট্রশিল্প হিসেবে ; অন্তর্ঘাতে আক্রমক শিল্প, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কখনো। যত রুচিবান প্রেমিক আর অস্ফুট বিশুদ্ধবাদীদের আশ্চর্য করে আমরা স্পষ্ট দেখলাম মহান খৃষ্টীয় শিল্পও আসলে প্রচারকার্যেই সমর্পিত ছিল।

সুতরাং, আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল মেক্সিকান বিপ্লবের বিকাশপর্ব ত্বরান্বিত করা, আমাদের শিল্পের যূথবেদী থেকেই।

১৯১৯-এ আরো কয়েকজনের সঙ্গে ইউরোপে গেলাম। পারিতে দিয়েগো রিভেরার সঙ্গে দেখা হলো। মেক্সিকোর সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের অংশী একজন তরুণ আদর্শবাদী মেক্সিকান শিল্পীর সঙ্গে দেখা হলো ইউরোপীয় শিল্পসাধনার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গড়নকাঠামোর বিপ্লবপর্যায়ের অংশী একজন শিল্পীর।

তখন পারিতে ঘনক-উত্তর গড়নভাবনার পরবর্তী পর্যায়। সম্ভবত আধুনিক রূপপ্রবণতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কিউবিজম। মনে হয়েছিল সেজান ও তার গোষ্ঠীর তত্ত্বদর্শনে শিল্পের গঠনমূলক পুনর্মূল্যায়ন শুরু হলো। "পুরাকালের

শিল্পের মতো সংবেদনবাদী শিল্পধারণাকে আরো শক্ত কাঠামোয় বাঁধো, আরো আঘাতসহ করে তোলো"।

১৯২১-এ, বিপ্লবী সেনাদলে আমার সহযোদ্ধা শিল্পশিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাগযোগ করে আমার চিন্তাকল্পনা প্যারিসের পুনরাবিষ্কারপন্থী দল অর্থাৎ রিভেরার ভাবধারণার সঙ্গে মিলেমিশে এক হলো। বার্সেলোনার সাময়িকপত্র 'ভিদা আমেরিকানা'য় আমেরিকান শিল্পকর্মীদের উদ্দেশে আমার বিখ্যাত ইস্তাহারটি প্রকাশিত হলো। সেই ছিল প্রকৃত বীরত্বের লক্ষ্যে প্রসারিত সৌধস্মারক নির্মাণের প্রথম আহ্বান, যা একইসঙ্গে মানবিক ও গণমানসিক, সরাসরি আমেরিকার প্রাক-হিস্পানীয় সংস্কৃতির প্রেরণাসৃষ্ট।

পরবর্তীকালে এর সঙ্গে আরো যোগ করলাম : "প্যারিসের শিল্পবিপ্লবের প্রকৃতি শুধু ছবির চিত্রিত সমতলেই সীমায়িত ; প্রকৃত প্রজ্ঞাবিপ্লব সাধিত হবে একইসঙ্গে ছবির গভীর অন্তঃস্থলে ও তার উপরিতলে; নিছক শৈলীপ্রকরণ নয়, এ বিপ্লব শিল্পের কার্যকর উপযোগিতা ও তার অন্তঃস্থ গড়নকাঠামোর নিয়মেই গড়ে উঠবে"।

তাহলে কীভাবে আমরা বীরাচারী, স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারিত সৌধস্মারকের গুণসম্পন্ন, গণমানসিক এক শিল্পভাষা অর্জন করে উঠতে পারি ? ঠিক হলো দেওয়ালছবিই হতে পারে গণশিল্পের প্রাথমিক রূপ। শুরু হলো মেক্সিকোয় দেওয়ালছবির আন্দোলন, আধুনিক মেক্সিকান ছবিপত্রের সেই হলো শিকড় ও বৃক্ষকান্ড—ক্রমে ভাস্কর্য, তক্ষণকারিগরি, সঙ্গীত, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হলো।

আমাদের দেওয়ালছবির প্রয়োগকারিগরি নিয়ে ভাবতে হলো। ঠিক হলো প্রাচীন ও মধ্যযুগ এমনকি রেনেসাঁর সময়ে ব্যবহৃত ফ্রেস্কো ও এনকস্টিক পদ্ধতিই উপযুক্ত। কাজ শুরু হলো—অতীতই ভবিষ্যতের উৎস-আকর।

১৯২৩-এ দেখলাম আমাদের প্রথম কাজ আকাঙ্ক্ষিত তাত্ত্বিক উপযোগধর্মের সঙ্গে মিলছে না, 'সিন্ডিকেট অফ রিভলিউশনারি মেক্সিকান পেইন্টারস, স্কাল্পটরস, এ্যান্ড এনগ্রেভার' নামে এক পেশাদার সংঘারামে নিজেদের সংগঠিত করলাম।

রাজনৈতিক জঙ্গীচেতনা আরো বাড়ল, আমাদের কাজের মতাদর্শগত স্তরের আর একটু উন্নতি হলো।

যদিও তখনও একই প্রকরণসিদ্ধি ও গঠনকাঠামোই ব্যবহার করছি—অতীতের বিলুপ্ত করণশৈলী যা আমরাই আবার ফিরিয়ে এনেছি।

১৯২৪-এ রাজনৈতিক আত্মীয়তাবশে আমরা স্বজ্ঞাবলেই আমাদের কাজের গণপ্রকৃতিধর্মের আরো বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করলাম। পোস্টার ও গ্রাফিকসে আমাদের উৎসাহ বেড়েছে, 'এল মাশেত্' নামে এক সাময়িকী প্রকাশ করছি, যা ছিল আমাদের রাজনৈতিক মুখপত্র।

তখন সরকারই ছিল আমাদের কাজকর্মের প্রবন্ধক, রাজনৈতিক বিরোধে সিন্ডিকেট

ভেঙে গেল। রিভেরা আর তার সহকর্মীরা দেওয়ালছবির কাজেই মন দিল। জেভিয়ার গ্যুরেরো, আমাদো দ্য লা কুভা, রেয়েস পেরে ও অন্যান্যরা, আমিও ছিলাম তার মধ্যে, ছাপাছাপির করণকৌশলে হাত লাগালাম, 'এল মাশেত' তখনও বেরোচ্ছে। ওরোজকো আর কেউ কেউ কিছুদিনের জন্য আমেরিকা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি দিল।

সেসময়ে আমি রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে দারুণ ব্যস্ত। মাসের পর মাস, কখনো বছরভোর জেলে কাটল। আর সরল বিপ্লবী শিক্ষানবিশ নয় তখন, আস্তে আস্তে অভিজ্ঞ জঙ্গী কর্মী হয়ে উঠছি।

১৯৩১, কড়া পুলিস-অনুশাসনে রয়েছি। ঠিক করলাম কিছুদিন তাসকো-র থাকব। আবার নিজেকে উজাড় করে দেব ছবির কাজে। যে-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হলো, সেখান থেকেই নতুন নমাগড়নের জন্ম হবে। চিরকাল তা-ই বিশ্বাস করেছি। তাসকো-র স্প্যানিশ কাসিনোয় বিরাট প্রদর্শনী হলো।

যদিও প্রদর্শনীর পরে বক্তৃতায় বলেছিলাম, কার্যত একজনের কাজ সর্বদা যে তত্ত্ব-মোতাবেক বিশুদ্ধ হবে, তার কোন মানে নেই। অতীতের নাছোড় কিছু অভ্যাস কখনো কখনো একজনের মতাদর্শগত সংকল্প-বিশ্বাসের চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে। আমি হয়তো কাঠামোনির্মাণে, আয়তনবিন্যাসে এবং সম্ভবত রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে সামান্য উন্নতি করেছি। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়—এখনও প্রায় আদিম স্তরে রয়েছি, অদক্ষ যে কত কাজেই।

ইতিমধ্যে আমাদের আন্দোলনে মেক্সিকোর নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের সহানুভূতি টের পেলাম। রুফিনো তামাইও, জুলিও কাস্তেলানো—এরা যদিও বরাবর রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে দূরেই ছিল, বদলে খৃষ্টীয়, পুরাতাত্ত্বিক ও লোকশিল্পের নিদর্শন, অতীতের ছবিল প্রকৃতির দিকেই নজর ছিল বেশি। তার ওপর, তারা আমাদের চেয়েও দ্রুত ও সরাসরি দেওয়ালছবির বিস্তৃতি ছেড়ে ক্যানভাসের চৌহদ্দিতে ফিরে গেল। ক্রমে রাজনীতিসিদ্ধ অর্জনের চেয়ে অনেক বিশুদ্ধ 'মেক্সিকানিস্ট' হয়ে উঠল। তারাই আজকের বিশুদ্ধ শিল্প-আন্দোলনের ভ্রূণাকার, বর্তমান আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুতর বিচ্যুতি। কেন—সেকথা পরে বলছি।

ধারাবাহিক পুলিশী হাঙ্গামায় নিরুপায়, অতিশিল্পোন্নত আমেরিকায় নির্বাসনে গেলাম। এখানেই আমার প্রায়োগিক চিন্তায় ট্রিক-চতুরালির প্রকৃত গল্প জমে উঠল। এসব প্রাযুক্তিক কায়দা বা তরিকা ঠিক কোন প্রাগার্জিত তত্ত্বচিন্তার ফল নয়, বরং কিছু অদৃষ্টসম্ভব নৈমিত্তিক ঘটনার যোগফল।

বিবরণ নিম্নরূপ :

১. সিমেন্ট ও বালির বদলে চুনবালি ব্যবহার করা, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ফ্রেস্কোয় যেমন দেখা যায়। আধুনিক বাড়িগুলোর কংক্রিটের দেওয়ালে অবশ্য চুন খুব একটা জুতসই

নয়। ২. সিমেন্ট ফ্রেস্কোয় স্প্রে-গানের ব্যবহার, কেননা নতুন উপাদান আরো জোর-গতির যন্ত্র দাবি করে। ৩. প্রথাগত কেতাবী রচনাবিন্যাসের বদলে আরো সক্রিয় বিন্যাসপদ্ধতির ব্যবহার। রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মবশে দর্শক মোটেই নিশ্চল কোন পাথরের মূর্তি নয় বা বক্ররেখার পরিপ্রেক্ষিতমতে সে কোন অক্ষবন্দী অটো-মেটনও নয়—দর্শক নির্দিষ্ট জায়গার গোটা সমতলে স্বাধীনভাবেই ঘুরেফিরে বেড়ায়। ৪. দেওয়ালে ছবি আঁকার প্রতিটি পর্যায় নথিবদ্ধ করা। প্রাচীন শিল্পীরা ফটো-গ্রাফির সাহায্য পাননি। ৫. দেওয়ালছবির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী আকারবিকারের প্রকৃতি খুঁজে বার করার জন্য ইলেকট্রিক প্রোজেক্টরের ব্যবহার। ৬. অখন্ডবাস্তবতার মানবিক দলিল সংরক্ষণের প্রয়োজনে ক্যামেরার ব্যবহার। ৭. করণ ও উপাদান—শিল্পের চরিত্র নির্ধারণ করে। সৃজনকল্পনার ওপরই শৈলী নির্ভর করে—একথা ভাবা গুরুতর ভুল। ৮. অবয়বায়তন ও ঘেরায়তন, এবং বায়ুঘেরে অবয়বের চলনবিচরণ—বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ক্যামেরার ব্যবহার। ফটোগ্রাফি অনেক কিছু শেখাতে পারে আমাদের এবং রচনাকাঠামো ও পরিপ্রেক্ষিতের আরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকৌশল সন্ধানে সাহায্য করতে পারে। ৯. দেওয়াল, বিশেষত বাইরের দেওয়ালে সিলিকনের ব্যবহার। সিলিকন এমন একটা পদার্থ, প্রাচীন ফ্রেস্কোর বিভিন্ন উপাদানের চেয়ে যার গুণাগুণ অনেক বেশি। ১০. পাইরোক্সিলিনের সাথে মিশ্রিত উপাদান আমি পছন্দ করি সবচেয়ে বেশি। আমার মতে পাইরোক্সিলিনের নম্যগুণ প্রায় উন্নত তৈলপদার্থের মতো—ফলে মসৃণ ও অমসৃণ বুনোট, ছায়াবিস্তার ও সূক্ষ্ম বর্ণমিশ্রণের ক্ষেত্রে এই আধুনিক রাসায়নিক আবিষ্কার অতীতের ব্যবহার্য বস্তুর চেয়ে অনেকগুণ ভালো। ১১. কেতাবী ছবিপত্রে বা এমনকি বিভিন্ন শৈলীর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়াজাত ছবিতে বহুকৌণিক রূপকাঠামোর ব্যবহার—চলচ্ছক্তিসম্পন্ন গড়নকাঠামোর ব্যবহার—প্রকৃত আধুনিক আদর্শসম্মত ভাষাভঙ্গির সন্ধানই এক্ষেত্রে কাম্য। আধুনিক মেক্সিকান ছবিপত্রে এখনো উত্তরাধিকারলব্ধ, সেকারণেই প্রাচীন গড়নের প্রাধান্য, ফলে সময়ের ·· হবানে তা অসাড়। বিশুদ্ধবাদীরা নিছক প্রবৃক্তিগত প্রবর্তনায় একধরনের আলঙ্কারিক গুণাগুণেই শুধু অর্জন করেছে এবং তা-ই সক্রিয় নির্মাণপদ্ধতি বলে চালিয়ে যাচ্ছে। ১২. দেওয়ালছবির ভাবনা শুরুই হওয়া উচিত স্থাপত্যসম্মত ঘেরচেতনার আদলে। একটা একটা আলাদা দেওয়াল বা আলঙ্কারিক কাঠামো, অনুপাত বা বর্ণসম্পর্কের ভিত্তিতে জোড়া কয়েকটা আলাদা প্যানেলের খুব একটা কোন মানে নেই। সৌধসম্মত ছবির প্রধান নীতিসূত্র নিঃসন্দেহে ঘেরচেতনার গভীরেই সৃষ্ট। উত্তল, অবতল বা কখনো উভয়ের সংযোগে সক্রিয় তলবিন্যাস, তার সঙ্গে সমতলের ব্যবহার, আকস্মিক ভাঙন ইত্যাদি—এসমস্তই সেই গতিধর্মের সূচক যা প্রাচীন শিল্প-গুরুরা বরাবর সন্ধান করে ফিরেছেন। ১৩. শেষমেশ আমার প্রস্তাব ছিল শিল্পসংক্রান্ত রসায়নবিদ্যার গবেষণায় মেক্সিকোয় একটা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হোক—যে সমস্যার

দিকে কেতাবী ঘরানার চোখ পড়েনি, ছদ্ম বিশুদ্ধবাদীরা বা আমাদের মতো নব্য বাস্তববাদীরাও যেদিকে খুব একটা নজর দেয়নি। একই সাথে আরো প্রস্তাব ছিল, জ্যামিতিক, পরিপ্রেক্ষিতসংক্রান্ত এবং দৃষ্টিগত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আরো একটা শিক্ষাকেন্দ্র যত দ্রুত সম্ভব স্থাপন করা হোক।

১৯৩৪-এ মেক্সিকোয় ফিরে এলাম। কায়দাগুলোর পরীক্ষানিরীক্ষা ততদিনে হাতে-কলমে কিছু কিছু করে ফল পেয়েছি। ফিরে দেখলাম রিভেরা আর ওরোজকোর স্বকীয় প্রধানুসারী প্রয়োগকৌশল অনেক উন্নত হয়েছে, কিন্তু কারিগরির প্যাঁচে পড়ে গেছে। পরবর্তী প্রজন্মের বাদবাকি শিল্পীরা আর বিমূর্ত অর্থে 'মেক্সিকানিস্ট' নেই, তথাকথিত বিশুদ্ধ শিল্পের পারি ঘরানা রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে কাজে। 'মেক্সিকানিস্ট' চিত্রগুণ আর পারিসিয়ান চিত্রগুণের একাকার সম্মিলনী যেন। তাদের ক্ষেত্রে মেক্সিকোর ছবিপত্র ফরাসি ছবিরই শাখা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের জাতীয় প্রয়োগবিধি আর বোধবুদ্ধির উৎসপ্রকৃতি প্রায় আগের মতোই আদিম। অনেকে আবার জাতীয়তাবাদী নব্যকেতাবী ঘরানার সমর্থক। স্পষ্টই বোঝা গেল, বীরাচারী সৌধপ্রমাণ প্রকৃত নব্যবাস্তবতার শিল্প ক্রমে আমেরিকার ছবিবাজার আর ইয়াঙ্কি ট্যুরিস্টদের লক্ষ করে বাণিজ্যিক প্রতারণার পথে পরিত্যক্ত হয়েছে।

এইসব নিয়ে লেখা একটা প্রবন্ধকে উপলক্ষ করে রিভেরার সঙ্গে তর্ক শুরু হলো। আমি বলেছিলাম : পর্যটন আর রপ্তানি লক্ষ করেই যা কিছু উৎপাদন, সব অর্থহীন; দেওয়ালছবির প্রয়োগপদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে, ঠিক কথা, কিন্তু আকারে ছোট হয়ে গেছে অনেক; আমাদের আদিম ও অস্থির রচনাবিন্যাসের পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা আরো বৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত। বলেছিলাম যে চার্চ অর্গানেও হয়তো বৈপ্লবিক স্তোত্র-গান বাজানো সম্ভব, কিন্তু সকলেরই তা পছন্দ না-ও হতে পারে; ঔপনিবেশিক স্থাপত্য থেকে আধুনিক স্থাপত্যের দিকে যেতে হবে এখন, যেখানে গোটা নকশার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সাযুজ্যে দেওয়ালছবি গড়ে উঠবে।

১৯৩৯ থেকে আমি মেক্সিকো সিটি, চিলি, কিউবা এবং পুনরায় মেক্সিকোর দেওয়ালে-প্রাচীরে ছবি আঁকছি। আমি যখন আমার কাজ করার কায়দা নিয়ে বলি, তখন প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের কথাই মাথায় থাকে—এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই।

কিন্তু একটা কথা জোরের সঙ্গে বলা উচিত যে যখন ১৯৩৪-এ আমি আর্জেন্টিনা থেকে ফিরে এলাম, মেক্সিকোর শিল্পদুনিয়ার চালচিত্রে খারাপ ছাড়া কোন বাস্তবিক পরিবর্তন চোখে পড়ল না। শিল্পীদের হতবুদ্ধি বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জোড় মিলিয়েছে ছবিপত্র নিয়ে লেখালেখি করেন যারা, তাদের সংশয়ী নির্বুদ্ধিতা। অনেকেই মহৎ কবি, কিন্তু সারা বিশ্বের শিল্পসমালোচকদের মতো তারাও একধরনের বিশ্লেষণী রীতির দাসত্ব করছেন, যা কখনোই কোন গঠনমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।

আমাদের আন্দোলনের গূঢ় প্রকৃতি এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে যেহেতু তারা তখনও অসচেতন, যে সমস্ত বিচ্যুতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি তা-ই প্রকারান্তরে খুঁচিয়ে তুলছেন ফলে। এমনকি বিশুদ্ধ শিল্পভাবনা পর্যন্ত তারা বিষময় করে তুলছেন।

এ অবস্থা থেকে মুক্তির রাস্তা কী? বিবেচনার জন্য আমি এই প্রস্তাব পেশ করছি :

১. তথাকথিত 'মেক্সিকানিস্ট' আদর্শধারণার পক্ষেবিপক্ষে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা শুরু হোক—শিল্পে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রকোপের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না; সমালোচনা করা হোক পুরাতাত্ত্বিক অতি-আগ্রহের, জনমনোরঞ্জক বিপ্লবীয়ানার; উপাদান ও প্রায়োগিক স্থিতাবস্থার ঠিকঠিক সমালোচনা হোক, কেননা প্রাচীন প্রয়োগ-কৌশল ও উপাদান অবশ্যই একধরনের উগ্র শৈলীসরলতার দিকে নিয়ে যায়। দিয়েগো রিভেরার কাজে এই স্থিতাবস্থার ছাপ রয়েছে, যদিও অন্তর্গত মূল্যে তাঁর কাজ মহৎ।

২. প্রণালীবদ্ধ সমালোচনা হোক বিশুদ্ধ শিল্পপ্রবণতার বিপক্ষে, সৌভাগ্যবশে প্রয়োগের চেয়ে তত্ত্বচিন্তাই সেখানে বেশি। আরো সমালোচনা হোক রাজনৈতিক চিত্তসংশয় নিয়ে (শূন্যবাদের উদারনীতি), অসাধারণ সম্ভাবনা ও শক্তিক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জোসে ক্লিমেন্টো ওরোজকোর কাজে যার ছাপ রয়েছে।

৩. পদ্ধতিমাফিক সমালোচনা হোক সমস্ত রহস্যবাদের বোঝাবুজরুকি আর রোমান্টিক আবেগগীতিকের বিরুদ্ধে, আধুনিক বাস্তবোচিত ধারণার প্রতিকল্প, যার ছাপ রয়েছে আমার কাজে; মৎপ্রণীত তত্ত্বসূত্রে যা-কিছু অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ একইসাথে তারও সমালোচনা করা হোক।

৪. সমালোচনা হোক ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবাদী বিশুদ্ধতার, সময়ের ঔচিত্যবোধ যেখানে বিপর্যস্ত, যার উৎস রয়েছে সম্ভবত কিউবিজমের প্রতি রিভেরার অতি-আগ্রহে। আরো সমালোচনা হোক ভাবসর্বস্ব আলঙ্কারিক ছবিলতার, কার্লোস মেরিদা বা রুফিনো তামাইও-র কাজে যার গাঢ় ছায়া পড়েছে, যদিও তাদের ক্ষমতাও অনস্বীকার্য। এই একই ধোঁয়াশার চিহ্ন রয়েছে তাদের কাজেও, যারা একদা প্যারির আধুনিক ঘরানার তামাদি প্রবণতার সপক্ষে আমাদের আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেদের, এবং যাদের কাজের লক্ষ্য-অভিমুখ বদলে যত ক্ষয়িষ্ণু স্বার্থান্বেষী আর তাদের স্তাবকদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে এখন।

৫. প্রণালীবদ্ধ সমালোচনা হোক 'মেক্সিকোনিস্ট' আর ঐতিহ্যবাদী নব্য-কেতাবী ঘরানার, তরুণতর প্রজন্মের শক্তিশালী তরুণ শিল্পীদের কাজের যা প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছে। উত্তম কারিগরি, উত্তম বর্ণলেপন, ভালো ড্রয়িং আর সুচারু তক্ষণ—এই তাদের আপ্তবাক্য, সর্বকিছুই বিমূর্ত, যারা ভুলে গেছে আমাদের শিল্প-ঐতিহ্য মূলত সৌধগুণান্বিত বাস্তবতার ঐতিহ্য।

৬. মেক্সিকোর আধুনিক শিল্পধারারার ভাঙন ও সংকটের প্রধান দুটি কারণ নিয়ে পদ্ধতিমাফিক সমালোচনা হোক :

ক. প্রথম যুগের আদিম ও আদিমভাবাপন্ন শৈলী, তত্ত্ব ও প্রয়োগপদ্ধতির ব্যবহারে এখনও স্থিতধী, একধরনের গোঁড়ামি লালন করা, এবং

খ. মেক্সিকোর নব্য-বাস্তববাদী আন্দোলনের উপযোগতত্ত্ব ও অনুশীলনের আওতা ছেড়ে ক্রমে পারির বিশুদ্ধ শিল্প-ঘরানায় ফিরে-যাওয়া—যে ঘরানার তত্ত্বদৃষ্টি ছবিতে মূলত একটা নতুন শৃঙ্খলা খুঁজে দেখতেই আগ্রহী, সংবেদনবাদী চিত্র-ভাবনাকেও ক্রমশ যা আর্ট গ্যালারির পণ্যসম্ভারে পরিণত করে। অন্য কথায় এক নব্য ধ্রুপদী কাঠামোর অনুসন্ধান, কিন্তু এখন যা ক্রমেই বিশুদ্ধ রূপ ও গড়নের জুয়া-খেলায়, এক বিচিত্র বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে, এক নতুন আলঙ্কারিক শৈলী যা মুষ্টিমেয় ধনিক-অনুচরের ঘরের দেওয়ালেই শোভা পাচ্ছে, 'ভদ্র'লোক ও 'ভদ্র'মহিলা-গণের উপভোগের খেলনায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই মন্তব্যের অর্থ এই নয় যে আমি ভুলে যাচ্ছি বিশুদ্ধ শিল্পের আন্দোলন কীভাবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী, কেতাবী ছকে বাঁধা চিন্তার মূলে আঘাত করেছে, কিন্তু বরাবরের জন্য তার ধ্বংসসাধনের উজ্জ্বল ব্রতে একনিষ্ঠ থাকার অর্থ আমার কাছে অন্য।

সারসংকলন করলে দাঁড়ায় :

পারির ছদ্ম-আধুনিক নন্দনভাবনার বিরোধিতায় রূপ ও গঠনের ক্ষেত্রে এক বস্তুগত প্রগতিসাধনার লক্ষণ দেখা গেছে। বস্তুগত বলতে এখানে উপাদান ও পেশাধর্মের সেই ইন্দ্রিয়সত্যের কথা বলছি যা ক্রমে রূপশৈলীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এই বস্তুকেন্দ্রিক প্রগতি আসলে এক ক্রমান্বিত সঞ্চয়সাধনার ফল, রূপগঠনের ভাষা ও বাচনশৈলী, এমনকি চিত্রগুণচর্যা যে-সাধনায় অনেক বেড়েছে। ঐতিহাসিক সূত্রে যা ক্রমশ সিল্যুয়েটের উদ্ভাবনা থেকে গড়নের রূপরেখা, আয়তনিক রূপরেখার আবিষ্কার, অবয়ব গঠনের কাঠামো, বায়ুঘেরের কাঠামো, পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান, নানাবিধ গঠনাবয়বের সঞ্চালন, বুনোটের খেলা, আলোর কম্পন ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছে এবং আরো আবিষ্কার করেছে নানান বিমূর্ত ভাব-উপাদানের অস্তিত্ব, যা মনুষ্য ও অন্যান্য জড়বস্তুর অন্যতম অংশবিশেষ। এক ঐতিহাসিক প্রগতিপ্রক্রিয়া, যা বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার সমধর্মী।

আমাদের আধুনিক মেক্সিকোর শিল্প-আন্দোলন বহু নেতিবাচক ধারা সত্ত্বেও তত্ত্ব ও অনুশীলনে ইতিহাসদত্ত সমস্ত ইতিবাচক রূপগঠনের মূল্য ও তাৎপর্য অনুসন্ধান ও সঞ্চয়সাধনার পথে এগিয়ে চলেছে। এই আন্দোলনই দুনিয়ায় একমাত্র, যা এসমস্ত কিছুই পরখ করে দেখেছে। চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত অখণ্ড ও আনুপূর্ব এক সত্য বাস্তবতার সন্ধানী আমরা। বারোক-পরবর্তী শিল্পে এর চেয়ে ভালো আর কী আমরা আশা করতে পারি।[১] □

---

১. ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৭, মেক্সিকোর প্যালেস অফ্ ফাইন আর্টসে প্রদত্ত ভাষণের রূপরেখা।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ডেভিড ক্যান্‌জলে

# নতুন চিলির ছবি ঃ বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার দেওয়াল ছবি ও দেওয়ালনামা

বর্তমান অধ্যায়টির রচনা শেষ হয় ১৯৭৩-এ এবং ১৯৭২-এ চিলি পরিভ্রমণের উদ্বেল উত্তেজনা এখানে কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। শিল্পনিদর্শনগুলি এবং শিল্পী ও সমালোচকদের সঙ্গে কথোপকথন আমার মনে তখন যে আশাবাদের সঞ্চার করেছিল, এই লেখাটিতে তা ধরা পড়েছে। কিন্তু ১৯৭৩-এর ১১ই সেপ্টেম্বর-এর ভয়ঙ্কর প্রতিবিপ্লব তা ধ্বংস করেছে এবং আনন্দের রূপান্তর ঘটেছে দুর্বার ক্রোধে। তাসত্ত্বেও আমি লেখাটির বিশেষ পরিবর্তন করিনি। যখন বিষণ্ণভাবে কিছু পরিবর্তনের কথা ভাবছিলাম, তখন একটি নতুন কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর এল, যা এই নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরবর্তী কয়েক মাসেই আমরা প্রতিবিপ্লব, চিলিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং যে-সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের তারা সাময়িক ধ্বংসসাধন করেছে তার উপর **Chile with Poems and Guns** নামে একটা চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলাম। এখানে যে-সমস্ত চাক্ষুষ উপকরণের কথা আছে তার অধিকাংশই এই চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল।

একদল উঠতি চলচ্চিত্রকার যৌথভাবে এই স্বল্প বাজেটের ছবিটি করেছিল। যারা তাদের অভিজ্ঞতা, ভাবনা ও লক্ষ্যকে একত্র করেছিল।

এখানে যে-সব ম্যুরাল ও পোস্টারের কথা আছে, পপুলার ইউনিটি ( UP ) সরকারের অন্য সব সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মতো ফ্যাসিস্ট জুন্টা তা পরিকল্পনা-মাফিক ধ্বংস করেছে। সবরকম সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, পোস্টার ও কমিক বুকস পথের উপর প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়েছে ও ম্যুরালগুলিকে হোয়াইট-ওয়াশ করে মুছে ফেলা হয়েছে। UP-সরকারে প্রেসের যে-স্বাধীনতা ছিল তা ধ্বংস করা হয়েছে। ইতিহাসে খুব কমসময়েই শ্রমিক সাধারণের প্রকাশবস্তু, শিল্পী ও তার শিল্পকর্মের উপর এমন ক্রুর উৎপীড়ন ঘটেছে।

এই পরিস্থিতি শিল্প-সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের উপর এক নতুন দায়িত্ব অর্পণ করে। চিলির বিপ্লবী শিল্পকে শুধু প্রশংসা করা বা তার উপর উৎপীড়নকে নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়। সমস্ত শক্তি নিয়ে এই শিল্পের শত্রুদের হারাতে হবে। নতুন চিলির ছবি আমাদের কর্মসক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত করে, অতএব তার ওপর আলোচনাকেও বাধ্যত তাই হতে হবে।

## □ পরিপ্রেক্ষিত

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে চিলি স্বতন্ত্র এই কারণে যে সেখানে বুর্জোয়া নির্বাচনী ও আইনব্যবস্থাকে ব্যবহার করেই সমাজতন্ত্র ক্ষমতায় এসেছে। চিলি প্রকৃতপক্ষেই এক বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিবর্তনের পথে চিলিবাসীরা উপলব্ধি করেছে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও প্রয়োজন।

সালভাদোর আলেন্দের ইউনিদাদ পপুলার বা পপুলার ইউনিটি সরকার শাসন-ক্ষমতায় থাকলেও চিলির উপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। গণমুখী সংস্কারের কর্মসূচিকে কার্যকর করতে গিয়ে তার প্রতিকূলে আছে এক বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী, সংসদে গরিষ্ঠসংখ্যক বিরোধীদল, বুর্জোয়া আমল থেকে চলে আসা আইন ও বিচার-কাঠামো, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তঃচারী একচেটিয়া স্বার্থ। এদের চেষ্টা হলো অর্থ-নীতিকে অন্তর্ঘাতে ডুবিয়ে দেওয়া এবং এক মনস্তাত্ত্বিক ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে সেনা-অভ্যুত্থানে পপুলার ইউনিটি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। এই আলোচনার জন্য যে-তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো যে দক্ষিণপন্থী বিরোধীরা এখনও শিক্ষা-পদ্ধতির অনেকটাই এবং অনেকগুলি বহুবিক্রীত সংবাদপত্র ও পত্রিকার নিয়ন্ত্রক। এখানে আমরা দেখাতে চাই যে এক শক্তিশালী প্রেসব্যবস্থার বিরোধিতা করে এবং বিরাট এক মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক সন্ত্রাসের মুখেও আলেন্দে সরকার কীভাবে এক সাংস্কৃতিক কর্মীবাহিনীর সমর্থন লাভ করেছে, যারা জনগণের সঙ্গে সংযোগের

বহু বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। চিত্রণ মাধ্যমের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত প্রধান ক্ষেত্রগুলি হলো ম্যুরাল, পোস্টার ও কমিক স্ট্রিপ।

এ কিছু বিচিত্র নয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিসংস্কৃতি গড়ে তোলার বীজতলা হিসাবে এই তিনটি মাধ্যম উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু Poster of Protest বা জ্যাপ কমিক বুকের নৈরাজ্যবাদী ভাবনা ও পদ্ধতির সঙ্গে চিলির এই সব পোস্টার বা ম্যুরাল-এর তুলনা করলেই বোঝা যায় যে তার পরিপ্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্য কত ভিন্ন।

পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রিত প্রেস ও ব্যাপক প্রচার-তান্ডবের প্রতিকূলতায় পপুলার ইউনিটি সরকার খুব সামান্য গরিষ্ঠতায় জয়ী হয়ে নির্বাচিত হয়। আলেন্দের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী প্রতিযোগী ইয়র্গে আলেজান্দ্রির প্রচারকৌশলে আতঙ্ক ছড়ানোর গোদা কায়দা ব্যবহার করা হয়েছিল। পোস্টার ও রেডিয়ো-বিজ্ঞাপনে মার্কসবাদ বা সাম্যবাদী মতাদর্শকে দেখানো হয়েছিল এমন এক ব্যবস্থাপ্রথা হিসাবে যা রাশিয়ান ট্যাংককে সান্তিয়াগোর প্রধান চত্বরে এনে হাজির করবে, স্কুলছাত্রের হাত থেকে পাঠ্য বই কেড়ে নিয়ে বন্দুক ধরিয়ে দেবে। এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে কিউবা বা মস্কোয় পাঠাবে। একটা রেডিয়ো-বিজ্ঞাপন ছিল এরকম: মেশিনগানের র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট ধ্বনি, এক মহিলার আর্ত চিৎকার: 'ওরা আমার ছেলেকে কেড়ে নিল, আমার ছেলেকে নিয়ে নিল'। 'কারা?' 'রাশিয়ানরা'। চিলির সংসদকৃত এক তদন্তে জানা গেছে এই আতঙ্কপ্রচারের উদ্ভাবক একটি মার্কিন বিজ্ঞাপন এজেন্সি এবং এর ব্যয় বহন করেছে মার্কিন এনাকোন্ডা কপার কোম্পানি।

চিলির অধিবাসীরা সংবাদপত্রের উৎসাহী পাঠক এবং লাতিন আমেরিকায় চিলিতেই সাক্ষরতা সর্বোচ্চ বলা চলে (শতকরা ৮৫)। এগারোটি প্রধান জাতীয় সংবাদপত্রের সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা আট লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার। একটি কাগজ [illegible]নেকে পড়েন ধরলে পাঁচ মিলিয়ন লোকের মধ্যে বলা যায় চিলির প্রায় সকলেই অন্তত একটি কাগজ পড়েন। ইউনিটি সরকারের দুবছর বাদেও বলা যায় প্রেসের গরিষ্ঠ অংশ এখনও সরকারের বিপক্ষে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে সরকারি পক্ষের সমর্থক দৈনিকগুলির প্রতি সংখ্যা বিক্রী হয় ৩১২,000 কপি, যেখানে সরকারবিরোধী দৈনিকের প্রতিসংখ্যা বিক্রী হয় ৫৪১,000 কপি। রবিবারের কাগজগুলির অনুপাতের সংখ্যাও এই রকম। পুঁজিবাদী বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া অর্থ বিরোধী প্রেসকে এখনও মদত দিচ্ছে। বিরোধী সংবাদপত্রের মধ্যে প্রধান মার্কুরিয়ো গ্রুপের কর্তা অগাস্টিন এডোয়ার্ডস, এক অভিজাত পরিবারে যাঁর জন্ম, ইউ. পি. ক্ষমতায় আসার পর থেকে মিয়ামিতে বাস করছেন। তিনি পেপসি-কোলার ইন্টারন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট। তথাকথিত সম্ভ্রান্ত, রক্ষণশীল এই মার্কুরিয়ো গ্রুপের প্রচারিত সংবাদের মিথ্যা ও বিকৃতিকে একাধিকবার ফাঁস করে দেওয়া সত্ত্বেও তা অব্যাহত।

আসলে ইউনিটি সরকার জনমনে যত প্রভাব বিস্তার করছে, বিরোধী প্রেসের প্রকাশ-খিঁচুনি ততই বাড়ছে।

বামপন্থী কল্পনাবিলাসীরা শুধু ভেবে এসেছেন যে সত্য প্রকাশিত হবেই এবং প্রচার কখনোই প্রকৃত ঘটনার থেকে বেশি বিশ্বাস্য হবে না। ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে বিশিষ্ট লেখক, সংসদ ও চিলি কম্যুনিস্ট পার্টি'র রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য ভোলোদিয়া টাইটেলবয়েম কর্তৃক প্রচার-সমস্যার উপরে প্রকাশিত এক প্যামফ্লেটে এই বিভ্রান্তির দোষ সমূহ আলোচিত হয়েছে। টাইটেলবয়েম সেখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে সবকিছু ভালোভাবে চলার জন্য শুধু ভালো কাজ করাই যথেষ্ট নয়। "একেবারেই ভুল ধারণা। যদি জনগণ না জানতে পারে, যদি তা থেকে জনমত না তৈরি হয় তাহলে তার ফল দাঁড়ায় বামপন্থীরা, এখানে সরকার, কিছুই করছে না অথবা খারাপভাবে করছে।" বিরোধী প্রেস সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও আসন্ন এক জাতীয় বিপদধারণার কথা প্রচার করছে যাতে গৃহযুদ্ধ এড়ানোর ছুতো করে সামরিক অভ্যুত্থানের মানসিক আবহাওয়া তৈরি থাকে। দক্ষিণপন্থী প্রেস দেশ ও জাতিকে এক যৌথ ভীতি ও আতংকের গভীর অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। তারা কুসংস্কার এবং হতাশা প্রচার করছে এবং জনতার মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব সৃষ্টি করছে।

চিলির দক্ষিণপন্থী প্রেস কীভাবে কাজ করছে, তার একটা উদাহরণ দেখা যাক। ১৯৭২-এর ১৮ সেপ্টেম্বর-এর ফিয়েস্তা পাত্রিয়া বা জাতীয় উৎসবের দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে রাজনৈতিক উত্তেজনা ততই বাড়তে থাকে। বিরোধীরা তখন এক আসন্ন সামরিক অভ্যুত্থানের গুজব ছড়াল। 'লা ত্রিবুনা' কাগজে প্রথম পাতায় সারি সারি টুপি পরা সৈন্যের মাথার নিচে পাতার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে বিশাল হেডলাইন ছাপা হলো সবাই যা পড়বে: THERE'S RATTLING OF SABERS (শোনা যাচ্ছে অস্ত্রের ধ্বনি)। খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য খুব ছোট অক্ষরে তার মাঝে 'but not' শব্দ দুটি চোখে পড়বে। অর্থাৎ আসলে হেডলাইনটা এই: "THERE'S RATTLING but not OF SABERS" (শোনা যাচ্ছে ধ্বনি, কিন্তু অস্ত্রের নয়)।

টাইটেলবয়েম এই সাংবাদিক মিথ্যাচারের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রচার ও জনসংযোগের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তাঁরা যেন 'সত্যের জন্য সংগ্রামের' এই আদিম যুদ্ধে যোগ দেন এবং 'সহজ ও নিবিড়স্বচ্ছ চিত্রকল্পে' ও 'ন্যায়সংগত, বিশ্বাসযোগ্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায়' সত্যের প্রচার করেন।

জনগণ যাতে নিজেরাই তাঁদের মতাদর্শগত আত্মরক্ষার লড়াই চালাতে পারেন সেজন্য কম্যুনিস্ট পার্টি'র জাতীয় সাংস্কৃতিক কমিশন জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্রের এক বিস্তৃত নেটওয়ার্কে'র প্রস্তাব দিয়েছেন। এই কেন্দ্রগুলি 'ব্রিগাদাস দে আজফাবেটি-জাদোরস'-এর সাহায্যে সাক্ষরতা অভিযান চালাবে, লাইব্রেরি গড়ে তুলবে, সামাজিক সমস্যা নিয়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করবে এবং লোকসংস্কৃতি, শ্রমিকদের থিয়েটার,

গানের দল এবং শিল্প-কর্মশালা গড়ে তুলবে। এ্যামালগামেটেড লেবর ইউনিয়নের (CUT) অধীন পিপলস থিয়েটার কারখানা ও গ্রামাঞ্চলে কাজ শুরু করেছে, কিন্তু এসব কেন্দ্র চিলিতে কতটা সফল হবে সেবিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। তবু বর্তমানে সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলি কীভাবে নতুন ভাবাদর্শ প্রচারের রূপান্তরিত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

## □ শিল্প শিক্ষালয়ের ভূমিকা

১৯৭২-এর ২৭শে মে, হাভানায় কাসা দ্য লাস আমেরিকাস-এ অনুষ্ঠিত লাতিন আমেরিকার শারীরাবয়বধর্মী শিল্পের উপর এক আলোচনাসভায় চৌত্রিশজন শিল্পী এবং কলাসমালোচক (যাঁদের মধ্যে অনেকেই চিলিয়ান) নীচের এই ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন। সারা মহাদেশে লাতিন আমেরিকান শিল্পের যে কোন প্রদর্শনীতে ব্যবহার-যোগ্য পোস্টার হিসাবে চিলিতে তা প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হয়। কিছু সংক্ষেপসহ ইস্তাহারটি এইরকম :

### লাতিন আমেরিকান শিল্পীদের প্রতি আহ্বান

'বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন প্রত্যেক লাতিন আমেরিকান শিল্পীর উচিত আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার বিকাশসঞ্চারে সাহায্য করা, যাতে এমন শিল্প গড়ে উঠতে পারে যা আমাদের নিজেদের কথাই বলবে ও জনগণ-ঐতিহ্যর অংশ হয়ে উঠবে। বিপ্লবী শিল্প এলিটিস্ট নন্দনতত্ত্বের সীমাকে অতিক্রম করে, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে এবং প্রভুত্বকারী বুর্জোয়াসির মূল্যবোধ বর্জন করে। বুর্জোয়া সমাজে শিল্প যে চাহিদাযোগানের যান্ত্রিকতায় বন্দী, বিপ্লব শিল্পকে তার থেকে মুক্ত করে। বিপ্লবী শিল্প কোন মডেল উপস্থিত করে না বা পূর্বনির্ধারিত কোন শৈলীর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে না। কিন্তু মার্ক্স যেমন বলেছেন, প্রকৃত সৃজনশীলতা এমন এক পক্ষপাতের ধারক যার ফলে একটি জাতির ও সংস্কৃতির চরিত্র-সত্তা নির্দিষ্ট রূপে ফুটে ওঠে।

লাতিন আমেরিকান শিল্পী নিজেকে পক্ষপাতহীন বলে ভাবতে পারেন না কিংবা একজন মানুষ হিসাবে তাঁর দায়িত্বের থেকে শিল্পীর ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন না। একজন শিল্পীর মধ্যে বিপ্লবী চেতনার জন্ম হয় যখন তিনি তাঁর সৃজন-শীলতার বিযুক্তি ও খণ্ডতায় যন্ত্রণা পান এবং তাঁর সৃষ্টিশীল কাজ বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থে দায়বদ্ধ আন্তরিকতায় ব্যবহার করে সেই বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে ওঠেন। সেইজন্য লাতিন আমেরিকান শিল্পীর জঙ্গী আচরণ তাঁর কাজের মতোই গুরুত্ব-পূর্ণ। একটি অপরটির নামান্তর। তিনি জনগণের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপায়পদ্ধতি কতটা উদ্ভাবন করতে পারছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ভাবনার বিস্তারকে কতটা রোধ করতে পারছেন তা দিয়েই তাঁর যোদ্ধাচরিত্রের বিচার হবে। প্রতিটি দেশের

সংগ্রামের নির্দিষ্ট রূপ অনুযায়ী তাঁর উচিত সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত ধরনের সাংস্কৃতিক অবদমনকে অস্বীকার, বর্জন ও ধ্বংস করা, তা প্রতিবাদ, অনুপস্থিতি, বয়কটের দ্বারাই হোক অথবা যেখানে ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন রয়েছে সেখানে অনুরূপ হিংসার দ্বারাই হোক। বিপ্লব এমন এক প্রক্রিয়া যা ক্ষমতাদখলের বহুপূর্বে শুরু হয় এবং তারপরেও দীর্ঘকাল চলতে থাকে। এই লড়াইয়ে নিজেকে জড়িয়ে শিল্পী শুধু ক্ষমতাদখলে সাহায্যই করেন না, তারপরেও এক বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মসূচিকে রূপায়িত করেন যার ফলে নতুন মানুষের জন্ম হয়।

তাই আমরা এসবের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই :

লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের বিস্তার, যা সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্নতা-কামী শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে ;

বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রচারের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রগুলির উপর শিল্পের নির্ভরতা ;

শিল্পকে স্থানীয় বুর্জোয়াদের চক্রান্তে জাতির শোষণের উপায়ে পরিণত করা ; তথাকথিত শিল্পের নিরপেক্ষতা ;

বাণিজ্যিক বাজারী যান্ত্রিকতা, ফ্যাশনের তাগিদ এবং তার থেকে উদ্ভূত নান্দনিকতায় শিল্পীর নির্ভরতা ;

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে উপস্থাপিত তথাকথিত নান্দনিক বিপ্লবসমূহ ;

তথাকথিত সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে বুর্জোয়া মতাদর্শের সুবিধার্থে ব্যবহার ;

ধনতান্ত্রিক সরকারসমূহকে কিছু শিল্পীর মদতযোগান ;

ব্যক্তিগত সফলতা খুঁজতে গিয়ে শিল্পী ব্যক্তিগত স্তরে যে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হন ;

জনগণের শোষণ ও উৎপীড়নকে আড়াল করার কাজে শিল্পকে এক উদারতার আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার।

এই ধরনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিলির শিল্পী, কলাসমালোচক ও শিল্প-শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৭০-এর ২৯শে ডিসেম্বর চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধীনে ইনস্টিটুটো দ্য আর্টে লাতিনো আমেরিকানো (IAL) প্রতিষ্ঠা করেন। লাতিন আমেরিকান শিল্পের উপরে গবেষণায় এবং প্রকাশনায় IAL ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার উপর সাংস্কৃতিক নির্ভরতার সমস্যার কথা তুলে ধরেছে। খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে এতদিন লাতিন আমেরিকান শিল্পের উপর কোন আলাদা পত্রিকা ছিল না ; তার ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য কোন মিউজিয়ম ছিল না ; ছিল না তার উন্নতির লক্ষ্যে গঠিত কোন সোসাইটি বা সংগঠন বা কোন লাইব্রেরি। সমালোচক ও অধ্যাপকদের মধ্যে IAL সাও পাওলো মিউজিয়মের প্রাক্তন ডিরেক্টর মারিয়ো পেদ্রোসা এবং আর্জেন্টিনার আলদো পেলেগ্রিনির নজর কেড়েছে এবং আরো অনেক বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা পাবে বলে আশা করছে। লাতিন আমেরিকান শিল্প ও

শিল্পী, এমনকি লাতিন আমেরিকান প্রকাশবস্তুর উপর ( IAL ডিরেক্টর মিগুয়েল রোজাস মিক্স এই ইতিহাসের উপর একজন বিশেষজ্ঞ ) বিদেশী শিল্প বিষয়ে ফটোগ্রাফ, স্লাইড, ফিল্ম ও টেপকরা সাক্ষাৎকার নিয়ে একটা লাইব্রেরি গড়ে তোলা হচ্ছে।

বক্তৃতা ও সেমিনারের সুযোগসুবিধাসহ IAL-কে রাউন্ডটেবিল আলোচনার কেন্দ্র-রূপে গড়ে তোলা হবে। এর আরো বিস্তৃত কার্যসূচির মধ্যে থাকবে ভ্রাম্যমান পোস্টার প্রদর্শনী ( যার দুটি চালু হয়ে গেছে ), প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, দেওয়ালচিত্রণ এবং নগর ও পরিবেশ পরিকল্পনায় উন্নতি। জাতির সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নে শিল্পী, স্থপতি, সমাজতাত্ত্বিক এবং শিক্ষাবিদদের ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে IAL-কে ভাবা হয়েছে।

মিউজিয়ম অফ লাতিন আমেরিকান আর্ট নামে একটা স্থায়ী শিল্পসংগ্রহশালার কথাও ভাবা হয়েছে যা ইতিমধ্যেই IAL-এর প্রদর্শনকক্ষগুলিতে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে, যেমন মিউজিয়ম অফ কনটেমপোরারি আর্ট, মিউজিয়ম অফ পপুলার আর্ট এবং ইউনিভার্সিটি গ্যালারিতে। মিউজিয়ম অফ কনটেমপোরারি আর্টে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রদর্শনীটি বাস্তব কারণে শুধু চিলির শিল্পীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তার শিরোনাম ছিল "আমেরিকাবাসী, আমি বৃথাই তোমার নামউচ্চারণ করিনি"। "জনতার বিজয়কীর্তিতে উৎসর্গিত" এক প্রদর্শনীতে চিলির শিল্পীরা ছাড়াও আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের প্রধান প্রধান শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। রামোনা পারা ব্রিগেড নব্য প্রাচীরচিত্রের নবজাগৃতি উদযাপন করেছিল। অপেক্ষাকৃত কম রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল "এ্যাবস্ট্রাক্টস, জিয়োমেট্রিকস এ্যান্ড কিনেটিকস" নামের প্রদর্শনীতে।

বুর্জোয়া শিল্প এবং এ্যাকাডেমিক সংগঠনগুলি দ্বারা অবহেলিত কমিকস্ট্রিপ-এর মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমটির উপরে IAL একটি সেমিনার ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। কমিকস্ট্রিপস বিভিন্ন ক্ষেত্রের যেসব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্মিত হয় বা হওয়া উচিত, যেমন মাস-কম্যুনিকেশন, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, শিল্পসমালোচনা ইত্যাদি, তাদের সকলকে একত্রে কাজ করানোর অসুবিধাও এক্ষেত্রে অনিবার্যত অতিক্রম করতে হচ্ছে। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে ঐক্য রয়েছে, যা এতদিন বুর্জোয়া স্বার্থে ব্যবহৃত এই মাধ্যমটির রূপান্তরের কাজে প্রথমত প্রয়োজন। তা হলো মার্কিন এবং মার্কিনপ্রভাবিত কমিকসকে সাম্রাজ্যবাদের গোপন অস্ত্র হিসাবে উন্মোচন করা।

মিউজিয়ো দে সলিদারিদাদ চিলি নামে আর একটি মিউজিয়ম এক সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে : সারা বিশ্বের শিল্পীদের কাছ থেকে দান হিসাবে শিল্পসংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এযাবৎ লাতিন আমেরিকান শিল্পীরাই এই আহ্বানে দারুণভাবে সাড়া দিয়েছেন। এরই মধ্যে বিরাশি জন মেক্সিকান, পনেরো জন কিউবান, সাতজন আর্জেন্টাইন, সাত ব্রাজিলিয়ান এবং ভেনেজুয়েলা ও উরুগুয়ের একজন করে শিল্পীর ছবি পাওয়া গেছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে আটাশজন স্প্যানিশ, ( মিরোকে

নিয়ে, যিনি একটি বিশেষ ছবি এই উদ্দেশ্যে এঁকে দিয়েছেন ), চব্বিশজন ফরাসি ( যার মধ্যে ল্যুরসাত ও ভাসারেলি আছেন ), দুই ইতালিয়ান, এক ডাচ, এক পোর্তুগীজ এবং এক রুমানিয়ান আছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র চারজন শিল্পী কাজ পাঠিয়েছেন : তাঁরা হলেন রিচ মিলার, পাবলো ও' হিগিনস, জে. পেটলিন ও এঞ্জেলা ফন নয়মান। এছাড়া ফিলিপ গাস্তোন, রবার্ট মাদারওয়েল, ফ্রাংক স্টেলা, আদিয়া ইউংকার এবং ফিলিপ ইয়ঙ্গারম্যান ছবি দেবেন বলেছেন, যেমন কথা দিয়েছেন ইংল্যান্ডের ফ্রান্সিস বেকন, ডেভিড হকনি, ফিলিপ কিং, হেনরি মুর, বেন নিকলসন, এদুয়ার্দো পাওলোজি এবং ব্রিজেট রিলে।

দি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ আর্টিস্টিক সলিডারিটি উইথ চিলি, যাঁরা এই মিউজিয়মের পৃষ্ঠপোষক, এইসব ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত : কবি লুই আরাগঁ, প্যারিস মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এর ডিরেক্টর জাঁ লেমারি, স্প্যানিশ কবি গিউলিয়ো আলবের্তি, ইতালীয় সেনেটর, শিল্পী ও লেখক কার্লো লেভি, স্প্যানিশ শিল্প-সমালোচক জোসে মারিয়া মোরেনো গালভান, আর্জেন্টিনার লেখক ও কলা-সমালোচক আলদো পেলিগ্রিনি, পোলিশ অধ্যাপক ও কলাসমালোচক জুলিয়াস স্টারজিনস্কি, কিউবার কাসা দে লাস আমেরিকাস-এর উপাধ্যক্ষ মারিয়ানো রোদ্রিগেজ ও শিল্পী মারিয়ো পেদ্রোসা যিনি ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অফ আর্টক্রিটিকস-এর উপসভাপতি এবং ইউনেস্কোর ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্টের পরামর্শদাতা ও চলচ্চিত্রাভিনেতা দানিলো ট্রেলেস।

"মিউজিয়ম রয়েছে, যদিও তার বিল্ডিং নেই। কিন্তু শিল্পকর্ম অনেক রয়েছে কোনলি সংগৃহীত দান হিসাবে এসেছে এবং এখনও আসছে।" এই কথা বলে মিউ-জিয়মের অধ্যক্ষ মারিয়ো পেদ্রোসা, যিনি ব্রাজিলের সাও পাওলো মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত হয়ে চিলিয়ান এমব্যাসিতে আশ্রয় নিয়েছেন, আলেন্দের নির্বাচনী জয় উদ্যাপন করলেন। ১৯৭২-এর ২৬শে এপ্রিল তাঁর বক্তৃতায় মিউজিয়মের পৃষ্ঠপোষণের জন্য প্রেসিডেন্ট আলেন্দে ও তাঁর সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে পেদ্রোসা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই মিউ-জিয়মের বিশিষ্টতার কথা বললেন : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধারার রাজনীতি চিন্তার ( দক্ষিণপন্থা ছাড়া ) শিল্পীরা এখানে এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে এক দরিদ্র দেশকে তাঁদের শিল্পকর্ম দান করতে একজোট হয়েছেন।

এই মিউজিয়ম জনগণের জন্য, কারখানার শ্রমিক, খনিশ্রমিক ও কৃষকের ঐতিহ্যের অংশ। UNCTAD ভবনে দান হিসেবে পাওয়া এইসব শিল্পকর্মের প্রথম প্রদর্শনীতে দশ দিনে ৩৫,০০০ লোকসমাবেশ হয়েছিল। এই বাড়িটিকেই আগে মিউজিয়মের জন্য ভাবা হয়েছিল। কিন্তু পরে অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় সান্তিয়াগোরই অন্য কোথাও এক চিরস্থায়ী ভবন নির্মিত হবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু এই সংগ্রহের এক অংশ দেশের সর্বত্র




建家立業



পৌঁছানোর জন্য বরাবরই ভ্রাম্যমান থাকবে।

## ☐ দেওয়াল ও প্রাচীরচিত্র : রামোনা পারা ব্রিগেড

কিন্তু জনগণের প্রকৃত মিউজিয়ম ও সংবাদপত্র হলো রাস্তাঘাট। প্রত্যেক শহরে এতাবৎ খালি পড়ে থাকা দেয়ালগুলি U. P.-র রাজনৈতিক দলগুলি দখল করেছে। গত দু'বছর ধরে চিলির বাম দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রচারসচেতন কম্যুনিস্ট পার্টির স্লোগানগুলিই রামোনা পারা ব্রিগেডের কাজের ফলে সব থেকে বেশি চোখে পড়ে।

এই বিখ্যাত গেরিলা ম্যুরালিস্টদের উদ্ভব হয় ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভালপারাইজো থেকে সান্তিয়াগো পর্যন্ত এক পদযাত্রায়। এই পদযাত্রার আগে জুভেনতুদেশ কম্যুনিস্টাস, কম্যুনিস্ট ইউথ (JJCC) সারা পথ জুড়ে এর সমর্থনে দেয়ালে ও ব্যানারে স্লোগান লেখেন। পরে নির্বাচনী প্রচার এগিয়ে আসতে তাঁরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলেন্দের সমর্থনে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৯ সালে শহীদ একজন জঙ্গী শ্রমিককিশোরীর নামে তাঁরা দলের নাম দেন রামোনা পারা ব্রিগেড (BRP)। (অন্যান্য পার্টির সঙ্গে যুক্ত আরো ম্যুরালিস্ট ব্রিগেড রয়েছে যেমন মুভিমিয়েন্তো দে আক্সিওন পপুলার ইউনিদো (MAPU) এবং সোস্যালিস্টব্রিগেড, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অনেক কম এবং তাঁরা শুধু শব্দনির্ভর স্লোগানই লেখেন।) নির্বাচনের সময়ে রামোনা পারা ব্রিগেড শুধুমাত্র উপযোগী রাজনৈতিক কথাবাণীই লিখেছেন। তাঁরা সাধারণত রাত্রে কাজ করতেন যাতে অতি দ্রুত পুলিশ বা প্রতিপক্ষ পার্টির লোকেরা আসার আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়। প্রায়ই সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নোংরা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং পুলিশ ও দক্ষিণপন্থী দলের লোকেদের আক্রমণের মুখে পড়তে হতো তাঁদের। তখনই ছদ্ম মিলিটারি নাম গ্রহণ করা এবং গৃহনির্মাণ শ্রমিকদের শক্ত টুপি পরার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবা হয়। দুটো প্রথাই এখনো রয়েছে, যদিও UP সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পুলিশ আর হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

একটি ব্রিগেডের সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা বারো এবং সদস্যরা হয় শ্রমিক নয়তো হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্র। তাদের ভাঙাচোরা ট্রাক এর বেশি লোক নিতে পারে না। এছাড়াও তাতে বড় বড় ৫0 গ্যালন-এর রঙের ভ্যাট নিতে হয়। আর একটা দেওয়ালে ভালোভাবে কাজ করার জন্য বারো জনই যথেষ্ট। ব্রিগাদিস্তারা, ছেলে মেয়ে সকলেই, খুবই কমবয়সী, তাদের গড় বয়স সতেরোর বেশি নয়। তারা একজন নেতা নির্বাচন করে যার ওপর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং বর্তমান রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে পরামর্শের জন্য পার্টির সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব থাকে। সমস্ত ব্রিগেডই কামিসিওন নাসিয়োনাল দে প্রোপাগান্ডার অধীন। প্রতিটি অভিযান বা 'রালাদো' আগে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পিত থাকে, বিশেষত স্থান (সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য

এবং লোক যাতায়াতের কেন্দ্র কিনা ) এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে ( বিষয় নির্বাচন, স্লোগানের ভাষা এবং ভিস্যুয়াল ডিজাইন নির্বাচন )। কাজটি শেষ হওয়ার পরে দলগত আত্ম-সমালোচনা করা হয়।

চিলিতে শহরের মধ্যে, মফস্বলে, গ্রামাঞ্চলে এবং পথের পাশে স্লোগান লেখার উপযোগী দেওয়ালের সংখ্যা প্রচুর। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে যে-সব দেওয়াল তৈরি হয়েছিল ব্রিগেড সেগুলি বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করে জনগণকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ব্রিগেড কিন্তু স্কুল, হসপিটাল বা চার্চের দেওয়াল কখনো নষ্ট করে না। কিংবা মার্কিন-স্টাইলে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং বা বিল বোর্ড, যা বুর্জোয়া ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেয়, সেগুলিতেও তারা স্লোগান আঁকে না। আইনকানুন তারা কঠিনভাবে মেনে চলে। শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কারখানায় তারা ভালোই অভ্যর্থনা পায়, কিন্তু গ্রামে ও মফস্বলে স্থানীয় লোকদের বোঝাতে হয় তাদের উদ্দেশ্য কী এবং আশ্বস্ত করতে হয় যে তারা তাদের দেওয়াল নোংরা করতে আসেনি (বিরোধী প্রেস যা ক্রমাগত প্রচার করে থাকে )।

এই দেওয়ালচিত্রীরা মধ্যযুগের শিল্পীদের মতো শ্রমবিভাজন সাপেক্ষে কাজ করে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গতি ও দক্ষতার প্রতি আধুনিক মনোযোগ। প্রথমে 'ত্রাজাদোর' দক্ষ ও নির্ভুলহাতে হরফ বা ছবির আউটলাইন এঁকে ফেলে। এমনকি সেগুলো আট থেকে দশ ফুট উঁচু হলেও তার দক্ষতার অভাব হয় না। তার ভূমিকাই সবচেয়ে কঠিন এবং প্রত্যেক ব্রিগাদিস্তাই তার জায়গায় পৌঁছতে চায়। এর পরে 'রেলেনাদোর' অক্ষর বা ছবিগুলি ভরাট করে। তারপরে 'ফন্দেয়াদোর' পশ্চাৎপট আঁকে। এই তিনটি প্রধান ভূমিকার সঙ্গে কখনো কখনো প্রয়োজন হয় 'ফিলেতাদোর'কে যে সূক্ষ্ম রেখা আঁকে কিংবা 'রেতোকাদোর', যে ফিনিশিং টাচ্ দেয়। যে-রঙ ব্যবহার হয় তা হলো কেসিন-ভিত্তিক সস্তা রঙ, যা যুক্তরাষ্ট্রে ম্যুরালের জন্য ব্যবহৃত দামী রঙের মতো ঝড়জলে বেশিদিন টেঁকে না। ফলে পুরনো দেওয়ালছবি মেরামতে অনেক সময় যায়, যদি না তাদের মুছে ফেলে নতুন স্লোগান আঁকা হয়।

এভাবে যে কাজ হয় তা দ্রুত হলেও কিছুটা নোংরা ও খসড়াধর্মী হয়। অনেকসময়ই দেওয়াল খুব উঁচুনীচু থাকে, কখনো কখনো রিলিফে দু'তিন ইঞ্চিরও পার্থক্য দেখা যায়, ফলে তুলি বেঁকিয়েচুরিয়ে চালাতে হয়। এই ধরনের সারফেস-এর জন্য স্প্রে-গান ও স্প্রে-পেন্টই উপযোগী। কিন্তু ব্রিগেড তা কিনতে পারে না। ডিজাইনের সবচেয়ে উপরের অংশ আঁকার জন্য বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। তলার অংশের জন্য মাটি বা ঘাসের উপর বসে পড়তে হয়। ধুলোবালি মাখাটা কাজেরই অঙ্গ মনে করা হয় এবং কার্যত স্কুলস্টুডেন্ট ব্রিগাদিস্তারা নিজেদের মজদুর বলে অনুভব করে। কাঁধে কাঁধ দিয়ে তারা যখন কাজ করে, তাদের অঙ্গভঙ্গি, আনন্দ উদ্দীপনা তারা যে কথাবাণীর রূপ দিচ্ছে তার মূল সুরকেই প্রকাশ করে। নির্বাচনী জয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী

উদযাপনে আট লক্ষ লোকের মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে আমি দেখেছিলাম হঠাৎ কোথা থেকে BRP ট্রাক আবির্ভূত হল এবং এক ডজন গেরিলা জনতার অভিনন্দনের মধ্যে শত্রু-অবস্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়ল। অর্থাৎ নিউফাসিস্ট (মার্কিন সমর্থিত) পাত্রিয়া ই-লিবের্তাদ অফিসের সামনে। এক মুহূর্তে PL-এর স্বস্তিকাচিহ্ন এক সরকারি স্লোগানে ঢাকা পড়ল।

ব্রিগেডের স্লোগানসব ভিত্তিমূলক হলেও বিভিন্ন ধরনের। সর্বাধিক ব্যবহৃত এই বাক্যটি যা প্রায় ব্রিগেডের আপ্তবাক্য: "পিতৃভূমি ও বিপ্লবের জন্য লড়াই করো, শ্রম করো, কাজ ও অধ্যয়ন করো।" সংবাদপত্র থেকে সরাসরি তুলে দেওয়া হেডলাইন: "এবং খনিগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়েছে।" কিংবা ভবিষ্যতের জন্য আশ্বাস: "এবং সকলের জন্য কাজ তৈরি হবে।" এ ছাড়া আছে পাবলো নেরুদার কবিতার লাইন যা জাতীয় চেতনার মধ্যে গ্রথিত হয়ে আছে: "তুমি আমাকে এক পিতৃভূমি দিয়েছ যা এক নব জন্মের মতন"। "শিশুরা সুখী হওয়ার জন্যই জন্মায়" বাক্যটি সম্ভবত ব্রিগেডের সঙ্গে কর্মরত এক এগারো বছর বয়সীর সৃষ্টি। মার্কিনবিরোধী স্লোগান সংখ্যায় কম। BRP মনে করে যে তারা পথকে জনতার ব্ল্যাকবোর্ডে পরিণত করেছে। ঐ বড় হরফের স্লোগানগুলো সাক্ষরতায় অনুপ্রেরণা যোগায়। নিজের সাংস্কৃতিক বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন যে-কোন নিরক্ষর কৃষক প্রতিদিন ঐ বিশাল হরফগুলোর সামনে দিয়ে যেতে যেতে তার অর্থ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে শেষপর্যন্ত তার সারার্থ উদ্ধার না করে পারে না।

আলেন্দের নির্বাচনে পরেই BRP তার স্লোগানের সঙ্গে ছবি যোগ করল। জয়ের দুদিন পরে তারা প্রথম সচিত্র ম্যুরালটি আঁকে। আগে তাদের কাজ ছিল পার্টির নাম লেখা, এখন তারা তাদের কর্মসূচি, ভাবনা ও ইউনিটি সরকারের আত্মশক্তির বিপ্লবী প্রক্রিয়াই প্রকাশ করতে চেষ্টা করল। স্লোগানের [illegible] ছবি জুড়ে এবং তাদের নিজস্ব ছবির ডিজাইন ব্যবহার করে BRP অনেক আকর্ষণীয় রূপে একটা কথাকে প্রচার করতে পারে। গত দুবছরে ব্রিগেড অত দ্রুত বাড়তে পারত না (সারা দেশে ১৫০) যদি তারা সকল শ্রেণীর বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য এবং অনভিজ্ঞ ব্রিগেডের পক্ষে সহজে অনুকরণযোগ্য কিছু প্রতীকী চিত্রকল্প না খুঁজে পেত। প্রথমে তারা কিছু ডিজাইন ব্যবহার করত যেগুলো খুব বিমূর্ত বলে পরে পরিত্যক্ত হয়। শিল্পগতভাবে অশিক্ষিতের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তারা এক ধরনের সহজ, সার্বজনীন, প্রতীকী এক আদি চিত্রভাষার আশ্রয় নেয় যা শান্তি, শ্রম ও যৌথতার ভিত্তিতে রচিত। যেমন পায়রা, ফুল, হাত, হাতের মুঠো, মুখ বা পতাকা, নক্ষত্র ও ধানের শীষ, কারখানার চিমনি, হাতুড়ি ও কাস্তে (এবং অবশ্যই কাস্তে-হাতুড়ি, যা এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতীকের থেকেওবেশি কিছু)। সমাজবাস্তববাদী অনুকরণবিদ্যার পরিবর্তে প্রতীকের ব্যবহার করে ব্রিগেড সেই কথাকেই সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা ছয়-এর

দশকের শেষভাগে কিউবার পোস্টারশিল্পীরা জোর দিয়ে বলেছিলেন : প্রতীকী শিল্প এমনকি অশিক্ষিত লোককেও নাড়া দেয়। এইসব চিত্রকল্প বিভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া। পিকাসো, লেজের, ইউরোপীয়পোস্টার ও আভ'গার্দ' পাশ্চাত্য গ্রাফিক্স-এর (পপ শিল্প, ইত্যাদি) কাছে স্পষ্ট ঋণ ছাড়াও রিভেরা এবং বিশেষত সিক্যেরাস এবং তাদের হাত ধরে প্রি-কলাম্বিয়ান শিল্পের থেকেও বহু কিছু নেওয়া হয়েছে। BRP-র কাজের সর্বোত্তম পর্যায়ে সিকোরাস-এর গতিময় স্থিতিস্থাপকতার সাথে রিভেরার নিবিড় কাঠিন্যের এক সুন্দর মিশ্রণ পাওয়া যায়। (সিক্যেরাস-এর শ্রেষ্ঠ ম্যুরালগুলির একটি চিলির এ্যাকুয়েলা মেক্সিকো ইন চিলান-এর গ্রন্থাগারে রয়েছে।) BRP-র কাজে বিখ্যাত মেক্সিকান ম্যুরালগুলির বিশালতা এবং প্রতীকী শক্তির কিছুটা রয়েছে যদিও তাদের সূক্ষ্মতা ও আবেগের বৈচিত্র্য সেখানে নেই। কিন্তু তা সিক্যেরাস-এর এক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করেছে যা তিনি নিজে করতে পারেননি, তা হলো ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে যাওয়া এক দর্শকের কাছেও একটি শিল্পকর্ম বোধগম্য হবে। কিন্তু একটি পার্থক্য আছে : এই মেক্সিকানরা এমন শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন যা স্থায়ী হবে, কিন্তু BRP-র শিল্প স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী, তা এক মুহূর্তের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সৃষ্ট। ব্রিগাদিস্তাও তাঁদের সমর্থকরা একে বলেন "contingent art" বা আকস্মিকতার ছবি অর্থাৎ তা বিশেষ সামাজিকপরিস্থিতিতে জন্ম নেয়, বাঁচে ও লোপ পায়। অবস্থার পরিবর্তনে তা মুছে ফেলা হতে পারে কিংবা ঝড়জলে নষ্ট হওয়ার মুখে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

BRP ম্যুরাল চিরদিন না টিঁকে থাকতে পারে কিন্তু যতদিন টিঁকে থাকে, ততদিন তা দিগন্ত অবধি নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে। মেক্সিকান শিল্পীর চিত্রিত ভিতর-দেওয়ালগুলি শুধু ওই চার দেওয়ালের মধ্যকার ক্ষেত্রই পূর্ণ করে। তা স্থাপত্য-গতভাবে সীমাবদ্ধ। ৪০০ ফুট রিওমাপোচো ম্যুরাল, যা তিরিশজনে মিলে পনেরো দিনে করেছে, প্রায় এক মাইল দূর থেকে দেখা যায়। কাছ থেকে দেখলে সেই দেওয়ালছবির চরিত্রে আর একটি দিক চোখে পড়ে : অমসৃণ দেয়ালের টেক্সচার ও গড়ন এক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

মেক্সিকান ম্যুরালিস্টরা তাঁদের ইস্তাহারে এবং প্রায়ই তাঁদের কাজে যৌথভাবে কাজ করার কথা ঘোষণা ও তার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ম্যুরালগুলি একক বড় শিল্পীর চিন্তাপ্রসূত। চিলির ম্যুরালগুলির উপরে একমাত্র যে-নাম থাকে তা হলো BRP, কখনো তার সঙ্গে JJCC (কম্যুনিস্ট ইয়ুথ)। এমনকি প্রকৃতই অসাধারণ ডিজাইনগুলিকেও যৌথ প্রচেষ্টার ফল হিসাবে দেখানো হয়—যেমন স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির কাছে রিওমাপোচো, ইয়ারুর টেক্সটাইল কারখানা এবং কিয়োটোর কাজগুলি।

## ☐ রোবের্তো মাত্তা

রোবের্তো মাত্তা নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শিল্পী আছেন যিনি জন্মসূত্রে চিলির লোক। তিনি ১৯১২-তে সান্তিয়াগোতে জন্মেছেন এবং ১৯৩৩ সাল থেকে পারি ও ইতালিতে বাস করছেন। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ স্যুররিয়ালিস্ট শিল্পী ও দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁর দেশ তাঁর শিল্পকে ধারণ করতে না পারায় তিনি দীর্ঘদিন দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, তা সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তিনি বরাবর নজর রেখেছেন এবং আলেন্দে সরকারকে সমর্থন জানানোর জন্য চিলিতে ফিরে এসেছেন। ১৯৭১-এর নভেম্বরে ফাইন আর্ট স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন : "যে-সব জিনিসকে নোংরা বলে মনে হতো, যেমন কাদা, আমি সেসব উন্নত করতে চেষ্টা করেছি।··· চলুন আমরা ব্রিগেডে ভাগ হয়ে কৃষকদের গৃহে বা কারখানায় বড় ব্রাশ ও মৌলিক তিন রঙ ব্যবহার করে কাজ করি। রামোনা ব্রিগেড তাদের প্রায় দামালকিশোর শিল্পের সাহায্যে এই কাজই করেছে।"

অভিজ্ঞ শিল্পী ব্রিগেডের কিশোরশ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। একসাথে তাঁরা সান্তিয়াগোর শহরতলি লা গ্রানিয়াতে এক শ্রমিকবসতিতে একটি সুইমিং পুলে রঙ করেন। ম্যুরালটি যদিও BRP-র নামে তবুও ডিজাইন অব্যর্থভাবে মাত্তার। অদ্ভুত ছোট ছোট ফিগার, মানুষে পরিবর্তমান কীট, জড়াজড়ি করে ও পারস্পরিক শাখার মতো বাড়ন্ত হাত পা। কমিকাল, আত্মসচেতন কিছু সত্তা অবচেতনের সরে যাওয়া জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কি যৌন অথবা রাজনৈতিক জয় উদযাপন করছে, কিংবা একত্রে উভয়ই ?

স্পষ্টতই মনে হয় মাত্তা ও ব্রিগেড পরস্পরের সাথে মেলে না : বিরাট ব্যক্তিপ্রতিভা, যিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, আর শ্রমিককৃষকের যূথসত্তা যারা শুধুমাত্র সামাজিক চিত্রকল্প ব্যবহার করে। রাজনৈতিক বিশ্বাসের সূত্রে এক হলেও বক্তব্যপ্রকাশের আঙ্গিকে তাদের মধ্যে কোন মিল নেই। তবু, ব্রিগেডের যে কৈশোরিক আনন্দকে মাত্তা প্রশংসা করেছিলেন, খুব ভিন্নভাবে হলেও তা তার কাজেও কিছুটা বর্তমান।

## ☐ পোস্টার বা দেওয়ালনামা

দেওয়ালচিত্রীরা দেওয়ালনামার কারিগরদের সঙ্গে চিলির দেওয়াল ভাগাভাগি করে নিয়েছেন, যাঁদের কাজে তাঁরা প্রায়ই সাহায্যও করে থাকেন। নতুন রাজনৈতিক পোস্টারের উদ্দেশ্য ম্যুরালের মতোই পথকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। নির্বাচনী প্রচারের আগে বামপন্থীরা সস্তা কাজ চালানো পোস্টার ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করেনি, এমনকি নির্বাচনের সময়ও তারা তাদের বিরোধীদের চূড়ান্ত প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। কিন্তু নির্বাচনে জিতে ও জিগ-জ্যাগ

"অফসেট লিথোগ্রাফিক প্রেসের নিয়ন্ত্রণ হাতে পেয়ে সরকার তার কর্মসূচির আত্মশক্তি ও ভাবচরিত্র জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পোস্টারের পিছনে প্রচুর খরচ করেছে।

চিলির লোকেরা পোস্টারের জন্য তিনটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন যার প্রতিটির পৃথক উৎস ও তাৎপর্য রয়েছে। সবচেয়ে চলতি 'কার্টেল' শব্দটি তথ্যবাহী দেওয়াল-নামা বোঝায়। ফরাসি 'আফিস' শব্দটি ব্যবহৃত হয় শৈল্পিক বা ফরাসি ধরনের পোস্টার বোঝাতে। আর 'পোস্টার' শব্দটি ইউরোপের মতো সম্প্রতি লাতিন আমেরিকাতেও মার্কিনী টাইপের হিউমারাস পপ পোস্টার বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন রাজনৈতিক দেওয়ালনামায় এই তিন ধরনের পোস্টারের উপাদানই রয়েছে।

পোস্টার যে নব্য চিলির প্রয়োজনের পক্ষে খুব উপযোগী একটি মাধ্যম তা সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ, শিল্পী ও সমালোচকেরা বোঝেন। বিভিন্ন দেশের প্রদর্শনীর সাহায্যে বিপ্লবী পোস্টারের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র ১৯৭২-এর সেপ্টেম্বরেই সান্তিয়াগোতে এতগুলি প্রদর্শনী হয়েছে : UNCTAD ভবনে কিউবার পোস্টার, মার্কিন প্রতিবাদী পোস্টার, মুক্ত ভিয়েতনামের পোস্টার ( দুটোই মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসে ), এবং একশ'রও বেশি চিলির রাজনৈতিক পোস্টার ( সেনত্রো দে আর্টে )। কিউবার উদাহরণ ( এখন বিশ্ববিখ্যাত ) চিলিবাসীদের অনুপ্রাণিত না করে পারেনি, যদিও তাঁরা কখনও তার নিছক অনুকরণের চেষ্টা করেননি।

নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে ১৯৭০-এর অগাস্ট-এর মাঝামাঝি বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছত্রিশটি পোস্টার নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়। এঁদের অনেকেই আগে সিল্কস্ক্রীন মাধ্যম ব্যবহার করেননি বা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ করেননি। এই প্রদর্শনীটি একই সময়ে চিলির আশিটি জায়গায় দেখানো হয়েছিল এবং এক-একটি পোস্টার অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি করে নির্বাচনের প্রচারের জন্য টাকা তোলা হয়েছিল। ৫00 কপির প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং পরে এক-একটি পোস্টারের এমনকি ৩000 কপি পর্যন্ত ছাপতে হয়। আগে কোনদিন ছবি কেনেনি এমন লোকের কাছেও তা অবিলম্বে পৌঁছে যায়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় UP সরকারের বিরোধীরা সরকারি কর্মসূচির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে ক্লান্তিহীন। দেওয়ালে ও হোর্ডিং-এ খুব সাধারণ বক্তব্যের পোস্টারও (এবং কোন কারণে যে-সব পোস্টারে শৈশবের উৎসব উদযাপন করা রয়েছে) খুব দ্রুত কমতে থাকে এবং বেশীদিন টেঁকে না।

যেহেতু প্রতি সপ্তাহেই সরকার বা বামপন্থীরা নতুন পোস্টার ছেপে বের করে, চিলির অন্যথায় একঘেয়ে পথগুলিও তাই নতুন নতুন চেহারায় সদাই হাজির হয়। শৈলী ও বিষয়ে দেওয়ালছবির থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই, কিন্তু আরো অভিজাত পোস্টারগুলির উদ্দেশ্য এক অস্থির সময়ে জনগণকে ভরসা দেওয়া ও সরল আশাবাদ এবং শ্রেণী-ঐক্যের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্যের বোধ জাগিয়ে তোলা। পার্লামেন্ট

বহির্ভূত পার্টি মুভমেন্ট অফ দি রিভোল্যুশনারি লেফট-এর মতো এই পোস্টারগুলিতে দক্ষিণপন্থার সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের কোন কথা থাকে না। (ম্যুরালগুলিও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিশ্বাসে উদাহরণস্বরূপ)। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণা, যা কিউবার পোস্টারে চোখে পড়ে খুব বেশি, এখানে প্রায় নেই বললেই চলে।

কিছু শ্রেষ্ঠ পোস্টার-এর বিষয় হলো ১৯৭১ সালে তামার খনি জাতীয়করণ, যাকে এখন "দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস" বলা হয়। (তামা থেকে চিলি শতকরা আশি ভাগ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে এবং জাতীয়করণের আগে তা ছিল মার্কিন কোম্পানি হাতে।) একটি পোস্টারে দেখা যায় নেরুদার একটি উক্তির নীচে চিলির সমাজের এক প্রতিনিধিত্বমূলক অংশ আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তামার খন্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বিষয় হলো ঐক্য। অপর একটির বিষয় যৌবনপ্রাপ্তি। সেখানে রাজনৈতিকভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক চিলি এখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতই বড় হয়ে উঠছে। শৈশবের নিষ্কলুষ চিত্তধারণা—শিশুদের আনন্দ ও অধিকার, বড়দের অধিক দায়িত্ব ইত্যাদি চিলির নব্য শিল্পের গভীরে প্রোথিত। "চিলির আনন্দের শুরু তার শিশুদের থেকে" স্লোগানটি প্রায়শ পোস্টারে এবং ম্যুরালে দেখা যায় উজ্জ্বল রঙ ও আঙ্গিকে এক সরল শিশুসুলভ আনন্দ প্রকাশ করছে।

এই একই ধরনের সারল্য দেখি অন্য কিছু পোস্টারেও, যেখানে সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবকে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে আহ্বান করা হচ্ছে। সেখানে এই ধারণাটা সরাসরি রাখা হচ্ছে যে খেলাধুলা, শিক্ষার মতোই কোন বিশেষ শ্রেণীর ভোগের জন্য নয়। ডিজাইনের হাল্কা চালে কাজ ও খেলার মধ্যে মিথ্যা বুর্জোয়া দ্বন্দ্বকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকে স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচিতে ছাত্ররা দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণ, শিশুদের জন্য খেলার মাঠ এবং ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের কাজ করেছে। একটি পোস্টারে ভূমিকম্পকে এইভাবে রূপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে তা শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, অতীতের অনুর্বর পাথর ফাটিয়ে নতুন চিলির আত্মপ্রকাশও। আর একটি বাচনিক চিত্রকল্পে কাজের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌথ প্রচেষ্টার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা হয়েছে এক জোড়া পাখির বাসা বাঁধার আনন্দে।

এই পোস্টারগুলি শক্তিশালী একদল শিল্পীর করা যাঁরা রেকর্ডের জ্যাকেট এবং ফিল্মের পোস্টার ডিজাইনেও বিপ্লব এনেছেন। নতুন চিলির লোকসঙ্গীত এবং সাম্প্রতিক সামাজিক বিষয় নিয়ে ফিল্মের এক ক্রমবর্ধমান ইনডাসট্রি ইতিমধ্যেই জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনায় দাগ কেটেছে, যা এতদিন মার্কিনী ইউরোপের আমদানি করা সংস্কৃতিতেই ডুবে ছিল।

সরকারি বড় আকারের পোস্টার বেশিরভাগই কিমান্তুর অফসেট লিথোগ্রাফিক প্রেসে ছাপা হয়। স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির (UTE) নিজস্ব অফসেট প্রেস

আছে যা তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রীষ্মকালীন স্কুল, শিক্ষাকর্মসূচি এবং শ্রমিকশ্রেণীকে জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিস্রোতে নিয়ে আসার জন্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়। UTE পোস্টারগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং বুদ্ধিদীপ্ত, ( অনেকটা কিউবার পোস্টারের মতোই বলা যেতে পারে, ) শ্রেষ্ঠ পোস্টারগুলির চিত্রিত প্রতীকে বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎপাদন একই ধরনের লক্ষ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন। শ্রমিক ও কৃষককে বুদ্ধিজীবি ও শিল্পকর্মীর থেকে ভিন্ন বা কোন অংশে কম মনে করা উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শারীরিক শ্রমের ভাবপ্রতীককে দক্ষভাবে সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সহজিয়া প্রতীকের সঙ্গে মেলানো হয়েছে। যন্ত্রের দাঁতওয়ালা চাকা (cog) হয়েছে উদীয়মান সূর্য, রেঞ্চকে আঁকা হয়েছে গীটারের সঙ্গে মিলিয়ে এবং গাঁইতিকে বইয়ের মতো।

চিলিতে এখনো শ্রমিকশ্রেণীর আপন শিল্প-উৎপাদনের প্রকল্প অনেক দূর। এবং তাদের সাংস্কৃতিক বঞ্চনা ও এতদিন ধরে চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা বুর্জোয়া আদর্শপাশ কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগবে। ভবিষ্যতের নির্দেশবাহী শিল্পের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ. আর. স্বাক্ষরিত কৃষক ও জেলেজীবনের সংকেতময় সিল্কস্ক্রীন ডিজাইনে, যা চিলির সুধীজনের নজর কেড়েছে। এঁর কাজে পোসাদা প্রিণ্টের সারল্য ও হিউমারের সঙ্গে মিশেছে প্রাচ্য ধারার অলংকরণ।

সরকারি এজেন্সির দেওয়ালনামা স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ইস্যু ভিত্তিক। ব্যক্তিশিল্পীরা সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা থেকে যেসব পোস্টার এঁকেছেন সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বোধে উদ্দীপ্ত এবং পপ আর্ট ও পুঁজিবাদী পশ্চিমের প্রতিবাদী গ্রাফিকস ও বিভিন্ন আভাঁগার্দ আন্দোলন থেকে আহৃত শৈলীর। চিলির শিল্পীরা ধনতান্ত্রিক শোষণের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসাবে বন্দুক আঁকেন। শান্তির পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিশ্বাসী তাঁরা কিউবানদের মতো তা জনতার বিপ্লবী ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে দেখেন না, যদিও তাঁরা দ্রুত কিউবার বিপ্লব-সূত্রে একাত্ম হয়েছেন। লাতিন আমেরিকান ঐক্যের প্রতি দায়বদ্ধ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজটি সম্ভবত পেনিয়া পারায় ( যেখানে বিখ্যাত পারারা গান গায় ) প্রদর্শিত বিশাল আমেরিকা দেসপিয়ের্তা নামক সিল্কস্ক্রীন পোস্টারটি। এই সুন্দর কার্টোগ্রাফিক রূপকর্মে লাতিন আমেরিকাকে দেখানো হয়েছে আশা ও বেদনার এক অস্থির বন্ধন হিসাবে, যেখানে প্রাচীনের প্রতীকসমূহ নবীন প্রতীকের সাথে সংগ্রামরত, ফ্যাসিবাদ ও বিপ্লবের আগুনের মধ্যে আটকে পড়া এক মহাদেশ যেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে আলেন্দের মুখের ছবি বরং খুব কম দেখা যায়। নতুন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় এসে প্রথমেই যে কাজগুলি করেছেন তার একটি হলো নিজের পোর্ট্রেট পোস্টার হাজারে হাজারে ছাপানো বন্ধ করা। এই পোস্টারগুলি সাধারণত একজন নতুন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় এলে সারা দেশে সমস্ত সরকারি অফিসে ঝোলানোর জন্য পাঠানো হয়। একক ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকেই এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। □







লু স্যুন

# চীনদেশের ছবিকথা

বছর পাঁচেক আগে আমি বেইজিং-এ সিতু কিয়েয়োর নাম প্রথম শুনেছিলাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে তিনি কোন বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা গৎ শেখেননি। এমনকি তার কোন গুরু-টুরুও ছিল না। কিন্তু সর্বক্ষণ কেটে গেছে চারপাশের পুরনো মন্দির, ন্যাড়া পাহাড়, ভাঙা কুঁড়ে বা গরীব লোকজন, ভিখিরি প্রভৃতির স্কেচ করে। দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসা কোন ভিনদেশীকে নাড়া দেবার পক্ষে এই বিষয়গুলি যথেষ্ট। চক্রাকারে সজ্জিত সেই ধুলোর দেশ, যেখানে সবকিছুই হলুদ বর্ণরঞ্জিত মানুষ নিয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। গাঢ় লাল বা উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ অট্টালিকা. মার্বেল পাথর নির্মিত রেলিঙ্, স্বর্ণমণ্ডিত বৌদ্ধমূর্তি, পুরু গদিওয়ালা জ্যাকেট, অথবা লোকের ঘনকুঞ্চিত দেহত্বক, কঠিন মুখ—সব কিছুর মধ্যেই দেখা যায় যে মানুষ কখনো প্রকৃতির কাছে মাথা নত করেনি, লড়াই করে যাচ্ছে।

বেইজিং-এর শিল্পপ্রদর্শনীতে আমি এই শিল্পীর যে কাজ চাক্ষুষ করেছিলাম, তা এক কথায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চৈনিক আত্মার যুদ্ধং দেহি অভিব্যক্তি। তার 'চারজন পুলিশ ও একজন মেয়ে' কাজটি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। 'যিশাস ক্রাইস্ট' নামে

একটি কাজের কথা বলতেই হয়। সেখানে একটি স্ত্রীলোকের মুখাবয়ব ছিল। সে খ্রীষ্টের কন্টকমুকুট চুম্বন করছে।

কিছুদিন আগে সাংহাই-তে সিতু ক্যিয়োর সঙ্গে দেখা হতে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : এই স্ত্রীলোকটি কে?

তিনি উত্তরে বলেছিলেন : একজন দেবদূতী।

স্বভাবতই আমি খুশি হইনি।

কারণ ততদিনে আমি জেনে গেছি যে তিনি কখনো কখনো তার সৌন্দর্যজ্ঞান উত্তর অঞ্চলের হলুদ ধূলিরঞ্জিত দৃশ্যাধারে উজ্জ্বল করে তুলতে পছন্দ করেন আর এই দৃশ্যাধার হলো প্রকৃতির নানান জিনিসের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই অর্থাৎ তার জীবন-সংগ্রাম। ফলে আর কিছু না হোক প্রারম্ভিক উচ্ছ্বাস থেকে আমি নিজেকে সতর্ক করে নিতে পারি।

যদিও খ্রীষ্টের শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে রক্ত অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ছে, শিল্পী বলেন দেবদূতী বা এরকম কেউ তাঁর কন্টকমুকুট চুম্বন করছে। এবার যেমন খুশি দেখুন না আপনি, স্পষ্ট হয়ে উঠবে শিল্পীর সাফল্য।

পরবর্তী সময়ের আলোকোজ্জ্বল জিয়াংসু ও কাজিয়াং-এর প্রাকৃতিক দৃশ্যে বা অগ্নিবৎ গুয়াংদং-এর নিসর্গ দৃশ্যে তার প্রকৃত শিল্পীমন অবিকৃত। যদি আপনি এগুলিকে তার উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে তুলনা করেন, বলতে বাধ্য হবেন যে কী সহজ সরল আনন্দের সঙ্গে শিল্পী তার বিষয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছেন, যেন দীর্ঘদিন পরে আবার হারানো বন্ধুকে ফিরে পাওয়া। অবশ্য তার পীতবর্ণরঞ্জিত কাজগুলিই আমার বেশি পছন্দের। এর মধ্যে আমি প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে আর্ত এক শিল্পীসত্তার হদিশ পাই। তখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া তো দূরের কথা, সেই যুদ্ধে সামিল হওয়াটাই গৌরবের চোখে দেখা হতো।

### □ কেন ধারাবাহিক ছবির বই

একবার আমার এক মজাদার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক সান্ধ্য ভোজসভায় কথাপ্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে শিক্ষার্থীরা বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা ফিল্ম দেখে অনেক বেশি শিখতে পারে এবং এই শিক্ষাপদ্ধতি ভবিষ্যতে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু আমার কথা শেষ হতে না হতেই সমস্ত ঘর জুড়ে হাসির হাট বসে গিয়েছিল।

অনেক প্রশ্নই হয়তো উঠতে পারে, যার প্রথমটা নিশ্চয়ই কী ধরনের ফিল্ম। অর্থ ও বিবাহ সার আমেরিকা-মার্কা ফিল্ম যে নয় সে কথা বোঝাই স্বাভাবিক। জীবাণু-বিদ্যার বক্তৃতা শুনতে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে ফিল্মকে দিব্যি ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্ভিদবিদ্যার বই তো মূলত ছবিনির্ভর—তাতে সামান্যই ব্যাখ্যামূলক টীকার দরকার হয়। আমার বিশ্বাস শুধু জীববিদ্যা কেন, ইতিহাস-ভূগোলের ক্ষেত্রেও এই রীতি সমান প্রযোজ্য।

কিন্তু বিদ্রূপাত্মক হাসির হাট শত্রুর নাকে সাদা চক ঘষে দেয়।[১] উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যে সে ভাঁড়ামি করছে।

কিছুদিন আগে আমি 'মডার্ন এজ'-এ মি.সু ওয়েনের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। একজন নিরপেক্ষ শিল্পসমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি 'ধারাবাহিক ছবির বই'-কে নিয়ন্ত্রণ-হীন বলে গাল পেড়েছিলেন। ঠিকই যে এই মন্তব্য আজ অতীত এবং তার পুনরোক্তিই ছবি সম্পর্কিত নয়। কিন্তু উপরের জিজ্ঞাসা যেহেতু শিল্পবিশারদের পেয়ে বসতে পারে তাই কিছু না বলে মুখ বুজে থাকতে পারলাম না।

আমরা যে শিল্প-ইতিহাসের সাথে পরিচিত, দেখা যায় যে সেখানে 'ধারাবাহিক ছবির বই' থেকে কোন অনুকৃতি নেই। অন্যদিকে পরিচিত শিল্পীদের কাজের প্রদর্শনী হলো।হয় 'উষাক্ষণের রোম' নতুবা 'গোধূলিবেলার ওয়েস্ট লেক' নিয়ে। স্পষ্টতই 'ধারাবাহিক ছবির বই'কে ভদ্রগোছের সঙ্গী হিসাবে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করা হয়। কিন্তু আপনার যদি ভ্যাটিকান দর্শনের অভিজ্ঞতা থাকে—ইতালি ভ্রমণের আনন্দে বঞ্চিত হয়ে আমি তো কেবলমাত্র ভ্যাটিকানের ছবিগুলি দেখেছি—তাহলে বুঝতে পারবেন যে চমৎকার ঐ সব প্রাচীরচিত্রগুলি আসলে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট', 'নিউ টেস্টামেন্ট' ও 'অ্যাক্টস অব্ দ্য অ্যাপোসলে'র ধারাবাহিক ছবি। আবার শিল্প-ইতিহাস সমীক্ষক শিল্পবিষয়ক একটি গ্রন্থের একভাগ যখন 'আদমের সৃষ্টি' বা 'শেষ নৈশভোজ' নামে চিহ্নিত করেন, পাঠক তো তা নিকৃষ্টমানের বা প্রচারমূলক বলে মুখ ঘুরিয়ে নেন না। তথাপি মূল ছবি-গুলি কিন্তু বাস্তবে প্রচারমূলক ধারাবাহিক ছবির বইয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। চীনেও 'কন্ফুশিয়াসের জীবন' শিল্পরসিকমহলে সমাদৃত হওয়ার পর মিং সংস্করণে স্থান পেয়েছে। একদিকে বৌদ্ধ জীবনকাহিনী, অন্যদিকে কন্ফুশিয়াসের উপাখ্যান—সন্দেহ নেই ধারাবাহিক ছবিরই বই এবং প্রচারমুখী।

কেন অলংকরণের প্রয়োজন? তো বলা হয় গ্রন্থের সৌন্দর্য ও পাঠকে কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যে। কিন্তু যতক্ষণ না তা ভাষা ছাড়িয়ে কিছু করতে পারছে তাকে প্রচার ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাবে না। আবার ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের অনেকগুলি ছবি একসঙ্গে থাকলে ইচ্ছে করলে মূল কাহিনী অক্ষুন্ন রেখে মূল বিষয় থেকে বেরিয়ে আসা যায়। ফলে মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ছবিগুলি স্বাধীনভাবে ধারাবাহিক এক ছবির বই সৃষ্টি করতে পারে। এর আদর্শ নমুনা হলো বিখ্যাত আলংকারিক গুস্তাভ দোরের আঁকা ছবিগুলি। অবশ্য তিনি বহুলপরিচিত ডিভিনা কমেডিয়া, প্যারাডাইস লস্ট, ডন্ কুইক্সোট এবং হিস্ট্রি অব্ দ্য ক্রুসেডের জন্য। প্রত্যেকটি কাজই স্বতন্ত্রভাবে জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছে (প্রথম দুটি অবশ্য জাপানেও পুনর্মুদ্রিত হয়) এবং এভাবে তিনি একটি বইয়ের মোদ্দা কথাটুকু বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু কেউ কি দোরেকে একজন শিল্পী হিসেবে অস্বীকার করতে পারবেন!

---

১. চীনদেশের অপেরাগুলিতে সাধারণত ভাঁড়দের নাকে সাদা রঙ করা হয়।

আবার এখনো আমরা সং রাজত্ব, তাং রীতি এবং কর্ষণ ও ঘর্ষমান রীতির অনুকরণ ও পালিশ করা কাজ দেখতে পাই। অন্যদিকে চাউ ইয়েং-এর 'প্রাইভেট লাইফ্ অব্ রোজ্ ম্যাও' ও 'দ্য রোমান্স অব্ দ্য ওয়েস্টার্ন চেম্বার'-এর অনুকৃতি চুটিয়ে ওয়েংশিং পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হয়। কী সেই সময়ে, কী আজকের দিনে এগুলিকে শিল্পবহির্ভূত বলার উপায় নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে উডকাটের মুদ্রণরীতি পুনর্জীবিত হয়েছে এবং দলে দলে শিল্পী ধারাবাহিক ছবির কাজে মন দিয়েছে। তাবলে সকলেই যে সমান বিষয়ানুগামী, এমন নয়। শিল্পানুরাগীদের সুবিধার্থে আমি এখানে সমসাময়িক কয়েকজন শিল্পীর নাম করছি যারা প্রত্যেকেই তাদের অবদানের জন্য শিল্প-ইতিহাসে সমাদৃত।

প্রথমেই যার নাম করতে হয় তিনি হলেন ক্যোথে কোলভিৎস্—একজন জার্মান শিল্পী। ছটি কাজের সমন্বয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন 'এ রিভোল্ট অব উইভার্স" তাছাড়া আর তিনটি কাজের নাম থাকলেও সঙ্গে কোন মন্তব্য নেই। ১. পিজ্যান্টস ওয়র (কৃষক সমর)—সাতটি এচিং, ২. দি ওয়র (যুদ্ধ)—সাতটি উডকাট্, ৩. প্রোলেতারিয়েত (সর্বহারা)—তিনটি উডকাট্।

কার্ল মেফ্যার্ট সিমেন্টের উপর নক্শা (illustration) করার জন্য চীনদেশে সুবিদিত। শিল্পী হিসাবে তিনি তরুণ হলেও আশাব্যঞ্জক। ইতিমধ্যেই তিনি ফিগনার-এর জার্মান অনুবাদ 'জার তত্মাশি' নিয়ে পাঁচটি উডকাটের কাজ শেষ করেছেন। তাছাড়া আরো দুটি ফোল্ডারের কাজ। ১. তোমার বোনেরা—৭টি উড্কাট, একটিতে কবিতা উৎকীর্ণ, ২. দ্য অ্যাপ্রেনটিসেস (আসল নামটা ভুলে গেছি)—১৩টি উডকাট্।

বেলজিয়াম শিল্পী ফ্রানৎস্ মাসেরীল রোম্যাঁ রল্যাঁর মতোই বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। কেননা তিনি যুদ্ধবিরোধী ছিলেন। শিল্পী হিসেবে অত্যন্ত সফল তিনি। সংগৃহীত তাঁর কাজ বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হলেও আলাদা করে কাজগুলির কোন নাম নেই। সম্প্রতি জার্মানি থেকে মুদ্রিত তাঁর একটি জনপ্রিয় সংস্করণে একসঙ্গে তিনটি কাজের সংকলন সহজপ্রাপ্য। আমার দেখা তার কাজগুলি হলো : ১. মনুষ্য ধারণা—৮৩টি উডকাট্, ২. আমার সময় কেতাব—১৬৫টি উডকাট, ৩. কথাবিহীন গল্প—৬০টি উডকাট্, ৪. সূর্য—৭৩টি উডকাট্, ৫. কাজ—উডকাটের সংখ্যা ঠিক মনে নেই, ৬. একজনের দুর্দশা—২৫টি উডকাট্।

আমেরিকার উডকাটের মধ্যে আমি উইলিয়াম সিরোগেলের 'প্যারি কমিউন' শীর্ষক কাজটি দেখেছি। এটি আসলে ছবিতে রচিত বিষয়ের বর্ণনা। নিউইয়র্কের জন রীড ক্লাব প্রকাশ করেছিল। তাছাড়া উইলিয়াম গ্রোপারের 'দাঁড়বাজদের জীবন ও প্রেম' নামে লিথোগ্রাফের একটি সংকলন দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে।

ইংরেজদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাদের বইগুলো

অত্যন্ত বায়বহুল হওয়া একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই। তথাপি বিখ্যাত রবার্ট গিবিংস-এর প্রায় দু'শ শব্দভাষ্যসহ পনেরোটি উডকাটের একটি পাতলা সংকলন আমার নজরে এসেছিল। অবশ্য তার সংকলন সংখ্যা খুব সীমিত। মাত্রই পাঁচশ। তাছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য এই ইংরেজ ভদ্রলোক কোন উৎসাহ বোধ করেননি। মনে হয় বইটি এখন আর ছাপা হচ্ছে না। আর তা যদি হয় বইটির দাম একশ ডলারের কম নয় কিছুতেই। হ্যাঁ, বইটির নাম 'সপ্তমজন'।

এতসব কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, প্রমাণ করা যে ছবির বই কেবলমাত্র এক বিশেষ শিল্পরীতি নয়, শিল্পজগতে রীতিমতো একটি চাঞ্চল্যকর বিষয়। বলাই বাহুল্য যে শিল্পের অন্যান্য রীতির মতো এর বিষয়বস্তু ও শৈলী উচ্চমানের হতে হবে।

তা বলে আমি শিল্পবিশদের বলছি না যে তারা তৈলচিত্র বা জলরঙের কাজ দূরে সরিয়ে রাখুন। আমার বক্তব্য শুধু তারা ছবির বইয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক অলঙ্করণের জন্যও সমান আগ্রহ দেখান এবং কাজে যেন ঘাটতি না থাকে। অবশ্যই ইউরোপের বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকা উচিত। সেই সঙ্গে প্রাচীন চীনের কাজকর্ম, তৎকালীন ছবির অ্যালবাম এবং বর্তমানের একপৃষ্ঠার জনপ্রিয় ছবি সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা জরুরী।

## ☐ আমি প্রাচীন আঙ্গিক গ্রহণের সপক্ষে

যদি আমরা 'প্রাচীন আঙ্গিক গ্রহণের' বিষয়টি পক্ষপাতহীনভাবে আলোচনা করতে পারি, তবে তা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ঠিক শুরুতেই মি. ইরিয়ে একে আক্রমণ করে বসে আছেন[১]। তিনি মনে করেন গত দশ বছর ধরে 'নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা'র প্রাপ্ত ফল কার্যত 'বশ্যতা ও সুবিধাবাদে'র জন্ম দিয়েছে। কিন্তু একথা বলা মানে প্রতিপক্ষের মন রাখতে তার স্তুতি করা কিংবা কিছুক্ষণের জন্য হলেও জলকাদা ছিটিয়ে তাকে নোংরায় ভরে দেওয়া। অবশ্য মি. ইরিয়েকে দুম করে ধান্দাবাজের দলে ঠেলে দিলে ভুল হবে, কারণ একই সঙ্গে তিনি 'শিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু'[২] নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন। আর একবার তা প্রকাশিত হলে সাত খুন মাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া তার কিছু মন্তব্য তো ঠিকই, বিশেষ করে তিনি যখন বলেন যে প্রাচীন আঙ্গিক অধিগ্রহণ ও নতুনের পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে যান্ত্রিকভাবে কোন ভেদরেখা টানা উচিত নয়।

অবশ্য এই মন্তব্য যে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু যান্ত্রিকভাবে আলাদা করা যায় না, সামান্য জ্ঞান থাকলেই তা বোঝা যায়। জনগণের সঙ্গে লেখাজোকার সম্পর্ক যেমন

১. ১৯৩৪ সালের ২৪শে এপ্রিল 'ফ্রেন্ডস্' নামক একটি খবরকাগজের সাময়িকীতে প্রকাশিত নাই গামুর প্রবন্ধকে উল্লেখ করে তিনি আক্রমণ করেন।

২. কোরিতো কুরাহারা নামে একজন জাপানী লেখকের প্রকরণগ্রন্থ।

সেরকমই। কাজেই প্রাচীন আঙ্গিক গ্রহণের মধ্যে আপত্তির কিছু দেখি না। যদিও মি-ইয়িয়ে এর মধ্যে 'সমস্ত প্রাচীন শিল্পকে প্রশংসা করার দুরভিসন্ধি' টের পেয়েছেন, তথাপি আমরা এক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে পারি একথা ভেবেই যে নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তাছাড়া কয়েকটি মাত্র বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলেই সমস্তকিছুর প্রশংসা করা হয় না। যেমন প্রগতিশীল কোন শিল্পী একই ভাবনাচিন্তার (বিষয়বস্তুর) মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকতে পারেন না। জনগণের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা যায় কিনা তিনি খতিয়ে দেখেন, কেননা তার ভালো করেই জানা আছে যে জোর করে তাদের সঙ্গে লেখালেখির বিচ্ছেদ ঘটানো অসম্ভব। তেমন দিনও আজ অতীত যে শিল্পকে শিল্পীর 'অনুপ্রেরণার' হঠাৎ উদ্‌গীরণ বলে মনে করা হবে। যেন তা এমনই যে একবার হাঁচলেই অস্বস্তিকর নাকের সুড়সুড়ি থেকে মুক্তি। আজকের দিনে শিল্পীরা সাধারণ মানুষকে আর এড়িয়ে যেতে পারেন না এবং সেজন্য তাদের উদ্বিগ্নতা অর্থবহ। সন্দেহ নেই যে এটা একটা নতুন ধারণা (বিষয়বস্তু)। আর তার ফলে তারা নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন। এর প্রথম ধাপ হলো কিছু প্রাচীন আঙ্গিক অধিগ্রহণ অর্থাৎ নতুন কোন একটার শুরু, পুরনোটার পরিবর্তন। এতে যেমন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যান্ত্রিক ব্যবচ্ছেদ সম্ভব নয় তেমনি 'দুই বোনের'[১] আঙ্গিকের সাথে এক করে সুবিধাবাদী বলে দোষারোপ করাও যাবে না, কারণ তার তো একটা রমরমা বাজার আছে।

নিঃসন্দেহে পুরনো আঙ্গিক অধিগ্রহণ, বরং বলা ভালো নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হলে শিল্পনৈবিশদের কঠোর পরিশ্রম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য তত্ত্বদর্শী সমালোচকদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কাজ হলো শিল্পীদের পথ দেখানো এবং তাদের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করা, এককথায় তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা। তা বলে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে ব্যর্থ শিল্পীদের কেবলমাত্র সমালোচনা করে তারা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। যেহেতু আমাদের একটি স্বকীয় শিল্প-ইতিহাস আছে এবং যেহেতু আমরা চীন দেশের নাগরিক, আমাদের সেই শিল্প-ইতিহাসের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। তার থেকে কী গ্রহণ করতে পারি আমরা? যদিও তাং-পূর্ব আসল ছবি দেখার সুযোগ আমাদের নেই, কিন্তু আমরা জানি যে তার অধিকাংশই বিষয় হিসেবে গল্প ধরে চিত্রিত হয়েছিল। এটাই আমাদের শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। আবার তাং-রাজত্বের বৌদ্ধ উপাখ্যাননির্ভর অনবদ্য শিল্পকীর্তির কাছেও আমাদের পাঠ নিতে হয়, কেননা এখানে রয়েছে অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট রেখাচিত্র। ইম্পিরিয়াল আকাদামিতে রক্ষিত সং-আমলের কাজকর্মের মধ্যে যে ক্লান্তি ও মেয়েলিভাব ফুটে উঠেছে অবশ্যই তা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু এই

১. সাংহাই থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ফিল্ম।

কাজগুলির সূক্ষ্ম দক্ষতাকে তারিফ না করে উপায় নেই। অন্যদিকে মি. ফেই-এর[১] নিসর্গদৃশ্যাঙ্কন রীতি সম্পূর্ণ অর্থহীন। পরবর্তী পর্যায়ের এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পের (পণ্ডিতদের কাজের) কোন মূল্য আছে কী নেই সঠিক বলতে পারব না, কিন্তু একটা কথা তো ঠিক যে তাদের কাজের মধ্যেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অবশ্যই শিক্ষণীয়। কিন্তু অধিগ্রহণ মানে এই নয় যে পুরনোদিনের চিত্রকলার ভিন্ন ভিন্ন টুকরো জুড়ে কোন এক নতুন বিন্যাসব্যবস্থা, বরং তা নতুন কর্তৃক প্রাচীনে অভিনিবিষ্ট হওয়াকেই বোঝায়। অনেকটা গো-মাংস বা ভেড়ার মাংস খাওয়ার মতো—আমরা কেবলমাত্র তাদের অপুষ্ট শারীরিক অংশের প্রতিপালন ও উন্নতিতে সহায়ক সবচেয়ে সেরা অংশটুকু রেখে খুর ও চামড়া রদ করি। তা বলে গো-মাংস বা ভেড়ার মাংস খেয়ে আমরা 'আদতে' ষাঁড় বা ভেড়ায় পরিণত হই না।

একটু আগে উল্লেখ করা উদাহরণগুলি (বিভিন্ন সময়ের শিল্পকর্ম) এবং এখনও পর্যন্ত প্রায় সমস্ত শিল্পই ক্রেতা-মনোরঞ্জনী শিল্প ( consumers' art ) আর তা তাদের ক্ষমতায় মদতপুষ্ট হয়ে বেশ বড়সড় আকারে টিঁকেও আছে। আবার ক্রেতা থাকলে যেহেতু উৎপাদক না থেকে পারে না সেইজন্য উদ্ভাবনী শিল্প ( producers' art ) ক্রেতা-মনোরঞ্জনী শিল্পের পাশেই অবস্থান করে। কিন্তু যেহেতু কেউ এই প্রাচীন চিত্রশিল্পের দিকে লক্ষই করেনি ফলে তৎকালীন প্রেমোপাখ্যানের ছবি ছাড়া আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সাম্প্রতিক কালেও আমরা বাজারে রংবেরং-এর 'নতুন বছরের ছবি' বলে পরিচিত এক ধরনের ছবি এবং মি. মেংকি-উল্লিখিত ছবির বই[২]-এর কথা জানি। এগুলিকে প্রকৃত উদ্ভাবনী শিল্প বললে ভুল হবে, কিন্তু এসবই যে অলস শ্রেণী-শিল্পের বিপরীত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি এসবের উপর ক্রেতা-মনোরঞ্জনী শিল্পের প্রভাব অনস্বীকার্য। চিত্রশিল্পে বিষয় হিসেবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাহিনী প্রাধান্য পেলেও লক্ষণীয় যে সেখানে এমন কিছু প্রয়োগরীতির ব্যবহার ছিল স্পষ্টতই যা অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি। এরকম রূপান্তর ঘটানোকে 'অশ্লীল' বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বিগ্ন শিল্পীরা এতে মনোযোগ দিলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং তাদের লাভ হতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।

চীনদেশের এই দু'প্রকার চিত্রশিল্প অনেক সময় সদৃশ বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তারা স্বতন্ত্র। উদাহরণ দিয়েই বলা যায় যে সমস্ত বৌদ্ধচিত্রমালা জুড়ে যে মেঘ-কুয়াশার আনাগোনা তা জাঁকালো বিন্যাস ছাড়া আর কী। কিন্তু 'নতুন বছরের ছবি'-তে এর সম্যক ব্যবহার অন্য কারণে। কেবলমাত্র কাগজের খরচ বাঁচানোর জন্য। তাং ইন্[১]

---

১. সং রাজবংশের একজন নিসর্গদৃশ্যের চিত্রবিদ্ (১০৫১-১১০৭)

২. ১৯৩৪ সালের ১৯ এপ্রিল ফ্রেন্ডস্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ 'উপযোগীকরণ ও অনুকরণ'-এ উল্লিখিত।

১. মিং রাজবংশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।

যে তার ছবিতে সরু কোমর ও ক্রমশ চিকন্ আঙুলের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেন, বলা বাহুল্য তার মতো লোকের অভাব ছিল না। যদিও 'নতুন বছরের ছবি'-তে এধরনের সৌন্দর্য বিরল নয়, কিন্তু তা শুধুমাত্র এক সামাজিক রীতি প্রকাশের স্বার্থেই রচিত যাতে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় বা অহেতুক কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। নাহলে জনগণের জন্য কাজ করতে উৎসাহী শিল্পীদের এগুলি এড়িয়ে যাওয়ার দরকার পড়ে না।

কথাশিল্পে যেমন কবিতা, গল্প, নাটক ও অন্যান্য ধারা রয়েছে, ছবির বইও তেমনি চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক এক ধারা—এতে কোন ভুল নেই। আবার বিভিন্ন ধারার উৎপত্তির সঙ্গে যে সামাজিক শর্তগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেকথা আজ আর অজানা নেই। সেই সঙ্গে এও আমরা জেনেছি যে এসব ধারার উৎপত্তি তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে দারুণ সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান সমাজে ছবির বই জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে কারণ হলো জনপ্রিয়তা অর্জনের উপযোগী অবস্থা ও তার বিশেষ চাহিদা। তাই প্রগতিশীল একজন শিল্পীর কাজ হলো এই ঝোঁকের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা ও তার গতিপথকে চালিত করা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পকে বোধগম্য করে তোলা। প্রাচীন আঙ্গিকরীতি গ্রহণ করলে যেমন কিছু জিনিস বাদ যাবে, কিছু আবার যোগ হবে এবং তার ফলে একটি নতুন রীতিপ্রকৃতি জন্ম নেবে। স্পষ্টতই এভাবে এক পরিবর্তন সূচিত হবে। তা বলে কোন মতেই এ কাজ নিষ্কর্মা দর্শকের ভাবনাবৎ সহজ সরল নয় বা এরকম একটি আঙ্গিকরীতি জন্ম নিলেই যে চিত্রশিল্প তার সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে যাবে, তা নয়। এর অগ্রগতি অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যমুখাপেক্ষী।

## ☐ সোভিয়েত গ্রাফিক চিত্রকলা থেকে

উডকাট্ যে পুনরুৎপাদনযোগ্য চিত্রকলার এক বিশেষ প্রকাশরীতি, তা চীনদেশে দীর্ঘ দিন ধরেই জানা। কিন্তু অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে কিছুটা সময় যেতে হয়েছে। পাঁচবছর আগে যখন সে গায়ে-গতরে বল ফিরে পেল, দেখা গেল প্রাচীন চীনা আঙ্গিকের সঙ্গে তার কোন যোগসাজশ নেই। পুরোটাই প্রায় ইউরোপ থেকে আমদানি করা। অবশ্য দীর্ঘ পরাধীনতার অভিশাপ নেমে আসার আগে থেকেই শিক্ষাবিশারদেরা বুঝতে পারছিলেন না, কেন এতদিনেও তার বিশেষ কোন উন্নতি হলো না। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে আমরা অসাধারণ কিছু কাজের নজির দেখতে পাই। ভি. ফাভরস্কি এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি গৃহযুদ্ধের সময় উডকাটের শিল্পগত সংশোধনে প্রবৃত্ত হন এবং তখন থেকে আস্থার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় আলোক-প্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন এ. দেইনএকা, এ. গনচারভ, জি. এচিসতোভ এবং এম. পিকভ। যদিও তারা সকলেই একই শিক্ষাগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, কিন্তু প্রত্যেকের কাজেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে একই বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র আঙ্গিকে প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু দাসবৎ অনুকরণ কখনো সৎ শিল্পের জন্ম দেয় না।



এ. ক্রেভশেংকোর একটি মাত্র কাজের সাথে আমাদের পরিচয়, তাও সৌভাগ্যক্রমে চীনদেশে ছাপা হয়েছিল বলে। এই প্রদর্শনীতে তার অনেকগুলি কাজ আমরা দেখতে পাই। সন্দেহ নেই যে তার কল্পনাপ্রধানরীতি চীনের যুবমানসকে উদ্দীপ্ত করবে। তাছাড়া তার পটভূমি মনস্কতা ও সবিশেষ বর্ণনা আমাদের কাজে আসবে। অন্যদিকে সঙ রাজত্বকাল থেকে চীনদেশের চিত্রকলা সংবেদনরীতির ( impressionist art) দিকে ঝোঁকে। লম্বাকৃতি বা গোলাকার, যাই হোক না কেন তুলির দুইটানে এক-একটি চোখ বোঝানো হতো। আবার একটিমাত্র টানে হয়ে গেল পাখি : এখন দোয়েল বা শ্যেন আপনি যা খুশি ভাবুন। বিমূর্ত এই ঝোঁক আসলে অর্থহীন এবং এখনো পর্যন্ত আমাদের শিক্ষানবিশ উডকাট্ শিল্পীদের মধ্যে এই ত্রুটি রয়েই গেছে। ফলে ক্রেভশেংকোর নতুন ধরনের কাজ নিশ্চয় বিপদঘন্টা হিসেবে আমাদের এরকম আগোছালো ভাব থেকে সতর্ক করে দেবে। এন. পিস্‌কারেভ সম্ভবত এই শিল্পীদলের মধ্যে প্রথম চীনদেশে পরিচিতি লাভ করেন। সেরাফিমোভিচের 'আয়রণ ফ্ল্যাক'-এর উপর তাঁর চারটি কাজ এখানকার তরুণ পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছে। এই প্রদর্শনীতে 'আনা কারেনিনা'-র উপর অলংকরণগুলি তাঁর শিল্পগুণের অন্য একটি দিককে তুলে ধরেছে।

একটা কথা অবশ্য বলে রাখা জরুরী যে এই প্রদর্শনীর কিছু কাজ ইউক্রেনিয়ান, জর্জিয়ান ও বাইলোরাশিয়ান শিল্পীদের করা। বোধহয় অক্টোবর বিপ্লব না ঘটলে তাদের কাজ দেখার সুযোগ আমাদের জুটত না। বাস্তবিক তারা আজও হয়তো অন্ধকারে তলিয়ে থাকত।

সাংহাইতে আয়োজিত প্রায় দু'শ কাজের এই প্রদর্শনী চমৎকার এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গ্রাফিক চিত্রকলা হিসেবে তারা যে নমুনা আমাদের সামনে হাজির করেছে, যদিও তা ফরাসি উডকাট্ অপেক্ষা কম সৌন্দর্যবর্ধক বা জার্মানদের চাইতে কম প্রাণচঞ্চল, কিন্তু পাণ্ডিত্যের জাহির না করেই অনেক বিশ্বাসযোগ্য। কোমলতা ব্যতীতই সুন্দর, বিলাসিতা ছাড়াই আনন্দদায়ক এবং রুক্ষতা ব্যতিরেকেই জোরালো আবেদনে মুখর। তা বলে যে খুব শান্তশিষ্ট এমন নয়। বিশেষ একটা শিহরণের স্বাদ পেতে এসবই সর্বদা আমাদের আগ্রহী করে তোলে। শিহরণ বলতে কাঁধে কাঁধ মেলানো এক বিশাল দলের সহযোদ্ধাদের কঠিন, ভাবলেশহীন মুখে অন্ধকার পৃথিবীর উপর দিয়ে ক্রমশ গঠনমূলক রাস্তার অগ্রসৃতি।

## ☐ ক্যোথে কোলভিৎস : আরও কিছু কথা

১৯৩১ সাল। মাসটা ঠিক মনে নেই। 'দ্য ডিগার' পত্রিকাটির আবির্ভাব হলো। কিন্তু প্রায় জন্মমুহূর্তেই তার মৃত্যুক্ষণ। এর প্রথম সংখ্যায় একটি ছবি ছিল। বেদনায় ঘনীভূত এক মা, চোখের পাতা বন্ধ, সামনে দুহাত বাড়িয়ে একটি শিশুকে ধরে আছেন। এটি 'যুদ্ধ' নামে একটি উডকাট্ সিরিজের প্রথম ছবি, নাম 'উৎসর্গ'। শিল্পী অধ্যাপক

ক্যোথে কোলভিৎস। চীনদেশের সাথে এই তাঁর প্রথম পরিচয়।

রুসী-র স্মৃতিচারণায় কাজটি আমি 'দ্য ডিগার' পত্রিকাকে দিয়েছিলাম। সে আমার ছাত্র হলেও বন্ধু ছিল। চীনদেশে বিদেশী সাহিত্য প্রচারে বরাবর সে আমাকে সাহায্য করেছে। উডকাটের কাজে তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। একবার সে আমেরিকা ও ইউরোপের উডকাটের উপর তিনটি সংকলন খণ্ডও প্রকাশ করেছিল। অবশ্য সেসবের মুদ্রণ খুব একটা উঁচু মানের ছিল না। এর কিছুদিন বাদে ঠিক কী কারণে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল বা সাংহাইয়ের লং হুয়াতে আরো পাঁচজন তরুণ লেখকের সাথে গুলি করে মারল, আজও তা রহস্য। সম্ভবত ভয়ে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করায় কোন পত্রিকা এই হত্যার খবর ছাপতে সাহস পায়নি। কিন্তু এরকম ঘটনা যেহেতু আগেও ঘটেছে, অনেকেই বুঝতে পারল যে রুসী আর বেঁচে নেই। মনে হয় তার অন্ধ মা-ই একমাত্র বিশ্বাস করত যে তার স্নেহের দুলাল তখনও সাংহাইতে অনুবাদক ও প্রুফ রীডারের কাজ করে যাচ্ছে। ঠিক এইসময়ে আমি একটা জার্মান বইয়ের দোকানে 'উৎসর্গ' নামে উডকাটের কাজটি আবিষ্কার করি। কাজটি সংগ্রহ করে 'দ্য ডিগার' পত্রিকাকে পাঠিয়ে দিই। বলতে পারেন, এভাবেই আমি রুসী-র আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম।

এসময়ে আবার ইউরোপ থেকে ডাক-পরিবহণ পথে কোলভিৎসের কাজকর্মের একটি সংকলন এসে পেঁছিল। যে-সময়ে বইটা সাংহাইতে এল, এদেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেত যে-লোকটি, এই পৃথিবীর বুকের উপর সে তখন চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন, কিন্তু ঠিক কোথায় আমাদের কারো জানা নেই। সে যাই হোক, আমি সংকলনটির পাতা ওল্টাতে লাগলাম। চোখে পড়ল দারিদ্র্য, অসুস্থতা, ক্ষুধা, মৃত্যু ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম ও রক্তপাতের অবিরল ঘটনাপ্রবাহ। তাঁর স্বপ্রতিকৃত মুখের অভিব্যক্তি যেমন, এখানেও তেমনি ঘৃণা ও ক্রোধের বদলে ভালোবাসা ও করুণার নিবিড় অনুভূতি। মনে হলো তাঁর স্বপ্রতিকৃতি যেন সমস্ত অপমানিত ও আহত মায়েদের প্রতিনিধিস্বরূপ। গ্রামাঞ্চলের চীনা মায়েদের দেখতেও অনেকটা এরকম। তাদের হাতের নখ এবড়োখেবড়ো। তা দেখে লোকেরা বিদ্রূপ করে। ভাবে তারা কেবলমাত্র তাদের দুর্বল ও অসহায় শিশুদের প্রতিপালন করে। কিন্তু আমার মনে হয় তারা তাদের হৃষ্টপুষ্ট, ভবিষ্যতের পক্ষে হিতকর বাচ্চাদেরকেও দারুণ ভালোবাসে। এরকম বাচ্চা যেহেতু শক্তসমর্থ ফলে তাদের নিয়ে তত বিব্রত হতে হয় না এবং সেজন্যই 'অপমানিত ও আহত' বাচ্চার জন্য তারা বেশি সময় দেয়।

সম্প্রতি চীনদেশে প্রকাশিত ক্যোথে কোলভিৎসের একুশটি কাজের সংকলন এই চিন্তার সপক্ষে। শিক্ষানবিশদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের কাছেও এই কাজগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রবল দমনপীড়ন সত্ত্বেও এখানে উডকাটের শিল্পকাজ গত পাঁচ বছর ধরে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক আঁদ্রে জোনের কাজ ছাড়া আর প্রায় কারো গ্রাফিক

চিত্রকলার কথা আমরা জানিনা। সদ্য প্রকাশিত কোলভিৎসের এই সংকলন গ্রন্থটিতে যে এচিং ও লিথোগ্রাফ্ রয়েছে, তা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে জোনের কাজ অপেক্ষা ভিন্ন। একটু মনোনিবেশ করলেই বোঝা যায় এগুলি ভিন্নস্বাদের এবং সর্বসম্মত তেলরঙ ব্যবহারের বাড়তি সুবিধা কী তাও অস্ফুট থাকে না।

চীনের প্রকাশদপ্তরগুলি আজকাল হামেশাই হিটলারের ছবি ছাপছে। এসবের প্রত্যেকটাই প্রায় একরকম অর্থাৎ সকলের মূল প্রতিপাদ্য হিটলারের পতন। শাশ্বতের লক্ষ্যে সমস্ত আলোকচিত্রেরই এ একটা তাৎক্ষণিক উপাদান। তথাপি এর পুনরাবর্তনে ক্লান্তি আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অন্যদিকে কোলভিৎসকে লক্ষ করুন। এই আশংকা অমূলক। এসব ছবির চরিত্র বিভিন্ন প্রকৃতির এবং সম্ভবত কেউ তারা 'নায়ক' নয়, তুলনায় অনেক বেশি ভূয়োদৃষ্টি সম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল। যত বেশি তাঁর কাজগুলিতে মনোযোগ দেওয়া যাবে ততই তার সৌন্দর্য ও শক্তি উপলব্ধি করা যাবে।

চীনদেশের সাল-তারিখমতে মহিলা এই শিল্পীর বয়স এখন প্রায় সত্তর বছর। সম্প্রতি মহান এই শিল্পীকে অকেজো করে দেওয়ার লক্ষ্যে নানান চক্রান্ত শুরু হলেও আরো বেশি বেশি করে তাঁর কাজ সুদূর প্রাচ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই, কোন কিছুই মানুষের প্রতি উৎসর্গীকৃত শিল্পীর গতিপথে শেষপর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

## □ একটি লোককথার বদলে

একদিন সকালবেলা একদল সশস্ত্র পুলিস একটা ছবি আঁকার স্কুল ঘিরে ফেলল। চীনদেশীয় ঢোলা পোষাক পরা কিছু লোক এবং পশ্চিমী স্যুট পরা কিছু লোক স্কুলের মধ্যে ঢুকে খানাতল্লাশি ও ভাঙচুর করতে শুরু করল। পিস্তল হাতে পুলিশ তাদের পিছু পিছু। হঠাৎ একটা ঘরে স্যুট পরা একটা লোক আঠারো বছরের একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে পাকড়াও করল।

"সরকার বাহাদুর আমাদের খানাতল্লাশির জন্য পাঠিয়েছে। তুমি কি……"

"এগিয়ে যান।" ছেলেটি দ্রুত বিছানার তলা থেকে একটা স্যুটকেস টেনে বের করল।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এখানকার ছেলেরা একটা জিনিস শিখেছে যে তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে এরকম কিছু প্রমাণ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলা বা নষ্ট করে ফেলা আবশ্যক। কিন্তু এই ছেলেটির বয়স মাত্র…। তার ড্রয়ার খুলতেই গুটিকতক চিঠি পাওয়া গেল। সে এগুলি পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি। কারণ এতে লেখা ছিল কী নিদারুণ অবস্থার মধ্যে তার মা মারা গেছেন। স্যুট পরা লোকটা গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিগুলো পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে তার চোখ বিস্ফারিত হলো—"এই পৃথিবী একটা ভোজনশালা। এখানে মানুষ মানুষকে খায়। তোমার মাকে খাওয়া

হয়েছে এবং তার মতো আরো অসংখ্য [illegible]……। এই অংশটির তলায় দাগ দিয়ে রাখার জন্য লোকটা পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করল।

"এর মানে কী ?" সে জিজ্ঞেস করল।

"……।"

"কে তোমার মাকে খেয়েছে ? এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে খায় নাকি ? আমরা তোমার মাকে খেয়েছি, এ্যাঁ ?" তার চোখ অগ্নিবর্ণ ধারণ করল এবং যে কোন মুহূর্তে তা মারাত্মক বুলেটের রূপ নিতে পারে।

"কেউ না !…অবশ্যই, না…কেউ না," ছেলেটিও উত্তেজিত।

একথা শুনে লোকটা রাগে ফেটে পড়ার বদলে চিঠিগুলো ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। সেই সঙ্গে ছেলেটির উডকাটের কাজ, ছুরি, দুটি প্রিন্ট—দ্য আয়রণ ফ্ল্যাক এবং এ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ্ দ্য ডন্ এবং কিছু খবরের কাগজের কাটিং নিয়ে নিল। একজন পুলিশের লোককে ডেকে বলল :

"এগুলি নিয়ে যাও।"

"কী আশ্চর্য ! আপনি এগুলি নিয়ে নিচ্ছেন কেন ?" ছেলেটি জানত একথা বলা তার ঠিক হচ্ছে না।

স্যুট-পরা লোকটা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর অন্য একজন পুলিশকে হুকুম দিল :

"একে নিয়ে যাও।"

বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে পুলিশটি ছেলেটির ঘাড় চেপে ধরল এবং টানতে টানতে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। বাইরে তার সমবয়সী আরো দুটি ছেলে ছিল। প্রত্যেকেই শক্ত হাতের নাগালে ঘাড় মটকে ধরা। আর তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল ছাত্র ও শিক্ষক।

একুশ দিন বাদে আর এক সকালবেলায় থানায় তাদের জেরা পর্ব শুরু হলো। ছোট্ট একটা কুঠুরিতে দুজন অফিসার বসে। একজন ডানদিকে আর একজন বাঁদিকে। ডান দিকের লোকটার গায়ে চীনদেশীয় জ্যাকেট। বাঁদিকের জন ইউরোপীয় স্যুট পরা। শেষের এই লোকটা স্পষ্টতই আশাবাদী, কারণ সে এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে খায় বলে মেনে নিতে রাজী নয়। পুলিসের লোকেরা গালাগালি করতে করতে আঠারো বছরের এক ছাত্রকে ভিতরে নিয়ে এল। ছেলেটির মুখ শুকনো। জামাকাপড় নোংরা। সে অফিসারদের সামনে দাঁড়াল। তখন জ্যাকেট পরা অফিসারটি তার নাম, বয়স ও জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করার পর জানতে চাইল :

"তুমি কি উডকাট্-ক্লাবের সদস্য ?"

"হ্যাঁ।"

"পরিচালক কারা

"সভাপতি মি. চ.—এবং সহসভাপতি মি. ঝ.—।"

"তারা কোথায় এখন ?"

"জানি না। তাদের দুজনকেই বহিষ্কার করা হয়েছে।"

"কেন তুমি তোমার স্কুলে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছিলে ?"

"মানে ?" ছেলেটি বিস্মিত হলো।

"হুম !" অফিসারটি উডকাটের একটি কাজ দেখিয়ে তাকে বলল :

"এটা তোমার করা ?"

"হ্যাঁ।"

"কে এই লোকটি ?"

"একজন লেখক।"

"নাম ?"

"লুনাচারাস্ক।"

"লেখক নাকি ? তা কোন দেশে তার বাস ?"

"জানি না।" নিজেকে বাঁচাতে ছেলেটি মিথ্যে বলল।

"জানো না ? আমাকে বুদ্ধু বানানোর চেষ্টা কোরো না খোকা। এ তো একজন রাশিয়ান, তাই না ? লাল ফৌজের একজন অফিসার। আমি রুশবিপ্লবের ইতিহাস ঘাটতে গিয়ে এর ফটো দেখেছি। তুমি অস্বীকার করতে পার ?"

"না, সত্যি নয় !" প্রশ্নের আঘাতে মূর্ছিতপ্রায় ছেলেটি চিৎকার করে বলল।

"খুব স্বাভাবিক। একজন প্রোলেতারিয়েত শিল্পী হিসেবে তুমি অবশ্যই একজন লাল ফৌজের অফিসারের ছবি আঁকবে।"

"না···বললাম তো আমি কক্ষনো···"

"তর্ক কোরোনা খোকা। এতটা অবাধ্য হওয়া মোটেই ঠিক নয় বুঝতে পারছি এখানে ( থানায় ) তোমার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। যা জানতে চাইছি, ঠিকমতো জবাব পেলে আমরা তোমাকে এক্ষুনি ন্যায়বিচারের জন্য আদালতে পাঠিয়ে দেব। তাছাড়া সেখানকার কারাব্যবস্থা তুলনায় অনেক ভালো।"

ছেলেটি চুপ করে রইল। সে জানত কিছু বলা অথবা না-বলা দুই-ই সমান।

"উত্তর দাও !" জ্যাকেটওয়ালা অফিসার বিচ্ছিরি করে হাসল।

"তুমি সি. পি. না, সি. ওয়াই.—কোন্‌টার সদস্য ?"[১]

"কোনটার-ই না। আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

"লাল ফৌজের অফিসারের ছবি তৈরি করতে পার আর সি. পি.-সি. ওয়াই. কী তা বুঝতে পারছ না ? বয়সে কাঁচা হলেও ধড়িবাজির বিদ্যেটা বেশ ভালোই শিখেছ, কী

১. কম্যুনিস্ট পার্টি বা কম্যুনিস্ট ইয়ুথ লীগের সদস্য।

বলো হে ? দূর হ !" সে হাত নেড়ে তাকে বিদেয় করার সংকেত দিতেই একাজে নিযুক্ত একজন পুলিশ তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

প্রিয় মি. ঝাও, থানার সেই ঘটনার পর কী ঘটেছিল আপনি জানতে চেয়েছেন। সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

সে-বছর শেষ মাসের শেষ দিনে প্রাদেশিক সরকার আমাদের তিনজনকে বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে পাঠাল। বিচার যত সম্ভব তাড়াতাড়ি হলো। অবশ্য অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারটা খুব মজার ছিল। কেবলমাত্র তিনটি প্রশ্ন।

প্রথমে, "আপনার নাম কি ?"

পরে, "আপনার বয়স কত ?"

এবং সবশেষে, "আপনাকে কোথা থেকে ধরা হয়েছে ?"

অদ্ভুত এই বিচারের পর আদালত আমাদের মিলিটারি জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিল। আমাদের শাসনকর্তাদের শাসন-নমুনা জানতে হলে একবার অতি অবশ্যই আপনাকে মিলিটারি জেলগুলো পরিদর্শন করতে হবে। আমার বিশ্বাস এমন কোন হত্যা বা অত্যাচারের কৌশল থাকতে পারে না, যা সেখানকার চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর। যখনই অবস্থা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়, তারা তৎকালীন বিশেষ রাজনৈতিক দলের কিছু বন্দীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে, কোন বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না। নাম করে বলা যায় যখন গোটা নানচাং[১] ভয়ে দিশেহারা, মাত্র একঘন্টার মধ্যে তিনটি মিলিটারি জেলে একসঙ্গে বাইশ জনকে খুন করা হয়েছিল। অন্যদিকে ফুজিয়ান সরকার[২] জনগণের জন্য ভালো কাজ করতে চেয়েছিল বলে তাদের অনেককেই ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। বধ্যভূমি হলো জেলের ভিতরের সব্জি ক্ষেতটি, আয়তনে প্রায় পাঁচ মু। সারের বিকল্প হিসেবে শবদেহগুলিকে ক্ষেতের মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, পরে সবুজের সমারোহে যা ঢাকা পড়ে যায়।

এর প্রায় আড়াই মাস পরে আমাদের নামে অভিযোগপত্র এসে পৌঁছল। হয়তো ভাবছেন একজন বিচারক মাত্র তিনটি প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে কী করে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র লিখে ফেললেন, কিন্তু আমাদের সেই বিচারকের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব ছিল না। আমার কাছে অভিযোগপত্রের কোন কপি নেই। তবু এক আইনের ধারাগুলি ছাড়া ( দুর্ভাগ্যবশত ভুলে গেছি ) গোটাটাই হুবহু মুখস্থ বলে যেতে পারি।

---

১. ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে লাল ফৌজ চতুর্থ ক্যুওমিনতাং-এর সামরিক অভিযান বিধ্বস্ত করে এবং নানচাং-এর দিকে অগ্রসর হয়।

২. ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে, কিছু স্বদেশপ্রেমিক ক্যুওমিনতাং ফুজিয়ানে একটি সরকার গঠন করে। কিন্তু অচিরেই চিয়াং কাই-শেক তাদের দমন করে।

> মি. চ. ও মি. ঝ-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত উডকাট্ ক্লাব আসলে কম্যুনিস্টদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রোলেতারিয়েত শিল্পের পাঠ দেওয়া হয়।…তাদের সব উডকাটের কাজগুলিই লালফৌজের অফিসার, শ্রমিক ও ক্ষুধার্ত মানুষদের আদলে তৈরি। এগুলি করা হয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম বিকশিত করবার লক্ষ্যে এবং প্রোলেতারিয়েত একনায়কতন্ত্র যে নিশ্চিত তা বোঝানোর জন্য…।

আবার একদফা বিচার প্রহসন। আদালত কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচ অফিসারের মুখোমুখি আমরা। কিন্তু অস্থির হলাম না। একটাই কেবল ছবির কথা তখন আমার মনে ঘুরে ফিরে আসছে। ওনোরে দোমিয়ে-র ছবি, "দ্য জাজেস"। কী নিখুঁত কাজ।

আট দিনের মাথায় আমাদের বন্দীদশা ঠিক করে ফেলতে চূড়ান্ত বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হলো। আমাদের বিরুদ্ধে পূর্বেকার সব অভিযোগ তো ছিলই, সেই সঙ্গে তলার দিকে আর একটি অংশ :

> কৃত অপরাধ অনুযায়ী এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্রিমিন্যাল-কেসের অমুক অনুচ্ছেদের তমুক ধারা অনুযায়ী এদের প্রত্যেকের পাঁচ বছর করে জেল হওয়া উচিত। তথাপি, যেহেতু এরা বয়সে নবীন ও অজ্ঞান এবং বিপথে চালিত, এদের কিছুটা নমনীয়তা দেখানো যেতে পারে। সেইজন্য, এই আইনের এই ধারা অনুযায়ী তাদের শাস্তির মেয়াদকাল আড়াই বছর মকুব করা হলো। যদি আসামীপক্ষের কোন অভিযোগ থাকে এই ব্যবস্থা কার্যকরি হবার দশদিনের মধ্যে তারা আবেদন করতে পারেন……

আবেদন করে লাভ কী? কাজেই সেই ব্যবস্থা 'মেনে' নিলাম। মোটামুটি এই হলো তাদের আইনকানুন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার গ্রেপ্তার হওয়ার দিন থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় পর্যন্ত আমি তিনটি মানুষ নিধনের কসাইখানা চাক্ষুষ করেছি। আমার ভবলীলা সাঙ্গ করে না-দেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়ার জন্যও তাদের ধন্যবাদ। কেবল অত্যাচারের দৃশ্য দেখতে-দেখতে আজ আমার দৃঢ় বিশ্বাস চীন দেশে একমাত্র যা আছে তা হলো এক, র‍্যাটান ছড়িতে পেটানো; দুই সারা শরীর দলাই-পেষাই। অবশ্য অত্যাচার হিসেবে এ দুটো কিছুই নয়। তিন নম্বর হলো লৌহ-দন্ড পীড়ন। আসামীকে হাঁটু মুড়ে বসতে বলা হয়। তারপর ভাঁজ করা হাঁটুর উপর একটি দীর্ঘ লৌহদন্ড রেখে দুটো হোৎকা লোক সেই দন্ডের দুই প্রান্তে উঠে দাঁড়ায়। কখনো কখনো দন্ডায়মান লোকের সংখ্যা বেড়ে আট পর্যন্তও হয়। চার নম্বর হলো রক্তবর্ণ তপ্ত শৃঙ্খল-পীড়ন। তেতে লাল একটা লোহার শিকল মেঝেতে রেখে আসামীকে তার উপর হাঁটু গেড়ে বসতে বলা হয়। পাঁচ নম্বর পান-পীড়ন। গরম

গোলমরিচের খোলের সাথে প্যারাফিন তেল, ভিনিগার ও মদ মিশিয়ে জোর করে আসামীর নাসারন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়। ছ'নম্বর হলো আসামীর থাইতে শক্ত পাটের দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া আর ঐ অবস্থায় একটু নড়াচড়া করলেই উত্তম-মধ্যম কষানো। এরকম পীড়নের প্রচলিত নাম কী আমার জানা নেই।

কিন্তু সবচেয়ে নিষ্ঠুর বোধহয় সেইটা যা তারা আমার সাথে থানাগারদের একই ঘরে থাকা একজন অল্পবয়সী কৃষকের উপর কার্যকরি করেছিল। তাদের বস তাকে যত বলে সে একজন লালফৌজের সৈনাধ্যক্ষ, সে তত অস্বীকার করে। একসময় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা মরীয়া হয়ে তার হাতের নখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। প্রথমে একটি নখে ছুঁচ বিঁধিয়ে হাতুড়ি ঠুকল। কিন্তু সে কিছুই কবুল করছে না দেখে আর একটিতে। তথাপি নিরুত্তর যখন তৃতীয়-চতুর্থ করে একসময় সবকটা আঙুলে ছুঁচ বেঁধানোর কাজ শেষ হলো। এখনো কৃষকটির মৃত্যুবিবর্ণ মুখ, কোটরাগত চক্ষু ও রক্তাপ্লুত হাত দুটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না। বুকের মধ্যে এক মারাত্মক যন্ত্রণা অনুভব করি···

ছাড়া না-পাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারিনি আমাকে গ্রেপ্তার করার আসল কারণটা কী। আমরা ছাত্ররা স্কুলের উপর, বিশেষত প্রোকটরের (ছাত্রদের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীর) উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলাম না। কিন্তু প্রোকটর ভদ্রলোক ছিলেন প্রাদেশিক কুওমিনতাং কমিটির একজন দালাল। ফলে ছাত্রদের চাপা ক্ষোভ দমন করার জন্য তিনি উডকাট্ ক্লাবের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করালেন, যাতে অন্যেরা তার ক্ষমতার প্রভাব একবার চাক্ষুষ করতে পারে। চীনদেশীয় জ্যাকেট পরা যে লোকটা লুনাচারস্কিকে লালফৌজের একজন অফিসার হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, সে হলো আমাদের এই প্রোকটরের যোগ্য শ্যালক। এবার বুঝতেই পারছেন হিসেবটা কত সোজা।

সংক্ষিপ্ত এই বিবরণটি লেখার পর এখন আমি আমার জানলা দিয়ে মাটির উপর আছড়ে পড়া ধূসর চন্দ্রসুষমার দিকে চেয়ে আছি। একটা বরফশীতল হাত যেন বুকের উপর চেপে বসছে। কখনোই ভীতু নই, কিন্তু টের পাচ্ছি ক্রমশ হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে······আশা করি ভালো আছেন।

ইতি বিনীত রেনু ফ্যান্ □

সংযোজনা :

# চীনের কাঠখোদাই : আন্দোলনের আরো কথা

চীনের কাঠখোদাই আন্দোলন যে-শক্তিগুলির শিল্পাভিব্যক্তি, তাদের অধিকাংশই সামাজিক বা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট। এককথায় বেশিরভাগ উডকাটই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা প্রচারধর্মী। কেননা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছবি-আঁকিয়ে বা বুদ্ধিজীবী সকলেই সমাজের দুরবস্থা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন, সেইসঙ্গে তা জনসমক্ষে



মেলে ধরবার মতো যথেষ্ট সাহসীও। একথা ঠিক যে রাশিয়ার প্রলেতারীয় বাস্তবানুসরণের কাছে চীনা এই স্কুলের হাতেখড়ি। কিন্তু অধিকাংশ পথপ্রদর্শক শিল্পী শৈলীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও জীবন্ত পদ্ধতি গ্রহণ করায় তাদের কাজ একদা তাদের অনুপ্রেরণা যে কষ্টসাধ্য বাস্তবানুকৃতির আলোকচিত্রধর্মী রাশিয়ান কাজ, তাকেও টপকে যায়।

১৯২৯ সালে লু সুন 'নিউ গ্লোরিস ইন্ দ্য রিয়েল্‌ম অফ আর্ট' নামে উডকাটের উপর চারটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[১] প্রথম খণ্ডটিতে কেবলমাত্র ইংরেজ উড্‌কাটারদের কাজ আর দ্বিতীয়টিতে রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান ও ফ্রান্সের একগুচ্ছ করে নমুনা ছিল। এমনিতেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত সাহিত্য তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, এখন তাদের উডকাট[২]—সরাসরি এই সামাজিক প্রতিচ্ছবি, সহজেই চীনামানসে আলোড়ন সৃষ্টি করল। গণশিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে লু সুন উড্‌কাট ব্যবহার করতে চাইলেন যাতে দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে সামাজিক জ্ঞানের প্রারম্ভিক পাঠ পৌঁছে দেওয়া যায়। যথার্থই তিনি বলেছিলেন, ভাবনাচিন্তার ব্যাপক সম্প্রচারে উড্‌কাটই হলো আদর্শ উপায়, যেহেতু তা স্বল্পব্যয়সম্ভব, ভারি মেসিনপত্রের ঝামেলা-রহিত এবং সর্বোপরি ইলাস্‌ট্রেশনের মাধ্যম হিসেবে চীনদেশে এর এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে।[৩] ১৯৩০ সালে লু সুন একজন জাপানি শিক্ষকের সহায়তায় সাংহাইতে উড্‌কাটের প্রাথমিক শিক্ষার ক্লাশ চালু করেন।[৪] অন্যদিকে বই, প্যামফ্লেট, ক্যাটালগ, —সর্বত্রই তিনি আন্দোলনের লক্ষ্যের কথা ফলাও করে ঘোষণা করলেন, অচিরেই যেন উৎকর্ণ যুবমানসে তা প্রবেশ করে। তিনি আহ্বান রাখলেন : 'চীনা লোক পরম্পরাগত শিল্পের ঐতিহাসিক সম্পদশালা থেকে নির্বাচন সাপেক্ষে গ্রহণ করো, আয়ত্ত করো বিদেশী শিল্পসম্ভারের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকৌশল ও শৈলী এবং এভাবেই জনগণের রুচি ও চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে তোল নতুন এক শিল্পধারা, য জাতীয়-

---

১. ১৯২৯-৩০ সালে ডন্ ব্লসম প্রেস থেকে প্রকাশিত। লু সুন ভূমিকা লেখেন। সূত্র : এ পিক্‌টোরিয়াল বায়োগ্রাফি অফ্ লু সুন।

২. অক্টোবর বিপ্লবের উডকাট ও সোভিয়েত জীবন গোড়া থেকেই লু সুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৬ সালে তিনি অসুস্থ থাকাকালীন 'কালেকশন অফ সোভিয়েত উড্‌কাটস' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করে প্রকাশ করেন।

৩. বরাবর চীনের ট্র্যাডিশনাল উড-ব্লকের ভক্ত লু সুন ১৯৩৪ সালে ঝেং ঝেনদুর সঙ্গে একত্রে 'কালেক্‌শন অফ্ বেইজিং প্রিন্টস' নামে একটি রঙিন উড-ব্লক প্রিন্টের গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাদের সম্পাদিত এরকম আর একটি গ্রন্থ হলো 'শিঝুচাই জিয়ানপু'।

৪. ১৯৩১-এ লু সুন কাকচি উচিয়ামা নামে একজন জাপানি শিক্ষককে নিয়ে আসেন এবং ভাষার ব্যবধান দূর করতে নিজে দোভাষীর কাজ করেন। ১৯৩২ সালে এই স্কুলটিই চা তি আর্ট রিসার্চ সোসাইটি নামে আত্মপ্রকাশ করে। ওই বছর গ্রীষ্মের শুরুতে চীনা ওয়াই. এম. সি. এ.-তে তারা তাদের প্রথম প্রদর্শনীটি করে। সূত্র : 'এ পিকটোরিয়াল বায়োগ্রাফি অফ লু সুন' এবং 'লিটারেচার এ্যান্ড দ্য আর্টস ইন্ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি চায়না'—এ. সি. স্কট।

চেতনায় সমৃদ্ধ।' তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় বহু উড্ এনগ্রেভিং ক্লাবের পত্তন হয়।[৫] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সাংহাইয়ের 'হ্যাংচাউ উড্কাট সোসাইটি' (১৯২৯) ও 'ওয়ান-এইট ক্লাব' (১৯৩০)।[৬] কিন্তু পত্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনকারী ক্লাবগুলিকে সরকারি নানান বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হয়, তীব্র বিরোধিতার। সন্দেহ করা হয় যে, তাদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের গোপন যোগসাজশ আছে। এসময়ে সাংহাইতে একদল তরুণ এনগ্রেভার গ্রেপ্তার হন। লিউ তিয়ে, চিয়াং ফেং বা হু ই-চানের মতো লোকেরাও বাদ যাননি। এমনকি শেষজনাকার স্ত্রী জেলের মধ্যে মারা যান। তাসত্ত্বেও নব্য এই শিল্পী-গোষ্ঠী তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তাকে এতটা গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করেছিলেন যে আন্দোলন গুটিয়ে আসা তো দূরের কথা, ক্লাবের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। পরে অনেক কর্মীই, যারা শুরু থেকে ক্লাবগুলির সাথে যুক্ত ছিলেন, ইয়েনানে কম্যুনিস্টদের সাথে যোগ দেন এবং যুদ্ধের সময় অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে একযোগে কাজ করেন। তা বলে সকলেই কম্যুনিস্ট হয়ে যাননি। চে'ন ই ফান এক বিবৃতিতে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলনের লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেন। আশ্চর্য! তা যেন সূচনাপর্বের তৈলচিত্রকরদের মতো একই আক্রমণাত্মক ভাষার হুবহু প্রতিধ্বনি :

"আজ চীনে তীব্র জাতীয় সংকটের সময়ে প্রতিটি মুহূর্তই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাম নিয়ে কোন কালক্ষেপ করার অবকাশ নেই। একমাত্র সেই শিল্পই আধুনিক, যা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। আধুনিক শিল্পাভিরুচি চীনের বস্তুগত উন্নতি সাপেক্ষেই বিচার্য। আমাদের তাই নজর দিতে হবে শিল্পধারা সংরক্ষণের দিকে, তার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির সঠিক ব্যবহারের দিকে। সেইসঙ্গে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃতি ও প্রয়োগকৌশল অধিগ্রহণ এবং কীভাবে তা জাতীয় চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। ভাবনাচিন্তায় যদি কোন শিল্পী সত্যিকারের দেশপ্রেমী হন, তাহলে তিনি দেশী তেল-কালি ব্যবহার করলেন, না পাশ্চাত্য পটভূমি—এটা কি কোন ব্যাপার? সাধারণ মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রই চীনের আধুনিক শিল্পকে প্রাণবন্ত করে তুলবে। তা আরও সংঘবদ্ধ ও উন্নত হবে চীনা লোকশিল্পের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারার সংযোগে ও তা উত্তরণের মধ্যে দিয়ে। এবং এভাবেই সমস্ত জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে তা শিল্পরসিকের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করবে, তেমনি সৃজনশীল কর্মীর সংখ্যাও বাড়বে।

৫. ১৯৩৪-এ লু সুন 'তিয়েমু আর্ট পাবলিশিং হাউস' নামে উড্কাটের একটি সংকলন সম্পাদনা করেন এবং নিজখরচায় প্রকাশ করেন। এতে চব্বিশজন তরুণ শিল্পীর কাজ সংকলিত হয়েছিল।

৬. চীনা প্রজাতন্ত্রের আঠারো বছর—জুনসান ক্লাবের নাম। অভিজাত শ্রেণীর শিল্পের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাঁদের স্লোগান ছিল : 'সংরম্য কক্ষ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসো'। ১৯৩১ সালে বসন্তকালের শেষদিকে তাঁরা তাঁদের কাজের প্রথম প্রদর্শনী করেন। সূত্র : 'লিটারেচার এ্যান্ড দ্য আর্টস ইন্ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির চায়না'—এ. সি. স্কট।

"মতাদর্শগত উপাদানের অন্তিম মানদন্ড অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। বাস্তববাদী শিল্প ছাড়া অন্য কোন শিল্প কি চীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? বাস্তববাদের এই চাহিদাই হলো আসল। জাতীয় চেতনাসমৃদ্ধ প্রকৃত শিল্প তার বিশেষ ক্ষমতাবলে মিস্টিসিজম বা ফিউচারিজমের মতো যে কোন একটি উপাদান, মতাদর্শগত বিশেষ একটি জাতীয় মাত্রার জন্ম দিতে পারে। চীন ও তার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাথমিক কাজ হলো সবকিছুকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, বোঝা ও অনুধাবন করা এবং প্রকৃত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের যথাযথ শিক্ষিত করে তোলা। শিল্পে একমাত্র বাস্তববাদের পক্ষেই একাজ করা সম্ভব। কেননা বাস্তবধর্মী শিল্পের সৃজনক্রিয়ায় শিল্পী পুরোপুরি তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন।" —তি'য়েন সিয়া, জানুয়ারি, ১৯৩৭।

সমস্ত উড্-এনগ্রেভাররাই যে নীরস এই মার্কসীয় অনুশাসনের সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে তৈরি ছিলেন, এমন নয়। কিন্তু অনেকেই, কী যুদ্ধের আগে কী যুদ্ধের সময়ে, গভীর স্বদেশপ্রেমের আবেগে ধরা পড়লেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একান্ত ইচ্ছায় সক্রিয় হলেন। একদিক দিয়ে নীতিনিষ্ঠ সর্বহারা আন্দোলন যেন বিগত দশকগুলির অন্যায় অবিচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের এ ধারণাই বদ্ধমূল হলো যে তারা কোন-না-কোন ভাবে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। ক্ষতিপূরণ এজন্য যে তথাকথিত জ্ঞানী-গুণী ও আপামর জনসাধারণ এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সনাতন ব্যবধান বিদ্যমান। আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, তা ছিল নব্য মানবপ্রেমের সৎ অভিব্যক্তি।

রাশিয়ার বাস্তববাদ দীর্ঘদিন ধরে জাঁকিয়ে বসলেও গেয়র্গ গ্রোসের নির্মম বিদ্রূপাত্মক কাজ এসময়ে অনেকেরই দৃষ্টি কাড়ে। একদল তরুণ শিল্পী ক্যোথে কোলভিৎসকে অনুকরণ করে ড্রয়িং করতে শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে লু স্যুন মারা যাওয়ার দিনকয়েক আগে আরও একটি কাজ শেষ করেন, উড্‌কাট আন্দোলনের পক্ষে তাঁর শেষ কাজ : পরাজয়ে ম্লান জার্মানির সাধারণ মানুষের জন্য গভীর মমতাবোধ সম্বলিত কোলভিৎসের বাছাই করা কাজের এক সংকলন প্রকাশ। তিরিশের গোড়া থেকেই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা কাঠখোদাই সংঘগুলির উদ্যোগে আয়োজিত ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী তার একটা বড় কারণ। সংঘগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চাইনিজ উড্-এনগ্রেভিং অ্যাসোসিয়েশন ও তার শাখা-প্রশাখা। তাদের উদ্যোগেই 'দ্য আর্ট অফ উড্-এনগ্রেভিং' এবং আরও কিছু পত্র-পত্রিকা বের হতো।

আকস্মিক যুদ্ধের সূচনা যুদ্ধকালীন উদ্যোগের জন্য ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা সমস্ত দলগুলিকে চাইনিজ উড্-এনগ্রেভারস' অ্যাসোসিয়েশনে সামিল করে (১৯৩৭-৪২), পরবর্তীকালে চাইনিজ উড্-এনগ্রেভিং রিসার্চ সোসাইটিতে (১৯৪২-৪৬) তা

রূপান্তরিত হয়।[৭] ইয়ে ফু ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় শিল্পী, ওয়ান-এইট ক্লাবের একেবারে গোড়ার সদস্য এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সংগঠক। উড-এনগ্রেভিং সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি বইও আছে তার। প্যা'ন জেন ও ইয়াং চিয়া-চ্যা'ং (আহ ইয়াং) তাকে উড্‌কাটের যন্ত্রপাতির একটা সমবায়িক কর্মশালা স্থাপন করতে সাহায্য করেন। সাহায্যকারী এ দুজনের মধ্যে শেষের জন উত্তরাঞ্চলের একজন শক্তসমর্থ চাষী হলেও উড্-এনগ্রেভার হিসেবে সুশিক্ষিত ছিলেন। লি হুয়াও অন্যতম একজন এনগ্রেভার। এনগ্রেভিং ছাড়া অন্যত্রও তাঁর কাজের সীমা বিস্তৃত ছিল। ১৯২৫-এ ক্যান্টন স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি কিছুদিন জাপানে থেকে পড়াশুনা করেন এবং দেশে ফিরে ক্যান্টন মডার্ন উডকাট সোসাইটি স্থাপন করার পর ১৯৩০-এ কাঠখোদাই আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে এই সোসাইটিই দক্ষিণ চীনের প্রধান শিল্পকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পী তো বটেই, একজন সরকারি কর্মচারীও ছিলেন তিনি। ফলে যুদ্ধের সময় দক্ষিণাঞ্চলের অনেকগুলি রণাঙ্গণ ঘুরে দেখেন এবং ব্রাশ হাতে অতঃপর এমন এক গুণের পরিচয় দেন যা আন্দোলনের স্বরূপ.যথাযথ মেলে ধরে। হাত ও মুখের প্রতিটি বক্র ও কুঞ্চিত রেখাই যেন সেখানে মনুষ্যশরীরের ভাষাকে ব্যক্ত করেছে। বিষয়ভাবনায় অনেকগুলি আশানুরূপ হওয়া সত্ত্বেও যে আবেগ ও সহানুভূতিতে তা বর্ণিত মানুষের প্রতি নতুন এক ভালোবাসার ইংগিত বয়ে নিয়ে আসে, তাতে করে নিছক বাস্তবানুসরণের উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠ উড্‌কাটগুলি উন্নীত হয়।

দেখা গেল উড্-এনগ্রেভিংকে তার পূর্বসূরীরা যেমন ভেবেছিলেন, তেমনই এক সস্তা-সরল ও গণতান্ত্রিক শিল্পমাধ্যম। তাতে সামিল হয়েছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিশাল সংখ্যক উৎসাহী তরুণ। এরকমই দুজন লিউ তি'য়ে-হুয়া ও লি চু'য়ান। অত্যন্ত উচ্চমানের কাজ তাদের। তার মধ্যে আবার দ্বিতীয়জনার 'জলপানরত চাষী' শ্রমের মর্যাদায় সম্পূর্ণ নতুন এক মাত্রা সংযোজন। তখনও পর্যন্ত এ ধরনের কাজ করে চীনা শিল্পী তার হাত ময়লা করতে রাজি ছিলেন না। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী চারজন শেচওয়ান প্রদেশের শিল্পীও উল্লেখযোগ্য। তাঁদের হাত ধরে আসেন ওয়াং চি ও হুয়াং ইয়াং-সান, যারা যুদ্ধের সময় চীনের দক্ষিণাংশে একটি নাটকের দলের সাথে কাজ করেন। লিউ পি'ং-চিহ, সাংহাইয়ের স্যিয়া হুয়া আর্ট আকাদমি থেকে স্নাতক, মিয়াও গোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে বড় বড় উজ্জ্বল রঙের যে সব ব্লক করেন তা সাফল্যের সঙ্গে আদিবাসী গ্রামগুলির বেশ কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত ও জীবন তুলে ধরেছে। চেংতু অধিবাসী

---

৭. ১৯৪৫-এ তাঁরা অতীত সম্পর্কীয় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটির নাম দেন 'উড্‌কাটস অফ্ দ্য এইট্ ইয়ারস ওয়র অব রেজিস্টেন্স'। ১৯৩৭-৪৫ মোট আট বছরের কাজ তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৫ সালে তাঁরা উডকাটস অফ ওয়র টাইম চায়না' নামে প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের একটি অ্যালবামও বের করেন। এতে একশরও বেশি শিল্পীর কাজ স্থান পায়। কী ধরনের কাজ তা নামকরণ দেখলেই বোঝা যায় যেমনঃ 'পলাতক শরণার্থী', 'দুর্যোগ', 'অনাহার', 'ফার্ম হাউসের কর্ম-সূচি প্রণয়ন' 'রেলপথ সংস্কার' ইত্যাদি।

চ্যাং ইয়াং-সি্য যুদ্ধের সময় 'দ্য চে'ং তু ৎজু—যু হুয়া-পাও' নামে একটি চিত্র-ব্যাখ্যান মূলক পত্রিকা সম্পাদনা করেন, অংশত যা সামাজিক নানান দুরবস্থার প্রতি বিদ্রুপাত্মক। চীনদেশীয় ঘরানায় অঙ্কিত তাঁর বাস্তব দৃশ্যগুলি একেবারে ভিন্ন স্বাদের। উজ্জ্বল সূর্যালোকের ব্যবহার ও দক্ষ প্রয়োগকৌশলের জ্ঞান সে ছবির স্বাদ পাল্টে দিয়েছে। অন্যদিকে তাঁর উড্‌কাটগুলি কেবলমাত্র মুক্তরেখাঙ্কনই নয়, চরিত্রের অসমান ও শক্তিমান বোধে তির্যক, হা-ভাতে মানুষদের জীবন থেকে উঠে আসা এক বিদ্রুপাত্মক মেজাজে তিক্ত, যারা রাস্তায় ভিড় করেছে তাদের মেয়েদের বিক্রি করবে বলে। মনে হয় এক্ষেত্রে তিনি যা চাক্ষুষ করেছেন তাই মূর্ত করেছেন, কোন নৈতিকতার ধার ধারেননি।

কোয়াংটাং থেকে আগত লিউ লুন, পড়াশুনা জাপানে, পরে ক্যান্টনের ন্যাশনাল সান-ইয়াৎ-সেন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন, অত্যন্ত শক্তিশালী একজন পেইন্টার ও এনগ্রেভার ছিলেন। লিয়াং ইউং-তে'ই, জন্ম কোয়াংটাং-এর ওয়াই-ইয়াং-এ, আর একজন শিল্পী যিনি ক্যান্টন-হ্যানকাউ রেলপথে একটি নাটকের দলের সাথে সারাক্ষণ থেকে কাজ করেন; ফলে তাঁর পক্ষে তীক্ষ্ণ ও খানিকটা যান্ত্রিক ভাষায় চিত্রিত উড্‌কাটের উপর একটি বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়—'দ্য আয়রন আর্টারি'। ৎসা'ই তি-চিহ্‌ও যুদ্ধের নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর কাজের বিষয় মূলত কৃষকচরিত্র।

যুদ্ধের কিছুদিন আগে কম্যুনিস্টরা তাদের তৎকালীন রাজধানী ইয়েনানে লু স্যুন আর্ট আকাদমি স্থাপন করে। উদ্দেশ্য এই যে, যেমন চেন-ই-ফানের প্রবন্ধে বলা হয়েছে, শিল্প মাধ্যমে বিশেষ করে উড্‌কাট ও দেওয়াল-সমাচারপত্রিকার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি বহন করে নিয়ে যাওয়া।[১] □

> The wind from the capital darkens the forest
> Under dark skies the flowers all die.
> Could you devise a new kind of art
> And use red ink to paint spring mountains ?
> —Lu Xun, To a painter, 1933.

---

১. Michael Sullivan : Art of the China



## এড্রিয়েন হেনরি

# শিল্পিত ঘটনার রাজনীতি-পরিবেশ

রোমান সম্রাটদের যুগ থেকেই শিল্পকে রাজনৈতিক-ভাবে অনুগত দর্শকশ্রোতাদের জন্য আফিমের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো তা হয়েছে সম্পূর্ণ সফল; কখনো তা কাজ করেছে শাঁখের করাতের মতো; আবার কখনো শিল্পীরা নিজেরাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'এনভায়রনমেণ্ট'— বা পরিবেশ পরিকল্পনার শিল্প এবং 'পার্ফর্মেন্স' বা সমবেত প্রদর্শকৃতির শিল্প চরিত্রগতভাবে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রের জন্য দারুণ উপযুক্ত।

রাশিয়ায় যখন পাশাপাশি একই সাথে রাজনৈতিক ও শৈল্পিক বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল, সেই সময়ের আউটডোর স্টেজ-সেট, ভার্তভের আউটডোর সিনেমা-স্ক্রীন এবং ১৯২০-এ এভরিংগার, কুগেল ও পেত্রভের উইণ্টার প্যালেস অধিকারের মতো ঘটনার পুনরাভিনয়, বিশাল দর্শনীয় অনুষ্ঠান সংগঠনের মাধ্যমে শিল্পকে মুক্ত ও সংযুক্ত পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই শেষের অনুষ্ঠানটিতে প্রয়োজন হয়েছিল একটি যুদ্ধজাহাজ ও ছ'হাজার অভিনেতা এবং প্রায় এক লক্ষ দর্শক অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে একই

ভাবে জাক লুই দাভি বিশাল বিশাল জনপথ-অনুষ্ঠান ঘটিয়েছিলেন। .

এ্যালান কাপ্রো ন্যুরেমবার্গ র‍্যালির থিয়েটার হিসাবে উপযোগিতার কথা বলেছিলেন। ১৯৩৪-এ এ্যালবার্ট স্পিয়ার যে র‍্যালির উদ্ভাবক ছিলেন, তা দৃশ্যগতভাবে সত্যিই বিস্ময়কর: রাত্রির আকাশে ১৩০টি সার্চলাইট এক বর্গক্ষেত্রের আকারে ফেলা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল স্পটলাইট দিয়ে আলোকিত পতাকাবাহকদের দশটি সারি। প্রায় বিশ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত আলোকস্তম্ভগুলির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আলোকিত মেঘপুঞ্জ। স্পিয়ার পরে বলেছিলেন: মনে হয় এই 'আলোর ক্যাথিড্রাল' এই ধরনের আলোক-স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নেভিল হেন্ডারসন নাকি এ ঘটনাকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে: একইসাথে গম্ভীর ও সুন্দর··· তুষারের এক ক্যাথিড্রাল যেন। গণ-অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত অবশ্যই চীনে অনুষ্ঠিত সেই বিশাল জনসমাবেশগুলি, যেখানে শূন্যে টাঙানো হাজার হাজার রঙিন কার্ড দেশপ্রেমের কথাবাণী বা কখনো চেয়ারম্যান মাওয়ের মুখ হয়ে ভেসে উঠত।

পাশ্চাত্যে এখন মিশ্র-মাধ্যমের সব থেকে বড় গণ-অনুষ্ঠান হলো রকসংগীতের কনসার্টগুলি। রক দৃশ্যের মিশ্র-মাধ্যম বিষয়সমূহ কেন্ কেজি ও তাঁর মেরি প্র্যাঙ্কস্টারদের ব্যক্তিগত কল্পনা থেকে জন্মেছে। 'অনেকটা এরকম বলা যেতে পারে যে তিনি যেন দেখেছিলেন অরণ্যের মতো বিশাল একটা স্টেজ সেটিং·· যেখানে প্রতিটি দিনই হবে একটা হ্যাপনিং[২], ঘটমান প্রদর্শনীর নতুন শিল্পধারা।' ১৯৬৪-তে কেজির সেই বহুখ্যাত আমেরিকাব্যাপী বাসে পাড়ি দেওয়া এবং ১৯৬৫-র সম্পূর্ণ মিশ্র-মাধ্যম ও ১৯৬৬-র ট্রিপস্ ফেস্টিভ্যাল অবশেষে বিল গ্র্যাহামের পাঁচ বছর ব্যাপী সফল প্রযোজনা ফিলমোর ইস্ট ও ওয়েস্টের 'গ্রুপ/লাইট-শো/কনসার্ট' ফর্মুলাতে তরল ও প্রথাবদ্ধ রূপ পেল। এই ফর্মুলা অন্যত্রও কমবেশি সফলভাবে অনুকরণ করা হয়েছিল। বিখ্যাত লাইট-শোগুলির কাজ, যেমন ১৯৬৯-এ ফিলমোর ইস্টে (The Who-র) রক অপেরা, টমি-র জন্য জোসুয়া-র শো বা জেফারসন এ্যারোপ্লেন নিয়ে গ্লেন ম্যাকের কাজ এবং ইংল্যান্ডে মার্ক বয়েল-এর কাজ অবশ্যই দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

অদ্ভুত উদ্ভাবনের উৎসভূমি লস এঞ্জেলস-এ বর্তমানে দুটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে, যারা

১. 'এনভায়রনমেন্ট' হলো এমন এক শিল্পরূপের নাম যা একটা গোটা ঘর বা মুক্ত আকাশ আলো শব্দ বর্ণ অথবা অন্য যে কোন উপাদান দিয়ে ভরিয়ে তোলে।—এ্যালান কাপ্রো

২. 'হ্যাপনিং' বলতে থিয়েটার সম্পর্কিত একধরনের বিশেষ শিল্পরূপকে বোঝানো হয়, যা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর গঠনকাঠামো ও বিষয়বস্তু 'এনভায়রনমেন্ট' থেকেই যুক্তিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে।—অ্যালান কাপ্রো।

মঞ্চ অর্থাৎ যেখানে আমি ছবি আঁকি। একথাটা এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে 'হ্যাপনিং'-এর শুরু হলো তখনই, যখন ছবি-আঁকিয়ে ও ভাস্কররা তাদের দেখার ও কাজ করার স্বকীয় ভঙ্গি নিয়ে থিয়েটার প্রাঙ্গনে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। —ক্লেস ওলডেনবার্গ।

ইচ্ছাকৃত বাড়াবাড়িকে তাদের কাজের অঙ্গ বলে মনে করেন। এ্যালিস কুপার চেষ্টা করেন রক, থিয়েটার ও স্যাটায়ারকে মেশাতে। মহিলা-শিল্পীদের একটি অসাধারণ দল 'লে কোকেৎ' রক থিয়েটার ও আর্ট গ্যালারি, উভয়তই 'এলিফ্যান্ট শিট—দি সার্কাস লাইফ', 'টিনসেল টার্টস ইন এ হট কাণ্ট্রি' ও 'ট্রিসিয়া'জ ওয়েডিং' ইত্যাদি নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছেন। এই দুই দলই ফ্রাংক জাপ্পা ও তাঁর 'মাদার্স অফ ইনভেনশন' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। জাপ্পা এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক কম্পোজার যিনি হিউমার, স্যাটায়ার ও শককে তাঁর মঞ্চক্রিয়ার প্রধানতম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন।

এ্যাবি হফম্যানের 'থিয়েটার অফ কনফ্রন্টেশন'-এর ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ। 'শিকাগো সেভেন'-এর বিচারকে প্রতিবাদীপক্ষ দেখেছিলেন গণমাধ্যমের জন্য পরিকল্পিত একটা দৃশ্যায়ন হিসাবে, তাঁদের ভাবনাকে রেডিও ও টিভির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপায়স্বরূপ। রাজনৈতিক কাজ যেন এখানে থিয়েটার-দৃশ্যায়ন হিসাবে ব্যবহৃত।

নিউ ইয়র্ক স্যুররিয়্যালিস্ট গ্রুপ এবং অ্যামেরিকান অ্যানার্কিস্ট গ্রুপ-এর কর্ষিত জমিতে উদ্ভব হয় ব্ল্যাক মাস্ক-এর, একটি র‍্যাডিকাল শিল্প / রাজনৈতিক দল যারা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি পত্রিকার প্রায় গোটা দশেক সংখ্যা প্রকাশ করেছিল এবং বেশ কয়েকটি শিল্প-রাজনৈতিক ডিমনস্ট্রেশনে অংশ নিয়েছিল। যেমন তারা চেয়েছিল মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট পুরো বন্ধ করে দিতে, চেয়েছিল ওয়াল স্ট্রীটের নাম বদলে দিতে।

**ওয়াল স্ট্রীট বস্তুত ওয়র (war) স্ট্রীট**

স্টক ও বন্ডের কারবারীরা নতুন সীমানার জন্য চীৎকার করছে—কিন্তু ব্রংক্স ও হারলেমে ফিরছে কফিনগুলি। হত্যার বুল মার্কেটগুলি মৃত্যুর স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে কারবার করছে। আপনাদের মৃত পুত্রদের তালিকায় লাভের সংখ্যা চড়ছে। ভিয়েতনামে বিষ গ্যাস বর্ষিত হচ্ছে। আপনি বলতে পারেন না যে 'আমরা জানতাম না'। জ্বলন্ত গ্রামের ছবি টেলিভিসন আপনার বাড়ির সাজানো নিরাপত্তার মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। স্বাধীনতার নামে আপনারা গণহত্যা করছেন!

**কিন্তু আপনারাও বলির পাঁঠা!**

বেকারী বাড়ছে? বেশ, আপনাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে, হত্যার কাজ। শিক্ষার মান নিচু তো কী হয়েছে, আপনাদের হত্যা করতে শেখানো হচ্ছে। কালোরা অশান্ত হয়ে উঠছে? তাদের মরতে পাঠানো হচ্ছে। এই হলো মহান সমাজের জন্য ওয়াল স্ট্রীটের ফর্মুলা!

বেন মোরিয়া এবং কবি ড্যান গেয়ার্গিয়াকিস-এর নেতৃত্বে ব্ল্যাক মাস্ক অবশেষে এক সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ আন্ডারগ্রাউন্ড বিপ্লবী দলে নিজেদের পরিবর্তিত করে নেয়।

নতুন নাম হলো 'আপ এগেইন্সট দি ওয়াল মাদারফাকার্স'। এর পরে সদস্যরা অনেকেই তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য জেল খাটেন। রাজনীতির স্বার্থে শিল্পকে ত্যাগ করার সাক্ষ্য রয়েছে কালোদের একটি কবিতা/গানের দলের নামেও যারা নিজেদের বলে 'দি লাস্ট পোয়েটস'—বিপ্লব কবিদের অপ্রয়োজনীয় করে ফেলার আগে তারাই শেষ কবির দল।

'প্রথাগত' গ্যালারির পথে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে গার্ট্রুড স্টেইন ও মার্চ গ্যালারি'জ দ্বারা প্রভাবিত একটি দল। জোরালো রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয় নিয়ে রুক্ষ ও ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রুর পরিবেশ-পরিকল্পনার কাজ করেছেন পঞ্চাশের শেষে ও ষাট দশকের প্রথম দিকে স্যাম গুডম্যান ও বোরিস লুরি। ১৯৬৪-তে গার্ট্রুড স্টেইন গ্যালারিতে গুডম্যানের 'নো স্কাল্পচার', এবং ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৩-র মধ্যে মার্চ গ্যালারিতে 'ভালগার শো', 'ইনভলভমেন্ট শো' এবং 'ডুম শো'—এজাতীয় কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ওয়েস্ট কোস্ট-এ সানফ্রান্সিসকো মাইম ট্রুপ-এর মুক্ত পথনাটক ছাড়াও 'দি ডিগার্স' একটি বিনামূল্যের দোকান চালু করেছিল : দি ট্রিপ উইদাউট এ টিকেট, যেখানে লোকে যা ইচ্ছে নিয়ে আসত ও নিয়ে যেতে পারত এবং এ ঘটনা এক ছেদহীন থিয়েটার অনুষ্ঠান হিসেবে ভাবা হয়েছিল। লস এঞ্জেলস প্রোভোরা, বিশেষত জোসেফ বিয়ার্ড, মাইকেল এ্যাগনেলো ও পিটার লীফ স্ব-উদ্ভাবিত বহু সামাজিক থিয়েটার পরিচালনা করেছেন। শহরের দরিদ্র অঞ্চল থেকে অবাঞ্ছিত সামগ্রী সংগ্রহ করে সাজানো লরি থেকে শহরের ধনী অঞ্চলে বিতরণ করা তার মধ্যে একটি। ওয়াটস থেকে সংগৃহীত একটা পুরনো ফ্যাশনের গ্যাস স্টোভ বিভারলি হিলস-এর পরিপাটি লনের উপর বসানো—'সানসাইন স্টেট'-এর মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিষ্কার প্রতীকস্বরূপ। একেবারে ইদানীং-কালে নিউইয়র্কে প্রগতিশীলদের মধ্যে অগ্রণী বেশ কিছু শিল্পী সংস্কৃতিক বৈষম্য (যেমন মিউজিয়মগুলিতে কালো ও মহিলাশিল্পীদের প্রতিনিধিত্বের নিদারুণ অভাব) ও রাজনৈতিক দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে (যেমন ভিয়েতনাম যুদ্ধ, এ্যাট্টিকা জেলহত্যা) প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে একজোট হয়েছেন। ১৯৬৯-এর ১০ এপ্রিল স্কুল অফ ভিস্যুয়াল আর্টস-এর এক সভায় আর্ট ওয়র্কার্স কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬৯-এ ভিয়েতনাম মোরাটরিয়াম দিবসে মিউজিয়মগুলি খোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পর ১৯৭০-এর মে মাসে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ম অফ আর্ট-এ তাঁরা অবস্থান ও 'নিউ ইয়র্ক আর্ট স্ট্রাইক' পালন করেন এবং মিউজিয়ম অফ মর্ডান আর্ট-এ পিকাসোর 'গ্যোর্নিকা'-র সামনে সংমি ম্যাসাকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। বিখ্যাত অনেকে যেমন মরিস, গ্রোসভেনর, হাকে, ওপেনহাইম এবং এন্ডার এ. ডব্লিউ. সি.-র সাথে বহু সময়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। এই আন্দোলনের জঙ্গী শাখা গেরিলা আর্ট এ্যাকশন গ্রুপ, যাতে আছেন 'নির্বাসিত' বেলজিয়ান শিল্পী জাঁ তোশ এবং জন হেনড্রিক্স (দুজনেই 'ডেসট্রাকশন

ইন আর্ট" আন্দোলনের প্রাক্তন সদস্য ), পাপ জনসন ও অন্যান্যদের সাথে অনেকগুলি সুপরিকল্পিত শিল্প/রাজনৈতিক ঘটনা রূপায়িত করেছেন। সংঘ প্রতিবাদে জড়িত থাকা ছাড়াও ১৯৬৯-এর অক্টোবরে 'নিউ-ইয়র্ক' পেইন্টিং এ্যান্ড স্কাল্পচার ১৯৪০-১৯৭০' প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময়ে তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন। মিউজিয়মের সিঁড়িতে একটি ট্রাংক ট্যাক্সি করে এনে নামানো হলে একক্ষেত্রে লেজওয়ালা একজন 'কিউরেটর' এবং তৎসহ এক শিল্পীকে দেখা গেল। এরপর শিল্পীকে জোর করে ট্রাংকে ঢুকিয়ে শ্যাম্পেন, ক্যাভিয়ার, স্ট্রবেরির শরবত ও ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো ও মাখানো হলো। জনতাকে ( যে সব ধনী পৃষ্ঠপোষকরা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন ) আমন্ত্রণ জানানো হলো শিল্পীকে ডিম ছুঁড়ে মারতে। অবশেষে পুলিশ ও মিউজিয়মের নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিলে কিউরেটর ও 'শিল্পী'-সমেত ঐ 'প্যাকেজ', যা তখন বিশ্রী আঠালো জিনিসে মাখামাখি, প্রদর্শনীর সংগঠক হেনরি গেল্ডসালার-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তাঁরা জেদ করতে থাকেন।

তারপর থেকে তাঁরা রাস্তায়, মিউজিয়মে এই ধরনের অনেক এ্যাকশন করেছেন এবং ১৯৭১-এ তাঁরা বহু বিখ্যাত রাজনীতিবিদের কাছে প্রচুর এ্যাকশন লেটার্স পাঠিয়েছেন। ১৯৭১-এর 'দি পিপল্‌স ফ্ল্যাগ শো'তে তোশ ও হেনড্রিক্স ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, যেখানে একদল শিল্পী বেআইনীভাবে আমেরিকার পতাকাকে একটি শিল্পকর্মের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং হেনড্রিক্স, তোশ ও ফেইথ রিনগোল্ড নামের একজন কালো মহিলাশিল্পী 'জাতীয় পতাকা অবমাননা'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। 'জাডসন থ্রি'-র বিচার এবং সাম্প্রতিককালে মিউজিয়ম রক্ষীরা যেরকম প্রতিহিংসার সাথে জি. এ. এ. জি-র প্রতিবাদ-অনুষ্ঠানকে রুখেছে, ( বিশেষ করে ১৯৭১-এর জানুয়ারি, মিউজিয়ম অফ মর্ডান আর্ট-এ ) তা থেকে প্রমাণ হয় রাজনৈতিক ও শৈল্পিক প্রতিষ্ঠান দায়বন্ধ শিল্পীকে এখনও কতটা ভয় পায়।

আলোচিত শিল্পীদের অনেকেই সরাসরি রাজনৈতিক বা সামাজিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন। ইকোলজির প্রতি যে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তা গুস্তাভ মেৎসগারের কাজে দেখা গেছে। তিনি ১৯৭০-এ লন্ডনের হেওয়ার্ড গ্যালারিতে কাইনেটিক আর্টের প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় তাঁর MOBBILE দেখিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। 'মোবাইল' মানে এখানে একটি গাড়ির নাম যার মাথায় PVC-ঢাকা বাক্সে মাংস, ফল ও ফুল রাখা ছিল, এবং গাড়ির exhaust থেকে একটি টিউব সেই বাক্সে ঢোকানোর ফলে ভিতরের বস্তুগুলি ধীরে ধীরে কালো ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ( একইভাবে 'আমেরিকান গ্রুপ আর্টিস্টস' আগেই 'ইকোলজিক্যাল সুইসাইড' প্রদর্শন করেছে : আঠারোটি ক্যানভাস একক্ষেত্রে সাতটি শহরের বাতাসে expose করা হয়েছিল এবং তা ধীরে ধীরে কালো হয়ে গিয়েছিল।) মেৎসগার, যিনি 'ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন ফর দি লিকুইডেশন অফ আর্ট'-এর একজন প্রধান প্রবক্তা, ১৯৭০-এর ২১ অক্টোবর লন্ডনে তাঁর নিজের 'এ্যান

এন্ড টু আর্ট" গ্রুপের সাথে টেট গ্যালারি বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য মেৎসগার-এর দৃষ্টান্ত অন্যেরা অনুসরণ করেননি। গত কয়েক বছরে আমেরিকা ও ইউরোপের ঘটনাবলীর তুলনায় ইংল্যান্ডে যতটুকু প্রতিবাদী ছবিছাবা হয়েছে তা অবশ্য খুবই ভদ্রগোছের।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'হ্যাপনিং' টেকনিকের সবচেয়ে সচেতন ও সার্থক ব্যবহার হয়েছিল সম্ভবত 'ডাচ প্রোভো গ্রুপে'র কাজে। রবার্ট জ্যাসপার গ্রুটভেল্ড-এর আউটডোর হ্যাপনিং থেকে উৎপন্ন তাদের কাজ ১৯৬৫-তেই পুলিশী নিগ্রহের বিরুদ্ধে শিল্পসম্পৃক্ত প্রতিবাদের এক মৌলিক রূপবন্ধ খুঁজে পেয়েছিল। পরের বছর তাদের ক্রিয়াকলাপ আরো সম্পূর্ণ ও প্রকট হলো : লম্বা চুল, সাদা স্যুট ও রুদ্ধ স্ট্রীট এ্যাকশন আমস্টারডামকে সচকিত করে তুলল। তাদের ক্রিয়াকলাপ শুধু একধরনের 'সৃজন-মূলক ধ্বংসবৃত্তি'ই নয়, অনেক বাস্তবযুক্তিসম্পন্ন প্রস্তাবও তাদের ছিল। যেমন মোটরগাড়ির বিরুদ্ধে প্রচার-পরিকল্পনা 'হোয়াইট বাইসাইকেল স্কীম' ছিল নগর কর্তৃপক্ষ দ্বারা কুড়ি হাজার পাবলিক বাইসাইকেল বিতরণ ও বিনামূল্যে গণপরিবহন ব্যবস্থার সপক্ষে। হোয়াইট কর্পসেস স্কীম-এ প্রস্তাব ছিল পথচারীদের হত্যা করেছে যে-সব গাড়ির চালক, তাদের দিয়ে পথের যেখানে সেই ঘটনা ঘটেছে, সেখানে মৃতের অশরীরী সাদা রেখাচিত্র আঁকাতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা ( হোয়াইট ওয়াইভস ) এবং নগর পরিকল্পনার ( হোয়াইট হাউসিং ) জন্য তারা সৃজনী প্রস্তাব দিয়েছিল। বিপ্লবী ডাচ স্থপতি কনস্টান নিউউেনহিস-এর নীতিসমূহকেও তারা গ্রহণ করেছিল। ১৯৬৬-তে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে অনেকগুলি সীটে জেতার পর ১৯৬৭-তে তাদের গ্রুপ ভেঙে যায়। অন্যান্য ডাচ গ্রুপ যেমন জঙ্গী উইমেন'স লিবারেশন গ্রুপ, ম্যাড মিনাস ইত্যাদিও প্রোভোর পথ-নাটক ও হ্যাপনিং টেকনিক ব্যবহার করত, যেমন করত কাবুটার, 'নোমস' ( Gnomes ) ও পিক্সিজ'রা, যাদের ইচ্ছাকৃত খামখেয়ালি [illegible]ার আড়ালে প্রোভো গ্রুপের মতোই রাজনৈতিক দৃঢ়তা ছিল, যার নেতৃস্থানীয় অনেকে রোয়েল ভ্যান ডুইন-এর মতো 'কাবুটার অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট'-এ যোগ দিয়েছেন। প্রোভো ও কাবুটাররা দেখিয়েছেন যে শিল্পভিত্তিক প্রতিবাদ নেহাৎই নঞর্থক অবস্থান থেকে কীভাবে পাবলিক প্ল্যানিং ও পৌরব্যবস্থার ক্ষেত্রে সচেতন অংশগ্রহণে সরে আসতে পারে।

ফ্রান্সে ১৯৬৮-র র‍্যাডিকাল গণ-অভ্যুত্থান, যা কয়েক সপ্তাহের জন্য সফলতার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছিল, শিল্পীদের অগ্রগামী ভূমিকা পালনের একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল। ১৯১৯ সালে বার্লিন ডাডা ও ডের স্টুর্ম-এর পরে আর কখনো শিল্পীরা এই অবস্থানে পৌঁছতে পারেননি।

১৯৬৬-র নভেম্বরে সিচুয়েশনিস্টদের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী গ্রুপ স্ট্রাসবুর্গ ইউনিভার্সিটি দখল করে নিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে তিন সপ্তাহ ছিলেন এবং শহরের দেওয়ালগুলি ভরে দেওয়া হয়েছিল 'দি রিটার্ন অফ দি দরুত্তি কলাম'-এর মতো

কোলাজ করা কমিক স্ট্রিপস দিয়ে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বার্কলে থেকে সরবোন পর্যন্ত এর ফলে ছাত্ররা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কেই শুধু সচেতন হলেন না, শ্রমিকদের সঙ্গে একটা প্রকৃত মৈত্রীর সম্ভাবনাও স্পষ্ট হলো। ড্যানিশ চিত্রকর এ্যাসগার ইয়র্ন এবং কোবরা গ্রুপের অন্যান্য শিল্পীদের নিয়ে সিচুয়েশনিস্টরা প্রথমে একটি শিল্পভিত্তিক সামাজিক-রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। এবং তাঁরা শহরগুলির মানসিক ভূগোলের উপর গী দ্যবোর-এর কাজ ও 'স্পেকটাক্যুলার সোসাইটি'র উল্লেখযোগ্য সমালোচনার মতো কাজ করেছিলেন। ১৯৬৮ সাল নাগাদ বহু নাটকীয় বিভাজন ও বহিষ্কারের পর তাঁরা ধীরে ধীরে এক চরম এ্যানার্কো-কম্যুনিস্ট অবস্থানে পৌঁছেছিলেন: "একটা নতুন চেতনা ও নতুন মৈত্রীর মধ্যেই প্রকৃত পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে—সুপার মার্কেট, বীটক্লাব, এমনকি দোকানঘরে, দৈনন্দিন জীবনের ক্লিন্ন গতানুগতিকতায় সংগ্রামের অবস্থানকে খুঁজে নিতে হবে ··শিল্প ও শ্রমিক আন্দোলন মৃত! সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল দীর্ঘজীবী হোক!"

এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে ১৯৬৮-র মে-তে প্যারিসের ঘটনাবলীর প্রেরণা অনেকটাই এসেছিল সিচুয়েশনিস্টদের কাছ থেকে। অনেক ডিমনস্ট্রেশনকে তখন থেকেই পথ-নাটক হিসাবে ভাবা হয়েছিল এবং 'একোল দে বোজার'-এর ছাত্রদের ভূমিকাও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'দি লিমিটস অফ প্রটেস্ট' বইতে পীটার বাকম্যান এক ছাত্রের সঙ্গে কথোপকথনকে রেকর্ড করেছেন। তার বক্তব্য ছিল যে চিত্রকর ও ভাস্করের মধ্যে যেমন কোন ভেদাভেদ নেই, তেমনি শিল্পী ও অশিল্পীর মধ্যেও কোন প্রভেদ নেই: এসবই হচ্ছে বুর্জোয়া সিস্টেমের অন্তর্গত, যা তারা উৎখাত করেছে। ১৯৬৮-র বিদ্রোহ থেকে দুটি বিশিষ্ট আর্ট ফর্ম অবশ্যই বেরিয়ে এসেছিল: আতলিয়ে পপ্যুল্যার-এর পোস্টার ও গ্রাফিত্তি স্লোগান। ইংলিশ ফুটবল ফ্যান ও পথের মাস্তানদের প্রিয় এ্যারোসল স্প্রে-ক্যান মে-র বিপ্লবী ছাত্রদের হাতে হয়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী অস্ত্র। প্যারিসের স্যুররিয়ালিস্টদের অবদান ছিল এই স্লোগান—'বি রিয়্যালিস্টিক: ডিমান্ড দি ইমপসিবল'। নিও রিয়্যালিস্ট ধারায় কর্মরত তরুণ শিল্পীদের দলের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য ছিলেন জাঁ জাক ল্যাবেল। তাঁর প্রথমদিকের একটি হ্যাপনিং 'ফিউনারাল সেরেমনি অফ দি এ্যান্টি-প্রসেস'-এ (ভেনিস, ১৯৬০) দর্শককে সৎকার-অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট পোষাক পরে আসতে বলা হয়েছিল। বিরাট বাড়িতে উপযুক্তভাবে সজ্জিত একটি ঘরে উঁচু জায়গায় কাপড় ঢাকা একটি মনুষ্যশরীর রাখা ছিল। এরপর একজন হত্যাকারী এসে আনুষ্ঠানিকভাবে শায়িত শরীরে ছোরা মারে। মৃত্যুকালীন 'সার্ভিস' পাঠ করা হলো বেশির ভাগ উইসম্যা ও সাদ্-এর বই থেকে। বাহকেরা তারপর কফিনটি বয়ে নিয়ে গিয়ে গন্ডোলায় তুলল। সেই শরীর—যা আসলে ছিল ত্যাংলির একটি ভাস্কর্য, অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে খালের জলে বিসর্জন দেওয়া হলো। ল্যাবেল পরে প্যারিসে অনেকগুলি 'ফেস্টিভ্যাল অফ দি ফ্রি স্পিরিট' সংগঠিত করেছিলেন, যার

মধ্যে 'টু ইনভোক দি স্পিরিট অফ ক্যাটাস্ট্রফি' ( ১৯৬২ ) নামে একটি ঘটনাসংঘটনে তিনি আরো অনেক শিল্পীসহযোগে এক ভায়োলেন্ট সামাজিক, যৌন ও রাজনৈতিক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ল্যাবেল-এর প্রথমদিকের কাজের বৈশিষ্ট্য হলো ন্যুডিটি ও রাজনৈতিক উত্তেজনা : একটি অনুষ্ঠানে ছিল নগ্ন মেয়েরা ও রক্তে স্নাত কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের মাথা। সেই সময় আমার মনে হয়েছিল যে তিনি শুধুমাত্র নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যপ্রচারের মঞ্চ হিসাবে এই ফর্মটিকে ব্যবহার করছেন এবং মাধ্যমটিরও ক্ষতি করছেন—তিনি একসময় বলেছিলেন যে ভঁদোম কলাম ধ্বংসই কুর্বের সবচেয়ে ভালো কীর্তি—কিন্তু ১৯৬৮-র মে-তে তিনি নিজ সত্তায় ফিরে আসেন। প্যারিসের সবগুলি হ্যাপনিং-এই তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে এবং তিনি ও লিভিং থিয়েটারের জুলিয়ান বেক মিলে মুক্ত ওদেয় থিয়েটারকে সামাজিক ও শৈল্পিক বিতর্কের একটা মঞ্চ হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ বছরই জুলাই মাসে আভিঞঁ ফেস্টিভালে লিভিং থিয়েটারের উপর পীড়নের প্রতিবাদে তিনি জড়িত ছিলেন।

ল্যাবেল-এর কাজে তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাই প্রাধান্য পেয়েছে। ১৯৬৮-র মে বিদ্রোহের সময় ও তারপর থেকে তিনি পথে ও কারখানা গেটে এক অত্যন্ত র‍্যাডিকাল থিয়েটারের ফর্মে কাজ করে চলেছেন। আমাকে লেখা সাম্প্রতিক এক চিঠিতে এক ব্রিটিশ বিপ্লবী রাজনৈতিক গ্রুপ 'এ্যাংরি ব্রিগেড'-এর কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'তারা সম্পূর্ণতই সৃজনশীল এক শক্তি, তারা পুরনো পৃথিবীর চিতাভস্মের উপর নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছে'।

১৯১৯-এর বার্লিন ক্যাথিড্রাল ও মস্কোর পথ থেকে ১৯৬৮-তে আমস্টারডাম ও প্যারিসের রাস্তায় এবং ১৯৭০-র মেট্রোপলিটন মিউজিয়ম অফ আর্ট বন্ধের মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা মানুষের মন ও শরীর মুক্ত করার কিছু কিছু পথ দেখিয়েছেন। আঁদ্রে ব্রেত বলেছিলেন : আজকের প্রকৃত শিল্প বিপ্লবী সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে, তার মতোই ধনতান্ত্রিক সমাজকে সংশয় ও ধ্বংসের পথে তা এগিয়ে নিয়ে যায়।

জি. এ. এ. জি., ল্যাবেল, মোরিয়া, ফস্টেল, বারুচেল্লো, নিউক্যাসল গ্রুপের মতো শিল্পীদের কাছে শিল্প প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক এ্যাকশনের পরবর্তী স্থান নিয়েছে। কাপ্রো এবং ইয়র্কশায়ারের তরুণ পথশিল্পীদের কাছে শিল্প তখনই তাৎপর্যপূর্ণ যখন তা সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে। আবার অন্যেরা তাদের কাজের যাথার্থ্য খুঁজে পায় তাকে এক নতুন অযৌক্তিক কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক অনুসন্ধানের রূপ হিসাবে দেখে।

আগামীদিনে দৃশ্যশিল্পের ক্ষেত্রে বিকাশ যেমনই হোক না কেন, একথা মনে হয় নিশ্চিত যে মিউজিয়ম এবং হাতে-আঁকা মাস্টারপিসের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ইত্যাদি গোটা

বিষয়টাই শিল্পীদের এই প্রজন্মের কাছে ক্রমশই অবান্তর হয়ে পড়বে, যাঁরা সামাজিক অঙ্গীভবন ও আদানপ্রদানের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যে পুনরায় ফিরে গেছেন। □

সংযোজনা : ১

# আমাদের স্বপ্নের মিউকাস মেমব্রেন

সংমি ম্যাসাকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ একটি পোস্টার ( Q. And babies ? A. And babies. ) প্রথমে মিউজিয়ম অফ্ মর্ডান আর্ট (MOMA) এবং আর্ট ওয়র্কর্স কোয়ালিশনের (AWC) তরফে যৌথ উদ্যোগ হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল। নভেম্বরের ২৫,১৯৬৯, এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রায় তিনসপ্তাহ টানা কাজ করার পর কালার প্লেট তৈরি করে যখন ছাপার প্রস্তুতি চলছে, তখন হঠাৎই মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ যাবতীয় দায়িত্ব অস্বীকার করে, এবং সরে দাঁড়ায়, যদিও মিউজিয়ম-কর্মচারীদের অধিকাংশের সমর্থন ছিল AWC-র দিকে। প্রকৃতপক্ষে, AWC চেয়েছিল MOMA-র সংগঠিত বিলিব্যবস্থার সুযোগ নিতে, প্রস্তাব-মোতাবেক এবাবদে MOMA-র প্রাপ্য সার্ভিস চার্জও বরাদ্দ ছিল। অতঃপর MOMA-র নাম ও বিলিব্যবস্থার সুবিধাসহযোগ ছাড়াই AWC ৫0,000 পোস্টার ছেপে বিনামূল্যে শিল্পী, ছাত্র ও পীস মুভমেন্ট কর্মীদের সহায়তায় গোটা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে দেয়। AWC-র মতে, MOMA-কর্তৃপক্ষের আচরণ সংস্থাটির অবক্ষয় এবং/অথবা নপুংসকতার ( তিক্ত ) প্রমাণ।

## ১৯৭০-এর ৩রা জানুয়ারি 'গ্যের্নিকা'র সামনে আর্ট এ্যাকশন

### □ উদ্দেশ্য

সংমি ও সংমিতে নিহত সকল শিশুদের উদ্দেশে পিকাসোর গ্যের্নিকার সামনে স্মৃতি-তর্পণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন কোন পুরোহিত বা চার্চের কেউ। ছবির সামনে ফুল ও মালা রাখা হবে। সকল শিশুর প্রতীক হিসাবে একটি জীবন্ত শিশুর অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ।

### □ বিবরণ

১৯৭০-এর ৩রা জানুয়ারি শনিবার ঠিক দুপুর একটার আগে জি. এ. এ. জি ; ডি. আই. এ. এস ও এ. ডব্লিউ. সি-র সদস্য, অভিনেতা ও দর্শকরা মিউজিয়ম অফ মর্ডান আর্ট অফ নিউ ইয়র্কে ঢুকে পড়ে ও চারতলায় পিকাসোর 'গ্যের্নিকা' ছবির সামনে জমা হয়।

কিছু শিল্পী লুকিয়ে মালা ও ফুল নিয়ে ঢুকেছিলেন। একটার সময় গেরিলা আর্ট এ্যাকশন গ্রুপের সদস্যারা ধীরপায়ে গ্যের্নিকা ছবির সামনে এগিয়ে গেলেন ও ছবির নিচে দেওয়ালে চারটি মালা স্থাপন করলেন। এই সময় জরেস কোজলফ তাঁর আট-মাসের শিশু নিকোলাসকে নিয়ে মালাগুলির সামনে মাটিতে বসলেন। ফাদার স্টিফেন

গারমে এলেন ও মৃত শিশুদের স্মৃতির উদ্দেশে সার্ভিস পাঠ শুরু করলেন। পাঠ চলাকালীন ছবিটির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষীদের মধ্যে একজন মিসেস কোজলফ ও শিশু নিকোলাসের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, তিনি শিশুকে নিয়ে মেঝের উপরে বসে থাকতে পারবেন না। ভদ্রমহিলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ভান করলেন। অনেকক্ষণ বিরক্ত করার পরে রক্ষীটি অবশেষে মিসেস কোজলফের হাত চেপে ধরলে তিনি শিশুটিকে তুলে নিয়ে সার্ভিস পাঠের বাকি সময় ছবির সামনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফাদার গারমে তাঁর পাঠ শেষ করলে বহু লোক, এমনকি সমবেত শিশুরাও এগিয়ে এসে ছবির নিচে ফুল ও মালা রাখলেন। মৃত শিশুদের স্মৃতিতে সার্ভিস পাঠ চলাকালীন সর্বক্ষণ জনতা শান্ত ও শ্রদ্ধাবনত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

## □ ফাদার স্টিফেন গারমে রচিত ও পঠিত সার্ভিস

যীশু তাহাদের আপনার নিকটে ডাকিলেন ও বলিলেন, শিশুদের আমার নিকটে আসিতে দাও ; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ইহাদের জন্যই।

প্রেয়ার বুক পৃ. ৩৩৬

একটি ছোট ছেলে বিহ্বলভাবে আমাদের দিকে হেঁটে আসছিল। তার হাতে ও পায়ে গুলি করা হয়েছে। সে কাঁদছিল না বা কোন শব্দ করছিল না। একজন জি. আই. তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল ও তার দিকে উপর্যুপরি তিনবার গুলি ছুঁড়ল। প্রথম গুলির ধাক্কায় সে পিছন দিকে হেলে গেল, দ্বিতীয় গুলি তাকে মাটি থেকে শূন্যে উঠিয়ে নিল, তৃতীয় গুলিটি তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। তার শরীর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে তখন, জি. আই.-টি স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে চলে গেল।

লাইফ, ডিসে. ৫, ১৯৬৯

ঈশ্বর স্বয়ং তোমার রক্ষক ; তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিতেছেন ; যাহাতে সূর্য তোমাকে দিবসে বা চন্দ্র রাত্রিকালে দগ্ধ করিতে না পারে। ঈশ্বর তোমাকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করিবেন ; হ্যাঁ, তিনিই তোমার আত্মাকে রক্ষা করিবেন। ঈশ্বর এখন হইতে চিরকালের জন্য তোমার গমন-আগমন রক্ষা করিবেন।

সামস্, ১২১ : ৫

তখনই যীশুর নিকট শিষ্যরা আসিল ও জিজ্ঞাসা করিল, ঈশ্বরের রাজ্যে সব থেকে বড় কে ? যীশু একটি শিশুকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন ও তাহাকে তাহাদের মাঝে স্থাপন করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যদি তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতো না হইতে পার, তবে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ম্যাথু : ১৮

সেখানে একটি তিন/চার বছরের ছোট ছেলে ছিল। এক হাত দিয়ে সে গুলি লাগা অন্য হাতটি চেপে ধরেছিল কিন্তু তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সে

চক্ষু বিস্ফারিত করে চারদিকে দেখছিল, যেন সবকিছুই এখন তার বোধের বাই
আর তখনই রেডিয়ো অপারেটর তার শরীরে এম-১৬-র আগুন পুরে দিল।
লাইফ, ডিসে, ৫, ১৯৬৯
ঈশ্বর স্বয়ং তোমার রক্ষক ··

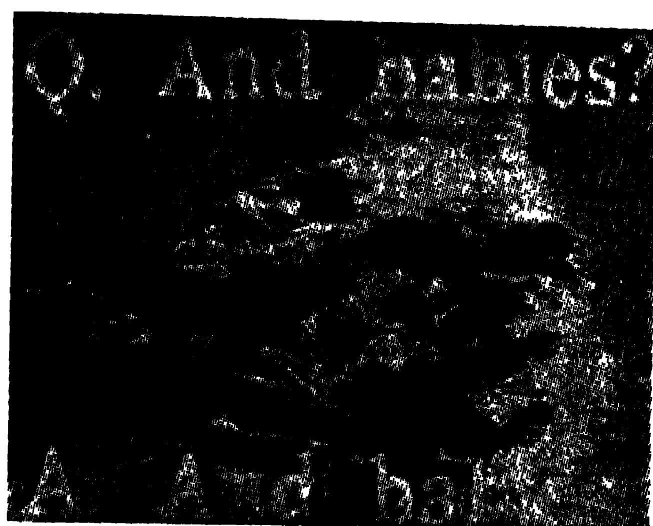
তখন হেরড, যখন তিনি দেখিলেন যে তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিদ্রূপের পাত্র হই
ছেন, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও বেথলেহেম ও তার সকল উপকূলবর্তী অঞ্চলে দুই বৎ
বা তৎনিম্নের, যে সময়কাল তিনি অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞানীদের নিকট হইতে জানি
লইয়াছিলেন, সকল শিশুকে হত্যা করাইলেন। তখন প্রফেট জেরেমির ভবিষ্যদ্বাণী পূ
হইল, যিনি বলিয়াছিলেন রামাতে ক্রন্দন ও গভীর শোকের ধ্বনি শ্রুত হইয়াছি
রাশেল তাহার সন্তানদের জন্য কাঁদিতেছিল ও কোন কিছুতে সুখী হইতেছিল ন
কারণ সন্তানেরা তাহা ছিল না।
ম্যাথু : ২
গ্রামের ঠিক বাইরে মৃতদেহের এই পাহাড় পড়েছিল। একটি অত্যন্ত বাচ্চা ছেলে
যার গায়ে শুধু একটি শার্ট ছিল/আর কিছুই নয়/সে এই স্তূপের কাছে এল এব
মৃতদের একজনের হাত ধরল। জি. আই.-দের একজন হাঁটু গেড়ে বসল এবং এক গুলিতে
তাকে হত্যা করল।
লাইফ, ডিসে. ৫, ১৯৬৯
ঈশ্বর স্বয়ং তোমার রক্ষক···

এই বিষ নিঃশ্বাসে পুরেছি আমরা, সারাজীবন,
আমাদের ফুসফুস ক্ষতবিক্ষত,
আমাদের স্বপ্নের মিউকাস মেমব্রেন
চাপা পড়ে গেছে, কল্পনা আমাদের
ঢেকে গেছে তার নোংরা ধূসর পর্দায় :

এই জ্ঞান, যে মানুষ নামক প্রাণী,
স্পর্শপ্রবণ মানুষ, যার শরীর
শিহরিত হয় চুম্বনে, চোখ যার
পুষ্প, এমন যা নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যকে প্রত্যক্ষ করে,

যার সংগীত সুন্দর পাখির গানের চেয়েও,
যার হাসি কুকুরের হাসির সমকক্ষ,
যার বুদ্ধি এমন পরিকল্পনা গড়ে
মাকড়সার জটিলতম জালের থেকেও যা উন্নত,

সেই মানুষ বিস্ময়হীন, শুধুমাত্র অনুতাপ নিয়ে দেখে


Q. And babies?
A. And



দুগ্ধপূর্ণ বক্ষ নিয়মিত ছিঁড়ে যায়, যায় দুধ
জীবন্ত শিশুর অন্ত্রনালীর উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়
প্রত্যক্ষকারী চোখ রূপান্তরিত হয় নরম ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরোয়,
শবময় অন্ধকার স্তূপে পুরুষাঙ্গ বিক্ষত হয়ে থাকে ।

ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন ।
ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন ।
ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন ।

গেরিলা আর্ট এ্যাকশন গ্রুপ / জন হেনড্রিকস, পপি জনসন, জাঁ তোশ । □

সংযোজনা : ২

# গুস্তাভ মেৎসগার

# স্বয়ংবিনাশী শিল্পের তিনটি ইস্তাহার

স্বয়ংবিনাশী শিল্প হলো প্রাথমিকভাবে শিল্পোন্নত সমাজের জনতার শিল্প ।

স্বয়ংবিনাশী ছবিভাস্কর্য ও নির্মাণ হচ্ছে বিযুক্তি বা বিশরণ প্রক্রিয়ার সময়াঙ্ক ও পদ্ধতি, গঠন, রঙ, পরিবেশ ও ভাবনার এক সামগ্রিক ঐক্য ।

এই শিল্পকাজ প্রাকৃতিক শক্তি, ঐতিহ্যানুসারী শিল্পপদ্ধতি বা আধুনিক প্রযুক্তি-লব্ধ বিবিধ উপায়ে সৃষ্ট হতে পারে ।

স্বয়ংক্রিয় ধ্বংসের ক্রিয়াপদ্ধতি জারি থাকাকালীন তার কয়েকগুণ বর্ধিত শব্দধ্বনি সামগ্রিক ভাবনার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ।

শিল্পী স্বয়ং এক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারেন ।

স্বয়ংবিনাশী শিল্পকর্মের জীবৎকাল কয়েকমিনিট থেকে বেশির বেশি কুড়ি বছর পর্যন্ত হতে পারে । ধ্বংসবিভক্তির এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে কাজটিকে অন্যত্র সরিয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলাই ভালো ।

লন্ডন ৪.১১.৫৯

□

রিজেন্ট স্ট্রীটের সমস্ত লোকই আত্মধ্বংসী, স্বয়ংবিনাশী ।
রকেট, বা পারমাণবিক সমরাস্ত্র—সবই স্বয়ংবিনাশী ।
স্বয়ংক্রিয় ধ্বংসের শিল্প ।
হাই হাই হাইড্রোজেন বোম···পড়ল···পড়ল···এই পড়ল বলে ।
যেখানেই ধ্বংসস্তূপে আমরা আর উৎসাহী নই ।

স্বয়ংবিনাশী শিল্প ব্যক্তিমানুষ ও সমষ্টি যে-ধ্বংসপ্রবৃত্তির ছন্দতালে বশীভূত, তাই নতুন করে প্রতিষ্ঠাপিত করে ।

ধ্বংসের স্বয়ংক্রিয়া দেখায় যে মানুষ প্রকৃতির অন্তর্গত বিভক্তিপ্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত করতে পারে এবং আরো শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলতে পারে।

স্বয়ংবিনাশী শিল্প সমরাস্ত্র নির্মাণের বাধ্যতামূলক উৎকর্ষসাধন এবং অন্তিম ধ্বংসের দিকে তার ক্রমকুশলতা প্রায় আয়নার মতো প্রতিফলনে সাহায্য করে।

স্বয়ংবিনাশী শিল্প হলো প্রযুক্তিবিদ্যার জনতার শিল্পে ক্রমরূপান্তরের কাহিনী। একদিকে প্রচন্ড উৎপাদনক্ষমতা, ধনিকতন্ত্র ও সোভিয়েত সাম্যতন্ত্রের তুমুল বিশৃঙ্খলা, উদ্বৃত্ত ও উপবাসের বিধুর সহাবস্থান, ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সমরসজ্জা—এ সবই প্রযুক্তিনির্ভর এই সমাজ ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। ব্যক্তির জীবনে সর্বত্র যন্ত্রপাতি ও জীবনের ক্রমবর্ধমান বিযুক্তির প্রভাব ও পরিণতি—

স্বয়ংবিনাশী শিল্পকর্মের ভেতরেই রয়েছে সেই বীজ, যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এক নির্দিষ্ট সময়ের ঘেরে ( সর্বাধিক ২০ বছর ) আপনাআপনি ধ্বংস হয়ে যায়।

এ কাজের অন্যরূপও থাকতে পারে, যেখানে মানুষী নিয়ন্ত্রণই প্রধান। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভক্তি বা বিশরণক্রিয়ার প্রকৃতি ও সময়ের ওপর শিল্পীর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ হতে পারে অনেক শিথিল।

লন্ডন ১০ মার্চ '৬০

□

**স্বয়ংবিনাশী শিল্প**

**যন্ত্র শিল্প**

**স্বয়ংসৃষ্টির শিল্প**

প্রত্যেক চাক্ষুষ ঘটনাই চূড়ান্তভাবে তার আনুপূর্ব বাস্তবতা প্রকাশ করে।

কোন কোন যন্ত্রোৎপাদিত গড়নই এযুগের সবচেয়ে নিখুঁত গড়ন।

সন্ধ্যেবেলা সোহো-র রাস্তায় রাস্তায় স্তূপীকৃত পড়ে থাকে এযুগের অসাধারণ সব সুন্দর ছবি।

স্বয়ংসৃষ্ট শিল্প হলো পরিবর্তনের শিল্প, বৃদ্ধি ও গতিধর্মের শিল্প।

স্বয়ংধ্বংসী ও স্বয়ংসৃষ্ট শিল্প বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির সঙ্গে শিল্পের সংহতি কামনা করে।

আশু উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনমতো কম্পিউটারের সাহায্যে সেই শিল্পের সৃষ্টি, যার গতিপ্রকৃতি প্রাক্‌নির্দিষ্ট এবং কখনো সেখানে 'আত্মনিয়ন্ত্রণে'র অবকাশও বজায় থাকে।

দর্শক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এইসমস্ত কাজের অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতার এক চাক্ষুষ উপলব্ধির শরিক হতে পারেন।

স্বয়ংবিনাশী শিল্প পুঁজিতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পারমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সরাসরি, প্রত্যক্ষ আক্রমণ রচনা করে।

২৩ জুন, ১৯৬১

# ফ্রান্স ও মোদকনের ছাত্রবিপ্লব

## কথাভায্যের হাতিয়ার

নামহীন চিরকুট, পোস্টার—এই অসংখ্য দেওয়ালের লেখা, পথচলতি শব্দ, কথ্য-শব্দ, অজস্র এইসব লিফলেট, বুলেটিন, ঠেকের ভাষা, মুখের ভাষা, চটজলদি প্রতি-ক্রিয়ার ভাষা—এই অনন্ত শব্দঅক্ষরবিন্যাসের কারুকাজ আদৌ কোন কাজে লাগবে ভেবে তৈরি নয়। কার্যকর হোক বা না-হোক, সেসবই আজ, এই মুহূর্তের সিদ্ধান্ত। কখনো তা ভেসে ওঠে, সৃষ্টি হয়, অকস্মাৎ মুছে যায়, স্মৃতি পুরো লোপাট হয়ে যায়। সব কথাই বলা হয় না এখানে, বরং উল্টে সমূহ ধ্বংসের বাণীই শোনা যায়। প্রচল বিষয়জগতের বাইরে কাজের সূচনা হয়, কাজের প্রকাশ এখানে ছাড়াছাড়া, খণ্ডিত, হয়তো বা রীতিবহির্ভূত। এসবের কোন স্মৃতিচিহ্ন পড়ে থাকে না, এমনকি আঘাতেরও কোন চিহ্ন থাকে না আর। ধরা যাক দেওয়ালের লেখা কথা স্লোগান…নিরাপত্তা-হীনতার মধ্যেই তা রচিত হয়, বিপদের বার্তাই তা বহন করে গর্ভে, আতঙ্কের পরিবেশেই ঠাঁই পায় লোকহৃদয়ে। তারপর পথচলতি মানুষজনের সঙ্গেই তা চলতে শুরু করে, এক হাত থেকে অন্য হাত, কখনো তা হারিয়ে যায়, বিস্মৃতির গভীরে ডুবে যায় ক্রমে।

অক্টোবর, ১৯৬৮, 'কমিতে', আন্দোলনের স্বার্থে ছাত্র ও লেখকদের অ্যাকশন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন সংখ্যা ১।

### □ প্রেক্ষাপট

১৯৪৭-এর মে মাসে সরকার থেকে কম্যুনিস্টদের বিদায়ে ফরাসি সমাজ রাজনৈতিক-ভাবে স্থিতিশীল হলো। এবং ১৯৫৩-র বিশাল ধর্মঘটের পর অর্জিত সামাজিক স্থিতি-ভাবনায় প্রথম অস্থিরতা দেখা গেল আলজেরিয়ার যুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স, প্রজা-তন্ত্রের নামে তার সম্প্রসারণবাদী দেশপ্রেমিক মনোভাব আর 'স্বাভাবিক' আরববিরোধী বিষমভাবনার বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার চ্যালেঞ্জ—না, তার কোন উত্তর ছিল না। নীতিধর্ম ও রাজনৈতিক বৈধতার গভীরতর সংকট, যুদ্ধের সময়ে যা প্রকট হয়ে উঠেছিল, শুধু দ্যগলের রাষ্ট্রনীতি, মানে প্রতিষ্ঠানের সেই সংরক্ষিত শক্তিকেই সাহায্য করল। অর্থনীতি ও আদর্শভাবনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন রক্তসঞ্চারে প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যস্ততা ছিল না, বরং ইচ্ছাকৃত দেরির ফাঁস চেপে বসল ফ্রান্সে। তথাপি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে গোপন প্রচার বন্ধ করা যায়নি, ফরাসি সমাজের এক নতুন প্রজন্ম শব্দে-শব্দে অলিগলি রাস্তা রাজপথে সে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তরুণ ক্যাথলিক ও কম্যুনিস্ট বুদ্ধিবিদের এই যুদ্ধবিরোধী দিকদর্শন অবশ্য সাধারণ নীতিভাবনা ও রাজ-নৈতিক পুনর্মূল্যায়নে খুব একটা উৎসাহিত করেনি সকলকে।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ্ ফ্রেঞ্চ স্টুডেন্ট (UNEF)—পঞ্চাশ ও ষাট দশকের নীতি-

আদর্শহীন ফরাসি সমাজে ক্রমে এক বিচিত্র বিস্ফোরক ধারণায় স্বশিক্ষিত বিচ্ছিন্ন এক উপদ্বীপে পরিণত হলো। ১৯৬০-এ দেখা গেল তৎকালীন ফ্রান্সের দু'লাখ ছাত্রছাত্রীর অর্ধেক অংশই UNEF-এর কার্যক্রমে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ। ১৯৫৪ থেকেই ফ্রান্সে মে-দিবস উদ্‌যাপন ও সমাবেশ-অনুষ্ঠান কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—প্রথমত আলজেরিয়ার যুদ্ধ তার কারণ এবং দ্বিতীয়ত, বিলম্বিত হলেও দেশে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের জোয়ার—তার সঙ্গে জোড় মিলিয়েছিল জীবনজীবিকার আপেক্ষিক মানোন্নয়ন এবং বামপন্থী দলসমূহের ক্রমাবনতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছাত্রমহল থেকে শুরু করে কৃষিজীবী সমাজ এবং পুরনো কলকারখানার জগত আধুনিকতার বিজ্ঞানপ্রযুক্তি আদৌ সমর্থন করেনি। দ্যগলের শাসনযন্ত্র, তখন ঐতিহ্যবন্ধন ও যৌক্তিক ক্রমপরিণতির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত, ১৯৬৩-তে খনিশ্রমিকদের ধর্মঘটে তার প্রথম প্রকৃত সামাজিক দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করল। দ্যগল ক্রমে তার শ্রমিকশ্রেণীর ভোট হারাতে থাকলেন। ১৯৬৩-র পর বামপন্থী ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন UNEF আরো জঙ্গী র‍্যাডিকালদের হাতে চলে গেল। শিক্ষাক্রমের আদর্শবস্তু এবং পদ্ধতির আধিপত্যকামী ধারা নিয়ে ছাত্ররা তখন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। তবু আলজেরিয়ার যুদ্ধ ও খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে ১৯৬৬/৬৮'র ভিয়েতনাম চাঞ্চল্যের আগে পর্যন্ত সামাজিক উদাসীনতা কাটেনি। মোটা সমাজের বুকে চেপে-বসা স্ট্যাটাসের স্থিতিবন্ধন নিয়েই তারপর আদত প্রশ্নটা সামরিক করলেন ছাত্রনেতারা, সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাভূমি পুনরায় খুলে দিলেন তারা, সংসদীয় খোরাক পেরনোর কথা বললেন, বললেন কীভাবে রাজনৈতিক চাপসৃষ্টির নিষ্ফলা রক্ষণশীল এলাকা অতিক্রম করে যেতে হবে।

ডিসেম্বর, ১৯৬৫, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্যগল পুনর্নির্বাচিত হলেন। মার্চ ১৯৬৭-তে আইনসভা নির্বাচনের পর থেকে দ্যগলপন্থীরা ক্রমে সংসদের বাইরে যত ডিক্রি, 'বিশেষ ক্ষমতা' আর সামাজিক নিরাপত্তার হাজারো বিধিনিয়মের ফাঁকে শাসন চালাতে শুরু করল। সামাজিক মজুরি কমল, কাজের সময় ও মজুরি কমার সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই শুরু হলো, মালিকপক্ষ কাজের পরিবেশ বদলাতে অস্বীকার করল। কৃষক পরিবার থেকে আগত শ্রমিকশ্রেণীর নবপ্রজন্ম এবং সদ্য স্কুলপাশ ছাত্রে শ্রমিকবাজার বেড়ে গেল, এবং তারাই এ দুর্যোগে সবচেয়ে কষ্ট পেল, কেননা '৬৬/৬৭-র মধ্যে বেকারের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণে পৌঁছেছে। তরুণ শ্রমিকরা সহিংস ধর্মঘটের ডাক দিলেন, এবং যেহেতু তারা ক্ষমতার প্রতীক চেম্বার অফ কমার্স আর যত আধিকারিক দফতর সরকারি আক্রমণ করলেন, ঘটনার শেষ হলো পুলিশের সঙ্গে হিংস্র লড়াইয়ে।
১৯৬৭-তে '৬৬-র তুলনায় ৩০ শতাংশ ধর্মঘট বেড়েছে। র‍্যাডিকাল ছাত্রের দল তখন মত বিরোধে স্বাধীন যৌন আচারধর্মে, ভিয়েতনামী জনগণের সঙ্গে তারা মনেপ্রাণে ঐক্যশক্তি অনুভব করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব তারা আগেরই যুবশ্রমিকসম্প্রদায়ের নব্য শিকড়চেতনায় সাড়া দিলেন।

## □ মে মাসের আন্দোলন

ছাত্র ও তরুণশ্রমিকদের র‍্যাডিকাল মেজাজ ক্রমে সমস্ত স্বীকৃত প্রতিনিধিসমিতি থেকে তাদের সরিয়ে আনল। শাসনতন্ত্র আর তার অনুগত বিরোধীরা সমস্যার আশু গুরুত্ব বুঝলই না, উল্টে সংগঠিত প্রথম প্রকাশ্য ঘটনাক্রিয়ায় সাড়া দিল জান্তবমুখে। তথাকথিত রাজনীতিবিদের গন্ডারের চামড়া উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ, রেজি দ্যব্রে-র জেল বা চে গ্যেভারার হত্যায় (৩ অক্টোবর, ১৯৬৭) এতটুকু কাঁপল না, এমনকি ছাত্রজীবনে মানসবিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাকেও তাদের চোখ খুলল না। বামপন্থী ছাত্রদের পুরনো আলজেরীয় প্রজন্ম বা '৬৫-র প্রজন্ম UNEF-এর আনুবীক্ষণিক জগত থেকে বেরিয়ে নব্য পপ-প্রজন্মের উদ্বেগে সাড়া দিল, আকৃষ্ট হলো সিচুয়েশনিস্টদের বৌদ্ধিক শূন্যসংকেতে।

ন্যাতের-এর ঘটনাক্রম '৬৬-র মার্চে যৌন স্বাধীনতার সপক্ষে প্রচার দিয়ে শুরু হয়ে '৬৮-র মার্চ-এপ্রিলে চূড়ান্তে পৌঁছল, যদিও তার অধিকাংশ তখনও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সরবোনের দুর্গপ্রাচীর পেরিয়ে তার প্রতিধ্বনি ছাত্রদের কানে পৌঁছয়নি। জাতীয় ছাত্র- রাজনীতিতে '৬৮-র ২২ মার্চ আধিপত্যবিরোধী ফেডারেশন নামে আপন গোষ্ঠী স্থাপনার আগে ন্যাতের-এর কোন ভূমিকাই ছিল না। পারির জঙ্গী ছাত্ররা ন্যাতের-সমস্যা আবিষ্কার করল ২৯ মার্চ, যেদিন থেকে ফ্যাকাল্টির বন্ধ দরজার সামনে গণ-অবস্থান শুরু হলো, 'সমালোচনামূলক বিশ্ববিদ্যালয়ে'র ধারণা তখন আরো দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ততদিনে ইস্টারের ছুটি পড়েছে, পারির ছাত্রদল খেয়ালই করল না '৬৬-র মার্চ-আন্দোলনের প্রবক্তা ড্যানিয়েল কোন-বেন্ডিট ১২ এপ্রিল কীভাবে তার একদিন আগে গুলির আঘাতে নিহত রুডি ডুচ্কে-র স্মরণ-সহযোগ সমাবেশে গোটা বামপন্থী ছাত্রদলের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন। ইস্টারের পর ২রা মে ন্যাতের আবার বন্ধ হলো। তার আগে দীর্ঘদিন পর পারি-তে মে দিবস উদযাপিত হলো সাফল্যের সঙ্গে। ৩ রা মে, পুলিশ যখন সরবোন আক্রমণ করল এবং সে-ও বন্ধ হলো, পারির সমাবিষ্ট ছাত্রসমাজ রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল, বিতাড়িত তারা সমস্ত রাস্তা অধিকার করে নিল, আবিষ্কার করল ন্যাতের-এর ঘটনাবলী, পুলিশী সন্ত্রাসের চিহ্ন, তারা দেখল প্রাতিষ্ঠানিক দমনলীলার স্বরূপ, লক্ষ করল ফ্যাসিস্ট শাসনদণ্ড উঁচিয়ে রয়েছে ( সরবোনের UNEF দপ্তর তখন ভস্মীভূত ) ; হ্যাঁ তারা লড়ল, স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই।

তরুণ শ্রমিকেরা ছাত্রদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলো, যাদের প্রতিদিনের বিক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর ছাপিয়ে উথলে উঠছিল। জনমত পুলিশী তান্ডবের বিপক্ষে রায় দিল। ছোট ছোট সংগঠন গড়ে উঠছে আপন তাগিদে, পথে পথে রচিত হচ্ছে ব্যারিকেড। ১০ মে: সরবোন সংলগ্ন সাঁশিয়েরের সেন্টার দখল করে নিল ছাত্ররা, স্ত্রাসবুর্গ ইউনিভার্সিটি স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করল। প্রধান প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে একজোট, উচিতমতো মজুরিবৃদ্ধির দাবি জানানো হলো।

১৩ মে-২৩ মে: পারি-তে কট্টর দ্যগলবিরোধী প্রায় ছ'লাখ মানুষের সমাবেশ, একদিনের সাধারণ ধর্মঘট। প্রথম কারখানা দখল। ওদেয় থিয়েটার দখল করে নাগরিক বিতর্কের মুক্তক্ষেত্র চালু করা হলো। বহু শ্রমিক, এমনকি সাদা উর্দির চাকুরিজীবীরাও ধর্মঘটে অংশ নিল সহমর্মী বোধে। ২০শে মে স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ হলো, ২২শে দেখা গেল প্রায় ৯ মিলিয়ন লোক ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।

## □ লিফলেট গ্রাফিতি দেওয়ালের পোস্টার

ছাত্রদের লিফলেট স্বভাবতই ভঙ্গি ও মেজাজে, এমনকি আদর্শগত সূত্রনিশানায় অনেক বিস্তৃত, কেননা ছাত্র আন্দোলন পেশা বা বৃত্তিগত কাজের সম্পর্কসমূহ এবং কর্মক্ষেত্রজ মাত্রা-আয়তনে তত উৎসাহী নয়। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে গ্রাফিতি বা দেওয়াল-লিখনের তুলনায় সেসব অনেক বর্ণহীন, অনেক দূরবর্তী। রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের অনুপ্রাণিত ভাষ্য প্রায় সম্পূর্ণত ঝরে পড়েছিল দেওয়ালে প্রাচীরে। ১৬ মে-র আগে পর্যন্ত দেওয়ালের সেইসব লিখন ছিল কখনো সিচুয়েশনিস্ট 'লেত্তরিস্ত্' ধারার, কখনো ডাডাইস্ট বা স্যুররিয়ালিস্ট রক্ত প্রবাহিত সেখানে।

কোন কোন লিখন আবার লিফলেট আকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন অষ্টাদশ শতকের ক্যাথলিক যাজক মেসলিয়েরের বিখ্যাত উক্তি অনুসরণে: "যদ্যপি না শেষতম আমলাটিকে (স্বৈরাচারীর পরিবর্তে) শেষতম ধনিকটির (যাজক পুরোহিতের বদলে) স্নায়ুতন্তু দিয়ে গলায় ফাঁস বেঁধে ঝোলানো যাচ্ছে, ততদিন মানবজাতি সুখী হবে না।" ২৯ মার্চ '৬৮ কম্যুনিস্ট পার্টির দৈনিক কাগজে তাদের ধিক্কার দেওয়া হলো, যারা বড় বড় হরফে ফ্যাকাল্টির সামনের দেওয়াল নষ্ট করেছে, লিখেছে "কোন কাজ কোরো না" এবং বিস্ময় প্রকাশ করা হলো যে কীভাবে ছোট্ট একটা দল প্রায় ১৬০০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এরকম কঠিন দায়বোধের আঁচ উসকে তুলল। গ্রাফিতি আর লিফলেটের অন্তর্বর্তী একটা পর্যায় ছিল দেওয়ালনামার—সাধারণ ছাপা পোস্টার থেকে শিল্পোত্তীর্ণ প্রাচীরনামা, কখনো জঙ্গী সাময়িকপত্রের ছেঁড়া পৃষ্ঠাও দেওয়ালে সাঁটা হয়েছে, আজ আর সামান্য কিছু ফটোগ্রাফ ছাড়া তার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু দেওয়ালের লেখাই হোক বা চিরকুট পোস্টার—প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়তার আহ্বানই শেষপর্যন্ত বড় কথা, সময়ের জরুরি তাগিদ ও তৎপরতার স্নায়ুস্পন্দনই সেখানে প্রধান। শব্দ-বাক্যে আগুন ধরে গেছে তখন, ছোট ছোট চিরকুট, কী অমিত শক্তি তার, অমেয় সম্ভাবনার 'চারিত্রলিপি সাদা কাগজ রাঙিয়ে তুলেছে, যেন নৈশ প্রজাপতির উড্ডীন ডানা গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়ানো সেখানে'।

## □ বিভিন্ন দলিল

রিভল্যুশনারি অ্যাকশন কমিটি, ছাত্রদের বিপ্লবী আন্দোলনের জঙ্গী কর্মীদের সঙ্গে একযোগে এক্স-থিয়েটার দ্য ফ্লাঁস আক্রমণ করে তা এক স্থায়ী খোলামেলা সভাগৃহে রূপান্তরিত করেছে। এ হলো ১৭/১৮ মে-র রাত্রে প্রকাশিত এক বুলেটিনের প্রতিক্রিয়া, যেখানে অভিনেতা, ছাত্র ও শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত এক দখলদারি সমিতির হাতে দীর্ঘ-

স্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রয়োগের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। সমিতির রাজনৈতিক দিশা 'কমিতে দা'কশিয় রিভল্যুশন্যার' বা CAR-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে যুক্ত। এ কথা বোঝা দরকার যে দখলদারির লক্ষ্যউদ্দেশ্য আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে, যথা :

যা কিছু 'সাংস্কৃতিক' : থিয়েটার বা শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি (দক্ষিণ বা বামপন্থী, সরকারি পক্ষের বা আভাঁগার্দ)—তার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতে জড়িয়ে পড়া—এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগ্রামকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সংস্কৃতির সঙ্গে, বিশেষত বিনোদন-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত যে কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক অন্তর্ঘাত জারি রাখা, এবং প্রকৃত অর্থে যা জনগণের, তাই দিয়ে বিকল্প প্রতিস্থাপন করতে হবে।

সমস্ত মনোশরীরশক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করুন। বিপ্লবী আন্দোলন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পথসমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতে থাকুক। বিপ্লবী শ্রমিককর্মী, ছাত্র এবং শিল্পীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলুন।

সরাসরি, প্রত্যক্ষ অ্যাকশনের পরিধি ও ক্ষেত্র বাড়াতে হবে। যেমন, যত বেশি সম্ভব কাজের জায়গা দখল করুন, স্লোগান ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তসমূহ সর্বত্র ছড়িয়ে দিন।

থিয়েটারের ক্ষেত্রে সামান্যতম প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিয়ম বা আইনী অধিকারের সীমাচিহ্নিত কাজ অথবা বৈপ্লবিক প্রতিরোধ-উন্মাদনার সামান্যতম শিথিলতাও ব্যারিকেড থেকে ব্যারিকেডে জনগণ যে-গতিধর্মে এগিয়ে চলেছে, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে। এক্স-থিয়েটার দ্য ফ্রাঁসে আর কখনো কোন প্রবেশমূল্য থাকবে না। জরুরি পরিস্থিতিতে দখলীস্বত্ব কায়েমের নাট্যক্রিয়া প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজের মর্যাদা পেয়েছে।

কমিতে দা'কশিয় রিভল্যুশন্যার বর্তমান দখলদারি সমিতির প্রতি তার সহমর্মিতা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে···এখন থেকে নাট্যশালায় যে এ্যাকশন প্রকাশ্যে সংগঠিত হবে, তা হলো গেরিলা অ্যাকশন।

**বিপ্লবী শিল্পকাজ অলিগলি রাস্তাঘাট জনপথের মহান সম্পদ।**

**রিভল্যুশনারি এ্যাকশন কমিটি অফ্ দি এক্স-থিয়েটার দ্য ফ্রাঁস, ১৭ মে ১৯৬৮**

## ☐ দ্বিতীয় দলিল

উডেন শোর্ড থিয়েটারে একটি সাংস্কৃতিক এ্যাকশন গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—১৯৬৮-র বসন্তকালীন ঘটনাক্রিয়ার অন্তর্গত ম্যুফেতার জেলার রাজনৈতিক জীবনে তা নিয়মিত অংশ নিচ্ছে।

উডেন শোর্ড থিয়েটারের এই পরীক্ষামূলক প্রয়োগচেষ্টা বস্তুত একাধিক উপলব্ধির

ফল। সংস্কৃতি সর্বদাই লোকসক্রিয়তার বিষয়, আজকের দিনে তা প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ-সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত।...যখন ছাত্ররা এবং কোম্পানি রিপাবলিক্যান দ্য সেক্যুরিতে ( বা রায়ট পুলিস, সংক্ষেপে CRS ) ব্যারিকেডের সংগ্রাম-নাট্যে সম্পূর্ণ নিয়োজিত, যখন সহযোগধর্মের মহোৎসবে সামিল হয়েছেন লক্ষ মানুষ (১৩ মে), যখন নিযুত শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘটের চূড়ান্ত খেলায় গভীর আশা নিয়ে অবতীর্ণ, তখন একথা মানতেই হবে যে সংস্কৃতিম্মন্য ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত প্রমোদ-অনুষ্ঠান আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন, অসময়োচিত এবং হাস্যকর।

আমাদের এই আশ্চর্য অ-সাধারণ সময় আদৌ 'তথাকথিত অভিনেতা সাজা'র সময় নয়। বরং ঠিক তার উল্টো, এখন বেপরোয়া সাহসে বস্তুত সেই আবহে সামিল হতে হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ ক্রমাগত স্বাধীন প্রকাশভঙ্গির অন্বেষণে সক্রিয়। প্রায় দশ বছরের গভীর নৈঃশব্দ্য এবং আত্মপীড়নের পর অকস্মাৎ বস্তুগতভাবে এবং মানসিক-ভাবে প্রত্যেক মানুষের কাছে সকলের সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগের রাস্তা খুলে গেছে। সরবোন বা ওদেয়র মতো যে সব জায়গা এতদিন শুধু বিস্ময় ও সংযমের নিয়ন্ত্রিত প্রকাশে ক্লিষ্ট হয়ে ছিল, শুধু সেখানেই নয় ; রাস্তা বা পার্কের মতো যে সব জায়গা এতদিন যান্ত্রিক সাক্ষাৎকার আর নিঃসঙ্গ ভিড়ের দৃশ্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল, আজ সেখানেও মানুষের প্রকৃত সংযোগসূত্র প্রতিদিন আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই সময়েই প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দরজা দু'হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছে। যে-কেউ আজ সেখানে আসতে পারে, যে-কেউ তার সমস্যাভাবনা-অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে এখন। অসংলগ্ন এই বন্যাস্রোত থেকে কখনো ছোট ছোট অভিনয়যোগ্য নাট্যবিন্দু সংহত হয়েছে, যা আবার তৎক্ষণাৎ রাস্তার মোড়ে বা গলিপথে অভিনয় করে দেখানো হয়েছে। "জনপথ প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় নাট্যঘটনারই নিষ্করুণ সাক্ষী ও প্রহরী।" এসমস্ত নাটক দুটো কারণে আকর্ষণীয় : প্রথমত নাট্যরূপের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত সক্রিয়তা এবং দ্বিতীয়ত দর্শকের সঙ্গে তার প্রভাব-পরিণতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত উৎসাহ।...অবশ্যই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে, সেই অনুযায়ী ভাবতে হবে। দর্শকশ্রোতার অংশগ্রহণ সাপেক্ষে সৃষ্টিপদ্ধতি নিয়ে আমাদের ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ করে যেতে হবে এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন এবং তার পরের প্রতিক্রিয়া পদ্ধতিমাফিক খুঁজে বার করতে হবে।

·· যে কোন প্রেক্ষাগৃহই সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। এ কোন মায়ারহস্যের জায়গা নয়, দেখাসাক্ষাৎ, কথোপকথনের জায়গা, এ হলো প্রতিষ্ঠিত বিধিশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জায়গা। সম্ভাব্য যাবতীয় প্রকাশভঙ্গি উন্মোচনের জায়গা, এ হলো লোকসক্রিয়তার যাত্রাবিন্দু।

...আর আজ, যে কোন সময়ের তুলনায় নাট্যানুষ্ঠান হয়ে উঠেছে মূলত বৈপ্লবিক।

জিবলেট, ১৯৬৮-র দ্বিতীয় ভাগ

## □ আতলিয়ের পপুল্যার

বুধবার, ৮ মে, লে'কোল দে বোজার-এ ধর্মঘট শুরু হলো।

১৩ মে, ছাত্র-ইউনিয়নগুলির ডাকে বিশাল সমাবেশে যোগ দিল ছাত্র ও শ্রমিকজনতা। ল্যাটিন কোয়ার্টারে পুলিশী নৃশংসতার পর নিযুত বিক্ষোভকারী প্রতিবাদ ও পদ-যাত্রায় সামিল হলেন।

১৪ মে তিনটার সময় প্রোভিশনাল স্ট্রাইক কমিটি আর্টস ট্রেনিং স্কুলের কর্তৃপক্ষদের জানালো যে ছাত্ররা তাদের ফ্যাকাল্টি দখল করে নিতে চলেছে। ১৫ মে ছাত্রদের গণ-সম্মেলনে নিম্নলিখিত ইস্তাহার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

কেন আমরা আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতে চাই?

কীসের বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা?

আমরা লড়ছি এক শ্রেণী-বিশ্ববিদ্যালয়, মানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক যাবতীয় বিষয়আশয়ের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম সংগঠিত করতে চাই:

১. ছাত্রজীবনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যে সামাজিক নির্বাচনের মহড়া চলে, আমরা তার সমালোচনা করছি···আর তা-ও শ্রমিকশ্রেণীর পকেট কেটে, দরিদ্র খামার-কর্মীর পয়সায়। নির্বাচনের প্রধানতম পদ্ধতি হিসেবে আমরা প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করতে চাই।

২ আমরা শিক্ষাশাস্ত্রের বিষয়চিন্তা ও তত্ত্ববস্তুর সমালোচনা করছি। সবকিছুই এখানে এত বাঁধাধরা যে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে পাশ করে বেরোয়, তার প্রকৃত জ্ঞানধর্ম বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধারণাই গড়ে ওঠে না, বিশ্লেষণী সূক্ষ্মদৃষ্টির কোন বোধই তৈরি হয় না।

৩. সমাজ বুদ্ধিবিদের কাছ থেকে যে-ভূমিকা আশা করে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার বাঁধা কুত্তার ভূমিকা—আমরা তার সমালোচনা করছি। আবার টেকনোক্র্যাটিক ম্যানেজার হিসেবেও আশা করে কখনো। এক্ষেত্রে তাদের কাজ হলো জন-গণকে দেখানো যে জীবনের বিপুলাসম্পদে তারা কেমন পরিতৃপ্ত, সুখী, এবং তারপর হ্যাঁ, ঐ একই সময়ে জনগণকে শোষণ করার কাজেও পারদর্শী হতে হয়।

উপরিলিখিত ক্ষোভ-অভিযোগের সঙ্গে স্কুল অফ পেইন্টিং এ্যান্ড স্কাল্পচারের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কমিটি অবশ্যই নিচ্ছে, কিন্তু আপাতত স্থাপত্য নিয়ে তাদের কী করতে হবে, সেকথা আমরা এখনই বলতে পারি।

১. কাউন্সিল অফ দি অর্ডার (অফ আর্কিটেক্টস) এবং তার সহযোগী সংস্থাসমূহের কায়েমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে চাই। শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে আমরা আমলাতান্ত্রিক যে কোন ব্যবস্থার বিরোধী। যে রক্ষণশীল আদর্শবস্তু বর্তমান ব্যবস্থা প্রতিদিন উগরে দিচ্ছে, আমরা তার বিরোধী। স্থাপত্যের শিক্ষা কিছুতেই বা গুরুবাবারা

করছেন, তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না, যে-প্রথায় শিষ্যছাত্ররা একেবারে তাঁর কার্বন কপি হিসেবে বেরোয়।

২. স্থাপত্যের সৃষ্টি-উৎপাদন বিষয়ক সেই সমস্ত রীতিনিয়মের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে চাই, যা সরকারি ও বেসরকারি যত ঠিকাদারের স্বার্থে নিয়োজিত। ছোট বা বড় আকারের Sarcelles (প্যারির উপকণ্ঠে নির্মিত ডর্মিটরি টাউন, এখন কংক্রিট-জঙ্গলের প্রতীক হিসেবে পরিচিত) বানানোর চুক্তিপত্র কতজন স্থপতি গ্রহণ করেছেন? ক'জন স্থপতি নির্মাণভূমির স্বাস্থ্য, তথ্যসরবরাহ ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা ভাবেন? যদি তারা সে কথা ভাবতেন, তবে নিশ্চিত যে কোন লোকেই এ জাতীয় প্রকল্পের দায়িত্ব নিতেন না। সকলেই জানেন যে ফরাসি ইমারতি ব্যবসায়ে প্রতিদিন তিনজন শ্রমিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

৩. শিক্ষাদানের বিষয়ক্রমের বিরুদ্ধেও আমরা লড়তে চাই। রক্ষণশীল, পুরো অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক একটা কান্ড, যেখানে ব্যক্তিগত মর্জি আর অভ্যেস প্রকৃত বিষয়-জ্ঞানের ওপর দীর্ঘদিন রাজত্ব চালাচ্ছে। রোম প্রাইজের আদর্শচিন্তা এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা বৃহত্তর সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে সচেতন থাকতে চাই। আমরা এর শ্রেণীচরিত্রের বিরুদ্ধে লড়তে চাই।

…শ্রেণী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম অবশ্যই ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে জৈবিক সংযোগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে।

সুতরাং, আমাদের স্বয়ং এই সমস্ত দায়দায়িত্ব নিতে হবে:

১. জীবিকাবৃত্তি এবং শিক্ষকতাকে যে সমস্ত সম্পর্ক শাসন করে, তা নিয়ে প্রশ্ন করুন।

২. একোল নাসিওনাল সুপিরিয়র দ্য বোজার এবং উচ্চশিক্ষার বর্তমান বিভেদ নিয়ে প্রশ্ন তুলুন।

৩. স্কুলে ভর্তির সময়ে যে কোন ধরনের পূর্বনির্বাচনী ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করুন।

৪. পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখুন। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের প্রকাশ্যে তর্ক করা উচিত। সমস্ত বক্তৃতাই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বনে হওয়া উচিত। সংগ্রাম সংগঠিত করার উপায় আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। □

পিপলস্ স্টুডিও, ২২ জুন ১৯৬৮

৮. Vladimir Fissera : Writi gs on the Walls.

# মাও ৎসে-তুঙ

# সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক

## বড় হরফের দেওয়ালনামা

'বড় গাছ হয়তো স্থির শান্ত থাকাই বেশি পছন্দ করে, কিন্তু বাতাস তা বলে প্রশমিত হয় না।'

মাওয়ের প্রিয় চৈনিক প্রবাদ

মার্কসবাদে হাজারো সত্যকথা আছে, কিন্তু সে সমস্তই এই একটি বাক্যে স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণিক হয়ে ওঠে—'বিদ্রোহে কোন ভুল নেই'। হাজারো বছর ধরে এ কথা বলে আসা হচ্ছে যে দমনপীড়ন আর শোষণই ঠিক, বিদ্রোহ করা ভুল। মার্কসবাদের আবির্ভাবে এই প্রাচীন রায় উল্টে গেছে। এ এক বিশাল অবদান। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারা জনগণ এই সত্যে উপনীত হয়েছেন, এবং মার্কস সে সিদ্ধান্ত সূত্রায়িত করেছেন। এই সত্য ভূমি থেকেই শুরু হয় প্রতিরোধ, সংগ্রাম এবং সাম্যবাদের জন্য প্রকৃত লড়াই।

স্তালিনের ৬০তম জন্মদিনে ইয়েনানে প্রদত্ত ভাষণ

□

'নিয়েহ উয়ান-ৎসু'র লেখা ২৫ মে-র বড় হরফের দেওয়ালনামা বিশ শতকের ষাট দশকে চীনা পারি কম্যুনের ঘোষণাপত্র; বস্তুত এর তাৎপর্য পারি কম্যুনের চেয়ে বেশি। এ জাতীয় বড় হরফের পোস্টার লেখা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।'

চেয়ারম্যান মাও কমরেড চে'ন পো-তা-কে এই সমস্ত তরুণ তুর্কিদের বলতে বললেন, 'বেশ করেছো এ কাজ করে।'

'আমি তোমাদের বলছি, তরুণরাই মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি। তাদেরকে পুরোপুরি কর্মস্রোতে টেনে আনতে হবে।

'পিকিঙে ফিরে সব কিছু শান্ত দেখে আমার দুঃখ হলো। কিছু স্কুল বন্ধ, কোথাও কোথাও ছাত্র-আন্দোলন দমন করা হয়েছে। অতীতে কারা এ কাজ করেছে? উত্তরের সমরপ্রভুরা। কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে ছাত্র-আন্দোলন দেখে ভয় পাওয়া মার্কসবাদ-বিরোধী। কেউ কেউ সারাক্ষণ মুখে 'গণনীতি'র কথা বলছেন, জনগণের শুশ্রূষার কথা বলছেন, কিন্তু কার্যত ধনিকতন্ত্রের পক্ষেই কাজ করছেন, সেবা করছেন বুর্জোয়া-শ্রেণীর।

'সেন্টার অফ দি ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগের উচিত ছিল ছাত্র-আন্দোলনের পক্ষে কাজ করা, বদলে তারা কাজ করেছে দমননীতির পক্ষে।

'মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতাই বা কারা করছে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুশী সংশোধনবাদ, জাপানী সংস্কারবাদ আর যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

'পার্টির ভিতর-বাহির আলাদা করার অর্থই হলো বিপ্লবভীতি। দেওয়ালনামা মুছে দেওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। এ কাজ করার অর্থ হলো আমাদের নীতিসূত্রে কোথাও একটা গুরুতর ভুল রয়েছে, এবং আমাদের বিষয়টার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সমস্ত বাধা, সব ছক এক্ষুনি ধ্বংস করে ফেলা উচিত।

'জনগণের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, তাদের শিক্ষক হতে চাওয়ার আগে তাদের ছাত্রশিষ্য হতে হবে। মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা, উত্তীর্ণ হতে পারি কি পারি না, সাহস আমাদের আদৌ আছে কি নেই—এ তার পরীক্ষা। এই হলো সেই শেষ পরীক্ষা যা শ্রেণীবৈষম্য দূর করবে, তিনটি প্রধান বিভেদেরও নিষ্পত্তি ঘটাবে।

'বিরোধিতা করুন, বিশেষত বুর্জোয়া 'আধিপত্যকামী' চিন্তার বিরোধিতা করুন—তার মানে ধ্বংস। এ ধ্বংস ছাড়া সমাজবাদের নির্মাণ অসম্ভব। প্রথমে সংগ্রাম, তার পর সমালোচনা এবং শেষত সংস্কার।

'অফিসে বসে রিপোর্ট শুনলেই শুধু চলবে না। জনগণের ওপর নির্ভর করতে হবে, জনগণে আস্থা রাখুন, লড়াই করুন যতক্ষণ দম আছে। সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, কেননা বিপ্লব আমাদেরই ফিরে আঘাত করতে পারে। পার্টি এবং সরকারি নেতৃত্বে যারা আছেন, এমনকি পার্টির দায়িত্ববান কর্মীরা সকলেই তৈরি থাকুন। এখন আর ফেরার পথ নেই, শেষপর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে যেতে হবে, এবং এই প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলব, নতুন করে গড়ে নেব নিজেদের। একমাত্র এভাবেই আমরা পার্টিসদস্যারা এযাত্রায় সহগামী হতে পারি, নতুবা বিপ্লব নির্ভর করবে তাদের ওপর, যারা পার্টির বাইরের লোক।

'কিছু কিছু কমরেড অন্যের বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রামী, কিন্তু নিজেদের বিরুদ্ধে তারা নিষ্ক্রিয়। এ পরীক্ষায় তারা ফেল।

'বিপ্লবের অভিমুখ নিজের দিকে আগে ঘোরাও, জ্বালাও, হাওয়া করে আঁচ উসকে তোলো। তাই কি করবে তুমি? বিপ্লব তোমায় পোড়াবে।

**talk to the leaders of the centre 21. 7. 1966**



সমস্ত আঞ্চলিক সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিক বিপ্লবী দলের সমস্ত সদস্যারা এখানে উপস্থিত আছেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো আমাদের নথিপত্র সব পরিষ্কার খুলে দেখা এবং বিশেষত কর্মীদল বা ওয়ার্ক টীম পাঠানোর ধরনধারণ পুনর্বিন্যস্ত করা। মহান এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত বিভিন্ন স্কুলের সংগঠিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবী দলের, যা বিপ্লবী শিক্ষক ও ছাত্র এবং নিরপেক্ষ অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত। বস্তুত যে কোন স্কুলের তারাই একমাত্র লোক, যারা এবিষয়ে কিছু না কিছু জানে। কিন্তু কর্মীদলের লোকেরা কিছু জানে না। কোন কোন কর্মীদল তো এমনকি নতুন সমস্যা তৈরি করছে। স্কুলে স্কুলে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অর্থ হলো 'সংগ্রাম

ও আধিপত্যবাদের বিরোধিতা'। কর্মীদল শুধু এই আন্দোলনে বাগড়া দিচ্ছে। আমরা কি সংগ্রাম ও সংস্কারে একই সাথে মন দিতে পারি না? চিয়েন পো-ৎসানের কথাই ধরা যাক। কত বই লিখেছেন তিনি—যদি সেসবই না পড়ে ফেলা যায়, কীভাবে তুমি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, কী করেই বা তাঁকে পাল্টাতে সাহায্য করবে? সব স্কুলেরই অবস্থা অনেকটা সেই প্রবাদবচনের মতো—'ছোট্ট মন্দিরে প্রশস্ত মস্ত দেবতা আর ছোট্ট পুকুরে অনেক কচ্ছপ'। স্কুলগুলোর আপনশক্তিতেই তার মোকাবিলা করতে হবে, এ কোন কর্মীদলের কাজ নয়, আমার, আপনার বা প্রাদেশিক পার্টিকমিটির কাজ নয়। আত্মশক্তির ওপরই নির্ভর করতে হবে তাদের, কর্মীদলের ওপর নয়। কর্মীদল সব পাল্টে কি যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাদের ব্যবহার করা যায়? উপদেষ্টার ভূমিকায় তাদের হাতে একটু বেশি ক্ষমতা এসে যাবে। বরং আমরা তাদের 'পর্যবেক্ষক' বলতে পারি। কিছু কিছু কর্মীদল তো বিপ্লবের পক্ষে রীতিমতো ক্ষতিকর, যাচ্ছেতাই, কোন কোন দল আবার তা নয়। যাচ্ছেতাই সব কর্মীদলই কালে প্রতিবিপ্লবী হয়ে উঠবে। শিয়ানের ইউনিভার্সিটি অফ কম্যুনিকেশনস্ তো কেন্দ্রে কাউকে পাঠাতে, এমনকি ফোনে কথা বলতেও বাধা দিয়েছে। কেন তারা লোক পাঠাতে এত ভয় পাচ্ছে? আসুক বিপ্লবীরা, দখল করে নিক স্টেট কাউন্সিলের ঘরদফতর। সিয়ান আর নানকিঙের সংবাদপত্র অফিস তিনদিনের জন্য দখল করা হয়েছিল, আর সকলে তো ভয়ে আড়ষ্ট। এত ভয়? ওঃ তোমরা, তোমরা সত্যিই বিপ্লব চাও না, কিন্তু এখন বিপ্লব তোমাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। কোথাও কোথাও সংবাদপত্রের অফিস ঘেরাও, প্রাদেশিক পার্টি কমিটিতে যাওয়া বা স্টেট কাউন্সিলে লোক পাঠানো বারণ। কেন, কেন এত ভয়? যখন এমনকি বিপ্লবীরা স্টেট কাউন্সিলে কথা বলতে আসছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পাঠানো হচ্ছে এমন সব লোককে যারা কোনকিছুই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে না। কেন এভাবে একাজ করা হচ্ছে? নিজেদের জায়গা ছেড়ে তোমরা যদি না নড়তে চাও, না দেখা করতে চাও তাদের সাথে, বেশ তবে আমি যাব, আমি কথা বলব। যাই বলো না কেন, এ নিছক ভয়, প্রতিবিপ্লবের ভয়, অস্ত্রের ব্যবহারে ভয়। কীভাবে সবাই রাতারাতি প্রতিবিপ্লবী হয়ে যায়? সম্প্রতি কেউ কেউ একেবারে নীচের স্তর থেকে ঘুরে এসেছেন, স্কুলে স্কুলে বড় হরফের দেওয়ালনামা পড়ে দেখতে গিয়েছিলেন। বস্তু-সত্যের প্রতি কোনরকম অনুভূতি ছাড়া কীভাবে কারো পক্ষে কাজ করা সম্ভব? কেউ নীচের স্তরে যেতে চায় না, সেখানে কাজ করতে চায় না, প্রত্যেকেই নিজের দৈনন্দিন রুটিন কাজ করেই খুশি। নীচে যান, ছকে-বাঁধা কাজ বন্ধ করুন, বস্তু থেকে প্রকৃত অনুভূতি আহরণ করতে শিখুন।

এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেক কমরেডের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল অফ ব্রডকাস্টিং-এ যাওয়া উচিত, গিয়ে তাদের বড় হরফের দেওয়ালনামা সব পড়ে আসা উচিত। সমস্যাদীর্ণ এলাকায় যান, ঘুরে দেখুন। যখন পোস্টার দেখতে যাবেন, সর্বদা বলবেন যে আপনি এসেছেন শিখতে, এসেছেন বিপ্লবে সাহায্য করতে, বিপ্লবী ছাত্র-

শিক্ষকের সমর্থনে বিপ্লব উসকে দিতে এসেছেন। দক্ষিণপন্থী পচা জঞ্জালে কান দেওয়ার কোন দরকার নেই। গত দু'মাস ধরে কোথাও প্রকৃত সমঝদারির চিহ্ন নেই, শুধু আমলাবাজি। ছাত্ররা আপনাকে ঘিরে ধরবে। ঘিরতে দিন। আপনি বলতে শুরু করলে ঘিরে তো ধরবেই, ঠিকই আছে। স্কুল অফ ব্রডকাস্টিং-এ প্রায় একশো লোককে পেটানো হয়েছে। আহা কী মধুময় এ সময়—বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের হাতে মার খাবে, খেয়ে সিধে হবে। ছ'মাস-একবছর ধরে শুধু কর্মীদল পাঠিয়ে গেলে কিছু হবে না। একেবারে জায়গায় দাঁড়িয়ে জনগণের ওপর নির্ভর করুন। প্রথমে সংগ্রাম, তারপর সংস্কার। সংগ্রামের অর্থ হলো সংস্কারসাধন এবং সংস্কার অর্থে নির্মাণ। ছ'মাসে শিক্ষাসূচির খুব একটা উন্নতি করা যাবে না। প্রথমত, অংশবিশেষ ত্যাগ করে ব্যাপারটাকে সোজা-সরল করে নিন। বাজে আর একঘেয়ে পুনরাবৃত্ত বিষয়গুলো কেটে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনুন। রাজনৈতিক বইপত্র, কেন্দ্রের নির্দেশাবলী এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়—সমস্তই জনগণের কাছে পথের নির্দেশ-বাহী, এসব কখনোই খাড়া মতডান্ডা বলে ভাবা ঠিক নয়। এসব আসলে সঠিক ধারণাদৃষ্টির ব্যাপার, সঠিক পথনির্দেশের বিষয়। আমাদের দৃক্‌ধারণা অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে বস্তুগত পরিবর্তন ঘটে। বিপ্লবী শিক্ষক, ছাত্র এবং বামপন্থীদের ওপর ভরসা রাখতে হবে। স্কুলের বিপ্লবী কমিটিতে দক্ষিণপন্থীদের অংশগ্রহণেও কিছু যায় আসে না। দক্ষ দক্ষিণপন্থীদের আমাদের 'নেতি'শিক্ষক বলে মনে করতে হবে, কিন্তু খবরদার তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করবেন না। পিকিং-এর পৌর পার্টি কমিটিতে এত লোকের দরকার নেই—কোন, বিরাট কমিটি হলেই লোকে শুধু ফোন করে পয়সা নষ্ট করবে, আর নানা আদেশ জারি করবে। সচিব-সম্পাদকের সংখ্যা কমিয়ে আনুন। আমি যখন ফ্রন্ট কমিটিতে ছিলাম, আমার মাত্র একজন সচিব ছিল। লং মার্চের সময় তো আমার কোন সচিবই ছিল না। চিঠিপত্র আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা একজন দেখলেই যথেষ্ট। আর হ্যাঁ, মন্ত্রণালয়। মন্ত্রীরা যারা কাজ করছে, তারা থাকুক। মন্ত্রীই হোক, ডিপার্টমেন্টের মাথা হোক, ব্যুরোর নেতাই হোক, আর সেকশনের বড়বাবুই হোক—কাজ না করলে হঠিয়ে দিন। অনেক কর্মীদল প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছেমতো গ্রেফতার করবেন না তাদের। যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল স্লোগান লিখছে, তাদেরও গ্রেফতার করবেন না। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, সংগ্রাম করুন, তারপর তাদের নিয়ে কী করা যায় তা ঠিক করবেন।

**talk at the reception of secretaries of Big Regions and members of Central Cultural Revolution team—notes for circulation 22. 7. 1966**

□

মূল প্রশ্ন হলো বিভিন্ন জায়গায় এই বিশৃঙ্খলা আটকানোর উপায় কী, প্রয়োগসূত্রই

বা কী হবে। আমার মতে, আরো কয়েকমাস চলুক এরকম, আর সঙ্গে সঙ্গে আসুন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই ভালো, মুষ্টিমেয় কয়েকজনই বদ।··· 'পিপলস্ ডেইলি'র সম্পাদকীয়তে শ্রমিককৃষক-সেনানীকে ছাত্রদের কাজেকর্মে নাক গলাতে বারণ করাহয়েছে, আর অহিংস, হ্যাঁ অহিংস সংগ্রামের তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে।

আমার তো মনে হয় না যে পিকিঙের অবস্থা খুব খারাপ, বিশৃঙ্খল। ছাত্ররা প্রায় লাখোলোকের সভা করেছে, তারপর খুনীদের প্রায় হাতেনাতে ধরেছে। এর ফলে ঠিকই যে একটু ত্রাস ছড়িয়েছে। পিকিং তো রীতিমতো ভদ্র। আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়েছে, আর শেষমেশ গুন্ডাবদমাসের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। আপাতত নাক গলানোর কোন দরকার নেই। ইয়ুথ লীগ সেন্টার নতুন করে সংগঠনের আগে, ধরা যাক, অন্তত আরো চারমাস অপেক্ষা করি। তাড়াতাড়ির সিদ্ধান্ত শুধু ক্ষতিই বাড়ায়। ওয়র্ক টিম পাঠানো হলো তাড়াতাড়ি; বামপন্থীরা বিরুদ্ধ-সংগ্রামে নামলেন তাড়াতাড়ি; লাখো লোকের সভা ডাকা হলো, সে-ও হুড়োহুড়ি কান্ড।···আমি নিজে একটা বড় হরফের দেওয়ালনামা লিখে প্রচার করেছি—'সদরদফতরে কামান দাগো!' কিছু কিছু সমস্যার আশু নিরূপণ চাই। যেমন, শ্রমিককৃষক-সেনানীর ছাত্রদের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মাথা গলানোর কোন দরকার নেই। ছাত্ররা নামুক পথে। বড় হরফের পোস্টার লিখলে বা রাস্তায় নামলে ভুলটা কীসের? তুলুক বিদেশীরা গুচ্ছের ছবি। আমাদের পশ্চাদ্মুখী প্রবণতা দেখানোর জন্যই ছবি তুলছে তো, বেশ কিছুই যায়-আসে না তাতে। করুক সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নামে হাজারো কেচ্ছা।

talk at the work conference of the centre, 23. 8. 1966

## □ সদর দফতরে কামান দাগো

আমার প্রথম বড় হরফের দেওয়ালনামা

৫ অগস্ট ১৯৬৬

চীনের প্রথম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বড় হরফের দেওয়ালনামা এবং 'পিপলস ডেইলি'তে তার ওপর লেখা ধারাভাষ্য সত্যিই অসাধারণ! কমরেড, দয়া করে আবার পড়ে দেখুন। কিন্তু কমবেশি গত পঞ্চাশ দিন ধরে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে একেবারে আঞ্চলিক স্তর পর্যন্ত কয়েকজন কমরেড-নেতা একেবারে উল্টো কাজ করছেন। বুর্জোয়াসির প্রতিক্রিয়াশীল মতসূত্র অনুযায়ী তারা একধরনের বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্র জারি করার মতলবে রয়েছেন এবং সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তীব্র স্রোত-আন্দোলন এইভাবে ধ্বংস করছেন। ঘটনাসমূহ তারা দুপায়ের বদলে মাথার উপর দাঁড় করাচ্ছেন, সাদা-কালোর তফাৎ ঘুলিয়ে দিচ্ছেন, বিপ্লবীদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে দমন করছেন। এমন সমস্ত মতামতের গলা টিপে ধরছেন যা তাদের সঙ্গে মেলে না, প্রায় এক শ্বেত সন্ত্রাস জারি করেছেন তারা, আর এভাবে নিজেদের নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন। বুর্জোয়াসির ঔদ্ধত্য ফাঁপিয়ে তুলছেন, তারা সর্বহারার নীতিশক্তি নষ্ট

করছেন। কী বিষাক্ত! ১৯৬২-র দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং ১৯৬৪-র ভুল প্রবণতা—যা কিনা গড়নে 'বাম', কিন্তু মূলত দক্ষিণপন্থাই—এইসূত্রে মিলিয়ে দেখলে আমাদের কী আর জেগে ঘুমনোর উপায় থাকবে ?

□ পিকিং রেড গার্ডস

পিকিং রিভিউ, সংখ্যা ৩৪, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

## সর্বহারার বিপ্লবী বিদ্রোহচেতনা দীর্ঘজীবী হোক

বিপ্লব মানে বিদ্রোহ, এবং বিদ্রোহই মাও-চিন্তার আত্মা। আমরা মনে করি 'প্রয়োগে'র উপরই সমূহ তীব্র মনোযোগ ন্যস্ত করা উচিত, তার মানে 'বিদ্রোহ' এই—শব্দের প্রতি মনোযোগ। চিন্তার ক্ষেত্রে দুঃসাহস, কথা কিংবা কাজের ক্ষেত্রে, ভেঙে বেরনোর ক্রান্তিকালে, বিপ্লব সংঘটনের দুঃসাহস, এককথায় বিদ্রোহের দুঃসাহসই সর্বহারা বিপ্লবীর সবচেয়ে মৌলিক ও মূল্যবান গুণ। সর্বহারা পার্টিচেতনার এই হলো প্রধান নীতিসূত্র। বিদ্রোহ না-করার অর্থ হলো পরিষ্কার সংস্কারপন্থা, সাদাসাপটা সংশোধনবাদ।

সতেরো বছর ধরে পাঠকেন্দ্রগুলি সংশোধনবাদের কবলে পড়ে রয়েছে। আজও যদি আমরা বিদ্রোহে না জেগে উঠি, কবে আর চোখ খুলবে আমাদের ? কিছু লোক আছে যারা বরাবর বিরোধ-বিদ্রোহের বিপক্ষে, আজ হঠাৎ ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন তারা, একঘেয়ে স্বরে তারা বলেই চলেছেন যে আমরা নাকি একতরফাই দেখছি সব কিছু, খুব উপর থেকে, কঠিনভাবে বিচার করছি সব, খুব নাকি রুক্ষ আমরা, যাচ্ছি একটু বেশিদূর।

স্পষ্টতই এসব অভিযোগ পুরো অর্থহীন। যদি তুমি আমাদের বিপক্ষেই থাকো, পরিষ্কার বলো সেকথা, লজ্জা করে লাভ কী ?

যেহেতু আমরা বিদ্রোহই চাই, গোটা বিষয়টা আর ঠিক তোমাদের হাতে নেই এখন। বিস্ফোরণে, ধারালো বারুদগন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে, ছুঁড়ে দিলাম তাই, বোমা আর গ্রেনেড পরপর সাজিয়ে রেখেছি, বিরাট এক লড়াই শুরু করতে চাই। 'করুণা', 'নিরপেক্ষতা'—দূর হঠো!

তুমি বলছো যে আমরা খুব একতরফা ? বেশ, তাহলে তোমাদের সব তরফের ব্যাপারটা নাহয় শুনি। দেখে তো মনে হচ্ছে তার মানে মেলে-না এমন দুই তরফকে মেলাচ্ছ তোমরা, তার অর্থ সব তরফেরই সুবিধে হজম করা।

তোমরা বলছো যে আমরা খুব সুদূর আর কঠিন ? সত্যিই তাই। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন : 'যারা উচ্চপদে রয়েছেন, তাদের আমরা ধুলোবালির চেয়ে বেশি কিছু মনে করি না'। শুধু আমাদের স্কুলের প্রতিক্রিয়াশীলদেরই নয়, গোটা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলদেরই আমরা মেরে হঠাতে চলেছি। বিপ্লবীরা গোটা দুনিয়ার রূপান্তর ঘটানোকেই নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে। কেনই বা আমরা সুদূর আর কঠিন



হবো না ?

তোমরা বলছো যে আমরা একটু বেশি রুক্ষ। রুক্ষ আমাদের হতেই হবে। কী করেই বা আমরা কোমলহৃদয় হবো আর সংশোধনবাদের লেজ আঁকড়ে ধরে থাকব অথবা মোটামুটি কিছু একটার কথা বলব ? শত্রুদের প্রতি নরম হওয়ার অর্থ হলো বিপ্লবের প্রতি ক্রুর হয়ে পড়া।

জানি, কেউ কেউ আছেন যারা বিপ্লবের ভয়ে মরে যাচ্ছেন, ভয়ে শুকিয়ে উঠছেন বিদ্রোহের নামে। গতানুগতিকের ধ্বজাধারী, রক্ষণশীল যত লোকজন, নিজেদের সংশোধনবাদী গাড্ডায় গুটিয়ে বসে আছো, যে মুহূর্তে বাতাসে বিদ্রোহের শনশন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তোমাদের স্নায়ু বিকল হতে বসেছে, ভয় পেয়েছ তোমরা।

বিপ্লবীরা হলো সেই বানররাজার মতো, তাদের হাতের স্বর্ণদন্ডের অতিবাস্তব ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী, তার শক্তিশালী যাদুর কথা সুবিদিত, কেননা মাও ৎসে-তুঙের অপরাজেয় চিন্তাধারা তাদের আয়ত্তে রয়েছে। আমরা সেই স্বর্ণদন্ডের নাচ দেখাব এখন, আমাদের অতিবাস্তব ক্ষমতার অনুষ্ঠান শুরু হবে, পুরনো পৃথিবীকে পুরো উল্টে দিতে যাদুশক্তির ব্যবহার দেখুন। খন্ড খন্ড হয়ে যাবে সব, সব ধ্বংস হবে, আমরা এক নয়া বিশৃঙ্খলার জন্ম দেব, ভয়ংকর এক মহা ধ্বংসলীলা, যত বড় হয় ততই ভালো। সর্বহারার বৈপ্লবিক বিদ্রোহচেতনা দীর্ঘজীবী হোক। □

রেড গার্ডস, ৎ-সিং হুয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন মিডল স্কুল, ২৪ জুন, ১৯৬৬

The basic materials of the theatre arise from the spectator himself—and from our guiding of the spectator into a desired direction (or a desired mood), which is the main task of every functional theatre (agit, poster, health education etc.) · the attraction ( in our diagnosis of the theatre) is every aggresive moment in it. i.e, every element of it that brings to light in the spectator those senses or that psychology that influence his experience—every element that can be verified and mathematically calculated to produce certain emotional shocks in a proper order within the totality—The only means by which it is possible to make the final ideological conclusion possible. The way to knowledge—'Through the living play of the passions'—applies specifically to the theatre (perceptually).

—Sergei Eisenstein, Montage of Attraction, 1923



ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

# সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পকলার সামাজিক পটভূমি প্রসঙ্গে

সম্প্রতি এদেশের শিক্ষিত লোকজনদের মধ্যে ছবি সম্পর্কে যে বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখা যাচ্ছে, সাধারণভাবে বলা যায় তার পেছনে বাংলার একটা ভূমিকা আছে। দক্ষিণে, রাজা রবি বর্মা এবিষয়ে প্রায় তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেও সম্ভবত তাঁর নিজের কাজের গুণমানই এই সদুদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেছে। বস্তুত, কলকাতার চৌরঙ্গীতে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হ্যাভেলের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার সূচনা হয়েছিল। শহরের অন্য প্রান্তে, জোড়াসাঁকোয় তখন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর সহোদর গগনেন্দ্র ও সমরেন্দ্রনাথের সাহায্যে ও কবির অনুপ্রেরণায় শিল্প-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মূল্যবান শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করছেন। যদিও তাদের না ছিল ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা, না ছিল সেই নান্দনিক বোধ, যা পশ্চিমের শিল্প-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও, সেসময়ের যে-কোন ভারতীয়ের মতোই বিভিন্ন অনিবার্য মানসিক পর্বের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছেন। ইউরোপীয়ান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তখন পশ্চিমী চিত্রকলার বিভিন্ন রীতি ও কৌশল তাঁর আয়ত্তে এসেছে, ইউরোপীয় কায়দায়

পোর্ট্রেট আঁকছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছেন না। পরিবর্তে, যুগে যুগে ভারতীয় শিল্পীদের যে-ভিন্ন মূল্যবোধ বরাবর চালিত করে এসেছে, বা এখনো করছে, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমে সচেতন হচ্ছেন। একই সময়ে, উত্তরভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় মুঘল চিত্রকলার সৌন্দর্য যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হলো। কলকাতায় ফিরে তিনি গুঁড়ো রং বা পিগমেন্ট নিয়ে নানান পরীক্ষা করলেন। এর পরেপরেই, তাঁদের উভয়ের সাধারণ ভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য হ্যাভেল তাঁকে সরকারি আর্ট স্কুলের সহাধ্যক্ষ-পদে আমন্ত্রণ জানালেন।

ই. বি. হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ—এই দুজন আদিপুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বিশাল শিষ্যগোষ্ঠী। নন্দলাল, অসিতকুমার, ভেঙ্কটাপ্পা, সুরেন গাঙ্গুলী, সমরেন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, হাকিম মুহম্মদ খান, বীরেশ্বর সেন, শামীউজ্জামান ও মুকুল দে তাঁদের অন্যতম। লেডি হেরিংহ্যামের সাহায্যকারী হিসেবে অজন্তার ছবি কপি করতে এঁরা দুবার অজন্তায় ও একবার বাঘ গুহায় গিয়েছিলেন। এবং ফিরেছিলেন সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য আবিষ্কারের গভীর আত্ম-প্রত্যয় সঙ্গে নিয়ে। ব্যারন কারমাইকেল, আর্ল অব্ রোনাল্ডসে, বর্ধমানের মহারাজা, ঠাকুর পরিবার, স্যার জন উড্রফ, কেস্টভেন, মি. পল্টেনমুলার, মি. রোদেনস্টাইন, মি. ব্লাউন্ট, ড. কুমারস্বামী, মি. ও. সি. গাঙ্গুলী ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা, সহমর্মী এবং একইসাথে ভাষ্যকার। প্রাচীন সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক পুনরুত্থানে বিশেষভাবে আগ্রহী বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তরফে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির জন্য বছরে পুরো দশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনী হতো, শুরু হয়েছিল নিয়মিত ক্লাস, আমন্ত্রণ করে আনা হতো প্রখ্যাত বক্তাদের, এমনকি নিয়মিত সভারও ব্যবস্থা ছিল। সত্যি বলতে, সোসাইটির মুখপত্র 'রূপম্', সেসময়ে প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা পত্রিকা ছিল। ও. সি. গাঙ্গুলী ছিলেন তার সম্পাদক। তারপর থেকে বাংলার ছবির জগতে এই নবজাগরণের আর পিছনে ফিরে তাকানোর সময় হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষিত ভারতীয়ের শিল্পচেতনা তাতে আপ্লুত, পরাভূত হয়েছে। এখন, বাংলার এই চিত্ররীতিকে প্রায় আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। অথচ তার গভীরতর উৎসে, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাবে এই রীতিকে এভাবে চিহ্নিত করা ভুল।

কিন্তু, এই দাবির যাথার্থ্য ঐতিহাসিক ও নান্দনিক—এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করে দেখা যেতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবে, এই ধারাকে অজন্তা, বাঘ, সিগিরিয়া, সিত্তনবাসল ও রাজস্থানী চিত্রশৈলী থেকে শুরু করে জৈন, মুঘল, পাহাড়ী, কাংড়া ও বাসোলী রীতির চিত্রিত পুঁথি; লাহোর, লক্ষ্ণৌ ও পাটনা কলমের নানা শরিকি ধারা-উপধারা থেকে একেবারে আমাদের ঘরের কাছে কালিঘাট পট পর্যন্ত যে-বিশাল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, তারই

অঙ্গ বা অনুসৃতি হিসেবে ধরা হচ্ছে। কালিঘাট তো এই শহরেই, সুতরাং আশা করা যেতেই পারে যে কলকাতার শিল্পীরা নিকটবর্তী প্রেরণার উৎস থেকে সমস্ত রস আহরণ করবেন। কিন্তু, খুঁটিয়ে দেখলেও, সুনয়নী দেবী আর যামিনী রায়—মাত্র এই দু'জন ছাড়া আর কারো কাজে কালিঘাটের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর তা-ও খুব সম্প্রতি। বস্তুত, অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যমের মতোই বাংলার চিত্রশিল্পের প্রধান উৎসও বাংলার বাইরে। সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বা ক্রমানুবর্তিতার যে-শিক্ষা, তা-ও আসলে ঐতিহাসিক নয়, নান্দনিক। আমাদের আধুনিক ছবির ক্ষেত্রে এটা খুবই লক্ষ করার মতো বিষয়। বাংলার সংস্কৃতি যে মূলত সমাজপ্রগতির সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে অনেকটাই সম্পর্কহীন, আমাদের এই মূল প্রতিপাদ্য বিশ্লেষণের ফলে পরিষ্কার হবে। পরিবর্তে, অস্বাভাবিক বা আকস্মিক স্বল্পকালীন বৃদ্ধির উদাহরণ হিসেবে তা গ্রহণ করাই যথাযথ।

ইতিহাসের যেটুকু অবদান, তা ছবির বিষয়েই সীমাবদ্ধ। পুরাণকাহিনীই তার প্রধান লীলাভূমি। দেখেশুনে মনে হয় প্রধান দেবতা আর দেবীরা যেন হঠাৎ স্বর্গ থেকে কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে ছুটি কাটাতে এসেছেন। এবার শিল্পীরা পছন্দমতো বেছে নিলেন তাঁদের—কেউ শিব, কারো পছন্দ বিষ্ণু বা তাঁর পরবর্তী রূপ, কিন্তু সর্বত্রই কোমল আর মধুরভাবের ছড়াছড়ি। কঠিন হৃদয়ের দেবদেবীরা একেবারে পরিত্যক্ত। এমনকি, অপেক্ষারত পৌরাণিক রাজা বা পুরাণকথার অন্যান্য চরিত্রের স্বর্গীয় আবির্ভাবকেও মোটেই বাহুল্য মনে করা হয়নি। ছবির পটে উঠে এল বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, অশোক বা এরকম আরো অনেকে। শকুন্তলা, মেঘদূত, রামায়ণ বা মহাভারত এবং তা বাদে আরো যে-সমস্ত কাব্যসাহিত্য যথেষ্ট প্রাচীনতার মর্যাদা পেয়েছে, তার প্রায় সবই যথেচ্ছ ব্যবহৃত হলো। পুরাণের প্রতি হঠাৎ কেন এই আকর্ষণ?—এই প্রশ্ন কিন্তু কখনোই উচ্চারিত হয়নি।

পুরাণের চরিত্র ততদূরই সমষ্টিগত, যতদূর পর্যন্ত তা প্রকৃতির সঙ্গে যূথবদ্ধ জীবনের সামাজিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। শুদ্ধরূপে তা মতান্ধ নয়। ধর্মীয় নয় এই অর্থে যে তা কোন 'বিশ্বাসে'র ওপর নির্ভরশীল নয়। ধর্ম ও পুরাণের বিচ্ছেদ সমাজকেও প্রধান দুই অংশে বিভক্ত করে দিল—এক, যারা বিশ্বাসে ভর করেই বেঁচে থাকে এবং দুই, জীবনযাপনের বিকল্প উপায় হিসেবে যারা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, সমাজ স্পষ্টতই দুই প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেল। সুতরাং, পুরাণকথার নবজন্ম সেইসব লোকজনের এক বিশেষ মনোভাবকেই প্রকাশ করে, যারা বিশ্বাস করে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ অপরিবর্তনীয় এবং নিম্নতর শ্রেণীর পক্ষে দারিদ্র্যই স্বাভাবিক। এমনকি কোন ধর্মীয় অন্তপ্রেরণাও এখানে পুরাণের এই নবজন্মের পেছনে সক্রিয় ছিল না। প্রকৃত প্রসববেদনার আগে মিথ্যে যন্ত্রণার সঙ্গেই শুধু তার তুলনা চলতে পারে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কী ছিল, তা আমরা জানি। নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবস্থা তখন ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে। চাকরির বাজার -ইউনিভার্সিটি ডিগ্রির প্রায় কোন মূল্যই নেই। কোনদিকে আর আশার আলো চোখে পড়ছে না। জাতীয়তাবাদ একধরনের আপাত-ঐক্য আনলেও অচিরেই তা নিছক ভাবাবেগে পরিণত হলো। যেহেতু, তৎকালীন আর্থসামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে তার প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না। নতুন ছবি ছিল একেবারে নামেমাত্র রাজনৈতিক, আর সেকারণে বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। সেদিনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মের মধ্যে তা সবচাইতে কম দায়বদ্ধ, আর একটু বেশিরকমের নান্দনিক। এমনকি সঙ্গীতের থেকেও, যেখানে তখন জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত গানেরই প্রচলন বেশি। আরো মোটাদাগে বললে বলতে হয়, বাংলা ছবির তুলনামূলকভাবে একটু বেশি বিশুদ্ধতার প্রতি ঝোঁক বোধহয় এই কারণে যে তার প্রধান ধারকবাহকদের সরকারি কাজ জোটানোর ক্ষমতা তখন শূন্য। বেশির বেশি বলা যায় যে, যে-সমস্ত সংকট তখনও বাস্তবে তেমনভাবে ঘনিয়ে ওঠেনি, তার একটা আবছা ধারণাই তাদের কাজে প্রকাশিত হয়েছে। পুরাণকথা বোধহয় নানাদিক থেকেই একধরনের মুক্তি, যদি তা পলায়নবৃত্তি না-ও হয়।

যদি সম্পূর্ণ নান্দনিক অর্থে ধরা যায়, তাহলে হয়তো বাংলার শিল্পীদের কৃতকার্যতা যথেষ্ট। কিন্তু তা শুধু ক্রিয়াকৌশল বা প্রকরণের অত্যন্ত সীমিত গন্ডির ভেতর। তিনটি বিষয় ভারতীয় শিল্পকলার নামে একেবারে বর্জন করা হয়েছে—বস্তুর আয়তন বা ঘনত্ব, গভীরতা, এবং স্থাপত্যধর্মী রচনা। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের কী এক অন্তর্নিহিত সুসঙ্গতির ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাকিনা আবার মনে করা হয় যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবির পটে প্রতিফলিত হয়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির ফল হলো এই যে ছবিও হয়ে উঠল গীতিকাব্যের মতো সূক্ষ্ম অনুভবের বিষয়। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির যে কোন প্রদর্শনী দেখা আর রবীন্দ্রকাব্যে মগ্ন হওয়ার মধ্যে প্রায় কোন পার্থক্যই নেই। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নান্দনিক অনুভূতির পরিণতি এর চেয়ে আর বেশি কী-ই বা হতে পারে। কিন্তু, তবু তা আধ্যাত্মিকতাবাদ বা অধিবাস্তববাদে পরিণত হলো না। প্রাচীন পুরাণের স্মৃতি বাংলা চিত্ররীতিকে তখনকার মতো অন্তত সংঘবদ্ধ স্মৃতি-ভ্রংশতার হাত থেকে বাঁচাল। পশ্চিম-ইউরোপে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনার মূলে, এদেশে তখনও তা এসে পৌঁছয়নি। কেননা এই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে বিকশিত ধনতন্ত্রের গভীর যোগ রয়েছে। এখানে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও টমাস ব্যাবিংটন মেকলের নতুন শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ধনতন্ত্রের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে, এমন সমস্ত শক্তিই জমির মালিকানা আর চাকরির মধ্যে রুদ্ধ হয়ে গেল। এবং যে-পর্যন্ত দেশীয় বাণিজ্যপুঁজি শিল্পপুঁজিতে স্বাভাবিকভাবে পরিণত হওয়ার পথে বাধা পেল, ধনতন্ত্রের বিকাশও ততদূর পর্যন্ত খন্ডিত হয়ে রইল।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার যে-কোন প্রকরণগত মূল্যায়নে জাতীয় কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশের পরেপরেই এ সন্দেহ অনিবার্যভাবে জাগে যে তা সঠিক অর্থে আদৌ ভারতীয় কি না। একথা বলতে গিয়ে অবশ্য এখানে চৈনিক ও জাপানী রীতির সচেতন বা অসচেতন অনুকরণের কথা বলা হচ্ছে না। বস্তুত, এসময়ের বহু আগেই ভারতীয় চিত্রকলায় তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সন্দেহের কারণ রয়েছে অন্যত্র। ভারতবর্ষে শিল্পী এবং কারিগরের মধ্যে কোনদিন কোন প্রভেদ ছিল না। দু'জনেই ক্র্যাফট্‌স্‌ম্যান, কারুশিল্পী, এবং তারা সকলেই অজ্ঞাতনামা। ছবিকেও কখনো স্থাপত্য থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি। এবং সেখানে বিষয়ের কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু এখানে, বাংলায়, কারুশিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছবিকে সুকুমার শিল্প বা চারুকলা হিসেবে গ্রহণ করা হলো। ছবি-আঁকিয়ের প্রচার বাড়ল, আর এখন সে তার স্বকীয় প্রয়োগকৌশলের জন্য দাবি জানাল স্বাধীনতার। তার বিষয়কে অত্যন্ত কাব্যিকভাবে উপস্থাপিত করা হলো। অবশ্যই, এইসব ভারতবর্ষের প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ নয়। পরিবর্তে, এখন তার অন্বিষ্ট একটা বিশ্বজনীন আধুনিক ধারণা এবং একটা বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক ধরন। ইউরোপে চারুকলার সঙ্গে কারুশিল্পের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় শিল্প-বিপ্লবের যুগে। শিল্পীর নাম প্রথম শোনা গেল, যখন কারুশিল্পী সঙ্ঘগুলি সংকীর্ণ আর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে উঠেছে, এবং সামন্ত বা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে সাধারণ জনজীবন থেকে বহুদূরে। আবার সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীকে তার ছবির ক্রেতা খুঁজতে হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে, আর সাধারণের অনুমোদনলাভের জন্য তাকে লড়তে হচ্ছে তাদের সঙ্গে, যারা তার সতীর্থ, সহশিল্পী। প্রতিযোগিতা জন্ম দিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, বাণিজ্যিকতা দুটোকেই আরো বাড়িয়ে দিল। জনসাধারণ এখানে আর কোন গোষ্ঠী নয়, এর মানে তারাই, খরচ করার মতো প্রচুর অর্থ যাদের আছে। পুঁজির জন্ম ও সঞ্চয় জমি থেকে নয়, কলকারখানা বা শিল্প-বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিনিয়োগ থেকে, কখনো বা উত্তরাধিকারসূত্রে।

প্রায় একইরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেল এখানেও। জনসাধারণের সংস্কৃতির প্রতি কোন ভণিতা ছিল না। বাঙালী বাবু সম্প্রদায়ের না ছিল সেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা, না ছিল আগের মতো ঐশ্বর্য। বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় আর জমিদার শ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশই তখন ছবির একমাত্র ক্রেতা। ছবির বাজার যখন এভাবে সংকুচিত হয়ে এল, মিথ্যে বুর্জোয়া আত্মগরিমাকে আরো ফাঁপিয়ে তুলতে ছবিকে স্বভাবতই হয়ে উঠতে হলো সুকুমার শিল্প, চারুকলা। ছবির নামকরণ দরকার হয়ে পড়ল তার বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করতে, আর তাকে অন্তত আপাতভাবে অত্যন্ত বেশি ধর্মীয় আর কাব্যিক হয়ে উঠতে হলো (বাঙালী বুর্জোয়ারা তো খুব বেশিরকমের কাব্যিক আর ধর্মভাবাপন্ন!)। অসাধারণ রুচিহীনতার সঙ্গে ছবির বিষয়কে বিজ্ঞাপিত করা হলো।

এভাবে প্রায় একশ বছর আগে ইউরোপীয় শিল্পকলাকে যে-বাস্তবের সম্মুখীন হতে

হয়েছিল, এখানে প্রায় তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। দু'দেশকেই দেখতে হলো, সামন্ত পৃষ্ঠপোষকতায় কাল কেমন করে শেষ হয়ে আসছে, এবং কীভাবে প্রায় সমস্ত কারু-শিল্পী সংঘ ভেঙে যাচ্ছে চোখের ওপর। ব্রিটিশ আধিপত্যরক্ষার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের শর্ত যে-ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি করল, তার ফলে বাংলার বুর্জোয়ারা পরিণত হলো বৃত্তিজীবী শ্রেণী বা মূলত চাকুরিজীবীতে। তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো এই যে বাংলায় ছবি কেনার লোকের ভয়ানক অভাব দেখা দিল। অন্য কথায়, যখন জমিদাররা পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়ার বদলে শুধুমাত্র খাজনা আদায়-কারী হিসেবেই রয়ে গেল আর স্থানীয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের কাছেও যখন তাদের স্বাভাবিক বিবর্তনের ছবিটা অস্পষ্ট, উপরন্তু অন্যান্য প্রদেশের বুর্জোয়ারা যখন প্রায় তাদের পথে বসিয়েছে, শিল্প ও কারুকলার পৃষ্ঠপোষকতা তখন স্বাভাবিক কারণেই দারুণভাবে কমে গেল। সুতরাং, বাংলার ছবিতে সামাজিক বিষয়বস্তুর অভাব, বা প্রয়োগকৌশলের যে-অসম্পূর্ণতা, তার মূল রয়েছে এই সামাজিক অবস্থার গভীরে। এবং উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে তার প্রভেদও এইখানে।

শেষপর্বের, অর্থাৎ ১৯১৯-পরবর্তী সময়ের বাংলা চিত্ররীতিকে যদি সম্পূর্ণ ভারতীয় বলা না যায়, তাহলে বোধহয় এই রীতি-অনুসারী ছবির প্ল্যাস্টিক গুণ ছিল, একথা বলা আরো দুঃসাধ্য। বরং বলা যায়, এ ছিল ছবির প্ল্যাস্টিক গুণ ও ধরা যাক, গল্প বলার জন্য যে-ধরনের সাহিত্যগুণ দরকার হয়, তার এক বিচিত্র মিশ্রণ। বেশির বেশি তার চেষ্টা ছিল সাঙ্গীতিক গুণ অর্জনের। বাদবাকি অধিকাংশই নিছক কাব্যিক। এছাড়া, অন্যান্যরা ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তীর বীরদের জীবন অবলম্বন করে আঁকলেন নানা নাটকীয় দৃশ্য। যার কোনকিছুকেই, আর যাই হোক, সমসাময়িক বলা অসম্ভব। বাস্তবধর্মী শিল্পকলার সবচেয়ে স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি যা, অর্থাৎ পোর্ট্রেট বা ল্যান্ডস্কেপ, এখানে খুবই লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। আর যখনই তাঁরা সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন, সেসবই হয়েছে অতি রোম্যান্টিকতায় ভারাক্রান্ত। মানুষের চরিত্র যেটুকু ছবির পটে এসেছে, সাধারণত তা আদিম, এবং কোনভাবেই তা বাঙালী বলে ভুল করবার জো নেই। ল্যান্ডস্কেপও কদাচিৎ শহরের, যদিও গগনেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

এখন ছবির সাথে সাহিত্যের, বিশেষত গীতিকাব্যের এই ঘনিষ্ঠতার শর্ত নিহিত রয়েছে বৃত্তিজীবী বা চাকুরিজীবী শ্রেণীর হাতে এর পূর্ববর্তী বিকাশের মধ্যে। কিন্তু তার আসল কারণ রয়েছে অন্যত্র। তা নইলে, ছবি-আঁকিয়েরা, যাঁরা মূলত এসেছেন অর্ধশিক্ষিত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে, তাঁদের কাজ আমাদের পক্ষে আদৌ তৃপ্তিদায়ক হতো না। বাংলার চিত্রকলায় কোন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু দেখা গেল না এই কারণে যে এ কোন অর্থনৈতিক বিপ্লবের সূত্র ধরে এল না। সুতরাং, এই চিত্রকলা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তনকে না পারল ধারণা করতে,

না পারল প্রতিফলিত করতে, এমনকি তা দেখাতে পর্যন্ত পারল না। যে-পুরনো মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, এ সেই মনোভাব আঁকড়ে ধরে থাকল। এই অন্তর্নিহিত নান্দনিক অশুদ্ধতা বাংলার সঙ্গীতের মতো ছবিরও একটা বৈশিষ্ট্য। যে-শ্রেণী তার অবসরে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারত, অথবা সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারত, যে-অবস্থায় 'বিশুদ্ধ' শিল্পের বিকাশ সম্ভব হতে পারে, তা তখনো সেভাবে আকার পায়নি। শিল্পের বিশুদ্ধতা সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাজনেরই ফলাফলমাত্র। কিন্তু দেশীয় শিল্পবিকাশের অনুপস্থিতিতে বাংলায় শ্রেণীসমূহ ছিল মিশ্রিত।

একমাত্র যুদ্ধ-পরবর্তীকালেই শ্রেণীগুলি মনে হলো যেন ধীরে ধীরে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এজেন্সির ভূমিকা তখন একমাত্র বাংলাতেই চোখে পড়ে। পাটের বাজারে দারুণ মন্দা জমিদারদের স্বার্থে ভয়ানকভাবে আঘাত করল। এদিকে, বৃত্তিজীবী শ্রেণীর স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেকারীর ক্রমবর্দ্ধমান চাপে। কৃষকশ্রেণী ক্রমশ দারিদ্র্যের আরো গভীরে নিমজ্জিত হয়ে গেল। অন্যদিকে, যুদ্ধের পরে, আমরা দেখলাম বিজ্ঞান ও পুঁজির প্রয়োগ ছাড়াই কৃষিক্ষেত্রে একটা নীরব পরিবর্তন ঘটে গেল। ইউরোপেও যার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রায় একইরকম ছিল। বড় জমিদারির হস্তান্তর ঘটল। মধ্যবর্তী শ্রেণীর জমিদার, যারা মাঝারি আকারের ভূসম্পত্তি থেকে খাজনা পেত, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। আর জমির ওপর নির্ভরশীলতা যাদের কম, তারা এসে ভিড় করল কলকাতায়। ভূসম্পত্তি আইনের প্রবর্তন হলো, যা পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির পেছনে আরো শক্তিশালী কারণ হিসেবে যুক্ত হলো। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মধ্যেও প্রায় একই ব্যাপার চোখে পড়ে। ইতিমধ্যে, কলকাতার নিকটবর্তী মিল অঞ্চল অন্যান্য প্রদেশের সর্বহারায় প্রায় ভরে উঠল। বাংলার ভূমিহীন সর্বহারা মিলে যোগ দেওয়ার বদলে তখনো তার পৈতৃক জমি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চেষ্টা করছে। ময়মনসিংহের লোকেদের আসামে অনুপ্রবেশও জমির ওপর জনসংখ্যার চাপকে খুব সামান্যই হ্রাস করতে পারল। শ্রমের চাহিদা যেখানে ছিল, যেমন সিলেট, তা-ও বহুদূরে। অতএব, উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর যে বিভাজন এখানে স্পষ্ট হয়ে এল, তা ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে উদ্ভূত শক্তির ফলাফল নয়, বরং বেকারীর ক্রমবর্দ্ধমান চাপই তার মূলে, যা শিল্পের সঙ্গে নতুন সংযোগ গড়ে ওঠার পরিবর্তে জমির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাকেই প্রমাণ করে।

কাজেই, বাঙালী শিল্পীকে এখন নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হলে যথেষ্ট ঐতিহাসিক কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। খিদিরপুর বা ব্যারাকপুরের দিকেও যদি সে যেত, তাহলে হয়তো দেখতে পেত কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে। চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ থেকে নতুন ধরনের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা যদি লাভ করতে হয়, তাহলে তাকে নতুন আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা দেখতে হবে। অথচ, আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্ররা এখনো তাদের মনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব,

আবেগ—এইসব নিয়ে কাজ করছেন। যারা বয়সে তরুণ, যাদের কল্পনাশক্তি আছে, তারা হয়তো রাশিয়ান পোস্টারের অনুকরণ করছেন। বিপ্লবী শিল্পকর্মের জন্য আমাদের এখনো অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে লোকশিল্পের গঠন ও শৈলীর দিকে আমাদের চোখ পড়েছে। এসমস্ত ছবিতে নতুন ধরনের প্রয়োগকৌশল রয়েছে বটে, কিন্তু শুধু প্রকরণের নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই সমাদরের বস্তু হতে পারে। আসলে আমাদের জীবনযাত্রার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৃহত্তর ভিত্তির ওপর তা স্থাপিত হওয়া উচিত। একমাত্র তখনই তা প্রথমত সামাজিক অর্থে, এবং দ্বিতীয়ত নান্দনিক অর্থে মূল্যবান হতে পারে।

কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলার বাইরে বাংলা চিত্ররীতির সাফল্য প্রায় বিস্ময়কর। বেনারস, লক্ষ্মৌ, জয়পুর, লাহোর, রাজামুন্দ্রি, মাদ্রাজ, দিল্লী, দেরাদুন থেকে শুরু করে দেশে এমন কোন প্রধান কেন্দ্র নেই, যেখানে এই রীতির প্রভাব না পড়েছে। একমাত্র বোম্বাই বোধহয় ব্যতিক্রম। এই সমস্ত শহরে ছবির প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, তরুণেরা কাজ শিখছেন হাতে-কলমে। যদিও অধিকাংশই নিকট-অতীতে পাদচারণা করছেন, তা সত্ত্বেও অন্তত কয়েকজন নতুন পথের অনুসন্ধান করছেন। এমনকি, লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসেও বাংলার চিত্ররীতি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। আধুনিক বাংলা ছবি বা নিদেনপক্ষে তার প্রিন্ট ধনীগৃহে শোভা পাচ্ছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতায় কয়েকজন তরুণ শিল্পী স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের ছবি ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করতে শুরু করেছেন। এসব ছবিতেই বলিষ্ঠতা আছে। কিন্তু হীনমন্যতা অথবা আগের সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় যে-আরোপিত কৃত্রিম বলিষ্ঠতা, তার সঙ্গে ছবিতে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর প্রকৃত বলিষ্ঠতাকে আলাদা করতে হবে। তাছাড়া, যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্প এখন অনেক সহজলভ্য বলে এজাতীয় বলিষ্ঠতার ভান করা তেমন শক্ত কিছু নয়। এক্সপ্রেশনিস্ট, কিউবিস্ট বা কন্স্ট্রাকশনিস্ট ছবি আমাদের হাস্যোদ্রেকই করে, যখন তা ভবিষ্যত আশার কোন দিগন্ত আমাদের দেখাতে পারে না। কিন্তু কয়েকজন তরুণ বিদ্রোহীর ছবিতে এখন সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চোখে পড়ছে, যদি আশা করার কোথাও কিছু থেকে থাকে, তবে তা একমাত্র এখানেই।

আগে যে-সমস্ত প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হলো রবীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায়ের ছবি তারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। এঁদের ছবিতে সেইসমস্ত অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ ঘটেছে, যা বাংলার অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশ এক-না-একসময় অবশ্যম্ভাবীভাবে সামনে নিয়ে আসত। এঁদের ছবিতে, দেখা গেল, সাহিত্যিক উপাদান বর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। খুবই আশ্চর্য যে সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সাহিত্যের সর্বাত্মক প্রভাবের জন্য যিনি সম্পূর্ণ দায়ী, তাঁরই প্রতিভার সর্বশেষ প্রকাশে সাহিত্যিকতা, এমনকি কাব্যিকতাও আর রইল না। কবির কিছু রঙীন ছবিতে আদিম প্রাণময়তার প্রকাশ

স্পষ্ট। অন্যদিকে, যামিনী রায় অবশ্য শিল্পশিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমনকি কিছুকালের জন্য, চলতি কথায় যাকে আমরা কালিঘাট পট বলি, সে সম্পর্কেও ভেবেছেন। সামাজিক জীবনের বিকাশ স্বাভাবিক হলে শিল্পীর জীবনের সঙ্গে সমাজজীবনের যে-গভীর সংযোগ থাকা সম্ভব, এবং তার ফলে শিল্পীর দৃষ্টি-ভঙ্গিতে যে-পরিণতি আশা করা যায়, বাস্তবে তা তাঁর ছিল না। পরিবর্তে, তিনি সময়ের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে চিত্রশিল্পের বহুকথিত মূলগত সত্যকে আঁকড়ে থাকলেন। অবশ্য এই ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ববোধের তুলনা নেই। আর তাঁর এই দায়িত্ববোধ এক অর্থে আমাদের ব্যর্থতার পরিচয়। আজ ভারতে তাঁর থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী আর কেউ নেই। এবং শুধুমাত্র ভাবনার দিক দিয়েই তাঁকে প্রগতিশীল বলা তাঁর কৃতিত্বের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার নয়।

অতএব মনে হয় আমাদের শিল্পকলায় আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তীব্র প্রয়োজন ঘনিয়ে এসেছে। কিছু কিছু পরিবর্তন যে হচ্ছে না, তা-ও নয়। যদিও, তার মধ্যে কিছু নেহাতই অর্থহীন, বাদবাকি শুধু প্রয়োগকৌশলের দিক থেকেই আকর্ষণীয়। প্রকরণের পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষিত হলেও তার তাৎপর্য কখনোই সুদূরপ্রসারী নয়। এমনকি তা-ও যা হচ্ছে, তা রবীন্দ্রানুসারী ছবি-আঁকিয়েরা যা করেছিলেন তার থেকে কম মূল্যবান। অর্থাৎ, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে যে-আঙ্গিকগত পরিবর্তন অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রার মৌল পরিবর্তনের ফলে যার জন্ম, একমাত্র তাই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই পরিবর্তন সমাজে যখন বাস্তব হয়ে ওঠে, স্বাভাবিকভাবেই নানাদিকে পরীক্ষানিরীক্ষার একটা আবহাওয়া গড়ে ওঠে, প্রযুক্তিবিদ্যায় নিত্যনতুন উদ্ভাবনও সম্ভব হয়ে ওঠে। শিল্পকলা তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি তার ভাববস্তু সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়। একথা বলা বাহুল্য যে কেউই নিঃসঙ্গ দ্বীপে রবিনসন ক্রুশোর মতো বাঁচতে পারেন না। সুতরাং সংকটের মধ্যে দিয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া শিল্পের প্রগতি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন শিল্পীকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি মূলত ভুল হলেও, অন্তত ঐতিহাসিকভাবে সত্যি কথাই বলেছেন। কারণ ভারতবর্ষে শিল্পীর অবস্থান বাধ্যতা-মূলকভাবে তাই-ই ছিল। আর অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে বাংলায় তা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি।[১] □

১. New Indian Literature, Vol. 1. No. 1., 1938.



# চিত্তপ্রসাদ

# ছবির সংকট

আমাদের জীবনের আর সকল দিকের মতো ছবির দিকটাও আজ সংকটাপন্ন। কিন্তু সেটা এমনকি বেশির ভাগ চিত্রকরেরও চোখে পড়েনি। আমাদের দেশের দু'চারজন সমঝদার ভিন্ন, সাধারণ সকলেই বলবেন—"হাটে-বাজারে ঘরে-বাইরে ছবির তো ছড়াছড়ি, আর সে-সব ছবিতে রঙ-চঙেরও ঘাটতি দেখিনে, কোথায় বাপু ছবির সংকট।" শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তো প্রায় সকলেই বলেন—"ছবি দেখাটাই তো একটা সংকট বিশেষ বলে জানি, ছবির আবার সংকট কিসের?" এক কথায়, ছবি আজ মানুষের কৃপাদৃষ্টির কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ; ছবির মধ্যে যে সম্পদ থাকলে ছবি মানুষের জীবনে অপরিহার্য হতে পারে সে সম্পদ তার মধ্যে খুঁজে মিলছে না ; ছবিকে মানুষ আজ দূর থেকে চলতে চলতে দেখে, পেছনে ফেলে চলে যায় ; ছবির জন্যে শিল্পীর কাছে ভিড় জমে না, ছবি দেখবার জন্যে মানুষ সময় করে নেয় না—এই হলো ছবির সংকট। আর এই সংকটের মূল আছে সামাজিক সংকটের মধ্যে নিহিত—কী ভাবে, তারই আলোচনা করলে আমরা এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথও দেখতে পাব।

এখন, ছবির মধ্যে সম্পদ হলো শিল্পীর মনের কথা। শিল্পীর মনের কথাটা সম্পদ কেন? কারণ শিল্পীর মন যেটা বলে সেটা সমাজের প্রাণের কথা; সমাজ যেটা গুছিয়ে বুঝতে এবং বলতে পারে না শিল্পী সেটা পারেন; আর সেই গুছিয়ে বলা আর শোনার মধ্যে দিয়ে সমাজ এগুবার বা পেছুবার একটা শক্তি পায় ভালো বা মন্দের দিকে। সেই শক্তিটাই ছবির সম্পদ এবং এই হলো ছবি বুঝবার মূল সূত্রের সংক্ষিপ্তসার।

ছবি জিনিসটির মধ্যে মানুষের মন বা চিত্ত থাকে তাই তার নাম চিত্র দেওয়া হয়েছে; আর সেই চিত্তকে গুছিয়ে দশজনের কাছে সহজবোধ্য করে প্রকাশ করবার উপায় শিল্পীরা গড়ে তুলতে পারেন, তাই ছবি আঁকার আর এক নাম সৃষ্টি করা। সৃষ্টি করার মূল তাগিদটা আসে চিত্তকে প্রকাশ করার ইচ্ছার মধ্যে। চিত্তই চিত্রের আসল কথা। রেখারঙের যে-কারিগরি এই চিত্তকে যত বেশি প্রবলভাবে প্রকাশ করতে পারে সে কারিগরি ততই সার্থক অর্থাৎ সেখানে ততই শিল্পীর কল্পনাশক্তির বাহাদুরি।

ছবির মধ্যে চিত্রকরের মারফতে মনগুলি প্রকাশ পায়। সমাজের মন এক-এক যুগে এক-একরকমের হয়ে থাকে, আর সমাজ নানান শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় সমাজের মনও নানান রকমের হয়ে থাকে। তাই এক-এক যুগের চিত্রকর এক-একরকমের মন ছবির মধ্যে এঁকেছেন এবং যে-শ্রেণীর প্রভাব চিত্রকরের মনের ওপর প্রবলতম হয়েছে সেই শ্রেণীর মনকেই এঁকেছেন।

সমাজ যে কথাটা গুছিয়ে বলতে পারে না, সেটা হলো তার এগিয়ে যাবার বা পেছিয়ে পড়বার ইচ্ছার বা শক্তির কথা—অর্থাৎ তার আদর্শের কথা। প্রত্যেক যুগের চিত্রের মধ্যে সে-যুগের সমাজের আদর্শের কথাটাই আঁকা হয়েছে; চিত্রকরের মনের ওপর যে-শ্রেণীর আদর্শের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সেই শ্রেণীর আদর্শকেই ছবিতে আঁকা হয়েছে, আদর্শকে সামাজিক জীবনে সক্রিয় করে তুলবার জন্যে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিকারী-জীবনই ছিল আদিম সমাজের আদর্শ, তাই ছোট-নাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক গুহার মধ্যে দেখি আদি চিত্রকর এঁকেছে শিকারের ছবি। শুধু সময় কাটাবার জন্যে সে-সব ছবি আঁকা হতো না; পণ্ডিতেরা সবাই একমত, যাদু-বিদ্যার দ্বারা শিকারের পশুসংগ্রহের জন্যে, তখনকার সামাজিক খাদ্যব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক উপায় হিসেবে, এককথায়, সমাজের ভালোর জন্যে সমাজের হাতের হাতিয়ার হিসেবে আদি চিত্রকর পশুচিত্র শিকারচিত্র এঁকেছে, তাই আদি চিত্রে ফুল পাখি নদী প্রভৃতি সৌন্দর্যসর্বস্ব ছবি আঁকেনি।

ছবি যেমন একদিকে সমাজের ভালো হবার ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে, তেমনি আদর্শের আর এক অঙ্গ হিসেবে ভালো হবার পথে এগিয়ে যাবার শক্তিও যুগিয়েছে, সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে—এজিটেটর হিসেবেও দেখা দিয়েছে, অর্গানাইজার হিসেবেও। আরো ঠিক করে বলা চলে, সমাজ তার নিজের ভালোর জন্যে বা নিজের ইতিহাসকে গড়বার কাজে ছবিকে হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ সমাজের কাজের পথ

ছেড়ে চিত্রকর আপন খেয়ালে বেপরোয়াভাবে সমাজের যে কোন মনকে প্রকাশ করে যাননি। বৌদ্ধযুগের ছবিগুলি সমাজের মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আঁকা হয়েছিল। (সে-যুগে ছবি ধর্মের অঙ্গ ছিল অর্থাৎ পুরোহিত বা আচার্যদের অনুগত থাকতে বাধ্য ছিলেন সে-যুগের চিত্রকর, ইচ্ছা করে তাঁরা সমাজের হাতিয়ার-যোগানদার হননি—এই কথা বলে যারা ছবির তথা শিল্পীর সামাজিক মূল্যকে সৌন্দর্যগত মূল্যের তথা শিল্পীর খেয়ালের মূল্যের তুলনায় উপেক্ষণীয় বলতে গৌরব বোধ করেন, তাদের কাছে সকল মানুষের, এমনকি, শিল্পীরও স্বাধীনতার অর্থ মানুষের আপন হাতে আপন উন্নতির পথ গড়ে চলা নয়, হয় অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করা, নয়তো এনার্কি। এই শ্রেণীর 'খেয়াল-সর্বস্ব' শিল্পীদের হাতে পড়েই আজ ছবির রাজ্যে মারাত্মক সংকট ঘটেছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ চিত্রকরদের ছবিতে যে-সৌন্দর্য ফুটেছে তা চিরকালই অম্লান থাকবে, আর সে-সব চিত্রকরদের কল্পনাশক্তি যে অসীম ছিল তা নিয়েও জগতে কোথাও কারও দ্বিমত মেলেনি।)

এখন সমাজের সবাইকার ভালো হবার ইচ্ছাতেই, সুখে শান্তিতে বাঁচবার ইচ্ছাতেই নেতা আর নিয়ন্ত্রিত হিসেবে শ্রেণীভেদসৃষ্টি সমাজই করে নিয়েছিল। আদিকালে 'যাদু-বৈজ্ঞানিক' বা পুরোহিতরাই হয়েছিলেন নেতাশ্রেণী। আদিকাল থেকেই ছবি 'যাদু-বিজ্ঞানের' বা ধর্মের অঙ্গ ছিল অর্থাৎ নেতাশ্রেণীর অধিকারে ছিল—নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর কাজে লাগানো হতো, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী নিজের শ্রেণীর ইচ্ছামতো বা দরকারমতো ছবিকে ব্যবহার করতে পারত না। পরবর্তীকালে দেবদেবীর মূর্তি বা ছবি সমাজের সর্বশ্রেণীর হিতের জন্যেই গড়া হতো, কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের আইনকানুন বেঁধে দিতেন পুরোহিতশ্রেণী। আবার অন্য যুগে, যখন রাজা-বাদশারা সমাজের নেতা হলেন তখন তাঁদের তৈরি শাস্ত্রেই ছবি আঁকা হতে লাগল। মুসলমান শক্তির অভ্যুদয়ে ভারতে সামন্ততন্ত্র যখন কায়েম হলো, ধর্মের হাত থেকে ছবির আদর্শ রাজশক্তির হাতে পাকাপাকিভাবে চলে এল; রাজা-বাদশাদের মূর্তি, শাহাজাদা, শাহাজাদী, সেনাপতি, রাজকুমারীদের মূর্তি, ভারি ভারি যোদ্ধাদের ছবি, ঢাল-তলোয়ার, কামান বন্দুক ছোরা, রাজপ্রাসাদ প্রমোদ-উদ্যান, যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির লড়াই, শোভাযাত্রা প্রভৃতির ছবি —এককথায় রাজমহিমায় মহিমান্বিত যা কিছু অর্থাৎ রাজতন্ত্রই ছবির আদর্শ হিসাবে দেখা দিল।

সামন্তযুগের শুরুতেই যেমন শ্রেণীবিভাগ কায়েম হলো সমাজে, তেমনি ছবির আদর্শও বিভক্ত হয়ে গেল একেক শ্রেণীর একেক আদর্শের তাগিদে। সেই আদর্শ ভেদটা পরিণত ও স্পষ্ট দেখা গেল মুসলমান আমলে। একদিকে প্রভুত্বের এবং দাসত্বের জয়গান চলতে লাগল রাজা-বাদশাদের দরবারে ও অন্দরে; অন্যদিকে শাসিত সমাজে প্রেম মৈত্রী সাম্যের আদর্শ—রাজশক্তিকে উপেক্ষা না করে ও মনুষ্যত্বের জোরেই টলিয়ে দেবার ভরসা নিয়ে—মাথা তুলে দাঁড়াল; জনতার এই 'বিদ্রোহী' আদর্শের

ছবি হলো রাধাকৃষ্ণের ছবি—। সে ছবির মধ্যে হিঁদুয়ানিটা আসল কথা ছিল না, বরং ইসলামের মনুষ্যত্বের কাছে আপীল ছিল, অহিংসার পথে তখনকার যুদ্ধ-সমস্যার সমাধানের জন্যে ব্যাকুল চেষ্টা ছিল, নূতন দলের সঙ্গে পুরানো অধিবাসীদের মিলে যাওয়ার চেষ্টা ছিল (অহিংসার জন্য আরেকটা কিছু না হয়ে—এমনকি সুফীবাদ না হয়ে—রাধাকৃষ্ণ কেন? কারণ মুসলিম জনসাধারণ সামন্তবাদেই সেদিন মশগুল—বিজয়ীপক্ষ কিনা, তাই। ওদিকে পরাজিত এবং রণক্লান্ত কিন্তু হিন্দুসমাজের 'নেতা' রাজপুতেরা রাধাকৃষ্ণভক্ত বৈতবাদী ছিলেন। তারাই তখনকার ভারতের প্রজাকুলের মুখপাত্র। কাজেই রাধাকৃষ্ণ)।

মুসলিম যুগের বহু পূর্বেই ধনীদের আদর্শ ও বিলাসের ক্ষেত্রে ছবি সীমাবদ্ধ হতে শুরু করেছিল, যদিও অন্যান্য শ্রেণী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হবার পূর্বে। ইংরেজ রাজত্বে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে গেল। বুর্জোয়া বলতে যা বুঝায় তা সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি। আর এদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীও দুভাগে বিভক্ত হয়ে দেখা দিল। একভাগ সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের সুযোগ নিল—ব্যবসাতে বিদেশীর শরিক হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। তাদের মারফতে এদেশে য়ুরোপীয় চিত্রের কারিগরির আমদানি হলো; সেই কারিগরি দিয়ে ছবিকে বাজারের পণ্য হিসেবে চালু করবার চেষ্টা শুরু হলো। এইভাবে এদেশে কমার্শিয়াল আর্টের গোড়াপত্তন হলো। যদিও খোলাখুলিভাবে কমার্শিয়াল আর্টের চর্চা শুরু হতে আরো কিছুদিন সময় লাগল, তবু ব্যবসাদারের প্রভাব ও পরামর্শকে সামাজিক আদর্শগত ছবির চেয়ে বড়ো করে দেখা এবং টাকার মূল্যে ছবির দাম ঠিক করা আরম্ভ হলো; এবং যাঁরা এইভাবে ছবি আঁকলেন প্রথমে তাঁদের মধ্যে রবি বর্মা, ধুরন্ধর প্রভৃতির নাম অনেকের আজো মনে আছে।

বুর্জোয়ার আর এক ভাগ হলো জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে গঠিত। রামমোহনের কিছুদিন পরে ওদিকে জাতীয় কংগ্রেস, এদিকে হিন্দুমেলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যে-দেশপ্রেম দুরন্ত আবেগে আত্মপ্রকাশ করল, সেই দেশপ্রেমের উদ্দীপনা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। কী রাজনীতি, কী সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, পুরাণ—কোনকিছুই বাদ পড়ল না তখনকার ছবির মধ্যে। জাতীয় জীবনের আদর্শ মুখর হয়ে উঠল ছবির মধ্যে। ছবির মধ্যে কোন আদর্শ, কোন নীতি না-থাকাটাই তখন ছিল ছবির চরম ত্রুটি; আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টাতেই কল্পবৃক্ষ হয়ে উঠল ছবি। কত রকমারি কারিগরি—কল্পনাশক্তির কত অজস্র প্রকাশ। ভারতীয় ছবি বলতে যে একঘেয়ে কারিগরিকে আজকের বাজারে বেরোতে দেখি, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার চিহ্নমাত্র ছিল না নবজাত ভারতীয় চিত্রে। স্বদেশকে ভালোবাসার এত জীবন্ত, এত রকমের এত বেশি ছবি

এদেশে তার আগে বা পরে আর দেখা যায়নি। তবু, সে সব ছবি তখনকার এদেশের সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর দেশপ্রেমের ছবি, সমগ্র সমাজের নয়। শুধু দেশপ্রেম বললে বোঝানো যাবে না, সাম্রাজ্যবাদী ধনিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বললে ঠিক বলা হবে। এদেশের ধনিক ও শিক্ষিতের, অর্থাৎ নেতৃশ্রেণীর বিদ্রোহ যে পথে চলেছিল আসল শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে সে পথ ঠিক অনুকূল ছিল না; এবং তখনকার দিনে শোষিত শ্রেণীর নিজস্ব কোন নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি, তার জন্যে যে পথ প্রয়োজন ছিল সে পথ পরিকল্পনা করাও নেতৃশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার ইংরেজ কূটনীতিজ্ঞেরা সে পথকে 'ভয়ংকর বিপ্লব' বলে ঘোষণা করেছিল; আর এদেশের ইংরেজী সভ্যতার গুণগ্রাহী শিক্ষিত সমাজও সে পথ সম্বন্ধে ঐ মতই পোষণ করে এসেছিলেন। এককথায়, শোষিত শ্রেণীর দেশপ্রেমের তথা বিদেশী-বিদ্বেষের কোন খবরই, স্বভাবতই, অবনীন্দ্রনাথ ও গগন ঠাকুরের ছবিতে পাই না। তাঁদের ছবিতে যে দেশপ্রেম রূপ নিল, তার আদর্শ গড়ে উঠেছিল জনতার বৈপ্লবিক শক্তিতে অবিশ্বাসের ওপর। জনতার উত্তেজনাকে তাঁরা অন্ধশক্তি বলে বুঝতেন—( তেইশ বছর আগেকার রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই।" কাজেই "আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জারতন্ত্র ও বলশেভিকতন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।"—প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তেরকথা'র ভূমিকা ১৩২৭ বাংলা।)

জনতার শক্তির প্রতি এই অবিশ্বাস ও ভয়, আর অন্যদিকে ঔপনিবেশিক হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্রসভ্যতার হাতে এদেশের ধনিকের পরাজয়ের গ্লানি—এই দুটোই এদেশের শিক্ষিত সমাজের দেশপ্রেমের আদর্শকে সমসাময়িক সমাজের বাস্তব সম্পদ ও শক্তির ক্ষেত্রের বাইরে এবং মানসিক ও কাল্পনিক সম্পদ ও শক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের কাজে। সমাজ-নিয়ন্ত্রণের কাজে ক্রমবর্ধমান নাগরিক জীবনের চেয়ে পল্লীজীবনই শিক্ষিত সমাজের কাছে আদর্শ হয়ে উঠল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই যন্ত্রসভ্যতার চেয়ে সামন্ততন্ত্রই বড় হয়ে উঠল। প্রবল দেশ-প্রেমের তাগিদেই সংস্কৃতিওয়ালারা নানান যুগের দর্শনকে, নানান কালের সামাজিক আদর্শকে পুনরুদ্ধারের সাধনা করলেন; সে-সব দর্শন ও আদর্শের বাহিরাবয়ব থেকে সমসাময়িক বাস্তব পরিবেশের ইতিহাসকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলা হলো; এবং (যন্ত্র-সভ্যতা তথা সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট য়ুরোপকে এবং বাস্তববাদকে তুচ্ছ ও অমানুষিক প্রমাণ করে স্বদেশের গৌরববৃদ্ধির জন্যে) সকল দর্শন ও আদর্শের মাঝ থেকে মূলসূত্রের এক নির্যাস বানিয়ে তাকে ভারতের চিরন্তনী বাণী বলে জগতে প্রচার করা আর স্বদেশের জনতার ওপর 'আরোপের' চেষ্টা চলতে লাগল। দেশমাতৃকার যে-ছবি





অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকলেন তা কল্পনা হিসাবে অতুলনীয় সুন্দর, কারিগরিতে নিখুঁত জীবনের প্রতীক; কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার ক্ষেত্রে সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে তখনকার জনতা যে-শক্তির প্রেরণা খুঁজছিল, অবনীন্দ্র ঠাকুরের সন্ন্যাসিনীর ছবি থেকে সে শক্তি মেলে না—শুধু ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগায়। এর ফলে ভারতীয় ছবি ভারতেই ঠিকভাবে গৃহীত হলো না, দেশপ্রেমের নামেও না।

সাধারণ মানুষ, যে-মানুষ ছবি গান নাটক থেকে জীবনসংগ্রামে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাবার প্রেরণা আহরণ করে, তারা ভারতীয় চিত্রকে গ্রহণ করল না—এই ব্যাপারটা তৎকালীন চিত্রকরদের কাছে জনতারই অযোগ্যতার প্রমাণ বলে গৃহীত হলো।

অন্যদিকে, যন্ত্রশিল্পের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসাবে, অর্থাৎ দেশের দশের কাছে, ছাপা ছবিকে ফেলে পাড়িয়ে, হাতের আঁকা ছবিকে পৌঁছে দিতে না পারায়, ক্ষুদ্রতর সমঝদার-গোষ্ঠীর সীমায় সে-সব ছবিকে আবদ্ধ রেখে, ছবির মূল্য বাড়াবার তথা চিত্রকরের মর্যাদা বাড়াবার দিকে চিত্রকরকে প্রবৃত্ত হতে হলো। একদিকে দুর্বোধ্য হওয়াকে, অন্যদিকে দুষ্প্রাপ্য হওয়াকে চিত্রের পরম সার্থকতা হিসেবে গণ্য করা শুরু হলো। অন্যান্য যুগে এবং এ-যুগের শুরুতেও 'গুরুর আসন' থেকে ছবি দেখানো হতো জনসাধারণের ওপর আদর্শ 'আরোপের' জন্য, এবং সমসাময়িক বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সমসাময়িক সিম্বলের সাহায্যে সে আদর্শ আঁকা হতো বলে লোকে তা বুঝত গ্রহণ করত। ভারতীয় চিত্রের পরিণত অবস্থার মধ্যেও, সমসাময়িক সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে সমসাময়িক সমাজের সিম্বলকে (যে সিম্বল চলতি ভাষার মতো দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত তাকে) চোখের সামনে আনল না। পুরানো ইতিহাস, পুরানো দর্শন, পুরানো সমাজ—ভারতীয় ছবির মধ্যে পুরাতনের জয়জয়কার (তা না করেই বা উপায় কী ছিল, বর্তমান ইতিহাস তো ছিল—শিক্ষিত সমাজের কাছে—গবর্নরদের শাসনের কথা দিয়ে, কৃষক ও কারিগরদের হাহাকারে আর নানান কুসংস্কার ও মূর্খতার প্রমাণে পরিপূর্ণ)। কাজেই ভারতীয় ছবি সাধারণের কাছে, সংস্কৃত ভাষার মতো, দুর্বোধ্য বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে উঠল, আর দুচার জন রাজা-নবাবের ঘরে, মূল্যবান গ্রন্থে, উচ্চাঙ্গের পত্রিকায়, উচ্চশ্রেণীর সমঝদারের সংগ্রহশালায় আত্ম-নির্বাসন ঘটিয়ে দুর্লভ হয়ে উঠল। জনতার সঙ্গে তার ন্যূনতম সম্পর্ক, দৃশ্য-দর্শক সম্পর্কটাও শেষ অবধি চুকল। ছবিটা ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ডতার মধ্যে আশ্রয় নিল; দেশপ্রেমের "গবাক্ষ" কোথাও একটুখানি সামান্য থাকলেও ছবি আঁকার প্রেরণার পথ হিসেবে তা রইল না। ঔপনিবেশিক জীবনের দুঃখগ্লানির শেষ রেশ হিসেবে, সামাজিক মনের সৌজন্যমার্জিত বিদ্রোহের মৃদু উত্তাপ হিসেবে, সোজা কথায়, জগতের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবার ইচ্ছার সঙ্গে জড়িয়ে রইল সেই দেশপ্রেম। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং কারিগরিতে ভারতীয়তা বজায় রাখার সতর্ক প্রয়াস—ছবি জনতার দখলের নয়—এমন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে জড়িয়ে দেখা দিতে লাগল। তারই একটা ফল হলো—বিষয় নির্বাচনের মধ্যে সারল্য বর্জিত হলো, কারিগরিও। এই দুয়ের

পন্থটা গত বছর দশবারো পূর্বে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল—প্রথমটা, ভারতীয়তাবোধ বজায় রাখার, প্রাধান্য দেবার ও ছবির দুর্বোধ্যতাকে গৌণ করার দিকে ; দ্বিতীয়টা তার বিপরীত—ছবিকে দুর্বোধ্য করা বা দুর্বোধ্য জগতের ছবি আঁকাই মুখ্য, জাতীয়তা-বোধকে, বিজ্ঞানের নামে, এড়িয়ে যাওয়ার পথে। নন্দলাল বসুর মতো শক্তিমান ও বিখ্যাত শিল্পী এই প্রথম নম্বর পথের পথিক। দ্বিতীয় দলের শক্তির সম্বন্ধে বলা শক্ত এবং খ্যাতিও বিশেষ শ্রেণীর সমঝদারের সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু 'স্কুল' হিসাবে তাঁদের ছবির বৈশিষ্ট্য শিক্ষিতদের কারো কারো নিকট পরিচিত; ইমপ্রেশনিস্ট, কিউবিস্ট,ফিউচারিস্ট, সুররিয়ালিস্ট, প্রভৃতি বিশেষণগুলি এই দ্বিতীয় পথের পথিকদের পরিচয়পত্রের নাম। এদেশের এই দ্বিতীয় দলটির দৃষ্টিভঙ্গি যতটা য়ুরোপের চিত্র-আন্দোলনের প্রতিধ্বনি তত তাঁদের নিজেদের আবিষ্কারের ফল নয়, এবং চিত্র-জগতে য়ুরোপের মতো ট্র্যাডিশন-এর বিরুদ্ধে অভিযান করার চেষ্টা এবং ব্যর্থ চেষ্টা। ব্যর্থ এইজন্য যে, যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেওয়াই এইসব 'স্কুলের' একমাত্র চেষ্টা ছিল তার কোন পাত্তাই মিলল না, মিলল য়ুরোপের ওঁদেরই বুলি ও কারিগরির অনুকরণ করার পরিচয় মাত্র। প্রতি পদে য়ুরোপের ওঁদের নজির দেওয়া ভিন্ন এক পা চলবার শক্তির পরিচয় এদেশের এইসব স্কুলের এঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে দেখাতে পারেননি—অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। রবীন্দ্রনাথের ছবিও এই স্কুলেরই অন্তর্গত—আরো স্পষ্টভাবে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চমৎকার সৃষ্টি।

ওপরে প্রথম পথ বলে যাকে বলা হলো সেই পথেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাটা অস্পষ্ট নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ আরো স্পষ্ট থাকায় দেশের চলিত চিত্ররীতির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটেনি বরং জাতীয় চিত্রভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যবান করে তুলেছে। কিন্তু বাস্তব জীবনকে সমসাময়িক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফলে জাতীয়তাবাদী চিত্র হয়েও সেগুলি রোমান্টিক বা কাব্যিক মূল্যে মূল্যবান হলো এবং সমাজের পরিবর্তনের শক্তিরূপে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তবু নন্দলালের ছবিতে আধুনিক না হলেও সমসাময়িক সমাজের খানিকটা বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে; নন্দলালের হাতে ভারতীয় চিত্র এই দিকে কিছুটা প্রগতিশীল হয়েছে—অর্থাৎ শুদ্ধকার পুরাণ ও পুরানো ইতিহাসের দিক থেকে সমসাময়িকের দিকে এগিয়েছে, সমাজের সঙ্গে তার বন্ধন বাস্তব না হয়ে কাল্পনিক হলেও 'বন্ধন আছে' এই কথাটা তার মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। এইখানেই চিত্রের পুনর্জীবনের প্রচন্ড আশা নিহিত।

সমাজের সঙ্গে ছবির এই-যে কাল্পনিক বন্ধন, অন্য কথায়, সমাজের ভাঙাগড়ার কাজে ইতিহাসের প্রভাব; সোজা কথায়, যন্ত্রসভ্যতার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে গিয়ে আদর্শ-বাদের চোখে সমাজকে এই-যে ভালোবাসা, সমাজের দারিদ্র্য-দুর্বলতাকে বাস্তব ক্ষতি-বৃদ্ধির মাপে না মেপে রোমান্টিক দৃষ্টিতে কাল্পনিক মূল্যে মূল্যবান করে তোলার এই-যে চেষ্টা তার মধ্যেই আছে ছবির সংকটের কারণ নিহিত। এরকমভাবে সমাজকে

ভালোবাসা ও সমাজের মূল্য পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে, তার কারণ চিত্রকর নিজেকে সমাজের বাইরেকার এক জগতের মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে দর্শক হিসেবে সমাজকে দেখছেন, সমাজের প্রভাবকে তাঁর মধ্যে দেখছেন না, সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও প্রগতিকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন না, বর্তমান ইতিহাসের তাৎপর্য বুঝতে পারছেন না।

অন্যদিকে ছবি যদি সমাজেরই অঙ্গবিশেষ হয়, তবে সমাজই বা সে অঙ্গের জীবন-মরণের দিকে অমন অসাড়তার পরিচয় দিচ্ছে কেন? যেমন করে সমাজ কবিতা ও উপন্যাস চেয়েছে তেমন করে ছবিকে চায়নি কেন? সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে মানুষ যেমন করে খুঁজেছে, খুঁজে না পেলে মাথাব্যথা দেখিয়েছে, ছবির বেলায় তেমন মাথাব্যথা নেই কেন? তার কারণ, মূলত, সমাজে সংকট যতই ঘনিয়ে এসেছে সমাজ ততই পথ খুঁজেছে পরিত্রাণের। যে-পথ যুক্তির পথ, তর্ক-সমালোচনার পথ, সাহিত্য কবিতা সেই পথেই চলে। অন্যদিকে ছবি হলো সরাসরি সিদ্ধান্তের আধার।—সমাজ সম্বন্ধে হয় প্রশ্ন নয়তো নির্দেশ। সে নির্দেশকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার বা সে-প্রশ্নকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে বিশ্লেষণ করবার অবসর ছবির মধ্যে অত্যন্ত অল্প—অর্থাৎ ছবি সমাজকে তার সংকট সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট কোন এক পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, এজিটেট ও অর্গানাইজ করতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু পথসন্ধানের কাজে সাহায্য করতে পারে না। এই গেল অনাগ্রহের একটা, কিন্তু গৌণ কারণ।—(গৌণ, যেহেতু শক্তিমান শিল্পীর হাতে পড়লে চিত্রের ঐ সংজ্ঞাও বদলে যেতে পারে, এবং বিশেষভাবে বর্তমান সমাজের ঐ অনুসন্ধিৎসু চিত্তের পরিচয় ছবিতে কেউ প্রকাশ করেননি সেটাও অত্যন্তভাবে ছবির আনপপুলারিটির হেতু)।

ছবির আনপপুলারিটির প্রধান কারণ হলো একদিকে সমাজের চরম দারিদ্র্যতা, অন্যদিকে বিজ্ঞানের দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট সমাজব্যবস্থা। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যে-বিক্ষোভ জমে উঠেছে, অনেকবার অনেক বিদ্রোহ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, সেটা স্বাধীনতারই ইতিহাস হওয়া সত্ত্বেও নবজীবনের একটা স্পষ্ট বা সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে একবারও দাঁড়ায়নি; ইংরেজের শেকল সহ্য হয় না, শেকলটাই আগে ছেঁড়ো, তারপরের কথা পরে হবে—অনেকটা এইরকমের মনোভাব আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মূলে থেকে এসেছে। সেই শেকল-ছেঁড়ার কাজে নেতাদের ওপর অন্ধ নির্ভরতা ভিন্ন উপায় নেই—কারণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বা সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা বা স্পষ্ট ধারণা থাকলে জাতীয় জীবনে সত্যকারের স্বাধীনতা আসে। তা না থাকার ফলে, ছবি হিসেবে একমাত্র নেতাদের প্রতিমূর্তিই পপুলার হয়েছে বা সমাজ সাগ্রহে গ্রহণ করেছে, দাবি করে চিত্রকরদের কাছ থেকে আদায় করেছে। এইটুকু যোগের মধ্যেই সংকট থেকে বাঁচবার আশার আলো দেখা যাচ্ছে, যদিও ছবির দারিদ্র্যটাও সমাজের এই দারিদ্র্যেরই প্রতিফলন বই আর কিছু নয়।

কিন্তু এতক্ষণ যা কিছু আমরা দেখলাম সবই অতীতের ছবি, অতীতের ব্যাপার। তার মধ্যে থেকে আমরা ছবির সংকটের হেতুগুলি বুঝলাম, আর বুঝলাম সংকট থেকে বেঁচে উঠবারও পথ আছে। সংক্ষেপে তা এই—চিত্রকরকে সমাজ থেকে আত্মনির্বাসনের পথ থেকে সমাজে ফিরে আসতে হবে, এবং সমাজকেও চিত্রকে জীবনসংগ্রামের এক প্রবল হাতিয়ার বলে গ্রহণ করতে হবে।'

আজ দুনিয়ার জনসাধারণ জীবনধারণের তাগিদে সংঘবদ্ধ হয়ে পুরনো সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। যন্ত্রসভ্যতাকে স্বীকার করছে কি না করছে সেইটাই দুনিয়াব্যাপী নরনারীর জীবনমরণ সমস্যা সমাধানের মধ্যে প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা ধ্বংসের পথ থেকে মানুষ বেঁচে উঠবার আয়োজন করছে এবং সে বেঁচে উঠবেই, এগিয়ে চলবেই; পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে পৃথিবীর সুখ-ঐশ্বর্যের ভোগের ক্ষেত্রে সর্বমানবের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবেই। এই ভাঙা গড়ার মধ্যে ছবির করবার কাজ আছে অসীম, সে-কাজ করলে ছবি আজকের জীবনযাত্রার মধ্যে বাঁচবে, নইলে ভবিষ্যতের আশায় একপাশে পড়ে পড়ে আপনার শক্তির অপচয় করবে।

প্রপ্যাগান্ডা?—কোন্ ছবি একটা না একটা আদর্শের প্রপ্যাগান্ডা নয়! আর্ট?—আদর্শকে বা বক্তব্যকে প্রবল করে তোলার অবসর কোন্ বিষয়বস্তুর মধ্যে নেই! শিল্পীর স্বাধীনতা?—নিজের গণ্ডিতে বদ্ধ হয়ে বাইরের হাতে মার খাওয়াটাই কি স্বাধীনতা, না সমাজের ইতিহাস তৈরির কাজে সচেতনভাবে দায়িত্বগ্রহণ ও বীর্যের সঙ্গে সে-দায়িত্ব পালন করে সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে মিলে এগিয়ে চলাই স্বাধীনতা। নতুন যুগকে বুঝতে হবে, নতুন যুগের আদর্শকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিতে হবে, তবেই চিত্রের সংকট দূর হবে, নইলে নয়। আর ছবি যদি একটা সৃজনশীল শক্তি হয় তবে তা শুধু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকতে পারে না, বিস্তৃতির তাগিদেই সে এগিয়ে আসবেই আপন জীবনের পরিচয় দেবার ক্ষেত্রে। সে-ক্ষেত্রটাই হলো সমাজ, সেই সমাজকে ভালো না বাসলে যেমন শিল্পীর বাঁচার উপায় নেই, আবার সেই সমাজের ভালোবাসা অর্জন করতে না পারলেও ছবির বাঁচার উপায় নেই।

শুধু এ যুগের নয়, যুগযুগান্তের শিল্পের ফসল সবই শুধু একমাত্র শিল্পীসমাজের সম্পদ নয়, সকল নরনারীর ভালোবাসা না পেলে তাদের অস্তিত্ব ব্যর্থ; আজ সেই ব্যর্থতার চেয়েও বড় বিপদ দেখা দিয়েছে—যে-শিল্পকলা সমাজকে আপন স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন ও উদ্দীপ্ত করে তারই বিরুদ্ধে ফ্যাসিজম্ পাশবিক অভিযান চালিয়েছে। সেই অভিযানের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে সকল নরনারীর সংঘবদ্ধ ও সচেতন প্রত্যাভিযান—একা কোন শিল্পীর বা কোন এক শিল্পীসম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্পর্শহীন চেষ্টায় শিল্পসংস্কৃতির স্বাধীনতাকে ফ্যাসিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না।

সমগ্র সমাজকে তার পরম সম্পদ, শিল্পসংস্কৃতির সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করে

তাকে রক্ষা করবার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—এই প্রয়োজনের পথে গতানুগতিকতার জড়তার খোলস থেকে বেরিয়ে আসাটাই শিল্পীর স্বাধীনতার প্রথম পাদ ; দ্বিতীয় পাদ —প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, যেমন করে কোদাল ভেঙে বেয়নেট গড়ার মধ্যে ঠিক তেমনি করেই শিল্পের রূপান্তর ঘটানোর মধ্যে। সেই স্বাধীনতার পরিচয় দেবার বেলা আজ বয়ে যাচ্ছে।

চিরন্তনী ?—পরিবর্তনের অধিকারটাই চিরন্তনী। সেই অধিকারকে আজ অস্বীকার করলে আজকের ইতিহাসে চিত্রকরের স্থান নিতান্ত নগণ্য, চিত্রকরের স্বাক্ষর নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে থাকবে—ভবিষ্যতের কাছে সেই স্বাক্ষর সুবোধ্য হতে পারে, কিন্তু অভিনন্দনের বস্তু হবে না। কারণ মানুষ চিরদিনই বীর্যবানকে অভিনন্দন দিয়েছে এবং দেবে, আর সে-বীর্যের পরিচয় প্রত্যক্ষ জীবনসংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার মধ্যে।

আজকের জীবনসংগ্রামে বিজয়ী হতে হলে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে মিলতে হবে—আরো স্পষ্টভাবে বললে, মানবজাতির জীবনসংগ্রামের সঙ্গে যোগ দিতে হবে, ছবিকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে—সে-হাতিয়ার বেদমন্ত্রের তুলনায় বা অজন্তা ইলোরার তুলনায় সমান মর্যাদার পাত্র এবং সে-মর্যাদা সে আজকের সমাজ থেকেও পাবে, ভবিষ্যৎ সমাজ থেকেও পাবে।—সেই মর্যাদা অর্জনের বেলা এ-যুগের মতো আজ বয়ে যাচ্ছে—তবু এ-যুগের শিল্পীরা কই ?[১] □

## চিত্তপ্রসাদ

# আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ভূমিকা

ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ইংরেজ আমল প্রথম আমদানি করে। আর আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংরেজি ( ব্রিটিশ ) পতাকা ভারতের অম্বর আচ্ছাদন প্রায় সমাধা করে। কিন্তু সতেরো শতকেই ব্রিটেন ও য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশজাত চিত্র, ভাস্কর্য আর কারুকার্যখচিত বস্ত্রালঙ্কার এদেশের বাজারে ঠাঁই করতে শুরু করে। "তখন ইংরেজ বণিক, শুধু ইংরেজ কেন, পর্তুগীজ বা ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি প্রভৃতি নানানজাতীয় দস্যু ও বণিক, জলদস্যু, ডাঙার ব্যাপারী নানা জিনিসের সঙ্গে তাঁদের দেশের ঝড়তি-পড়তি আর তার সঙ্গে কিছু ভালো অয়েল-কালারের কাজ নিয়ে সাজগোজ করে দিল্লীর বাদশা, বাঙলা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের নবাব জমিদারদের দরবারে উপস্থিত। ছোট বড় নানা সাইজের কাজ ভালো ভালো চকচকে সোনালী গিল্টি করা ফ্রেমে আঁটা লোভনীয় বস্তুগুলি তাদের বেশ চড়া

১. অঘ্রাণ ১৩৫০ ( ১৯৪৩ )

দামে বিক্রি করা হতো। এইভাবে সতেরো শতক থেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিল্পকলা প্রবেশ করেছিল। আর তার মধ্যে করেজিও, মুরিলো, তিশিয়ান, রাফায়েল, দা ভিঞ্চি, রুবেন্স, রেমব্রাঁর নকল আসল সবরকমের নিদর্শন থাকত। শুধু ছবি নয়, এই সঙ্গে এই সময়ে মার্বেল ও ব্রোঞ্জমূর্তিও অনেক এসেছে। ...তখনকার দিনে বণিক দস্যুগণের শুধু ছবি বিক্রীর ব্যাপারে নয়, আরো ঘনিষ্ঠভাবেই য়ুরোপীয় তৈলচিত্র-পদ্ধতি ভারতের শিল্পীদের অন্তরে সাড়া তুলেছিল। তার পরিচয় এইসকল বিলাতী-ধরনের পোর্ট্রেট পেইন্টিং-এর মধ্য দিয়ে ( প্রকাশিত হয়েছে )।" [ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, সভাপতি: শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ, ১৩৪৮ বাং, কাশী ]

হিন্দু আমলের ভারতে শিল্পকলার দুটো বিভাগ ছিল, প্রথমটা ধর্মভাগ; দ্বিতীয়টা, প্রথমটারই অনুগত বিলাসের ভাগ। প্রথম ভাগে হিন্দুর মূর্তিপুজার প্রধান আশ্রয় ভাস্কর্য এবং দেবদেবীর লীলা-চিত্র; দ্বিতীয় ভাগে ধর্মানুমোদিত এবং মন্দিরের প্রভাবে প্রভাবিত বিলাসোপকরণ-শিল্প। ভাস্কর্যের পর্যায়ে মৃৎমূর্তিকে গ্রহণ করা দরকার। এবং স্থাপত্য এই পর্যায়ের মেরুদন্ডস্বরূপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাসন-কোসন, কাঠের কাজ, বস্ত্র ও অলংকার প্রভৃতি ধরতে হবে।

প্রথম পর্যায়ের শিল্পকলার কারিগরদের ভাত যোগাত হিন্দু রাজারাজড়ারা— দ্বিতীয় দলকে দেশের জনসাধারণ। জনসাধারণের বিলাসসামর্থ্য ছিল প্রচুর।

মুসলমান আমলে হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ রাজশক্তি সরে গেল—তাই থেকে দুই দলেরই কারিগরশ্রেণীর কাজের আদর্শ বদলাতে লাগল। স্থাপত্যের আদর্শ বদলে গেল। মূর্তি-শিল্প ( যেমন ) লোপ পেতে লাগল, ( তেমনই ) প্রথম শ্রেণী থেকে ভাস্করের দল স্থাপত্যে ভিড়ে গেল। রাজশক্তিপুষ্ট মুসলমানী কারিগরি সকল শিল্পেরই আদর্শ হলো। রাজপুতানার হিন্দু নৃপতিরাও সে আদর্শের প্রভাব কাটাতে পারলেন না। অল্পপরিমাণে দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্র যা রচিত হতে লাগল, তাও মুসলমানী ঠাট্ নিতে লাগল।

মুসলমান-অভ্যুদয়ে ভারতের লক্ষ্য ক্রমশ ধ্যান-ধর্মের জগৎ থেকে শক্তি ও ঐশ্বর্যের জগতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। কাজেই ধর্মজগতের চেয়ে বিলাসের জগত থেকেই ভারতের শিল্পকলা অধিকতর খোরাক পাচ্ছে, য়ুরোপ এসে সেই খোরাকের অংশীদার হলো।

ইংরেজ যদি তার শিল্পকলাকে এদেশে শুধু প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত, তবে ভারতের বিলাসজগতে শিল্পীদের মৃত্যু ঘটত না। ইংরেজ এদেশ থেকে সকল ঐশ্বর্যকে যদি লুটেও ক্ষান্ত হতো, তবু হয়তো এদেশের ভান্ডার খালি হতো না। ইংরেজ এদেশের কারিগরদের হত্যা করতে শুরু করল ব্যবসাদারী দিয়ে।

ইংরেজরা এদেশে তার ললিতকলার বাজার খুলতে আসেনি, এদেশকে য়ুরোপীয় ললিতকলার আদর্শে দীক্ষা দিতেও আসেনি, তারা এসেছে এদেশে তার কলের তৈরি মাল বেচতে এবং তার চেয়ে বড়ো কথা, এদেশ থেকে কাঁচামাল লুঠ করতে। এই দুই

উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এদেশের কৃষিজীবনের দিকে দেশবাসীকে ঠেলে দিয়েছে, এবং প্রথম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কলের মাল বেচবার উদ্দেশ্যে—এদেশে কল তৈরির পথ বন্ধ করে নিজের দেশ থেকে সস্তায় বিলাসের সামগ্রী ঘরে ঘরে তুলে দিয়ে এদেশের হাতকারিগরদের ভাতে মেরেছে।

এখানে "বিলাস" কথাটির অর্থ একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। ভারতের বিলাসিতা, ভারতের ভাবপ্রবণ স্বভাবের মতোই ভারতের জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে নগ্ন-দারিদ্র্য আজ দেড়শ বছরের ইংরেজ শোষণের পরে ভারতে দেখা দিয়েছে, তা ভারতে ছিল না। অতি সামান্য পল্লীবালিকার গায়েও অলংকার ছিল, অতিসাধারণ ঘরেও কাঁসা-পিতলের ভারি ভারি আর কারুখচিত বাসন ছিল—এদিকে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। সেইজন্য দ্বিতীয় ভাগের শিল্পকলা, যাকে বিলাসোপকরণ বলা হয়েছে, সেই বিলাসোপকরণ এদেশের বাজারের পণ্যসম্ভার ছিল, সেসব উপকরণের কারিগরেরা ম্যানুফ্যাক্‌চারার ছিল।

যেহেতু, সেইসব পণ্যনির্মাণের মেহনত আর অন্নোৎপাদনের মেহনত প্রায় সমান ছিল, সেহেতু পণ্য-ব্যবসায়ীদের হাতে কৃষকেরা ঠক্‌ত না, সমান পরিশ্রমের বিনিময় হতো, কৃষকের জীবনেও বিলাসিতা ছিল। উপরন্তু কাঁচামাল চালান যেত না—পণ্য-শিল্পীদের মেহনত পোষাবার মতো অন্ন জুটত চাষীদের কাছে থেকে।

ইংরেজ এসে কাঁচামাল নিয়ে কলের তৈরি পাকামাল দিতে লাগল। সেই পাকা-মালের মধ্যে থাকে অল্প মেহনত, কাজেই সে মাল সস্তা হতে পারল। অধিক কাঁচামাল যুগিয়ে আর নতুন নতুন ইংরেজি খাজনা যুগিয়ে চাষীদের হাতে যা থাকতে লাগল তা দিয়ে হাত-কারিগরদের তৈরি মূল্যবান জিনিস কিনে "বিলাসিতা" পোষাল না। সস্তার দিকে নজর আপনি যেতে লাগল। কাজেই যুগীপাড়ায় তাঁতের শব্দ বন্ধ হয়ে এল, কাঁসারীপাড়ার দশাও তাই, স্যাক্‌রাপাড়ার দুর্দশার তো কথাই নেই।

দেশের এই দুর্দশা শিক্ষিত সমাজের চোখে ধরা পড়তে দেরি হলো না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই আন্দোলন শুরু হলো। সে-আন্দোলন সামলাবার দোহাই দিয়ে ইংরেজি বণিক-সরকার কীভাবে এদেশে তার পাকামালের বাজার আরও ব্যাপ্ত করে চলল তার ইংগিত পাই Indian Revenue and Agricultural Department সম্পাদিত Indian Art journal থেকে।

উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতের হস্তনির্মিত পণ্যের উন্নতির ছলে এই বিভাগ (আরো) একটি নতুন বিভাগ খুলল: এক্জিবিশন ও মিউজিয়ম্ বিভাগ। সেই বিভাগ এবং ঐ Journal-এর কাজ ছিল এদেশের পণ্যের নমুনা, গড়পড়তা মূল্য ও চাহিদা, আর উৎপাদন-ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে নিখুঁত হিসাব য়ুরোপে, বিশেষভাবে ইংলন্ডের ব্যবসায়ী মহলে চালান দেওয়া। এই কাজের নিগূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করেন, এমন কুটিল শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশে তখন কেউ ছিলেন না। কিন্তু এই কাজের

ফল যা দাঁড়াল, তার ধাক্কা সামলাতে ভারতের বণিকদের কংগ্রেসের আশ্রয় নিতে হলো। কংগ্রেস-প্রসঙ্গ এরপর এখানে অবান্তর, কারণ ভারতের ললিতকলার জগতে তার দান প্রত্যক্ষভাবে কিছুই নেই, পরোক্ষভাবেও অতি সামান্য।

মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে ইংরেজী শিল্পবিদ্যালয় খাড়া হলো। সেই বিদ্যাও ভারতীয় আদর্শের শত্রু ছিল। সেই শত্রুতাও ফাঁস করে দিলেন এক ইংরেজ—অর নাম ই. বি. হ্যাভেল্। তাঁরই প্ররোচনায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নব্য-ভারতীয় শিল্পের গুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার একটা আধুনিক রূপ খাড়া করবার সাধনা শুরু করলেন—বিশ শতকের প্রথম দিকে।

ভারতের প্রাক্-ইংরেজ যুগেও শিল্পকলা ছিল সর্বসাধারণেরই ভোগের বস্তু। "আর্ট" নামের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মধ্যে গিয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে শিল্প-কলাকে উপভোগ করতে হতো না। পণ্যব্যবসায়ীরা খরিদ্দারের রুচিকে ফাঁকি দিয়ে সস্তার আমোদ বিকিয়ে রাতারাতি ধনী হতে সুযোগ পেত না। খরিদ্দারের ছিল খাঁটি বাচাই করবার ফুরসৎ, আর খাঁটি কিনবার মতো পকেট। সৌন্দর্যভোগের রেওয়াজ ছিল সবারই—আর বিশেষভাবে মেকি বা নকল সৌন্দর্যের উৎপাদন-প্রণালীর কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজরা ভারতের আসল সৌন্দর্যকে নকল আর মেকি দিয়ে ধ্বংস করল। সেই ধ্বংসজাত বেদনার মধ্যেই অবন ঠাকুরের ভারতীয় চিত্রকলার জন্ম। এই বেদনাবোধেরই নাম স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের ঝোঁকটা এদেশের শিল্পজগতে এখনো তীব্রভাবেই অতীতমুখী। অবন ঠাকুর তাঁর শিল্পকলার আহার্য এবং আদর্শ সংগ্রহ করেছিলেন অতীত ভারত থেকে। সমসাময়িক যুগে সেই অতীতকে আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব ছিল। বিদেশী যন্ত্রজ পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বদেশী হাতকারিগরি তখন মার খেয়ে মুমূর্ষু। কাজেই নব-আবিষ্কৃত প্রাচীন শিল্পনিদর্শনগুলি যেমন সেদিন মিউজিয়মে আশ্রয় নিল, তেমনি নবসৃষ্ট প্রাচীনপন্থী চিত্রগুলিও "আর্ট"-এর কোঠায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। সেই ধরনের কোঠা এদেশে পূর্বে ছিল না বলা চলে; ওটা য়ুরোপেও যেমন, এদেশেও তেমনি এযুগের সৃষ্টি। ঐ কোঠাটি যে পরিশ্রম দিয়ে গড়া হলো, সে পরিশ্রমের দাম যন্ত্রজাত পণ্যের চেয়ে অনেক বেশি হওয়াতে আর্ট ক্রমশ জনসাধারণের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়তে লাগল।

মানুষের সাধারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার সামগ্রী নিয়ে যন্ত্র-বণিকরা যেমন বাণিজ্য করেছে, তেমনি মানুষের সৌন্দর্য ও রসপিপাসা নিয়েও তারা বাণিজ্য শুরু করল। শুধু বাসন-কোসন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা নয়, ওলিওগ্রাফ, ফোটোগ্রাফ, লিথো এবং গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম, ফ্লুট, সেতার-এস্রাজের তার এবং সিনেমা, রেডিও প্রভৃতি দ্বারা আর্ট রাজ্যেও বণিকেরা হাট খুলল। সেই হাটে প্রতিযোগিতায় টিঁকতে হলে স্বদেশপ্রেমই যথেষ্ট নয়, এমনকি প্রবল প্রচারও না। দরকার অনেক টাকার মূলধন

এবং বিশেষভাবে বস্ত্রশিল্পে স্বাধীনতা। তারই অভাবে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা এখনো ভারতের জীবনেই অত্যন্ত সংকীর্ণস্থানে একঘরে হয়ে আছে। আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার শীর্ণ গৌরবের আরও এক হেতু—তার আদর্শের থেকে ভারতের দৈন্য ও পরাধীনতাপীড়িত জনতা জীবনের কোনও শক্তি, কোনও প্রেরণা পায় না। প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য, শান্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি নিয়ে যে-জীবন আধুনিক ভারতে সম্পূর্ণ অবাস্তব বললেও ভুল বলা হবে না। সেই জীবনে পৌঁছবার পথে প্রথম বাধা বিদেশীর শাসন, দ্বিতীয় বাধা ধনিকের শাসন ও শোষণ, তৃতীয় বাধা প্রয়োজনীয় শিক্ষা। সেইসব বাধা অতিক্রমণের প্রেরণা, অথবা সেইসব বাধা থেকে বিস্মৃতির মধ্যে ক্ষণিক মুক্তি আশা করে জনতা আর্টের দ্বারে ভিড় করে। সেই বিস্মৃতির খোরাক যোগাচ্ছে সিনেমা ও বণিকের ফরমায়েসী সাহিত্য, চিত্র প্রভৃতি। বণিক-উদ্ভাবিত এই খোরাক মারাত্মক নেশা—অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য, তাই প্রয়োজন বণিকের সঙ্গে সুগঠিত শিল্পীবাহিনীর সংগ্রাম।

এ যুগে জনতার জীবনের সর্বদিকে সকলক্ষেত্রেই বণিক-রচিত যত সংকট, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তেজ জাগাতেই প্রয়োজন মনুষ্যত্ব-দৃপ্ত শিল্পকলার। তেমন বীর্যবান কাজে না লাগলে যে-শিল্প যত মধুর ও পবিত্র রসের আধার হোক, সবই আধুনিক জীবনে নিষ্প্রয়োজন বলে অন্তত আপাতত ব্যর্থ—অর্থাৎ আধুনিকতার দাবি সে-শিল্প করতে পারে না।

স্বদেশপ্রেমের নামে কুটিরশিল্প আর গ্রাম্য দরিদ্র জীবন, দৈন্য-প্রপীড়িত কৃষি-জীবন, কুশিক্ষা ও নিষ্ঠুরতাকীর্ণ ধর্মজীবন প্রভৃতিকে কল্পনার রঙে ললিত ও মনোহর করে এদেশের মনে আজ আর রঙ ধরানো সম্ভব নয়—সে-কল্পনাকে জনতা তীব্র পরিহাস বলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বারবার। এই প্রত্যাখ্যান আদৌ মূর্খতা নয়, এটা অভিজ্ঞতার সুবিচার। এই সুবিচারকে যত কাল না সম্পৌরুষ শ্রদ্ধা করা হবে, ততকাল এদেশে আর্ট আর আর্টিস্ট উভয়েই একঘরে থাকতে বাধ্য, প্রায় অন্দর-মহলের মধ্যে রুদ্ধ থাকতে বাধ্য।

জনতা অভিজ্ঞতায় জানে কুটিরশিল্প আজ শুধু মৃত্যু দান করে। গ্রাম্যজীবন দান করে অসহ্য অভাব আর রোগ, কৃষিজীবন প্রবঞ্চনায় ভরা। ধর্মজীবন আনে শুধু অবসাদ—মানুষ সেসব চায় না, চায় মানুষের মতো বাঁচতে। জীবনকে ভোগ করে আনন্দিত, তৃপ্ত, সুস্থ হতে চায় মানুষ। সেই নিখুঁত মানবজীবন থেকে বঞ্চিত করেছে যে-শত্রু, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার প্রেরণাই হলো এ যুগের শিল্পীর কাছে জনসাধারণের পাওনা।

এই পাওনা মিটাতে হলে শিল্পীদের শুধু স্বদেশপ্রেমিক হলেই চলবে না, স্বদেশের এবং সকল দেশেরি সব দিকের খবর রাখতে হবে, কারণ একটা দেশের ভাগ্য-রচনার বৃহৎ অংশভার শিল্পীদের হাতে। সেই ভার শুধু অন্ধ প্রেমে বহন করা যায়

না, জ্ঞানই সেই ভার বহনের শক্তি যোগায়।—শিল্পীদের প্রতি এটা উপদেশ নয়—জাতির সংকটকালে এটা তাঁদের কাছে জাতির দাবি। এই দাবি পূরণ করতে হলে ভূমিকায় চাই শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি আর সঙ্ঘবদ্ধ আদর্শ।[১] □

# চিত্তপ্রসাদের চিঠি

# নিজের রক্তের গানে

আন্ধেরি, মে-জুন ১৯৫৩

আমার উপর রাগ করো না রাজা, আমি সদা-বিপদগ্রস্ত ভগ্ন-স্নায়ু জীব—আত্মকরুণা-বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও।

আমি গেছিলাম মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত একটি মাত্র অঞ্চলে, দশ দিনেও প্রায় একরকম দিশেহারা হয়ে ফিরে এসেছি। তার আগে IPTA Conference গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুধু এই যে আমার প্রচুর সময় আর অর্থ অপচয় হয়েছে। বাকিটা literally ভূতের নেত্য। IPTA-এর সাবেকি prestige ভাঙিয়ে এমন এক স্টেজ তৈরি হয়েছিল যে বম্বেতে আজো কেউ দেখেনি—স্বয়ং উদয়শঙ্কর উদ্বোধন করলেন। কিন্তু তারপরই skeleton in the cupboard-এর খেল—গভীর দরদীরাও কাগজে লিখতে বাধ্য হয়েছিল—আজ দাঁড়িয়েছে peoples' theatre minus the people। show-এর দিক থেকে নাক মুণ্ডু কাটানো মুড়োনো হয়েছে। আলোচনার দিক থেকে আজো form বড়ো না করে content এই নিয়ে যত রাজ্যের রগাটে উড়ুনচুড়েদের গলাবাজি।—culture-এর সীমা কুঁচকি চুলকানো আর সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে সলিল চৌধুরীর সুর ভাঁজা। বটুকদা-শম্ভু-বিজন-জর্জ সব বাদ। Provincial report গুলোয় শুধু "করা সম্ভব হয়নি", "উল্লেখযোগ্য নয়" এইসবে ভরা। তবু··· শেষ মন্তব্য : Historic conference।

গেছিলাম শোলাপুর জেলার কারসালা নামের মাঝারি রকমের এলেকায়। অঞ্চলটি চরম দুঃস্থ অঞ্চলের একটি। তিন বছর একটানা অনাবৃষ্টি। এখন গরম হচ্ছে ১১০।১১৪ ডিগ্রি অবধি। ৭০।৮০ ফুট গভীর সব ইন্দারা শুকিয়ে আছে গাঁয়ে গাঁয়ে। নদী-নালা নামমাত্র, তাও শুকনো। মরুভূমি বলাই ভালো। একটি ছোট নদীর বঙ্কালের বুকের ওপর বাঁধ তৈরি হচ্ছে, ভবিষ্যতে বর্ষার জল বেঁধে খাল কেটে গাঁয়ে-গাঁয়ে জল নিয়ে যাবার জন্যে। মাঙ্গী নাম বাঁধের। পি-ডব্লু-ডি-র কাজ। এটাকেই সরকারি Relief Centre করা হয়েছে বলে চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু রোজই নতুন মানুষ আসছে। তিন বছর চাষী চাষ করতে পারেনি জলের অভাবে। ব্যাপারটার স্বরূপ এক কথায় বলা অসম্ভব, কারণ স্বরূপটি বহুমুখী। গ্রাম্যজীবন

১. অরণি ১৯৪৩

ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ক-টা গাঁয়ে গেছিলাম—দেখতে ঠিক বোমাবিধ্বস্ত কোরিয়ার গ্রামের ছবির মতো। গাঁ-ছেড়ে পালিয়েছে গ্রামবাসী, ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়েছে। গরু-বাছুর-মোষ মরেছে এক ফোঁটা জলের অভাবে, একদানা খড়ের অভাবে—হাজার হাজার। মানুষ পালিয়ে বেঁচেছে—। পালানোটাও escape বলা যায় না বোধহয়। যখন যেখানে কাজ মিলবার গুজব পাওয়া যায় সেখানেই ছোটে দল বেঁধে। গিয়ে না পেলে কাজ, আবার ছোটে অন্যত্র। Relief Centre যথেষ্ট নেই। রিলিফের অর্ধেক টাকা চুরি। সত্যি বলছি আমি এখনো হদিস পাইনি ছেলে বুড়ো কচি-কাঁচা অন্তঃসত্ত্বা রুগী সব নিয়ে মানুষগুলো কিসের জোরে বেঁচে আছে। এসব অঞ্চল chronic famine-এর এলেকা। প্রতি দু-চার বছর অন্তর ক্রমাগত তিন-চার বছর অনাবৃষ্টি এদের বরাদ্দ। অথচ এরই মধ্যে সদ্য-ফোটা ফুলের মতো শিশু ছেলে-মেয়ে, রাণীর মতো রূপসী বৌ-ঝি। পুরুষগুলোই শুধু কাঁটাগাছের মতো রুক্ষ রুদ্র।

এতদিন দুর্ভিক্ষটা ছিল অস্পৃশ্য মাহার মাঙ্গ ধাং গরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবারের ধাক্কায় একেবারে পাটিল-পুজারী-বানিয়া অবধি নেমে এসেছে relief centre-এ.

relief-এর মূর্তি, খান চার করে দর্মা আর খানকতক বাঁশ—এই দিয়ে তৈরি সারি সারি "ঝোপড়া" খাঁ খাঁ মাঠের মধ্যে। উদয়াস্ত মাটিকাটা পাথর বওয়া, হপ্তার শেষে ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা অবধি নরনারী নির্বিশেষে। এর মধ্যে শহর থেকে ঠিকওলারা এসেছে "Contract" নিয়ে, তাদের রোজগার দিনে ১০।১৫ টাকা অবধি !!! PWD-র "সায়েব"দের রোজগারের মাপজোক নেই, রূপকথার রাজ্য সেটা চাষীদের চোখে। —খাদ্য, জোয়ারের ভাক্‌রি—আর যা কিছু তা বেস্পতিবারে কারসালার হাট থেকে কিনে নিয়ে এসো। নুন লঙ্কার বেশি কেনার রোজগার হয় না জোয়ান মেয়ে মরদ কারোরই। এর ওপর অল্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন চাষীর, বলদ আছে—গাড়ি আছে—বলদের খোরাক যোগাতে নিজের আর শিশুদের খোরাকে বখরা বসাতে হয়। বুড়োদের ব্যবস্থা আরো চমৎকার। তাদের "Disabled gang" নাম দেওয়া হয়েছে। সারাদিন খাটতে হয় ঠিকই, তবে পারিশ্রমিকটা দিনে সাত আনা হিসাবে—তারও "ফাঁকি" দেওয়ার অপরাধের দাম হিসেবে কিছুটা দন্ড দিতে হয় সবাইকেই এক আধ দিন।

১লা মে সন্ধ্যেবেলা পুড়ে ঝলসে আধমরা হয়ে ফিরেছি। সেদিনই সকালে নেহরু গেছিল মাঙ্গি। ঠিক ৭ থেকে ১০ মিনিট। চাষীদের self-help-এর উৎসাহ দেখে খুশি হয়েছেন। পাঁচশালা প্যাঁচের পর কোন শালাই ভুখা থাকবে না এদেশে—এই বলেই কর্তব্য সেরে গেলেন। তাঁর মহাগমনের জন্যে হাজার টাকা খরচ করে বাঁধানো পথ তৈরি হলো ১০ দিন ধরে। আরো হাজার টাকা খরচ করে বেদি বাঁধানো হলো। তিনি প্রায় নাচের ভঙ্গিতে ক্যামেরামুখী হয়ে এসে পুনা-বম্বে থেকে আনা ফুলের মালা, তোড়া, চাষী বৌ-ঝিদের ছুঁড়ে দিয়ে জয় হিন্দ বলে জিপে উঠে বসলেন।

সকাল থেকে ১১টা অবধি লাউড স্পিকারে স্থানীয় খাদিধারীর দল জনতাকে 'পন্ডিত নেহর: জিন্দাবাদ' পাখিপড়া করিয়ে রেখেছিলেন। পন্ডিতের জিপ চলে গেল, জনতার মুখে রা নেই। অবশ্যি তার পরদিন খবরের কাগজে কাগজে রৈ রৈ।

আন্ধেরি, ২৩শে জুন '৫৩

বললে বিশ্বাস করবে কি যে আমিই প্রথম কম্যুনিস্ট শোলাপুরের এই অঞ্চলে পা বাড়িয়েছি তার কাজ করেছি ··আসবার দিন সন্ধ্যেবেলা দৈবাৎ কারসালা তালুক কংগ্রেস অফিসে উঠেছি—দেখি সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট দুজনেই কংগ্রেস রাজের বিরুদ্ধে ফুঁসছে—মনে রেখো এরাই সকালে নেহ্রু পন্ডিতকে মালা পরিয়েছে, সাতদিন ধরে ঢোল-ঢেঁড়া মিটিং করে লোক জড়ো করেছে, শহর সাজিয়েছে!—আলোচনা করে দেখি কংগ্রেস অফিস নীতির দিক থেকে লাল-ঝান্ডার অফিস বনে আছে,—কংগ্রেসকে তাড়াবার জন্যে বিরোধীদলের ঐক্য চাই, দেশের বহু সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হওয়া চাই। চাষীদের নিজস্ব সংঘ চাই ইত্যাদি। ··বর্ষা আসছে। চাষীর হাল-বলদ নেই, বীজ নেই, খেয়ে খাটবার ভাকরি নেই, মাথা গোঁজবার ঘর নেই। ওদিকে সরকার "তাগাই"—কৃষিঋণ আর দেবে না পণ করেছে—বকেয়া আদায় হয়নি। ১৫০।২০০ একর জমির মালিক অবধি মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে বর্ষা নামলে কোথায় ভাসতে হবে এবার।

মনে পড়ছে না আগের চিঠিতে তোমায় লিখেছিলাম কি না যে RPD-র India Today-র শিশু সংস্করণের ছবি করতে আমায় বলা হয়েছে। দেবী চট্টোপাধ্যায় লিখেছে মূল খসড়া, RPD revise করেছেন। PPH প্রকাশক। কলকাতায় দেবীর সঙ্গে আলোচনা করে-করে আমায় ছবি করতে হবে, তাছাড়া কলকাতায় ছবির জন্যে reference পাওয়া সহজ হবে দেবীর সাহায্যে। PPH আমায় যাতায়াতের ভাড়া ২০০+আঁকার মাল-পত্তর ২০০+চার মাসে মাসোহারা ১৫০—৬০০ এই এক হাজার দেবেন। হিসেবটা দেখলেই বুঝবে, এ ঠিক whole timer-এরই হিসেব বা 'টেম্পোরারি' নোকরিও বলতে পারো। বইটার প্রকাশকী monopoly PPH-এর, মানে সারা পৃথিবীতে হাজার-হাজার বিকবে। +ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা হবে। এক কথায় royalty হিসেবে আমার প্রাপ্য পেট-ভাতার ঢের বেশি হওয়ার কথা।

খুব ভগ্ন-স্বাস্থ্য অবস্থায় দিন কাটছে আমার। গোবিন্দ আছে এখনো, যাই-যাই করেও। ওর মতো হতে পারলে মন্দ হতো না, বসুধৈব পেয়ার, খাচ্ছে না খাচ্ছে, ক্যামেরায় ডুগডুগি বাজিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে শহরময়। না সত্যিকারের সুখবোধ, না সাচ্চা দুঃখ-বেদনাবোধ। ছিল সন্ন্যাসী, হয়েছে ভারতীয় কম্যুনিস্ট, চামড়া দুনো মোটা হয়ে গেছে, চোখেরও, বুকেরও। পেট আর পায়ের তলায় কথা নাই ধরলাম হিসেবে। আমারই বরাৎ এমন যে আমার ওপর যত বিষ ফোঁড়ার ভয়। বোধহয় নিজেই

এক vagabond আমি, তাই জোটেও আমারই যোগ্য দোসর সব। তবু নিজের কথা ভুলে যাই এদের মতো।

মনে এমন একটা sense of futility চেপে বসেছে যে শরীর থেকেও নেই হয়ে আছে। বোধহয় যে-শ্রেণীতে মানুষ হয়েছি তারই একটা লক্ষণ আমার মধ্যেও কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছে বাইরের জীবন থেকে আন্দোলনের উত্তাপের অভাবে। বাইরে কোথা থেকেও কারো যেন আজ আর আমার প্রয়োজন নেই। দু-চারটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জীবনের সৃষ্টি-কর্ম-ক্ষেত্রের চেয়ে ঋণের সম্পর্কই বড় হয়ে উঠেছে। নিজে থেকে যে এগিয়ে গিয়ে নিজের দেহমন সমর্পণ করব—তা হয় নেবার কেউ নেই—Famine Exhibition-এর ব্যাপারে কত বড় ঘা খেয়েছি আর জ্ঞান লাভ করেছি তা বলার নয়—। নয়তো artist-এর সঙ্গে দেশের যোগাযোগের পথ এদেশে আর বর্তমান কালে এতই সুদূর আর ঘোরালো যে আমার চোখ আর দম আর বুদ্ধি-সামর্থ্য কোনটাতেই আর কুলোচ্ছে না একা পাল্লা দেবার। ভ্যান গঘের একটা শক্তিকেন্দ্র ছিল নিজের মধ্যে যে সে শুধু art-কেই ভালোবেসে ছিল দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে। শুধু ঐ একটাই কেন্দ্র ছিল তার, তাই শেষ অবধি সেটা রোগ হয়ে সর্বনাশ করল অতবড়ো মানুষটাকে। কিন্তু সেটা আরেক কথা। এ যুগের আর্টিস্টের পক্ষে সমাজকে ভালো না বাসতে পারাটাই আশ্চর্য ব্যাপার এবং রোগের লক্ষণ। কিন্তু আমি বিপদে পড়েছি সেইখানেই। শুধু এঁকে যাওয়া ছবির পর ছবি—অকারণে গান গাওয়ার হৃদয়মন কোনটাই আমার নেই। অথচ কারণগুলো আমার পাড়া দিয়েই আসা-যাওয়া করছে না আর। আর আমিও জানি না কোন্ যুগে কোথায় গিয়ে তাদের ধরা-ছোঁয়া পাব। artist হিসেবে সৃষ্টির জন্যে যে-সংগ্রাম, সমাজের ভাঙাগড়ার কাজে তাঁকে যেখানে পাওয়া দরকার, সেখানে তাঁর সময় নেই। আমার জীবনে আজ আমার সঙ্গীসাথী নেই, শুধু দরদীরা, তাঁরা নমস্য, কিন্তু তাঁরা শুধু আমার ঋণ-বোধকেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন কারণ তাঁদের যোগ্য কিছুই আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

লিনোকাটে Children's album-টা নিয়ে যা দেখলাম তাতে সমগ্র দেশ সম্বন্ধেই ভয় ভাবনা বাড়ে। আমার কদর বুঝল না ওরা বলে নয়। ভালোকাজকে দরকারি জরুরি কাজকে কাজে লাগাতে ভুলে গেছে ওরা, এর নাম বর্বরতা। এটাই আতঙ্কের কথা। আমার একার মনের ও শরীরের জোরে যদি কিছু হবার হতো আমি হতাশ হতাম না। কারণ হতাশাটা রোগ বলে জানি। কিন্তু এ অবস্থার তুলনা হলো অনাবৃষ্টি, রোগে মরছিনা, মরছি তৃষ্ণায়, যেমন করে ফলগাছ মরে আগ্নেয় আবহাওয়ায়।

আমি মরছি খাবি খেয়ে, বোঝাতে পারছি না কাউকে, কলজেটা ফেটে যাচ্ছে, সাঁতরাতে পাচ্ছিনা বলে। নিজের কথা সাত কানে করছি সত্যি কিন্তু ভুলেও ভেবো না যে নিজেকে কেউকেটা ভেবে বসে আছি। ঠিক বিপরীত। ভ্যান গঘের মতো জিনিয়স নই, একথা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। আর, তা নই বলেই দেশের

আন্দোলনেই আমার প্রাণের জীবনমরণ। মরছি আমাকে কারো প্রয়োজন নেই বলে। নাট্-বল্টু জীবন্ত হয়ে ওঠে যদি গোটা যন্ত্রটা চালু থাকে এবং নাট-বল্টুকে যথাস্থানে স্থান দেওয়া হয়, কাজ দেওয়া হয়। হাতিয়ারে আজ মরচে ধরচে, চোখের ওপর দেখছি, সইতেও পারছি না, চোখ বুজতেও পারছি না।

মানি, এদেশের বাইরে সব দেশেরই ইতিহাস আজ যতগুলো ধাপ পেরিয়ে এসেছে বিশেষ করে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক স্তর, তা এদেশে ঘটেনি আজও, তাই আর্ট সাহিত্যের মূলও যেমন নিরস নিরাশায় ধুঁকচে, শাখা প্রশাখার আকাশও তেমনি বিষাক্ত আর সংকীর্ণ, শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর আর [?] মূলত ফিউডাল "সভ্যতার" দেশে। তবু এই নির্জীব অবস্থার বিরুদ্ধে গভীর বিদ্রোহ নেই কেন বুদ্ধিমানদের দলে? বরং দেখি উল্টোটাই, ইতিহাসের দোহাই দিয়ে লুম্পেনবৃত্তি, এনার্কি-ব্যাভিচার, বিশ্বনিন্দা, সুবিধাবাদী যত রকমের কদর্য আত্মঅপচয় আত্মঅবমাননা হতে পারে সবই। এটা বৃটিশের খয়রাতি আইডিয়ালিস্টিক "শিক্ষা"র পরিণাম কি? নিজের দেশ থেকে নিজের মানুষ থেকে ছিন্নমূল শহুরে "সভ্যতার" মড়কের পর্যায় এটা এদেশের ইতিহাসের। না ভারতবাসী হিসেবে, না মানুষ হিসেবে, না শিল্পী-সাহিত্যিক হিসেবে দুর্দশা পরাধীনতা বর্বরসভ্যতা নোংরামি ক্ষুদ্রতা—এক কথায় Sub-human জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে সত্যিকারের বজ্রদৃঢ় পুরুষোচিত বিরুদ্ধতা দেখবে এদেশের "শিক্ষিত" শ্রেণীর মধ্যে। কাজে escapist anarchist, বুর্জোয়া এডিশান নয়, feudal edition, মানে হন্দ coarse আর filthy; বুর্জোয়া হলে criminals হতো মঁসিয় ভার্দু জাতের, মানে ক্ষুদ্র হলেও স্বার্থপর হতো, আত্মরক্ষাটা বুঝত অন্তত। এখানে দেখবে morally escapists।

নাম করে অপরকে গাল দিচ্চি বটে কিন্তু আসলে নিজেকে খোঁচাচ্ছি সবার আগে, তাতিয়ে তোলার জন্যে নিজের মনের হাত-পাগুলোকে। অন্যদিকে সন্নেসীও নই—মাকে ভালোবাসি, মানুষ জাতের অনন্ত মহিমাকে ভালোবাসি দেশকে ভালোবাসি, এ দেশের একটি মেয়েকে ভালোবাসি, এ দেশের অনেক বন্ধুকে ভালোবাসি, ছবি আঁকতে ছবি দেখতে ভালোবাসি, আমার অনেক ভালেবাসা এ পৃথিবীতে অতি সাধারণ অগণ্য নরনারীর মতোই। কাজেই কাজ করতে না পারাটা মর্মান্তিক যাতনা, নিজেকে দিয়ে যেতে না পারার যাতনা। আর পার্টিতে এসে এইটুকু বুঝতে শিখেছি যে, কাকে দেব কেন দেব না জানলে কি দেব কি করে দেব জানা যায় না।

লিনোকাট, অবলম্বন করে একটা কিছু খাড়া করবার বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। কারণ লিনোকাট্ নিয়ে কম খরচে কম সময়ে সারা দেশময় মায় পৃথিবীময় ছবি—অর্থাৎ এদেশের কাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া যায়। যা নাকি exhibition-patron মুখাপেক্ষী দিয়ে বা পত্রিকা-মুখাপেক্ষী black & white দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু লিনোকাটেও সহায়তা দরকার—mass organisation-এর, progressive ছাপাখানার, মানে প্রধানত

পার্টিতে art-consciousness না থাকলে ঐ children-series-এর মতোই বিফল হবে আমার সব শ্রম আত্মক্ষয়। এখানেই আজ বড় বুক-ভাঙা নিরাশায় এসে ঠেকেছি।

মেদিনীপুর, ২৭ অক্টোবর '৫৩

তুমি যে আমায় কি চোখে দেখেছ জানি না, ভাই চোখে জল আসে সুখে আবেগে তোমার চিঠি পড়তে-পড়তে। তুমি ভালোবাসো আমায়, এইটেই আমার কাছে পরম গর্ব পরম সুখ পরম ঐশ্বর্য, কেন ভালোবাসো তার হিসেব করবে কার সাধ্যি আছে। আমার কাজের কথা লিখেছ—বিশ্বাস করো মুরারিদা ভাই, কাজটা আমার কাছেও সর্বস্ব নয়। তোমার মতো নির্মল যাঁরা, তাঁদের ভালোবাসা পাব এইটেই আমার পরম কামনার। কাজের মধ্যে দিয়ে, নিজের সততার মধ্যে দিয়ে আমি তোমাদের ভালো-বাসার যোগ্য বলে নিজের পরিচয় দিতে পারি, তাই কাজ আমার কাছে প্রিয়।

আন্ধেরি ৩১ জুলাই '৫৭

ইতিমধ্যে নাটক লিখে ফেলেচি দুটো। এক নম্বর—শকুন্তলা। সম্পূর্ণ ঢেলে তিন দৃশ্যে সম্পূর্ণ, সওয়া ঘন্টার ব্যাপার। শেষ দৃশ্য সম্পূর্ণ আমার, প্রথম দু দৃশ্যে কালিদাসের সামান্য কিছু। দু নম্বর—এক অঙ্কের পনেরো মিনিটের প্রহসন।—শকুন্তলা এখন সম্ভব হবে না, বহু লোকজনের দরকার আর বহু পরিশ্রমের। আপাতত ছোট ছোট ১০।১৫ মিনিটের আর ৪।৬ চরিত্রের খেল নিয়ে তুষ্ট থাকতে হবে। পরন্তু বাক্‌সর্বস্ব রাখতে হবে, tricks বা action-বহুল সামলানো সম্ভব হবে না। দেখতে মনমজানো puppets আর তেমনি dialogues—এ হিসেবে রাজা কেষ্ট চন্দর আর গোপাল ভাঁড় জমবে আমার ধারণা।—বিস্তারিত লিখে শেষ করা যাবে না। বহু কিছু নতুন শিখেচি-শিখচি।

সবচেয়ে অভাব লোকের। একার কম্ম নয়—team-এর দরকার, ছেলে-মেয়ে উভয়ই। লালারা committee গড়ে দিয়ে গেছে। আমার থিয়েটারের নাম রেখেছি 'খেলাঘর'।

এখনো ওদেশী প্রভাবে naturalistic puppets নিয়ে আছি। কিন্তু মাথায় নয়া চিজ গিজগিজ করছে। দিশী কাঠের আর মাটির পুতুলকে puppetized করব। মায় শকুন্তলা অবধি। committee-র সঙ্গে লাঠালাঠি বাধবে প্রথমটা—তবু আইনত বা অন্যথা আমি dictator-এর আসনে কায়েম। আমি যাচ্ছেতাই করব মরবার আগে।

আন্ধেরি, ২৫ এপ্রিল '৫৮

তোমায় লিখেছিলাম কি নতুন নাটক ফিঙে পাখির গপ্পয় হাত দিয়েছি? এতে প্রায় ১৭টি কাঠপুতুলির দরকার। দশটি আজ অবধি তৈরি হয়েছে। চোখমুখ রঙচঙও হয়েছে—পোষাক বাকি। খুব মজার হয়েছে, সব কটি সত্যি খুব মজার। আর একেবারে নতুন জাতের কাঠপুতলি। এমন কি চেক-বাবাজীদেরও তাক লাগাবার মতো। তেমনি simple।

ক্রমশ, খুব দ্রুত দেখছি "পুতুল নাচের কল্যানে এক নতুন ধরনের জীবন গড়ে উঠছে আমার জন্যে নতুন নতুন লোকজন ছেলেপুলের ভিড় জমছে। সরকার পক্ষ থেকেও খোঁজ খবর আসছে। এ সব খবর যদি বিস্তারিত লিখতে হয় তো মহাভারত লিখতে হবে। নিরীহ কাঠপুতুলি এখন আমায় ভূতের মতো খাটাচ্ছে, দিবারাত্র বলা চলে। খুব exciting, তবু বাইরের সঙ্গে জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাই না। আমার কাজের আনন্দ বাজার-হাটের বাইরে, নইলে জমে না। সঙ্গীর জন্যে সাথীর জন্যে বুক খাঁ-খাঁ করে দিন রাত। ভিড় হৈ-হল্লার জন্যে নয়। অথচ কাজের তাগাদা আসে নিজের রক্তের থেকে আর কাজ মানেই হাটের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া। এ এক অবর্ণনীয় অবস্থা।

ছবির ব্যাপারে আজ অবধি আমার বরাত সম্পূর্ণ আমারই বরাৎ থেকে এসেছে। মানে ভিড় নয়, দু চার দশজন বড় জোর, কেউ কাছ থেকে কেউ দূর থেকে আপন করে নিয়েছে, আমার শান্তিতে আমি থাকতে পেরেছি। কাঠপুতলির কারবার অন্য, ভিড় জমানোই এর পেশা। শুরু যখন করেছি, তখন ছাড়ব না তা ঠিক। তবু নিজেকেও বিকিয়ে দেব না তা নিশ্চয়। একটা সীমা রাখতেই হবে। তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এখন।

আন্ধেরি, ৩০ নভেম্বর '৫৮

তবু যতটা সহজে আজ এসব তোমায় লিখছি, ততটা সহজ হয়নি আমার খেলা-ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করা। মাত্র দু চার দিন তবু কি জ্বলেছি তা তোমায় না লিখলেও বুঝবে। আমার বুক ঢালা বন্ধুত্বের অপমান করল ওরা, আমার সব আশা সব পরিশ্রম, বহু আত্মত্যাগের অপচয় করল। অথচ মুখ বুজে সব সহ্য করা ভিন্ন আর উপায় কই আমার। এখনো জানি না এর পর কি করব 'খেলাঘর' নিয়ে। আপাতত ভাবছি ছবি আঁকায় মন দেব। কিন্তু ছবি আমার যদি এরপর ভাঙাচোরা, অন্ধকারে ঘেরা, বিষণ্ণ আর ক্ষুব্ধ হয় অবাক হয়ো না। এ যুগে সরলতার, প্রেমের, সত্যিকারের মানবোচিত ঐশ্বর্যের, মানবোচিত আনন্দের আর বেদনার যে অপচয় অপমান—এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে নৃশংস অত্যাচার আর হত্যা—তা এ যুগের চরিত্রেরা বারবার যদি আমায় জানতে আর মানতে বাধ্য করে, তবে তা আমার আত্মপ্রকাশে এড়াব কি করে? যা পেয়েছি তা সম্পূর্ণ স্বীকার করাই তো আর্টের justification।

শোন মজার ঘটনা। ভারতের ডিফেন্স মিনিস্টার মেনন এসেছিল আমাদের উঠোনে, ইলেকশন ক্যাম্পেন করতে। গুজরাতি ছোকরাদের কিংক মন্ডল আছে দুনম্বর রুবি টেরেসে, তারাই ওকে ডেকে এনেছিল, সঙ্গে ছিল শান্তিলাল শা—বম্বের ফিনান্স মিনিস্টার। কলাগাছ, আমপাতার ঝালর আর মাইক গদি শতরঞ্জির হল্লা চলছিল সকাল থেকে সারা উঠোনে। প্রথমে গা করিনি, তারিখও মনে নেই আজ। মেনন এল প্রায় বেলা বারোটায়। পেল্লায় দুটো গাড়ি ঠিক আমার জানলার ওপারে। ছেলেরা ডেকেছিল, তাই পাশের ব্লকের শিশু বাবলাকে কোলে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে





গিয়ে ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেননের তকমা শুনতে শুনতে মেজাজ বিগড়ে গেছিল। বলছিল sacrifice করো, কান্না ভুলে যাও, এমনকি নেহরুর foreign policy আর সব "বড় বড়" কথা ভুলে যাও, দেশের জন্যে কাজ করো। আরো বিরক্তিকর, deliberate, calculated মতলব নিয়ে full speed-এ ইংরেজিতে বকছিল মেনন, নিজের চোখে দেখছিলাম কেউ একবর্ণও বুঝছে না। শুধু স্পষ্ট বারবার এক কথা—কংগ্রেসকে ভোট দাও।—ইত্যাদি। শুনে শুনে শেষ অবধি ধৈর্য রইল না। বললাম, "মিস্টার মেনন, excuse me, please, you ask us to work for our country. That's fine, but will you please advise us how may we work in the present condition?" প্রথমটা খেপে গিয়ে বললে, "Do you want to speak?" (মানে on the mike—মাইক এগিয়ে দিলে)। বললাম, "No, মিস্টার মেনন, I don't know how to speak. I only work and I want to know from you how can I and all the young folks may work in our country today?"

আড় চোখে বারবার আমার মুখ দেখতে দেখতে আরো মিনিট কতক বক্তিমা ঝেড়ে শেষকালে বললে, "I will answer your question personally, please wait—May I know your name." নাম বললাম, বললাম, আমি তোমার শত্রু নই, গত ইলেকশনে তোমাকেই ভোট দিয়েছিলাম। আমি সামান্য আর্টিস্ট, অনেক কিছু করবার স্বপ্ন দেখি, এ-পাড়ার শিশু যুবা বৃদ্ধ সবাই ভালোবাসে আমায়। উদ্যোক্তাদের বুড়োরা ঘাবড়ে আমায় থামিয়ে দিলে। মেনন বারবার তিনবার বললে—I will talk to you personally, please wait. শেষটায় এক পুলিশ অফিসার loud whisper-এ বললে শুনলাম—He is a communist, sir. অমনি মেনন সবার চোখের ওপর ভড়কে গেলেন।...পরে, সভা ভাঙতেই সোজা গাড়িতে চড়ে ভাগলবা!!! এই stupidity-র কী দরকার ছিল জানি না।

কিন্তু হাসি থামলেই কান্না পায় নাকি? এই রাজ্যে আর্ট আর কালচার করা মানে জীবনকে ভস্মে ঢালা, সব স্বপ্নকে দেনার অপমানে চুকিয়ে দেওয়া, নয় কি? শুধু যদি সিনেমার সাম্রাজ্যে বেশ্যা হতে পারতাম! কিন্তু ঘেন্না করে যে। তবু যাক গে, আমি বিচার করবার কে? ছবি আঁকি, তাইতেই সব হৃদয় বুদ্ধির যোগ্যতা অধিকার আমার বর্তায়? হয়তো মেনন সত্যিই বহু মহৎ কাজ করছেন, যা নাকি আমার বুদ্ধির জ্ঞানের বাইরে। কে জানে। ভাই মুরারি, বলো না, যদি জানো, কী করে, আমার মাত্র কজন প্রিয়জনদের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা লাঘব করার কাজে কী করে আমি কী করতে পারি আজো? দেশোদ্ধার বিশ্বত্রাণের ঔদ্ধত্য আজ আর আমার নেই, বিশ্বাস করো ছিল না কোনোদিনই। আনন্দে দুঃখ-বেদনায় ছবি এঁকে গেছি, এই শুধু। ছবি, দুনিয়ার নানান আর্টিস্টের আঁকা ছবি, রং-রেখা আমায় চিরকাল মাতাল করেছে এই শুধু। কিন্তু

আমার প্রিয়জনদের জীবনের তীব্রতম ব্যথা-বেদনার তো কিছুমাত্র নিবারণ করতে পারলাম না। তোমাদেরই সাহসভরা আনন্দে, তোমাদেরই আত্মার স্পর্শে আমার যা ধনরত্ন আমার জীবনের ভান্ডারে জমেছে, আর তাই তোমাদের তুলে দিয়ে আমার গর্বের সীমা নেই। তোমরা না থাকলে কবে ধুলো হয়ে উড়ে যেতাম, বা কোন নালা-নর্দমায় আকণ্ঠ ডুবে যেতাম। বিনয় করছি না। যে প্রচন্ড সৃষ্টি-শক্তি বহু মানুষকে মহামানব করেছে, আবার আত্মঘাতী উল্লাসের নরক জুগিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে চির-কলঙ্কের দাগ দিয়ে,—সেই শক্তিই বারবার নিজের রক্তের গানে শুনতে পেয়েছি। না, বিনয় বা গর্ব করছি না। সত্যি কথা, তোমরা মাত্র, কটি মাত্র মানুষ আজো আমায় মানুষ রেখেছ। কিন্তু চতুর্দিক থেকে এত বাধা আমার কাজের পথে, আশৈশব, যে যা-কিছু করে যেতে পারতাম তা পেরে উঠলাম না। এখন শুধু ক্লান্তি, শুধু ধুমোতে দেহ-মন এলিয়ে আসচে। তবু বিশ্বাস করো, পরাজিত হতে চাই না, শুধু জানি না, কোন পথে—কোন নতুন পথে, কোন উপায়ে আমার জয়—নিজের পক্ষেও, তোমাদের ভালোবাসার পক্ষেও জয়। কিছু ভালো ভালো বই, আর কিছু ছবি, আর ঐ সামান্য সমাপ্ত পাপেট থিয়েটার, এই সবের দাবিতে নিশ্চয় এদেশের cultural barons-দের কাছ থেকে আমার বেঁচে থাকার বাস্তব (মানে টাকার) প্রয়োজনের অধিকার দাবি করতে পারি না।

ক্ষমা করো ভাই, সুনীতির পথ আমার আজ শেষ সীমায় এসেচে, আমার এবার তলিয়ে যাবার সময় এসেছে মনে হচ্ছে। জীবনেরই যখন মানে হলো না, তখন মরণের বা দুর্নামের বা লাঞ্ছনারই বা কী মানে থাকে? জানি না আজ এসব তোমায় কী লিখছি। কিন্তু প্রাণ খুলে মরিয়া হয়ে লিখছি। তবু মনে হচ্ছে যেন, কিছুই যেন লিখতে পারছি না।

আমার শূন্যতার চাঁদসূর্য নিভে যাবে না, বাইরের ঐ ঝড় বর্ষা আর রেডিও বা ট্রাক থেমে যাবে না জানি। তবু জানি না কেন সর্বরকমের শোকে ক্লান্তিতে আজ নিজের বিরুদ্ধে নিজের চোখের ওপর নিজে ভেঙে পড়চি।

ঐ চিঠি পড়ে কী ভাববে কী করবে তা জানিনা। হয়তো কাল সকালে নিজেকে সামলে নিতে পারব। হয়তো বিধাতা কাল সকালে সাম্প্রতিক জীবনের পথ অন্য পথে—আমার যোগ্যতার পথে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন। জানি না। আজ যা কিছু বুক থেকে উঠে এল তাই লিখলাম তোমার

আন্ধেরী, ৯ই নভেম্বর '৬০

তারপর এই দিন দশ-পনেরো শুধু ভাবছি ভবিষ্যৎ ইতি-কর্তব্য নিয়ে। তার সার-কথা এককথায় এই যে—আজ না হোক কাল—অচিরে না হোক অদূর ভবিষ্যতে

আমার আশৈশবের তথা বম্বের মায়া-মোহ কাটিয়ে গৌড়েই ফিরতে হবে। শুধু রুজি-রোজগারটাই যদি আমার বম্বে থাকার মূল কথা হতো—এতকাল—তবে ভালো ভাবেই তা সম্ভব হতো। আমার কাজ না জোটার মোটা কারণ, বাজারে-কাজ সম্বন্ধে আমার রক্তগত নিস্পৃহা। অথবা বানিজ্যবিদ্যায় অন্ধতা। এখন আমার একান্ত ইচ্ছা যে, প্রথম—আমার সেই story of India ছবির বইয়ের সব ছবি শেষ করে বই হিসেবে প্রকাশের জন্যে খাড়া করা,—আর বাংলাতেই প্রথম প্রকাশ করা। মানে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, খোয়াব দেখছি।

তারপর আমার আশৈশবের ইচ্ছা—বাংলার ইতিহাসের ছবির বই করব। একবার শুরু করেছিলাম দিনেশ সেনের বাংলার ইতিহাস সম্বল করে—সে প্রায় ২৫ বছর আগে—সে নেহাত ছেলেমানুষি হয়েছিল। এখন বাংলায় প্রচুর রসদ পাব—অশোক মিত্রের বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু আমি কেতাবি ইতিহাস আঁকব না পারতপক্ষে। বাংলাদেশ প্রথমে যথাসম্ভব পয়দলে ঘুরব—বছর দুবছর ধরে। আগে টুর প্রোগ্রাম করব কেতাবাদি ঘুঁটেঘুঁটে। তারপর ইতিহাসের ছবি তুলে আনব শহর-গ্রাম-প্রান্তর ঘুরে,—অতীতকেও আমার এই সাম্প্রতিক দুচোখে যা দেখি, আধুনিক মনে যেমন অনুভব করি, তেমনটিই আঁকব লিখব আমার রচিত কেতাবে। আমি ভেবে দেখেছি—এমন কেতাবের দরকার শুধু আজ বঙ্গেই নয়—প্রত্যেক অঞ্চলে, ভারতের নয়া দৃষ্টিতে দেখা নয়া ভারতের ইতিহাস দরকার আজ। স্থানীয় আর্টিস্ট লেখকদের দ্বারাই তা সম্ভব।

এমন কাজে ছবিকে ইতিহাসের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কোন দরকার নেই। আমি অন্তত তা করব না,—যাকে বলে ছবিকে বইয়ের সাহিত্যের সাপ্লিমেন্ট, তা করব না। আমার ফেমিন স্কেচের সঙ্গে যদি রিপোর্টার নাও থাকত ছবি নিজেই কথা বলত। কিন্তু ইতিহাসের ধারার সঙ্গে ছবির প্রাণবস্তুর যোগাযোগ রাখতেই হবে, আর তাই আমাকেও পয়দলে বাংলাদেশ ঘুরতেই হবে।[১] □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

## দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

# জীবন শিল্প ও রাজনীতির বিবিধ প্রসঙ্গ

আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যখন আসছি, তখন আমার মন-মেজাজ, চরিত্র তৈরী হয়ে গেছে। আমার বাবা অচিন্ত্যকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন 'যুগান্তর'-র হুগলী গ্রুপের 'ছোড়দা', জ্যোতিষ ঘোষের ডানহাত। অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, যিনি এখন 'বিপ্লবাচার্য' নামে খ্যাত, তাঁকে আমরা জ্যাঠামশাই বলতাম। আমি সেই সময় থেকেই, অর্থাৎ ৮ বছর বয়স থেকেই সেখানে যাতায়াত শুরু করি। রিভলভার আমি তখনই দেখেছি—handling করিনি হয়তো, কিন্তু লুকোবার জন্য আমাকে দেওয়া হতো, কখনো carry করার জন্য দেওয়া হতো। বলতে পারো, এর মধ্যেই আমি বেড়ে উঠেছি। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন—সেখানে আমাকে নানারকম কাজকর্ম করতে হতো; কারণ তখন ছোট ছেলে আমি, আমাকে দিয়ে করালে হয়তো পুলিসের তেমন সন্দেহ হবে না। ফলে, আমার অদ্ভুত মানসিকতা তৈরি হয়েছে, লোকসংযোগও হয়েছে অনেক। যেমন ধরো, একবার মহিষাদলের গ্রামে গেলাম। আমার বয়স তখন দশ-বারো বছর। যাদের বাড়িতে গেলাম, তারা তো নিজেদের আইডেনটিটি পাবলিককে জানাত না, গ্রামের সকলের

সঙ্গে নরম্যালি মিশত, স্বাভাবিকভাবে মিশত। এই সমস্ত লোকেরা তাদের বিপ্লবী চরিত্র গোপন করতে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, বিভিন্ন সংগঠন করত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করত। এবং এইসব ব্যাপারে আমি ইনভল্‌ভড হয়ে পড়তাম সহজেই। আর, যেহেতু আমার ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই, সেকারণে আমি তখন থেকেই জনগণের সংগ্রামী জীবনের কাছে এসেছি, সেই জীবনের ছবিই আঁকতে চেয়েছি। এরকম অভিজ্ঞতা আরো অনেকই আছে।

এই সময় '৩৯ সাল নাগাদ স্কটিশে স্ট্রাইক শুরু হলো। তখন স্কটিশের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন আরকার্ট। সুভাষচন্দ্র জেল থেকে বেরোলেন। স্কটিশের ছেলেরা সুভাষ বোসকে সম্বর্ধনা জানাতে চাইলে তিনি আপত্তি করলেন। তার বিরুদ্ধে বিরাট স্ট্রাইক হলো, স্কটিশে এই প্রথম। একদিন নিতাইদা (নিতাই গাঙ্গুলী) আমাকে বললেন, কিছু ছবি এঁকে দে। সেই প্রথম রাজনৈতিক পোস্টার আঁকলাম। সেই থেকে, আমি তোমাদের বলছি, কমিউনিস্ট পার্টির জন্য অন্তত পক্ষে হাজার পাঁচেক পোস্টার আমি করেছি—এবং সেগুলো সমস্তই হারিয়ে গেছে, আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, সেই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, সেই পোস্টার কোথায় কে নিয়ে গেছে, কেউ জানে না। স্কটিশের প্রথম পোস্টারটা আমার এখনো মনে আছে। আর মনে আছে যে ছাত্ররা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছিল।

### কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমার ছবি

এই প্রসঙ্গেই একটা ঘটনা বলি। যখন কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে গেল, তখন সি. পি. এম. ধরে নিল যে আমি বোধহয় সি. পি. আই। ধরে নেওয়ারও কারণ ছিল। আমার বন্ধুরা, স্বভাবতই সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত লোকজনই আমার বন্ধু, এবং তাদের মেজরিটিই সি. পি. আই। কিন্তু সেই সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সি. পি. এম-র ছাত্রসংগঠনের একটা সম্মেলন হলো, আর তারা প্রায় সি. পি. এম-নেতৃত্বের হুকুম না মেনে আমার কাছে এল। তাদের জন্য পোস্টার এঁকে দিতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে আমি প্রায় এতটাই জনপ্রিয় ছিলাম। অথবা, নকশালপন্থীদের কথাই ধরো। তখন নকশাল আন্দোলন চলছে। সুশীতল (রায়চৌধুরী) আমাকে একদিন এসে বলল, তুমি একটা মাও-সে-তুং-এর ছবি এঁকে দাও,সেটা আমরা দেওয়ালে লাগাব। সেই ছবি স্টেনসিল করল। পরে, তোমরা দেখেছ, সারা বাংলাদেশে সেই ছবি ছড়িয়ে গিয়েছিল। এইরকম, কমিউনিস্ট, মানে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে আমার ছবি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বামপন্থী হলে তাদের জন্য আমার কাজ করে দিতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই সম্পর্ক তো কংগ্রেসের সাথে হতে পারে না। যেমন, অনেকে আমাকে বলে, একদিন তো 'দেশ'-এ আপনার অজস্র কাজ বেরিয়েছে। এটা কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা বললে ভুল হবে, বলা উচিত ভারত-চীন যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বেরিয়েছে—

যে-পর্যন্ত হয়তো দেশ-আনন্দবাজারের একটা পেট্রিয়টিক রোল ছিল। কিন্তু কমিউনিজমের বিরোধিতাই তাদের মূল সুর হয়ে উঠতে আমার সাথেও স্বভাবতই আর কোন সম্পর্ক রইল না।

**কৈশোর থেকে যৌবনে পা। মার্কসবাদে দীক্ষা**

কমিউনিস্ট পার্টিকে মই হিসেবে, সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে অনেক লোক উঠেছে, উঠে তাদের সিঁড়িটা ফেলে দিয়েছে। নাম করে বলছি না, কারণ তারা আজও আমার বন্ধু। কিন্তু, এরকম অনেক চরিত্রই আমি দেখেছি। আমি কিন্তু তা করিনি। এক্ষেত্রে, আমার শৈশবের বিপ্লবী শিক্ষা আমাকে রক্ষা করেছে। আরো একটা কারণ আছে। তোমরা জানো, আমি হেঁটে প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। আর এই পরিব্রাজক চরিত্রটা আমার শৈশব থেকেই ছিল। যেমন ধরো, আগস্ট রিভলিউশনের সময়ে আমি cross country হেঁটেছি, যে-গ্রামে গেছি, সেখানে মিটিং করেছি, সকলকে নিয়ে আলোচনা করেছি—আর এই সুযোগে, আমি কিন্তু গণসংযোগ, মাইনাস কমিউনিস্ট পার্টি করতে পেরেছিলাম। এবং আমার ছবি কিন্তু তখন থেকেই মানুষের ছবি, মানুষের জন্য ছবি।

এরপর কমিউনিস্ট পার্টি যখন সংগঠিত হলো, তখন আমি যে তার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলাম, তার কারণ হলো আমার ঐ বিপ্লবী চেতনা। যদিও রাজনৈতিক-ভাবে তখনও আমি কমিউনিস্ট চেতনা সম্পূর্ণ গ্রহণ করে উঠতে পারিনি। আমার কাছে তখনও দেশের স্বাধীনতা এবং তার জন্য আত্মত্যাগই প্রধান। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন পার্টিশন হলো—গান্ধীর নীতির যে-নগ্ন রূপ দেখতে পেলাম, কী? —না, যখনই সত্যিসত্যি আমরা বিদ্রোহে মুখরিত, প্রস্তুত হচ্ছি, তখনই তিনি সেটাকে ভেঙে দিচ্ছেন। সেই চৌরিচৌরা থেকে তার শুরু, যখনই Revolutionary character grow করছে, তখনই ঐ নীতির স্বরূপ বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ Vested interest কে তিনি serve করছেন, People's interest থেকে সবসময়ে সরে থাকছেন—এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থা দেখার পর আমরা সোজা কংগ্রেস থেকে সরে গেলাম। আর তখন রিভলিউশনারি গ্রুপগুলো disintegrate করে গেছে, আমাদের অনেকেরই একটা প্লাটফর্ম দরকার, আমরা সেসময় কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু মার্কসবাদ আমাদের বাড়িতে অনেক আগেই ঢুকেছিল। যেমন ধরো, জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন নামে একটা সংগঠন হয়েছিল, যার সেক্রেটারি ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্তা। এই ভদ্রমহিলা জার্মান-বিলেত থেকে কমিউনিস্ট ভাবধারা ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একনম্বর অপরচুনিস্ট, অত্যন্ত করাপ্টেড্। বাবা ছিলেন ঐ এসোসিয়েশনের সহ- সম্পাদক। কিন্তু পরে নানা দুর্নীতি দেখে ছেড়ে চলে

আসেন। যাই হোক মার্কসবাদ অনুশীলন ও অনুধাবনের একটা ধারাবাহিকতা আমাদের বাড়িতে ছিল। সৌম্যেন ঠাকুর আমাদের বাড়িতে আসতেন। মনে আছে, 'সাম্যবাদ' বলে একটা বই আমাকে তিনি প্রেজেন্ট করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত কিন্তু তিনি আর. সি. পি. আই. করেননি।

এরমধ্যে বাবা একদিন মারা গেলেন—আমার মাথায় সংসারের চাপ পড়ে গেল। তা সত্ত্বেও, সংসারের দায়িত্ব নিয়েও আমি ছবি আঁকার কাজ সমান উদ্যমে চালিয়ে গেছি।

ভারতীয় পরম্পরা / ছবির রেখাধর্মিতা

আগেই বলেছি তোমাদের যে আমি পরিব্রাজক। লাদাক থেকে কন্যাকুমারী, ওদিকে গুজরাট থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। এটা একদিনে হয়নি অবশ্য, হঠাৎ ঘটেনি। উদ্দেশ্য ছিল একটাই যে দেশকে জানব, দেশকে চিনব। এর ফলে আমি ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরার একটা রূপ দেখতে পেয়েছি। তোমরা একটু লক্ষ কবলেই দেখতে পাবে যে আমার ছবি মূলত রেখাধর্মী। রেখা ভারতীয় চিত্রকলার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিককালেও নন্দলাল, যামিনী রায় বা গোপাল ঘোষ—এঁদের ছবিতে রেখার জোর, রেখার ব্যবহার অত্যন্ত বিস্ময়কর। এবং এঁরা সকলেই ছিলেন গণসংযোগে অতি সমৃদ্ধ। যেমন নন্দলালের রেখা খুবই সূক্ষ্ম, কিন্তু সিদ্ধ রেখা; গোপাল ঘোষের রেখা উত্তেজনাময়। হঠাৎ একটা রেখা টেনে দিলেন, তারপর ছবিটা ভাবতেন, রেখাকে কেন্দ্র করে ছবিটা হয়ে উঠত। যামিনী রায়ের রেখা মূলত পটশৈলীর। এখানে আর একজনের নামও বলা উচিত, অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নী সুনয়নী দেবী—তাঁরও রেখার জোর ছিল খুব। আমার রেখা এল ভারতীয় পরম্পরার হাত ধরে। ছবির প্রয়োজনে আমি রেখা ব্যবহার করেছি যে-কারণে তোমরা দেখবে, আমার ছবিতে বহু বিচিত্র রেখার ব্যবহার। যাঁর ছবি আঁকছি, তাঁর জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখা প্রয়োগের উদাহরণ তোমরা পাবে শিশির ভাদুড়ীর পোর্ট্রেটে, ও. সি. গাঙ্গুলী বা সুকান্তর পোর্ট্রেটে।

কিন্তু এর একটা দুঃখের দিকও আছে। আমার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ছবি রেখাধর্মী ও সাদা-কালোর অঙ্কন। পার্টির প্রয়োজনে—কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজনে আমার সাদা-কালোর ছবি এত বেশি প্রচারিত হয়েছে যে অনেকেরই ধারণা আমি এছাড়া অন্য কাজ বিশেষ-করিনি। পার্টিও তো এমন অর্থবান ছিল না যে তারা রঙীন ছবি ব্লক করে ছাপতে পারে। ফলে, এরকমটা হয়েছে। এটা আমার ক্ষেত্রে একরকম ট্র্যাজেডিই বলতে পারো। কেননা, আমি তো রঙীন ছবিও করেছি, আর কাজও সব মাধ্যমেই করেছি।

আমার ছবিতে একটা ভারতীয় চরিত্র আছে। কারণ ভারতীয় জনগণ অন্যদেশের মতো তাদের পরম্পরা ভুলে যায়নি। তাদের ধর্মজীবনে যেমন, বা সমবেত নৃত্য ইত্যাদিতে ভারতীয় পরম্পরা এখনো প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, তেমনই ছবির ক্ষেত্রে তারা লোকশিল্পের পরম্পরা বুঝতে পারে—এই কথাটা আমি লোকসংযোগের ফলে, গণসংযোগের ফলে বুঝতে পেরেছিলাম। তাই, ভারতবর্ষের আদিম ছবি দেখার জন্যে সেই ভীমভেটকা থেকে আরম্ভ করে আমি বিভিন্ন আদিম মানুষের ছবি দেখে বেড়িয়েছি। তারপর অজন্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৌদ্ধ গুহা দেখেছি। শুধু যে দেখেছি তাই নয়, সেখানে প্রয়োজনে স্টাডি করেছি, কপি করেছি। ফলে, অজন্তার রেখার বৈশিষ্ট্য, তার চলন, ছন্দ বুঝতে পেরেছি। এছাড়া, মোগল, রাজপুত পেইন্টিং আমি দেখেছি। আমি কিন্তু সবকারিভাবে এসব করিনি, সরকারি সাহায্য পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। তারপর ধরো রাজস্থানে যেসব জীবিত পরম্পরাগত শিল্পী আছেন, তাঁদের সাথে যোগাযোগ করেছি। অনুকরণ আমি করিনি বা করবার চেষ্টাও করিনি, আমি তার থেকে আমার রেখা ভারতীয়ত্ব বজায় রেখে তৈরি করেছি।

আবার ধরো, 'শলাকালিখন' দক্ষিণভারতের একটা পরম্পরাগত শিল্প। এবং ওখানকার শিল্পশাস্ত্রে এ সম্পর্কে অনেক টেকনিক্যাল ও থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা আছে। এমনকি উত্তরভারতের শিল্পশাস্ত্রেও এসম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। যাই হোক, শলাকালিখন পদ্ধতিটা খুবই আকর্ষণীয়, অনেকটা গ্রাফিক্সের মতো। সীজন্ড তালপাতার ওপর কোন তীক্ষ্ন শলাকা দিয়ে প্রথমে খোদাই করা হয়, তারপর কালি বুলিয়ে খোদাই করা অংশ উজ্জ্বল করে তোলা হয়। কেরল থেকে অন্ধ্র হয়ে উড়িষ্যা পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। ট্র্যাডিশনাল শিল্পীদের কাছে আমি এপদ্ধতিও অনুশীলন করেছি। এছাড়া ধরো, বাংলার পোটোদের কাছেও আমি কাজ করতে শিখেছি। আবার চীনা বা জাপানী তুলির ব্যবহার আমি সরাসরি ওদেশের শিল্পীদের কাছেই শিখেছি।

এইসব ঐতিহ্যাশ্রয়ী পরম্পরাগত শিল্পের সম্ভার তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে, আমাদের দেখা উচিত, বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

এখন, আমি যে রেখানির্ভর ছবি বেশি বেশি করে এঁকেছি,তার কারণ আমি জনগণের ব্যবহৃত ও চেনা ভাষায় কথা বলতে চেয়েছি। ফলে, তাদের কাছাকাছি যেতেও পেরেছি। গনসংযোগের সবচেয়ে ভালো মাধ্যমটা কী—এটা খুঁজে বেড়ানো ও খুঁজে পাওয়ার পেছনে আমার ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টির একটা ভূমিকা আছে, প্রেরণা আছে। যেমন ধরো, তুমি যদি একটা আদিবাসী অঞ্চলে যাও, তখন শুদ্ধ বাংলায় কথা বললেঁ তো হবে না। তুমি যদি তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারো, তাহলে তাদের প্রাণে প্রবেশ করতে পারবে। দুজনের নাম বলছি—কমিউনিস্ট পার্টির দিকপাল বক্তা, শুধু বক্তা নয়, দিকপাল নেতাও ছিলেন তাঁরা। একজন সোমনাথ


29
4
81

লাহিড়ী—কলকাতার যে কোন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিলে অন্য কেউ তার পাশে দাঁড়াতে পারত না। আর একজন ভবানী সেন—যখন গ্রামে হাজার হাজার লোকের জনসমাবেশে কথা বলতেন, তখন ঐখানে আর কারোকে ভাবা যেত না। তিনি তাদের ভাষায় তাদের প্রাণের কথা বলতে পারতেন। যেমন, আমার ক্ষেত্রে আমি হয়তো কলকাতার শিল্পী, উচ্চসমাজের শিল্পী হতে পারিনি, কারণ নিশ্চয়ই আমার ভাষা। আমার ভাষা তো কেয়ারি করা ভাষা নয়।

#### তুলনায় শিল্পের জীবন অনেক বড়

কমিউনিস্ট শিল্পীদের প্রথমত জনতার কাছে যেতে হবে। আমার মতে একজন কমিউনিস্ট শিল্পীকে মানুষের দরজায় দরজায় যেতে হবে, যাওয়া উচিত। ছবি তাদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

তোমাদের বলেছি, আমি কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজনে কয়েক হাজার পোস্টার এঁকে দিয়েছি। এসমস্ত পোস্টার বিভিন্ন মিটিং,জনসমাবেশে প্রদর্শিত হয়েছে, বারবার এভাবে দেখানোর ফলে তার একটা চাহিদা, একটা বোধগম্যতা তৈরি হয়েছে। আমার দিক থেকে এখানে একটু সূক্ষ্ম অন্যায়বোধ কাজ করে। কেননা, শেষবিচারে পোস্টার তো একটা তাৎক্ষণিক বিষয়কেই মাত্র ধরতে পারে। সে তুলনায় শিল্পের জীবন অনেক বড়। সুতরাং তাৎক্ষণিক ঘটনাসম্বলিত পোস্টারকে শিল্প বলে চালিয়ে দেওয়ার একটা মারাত্মক ক্ষতিকর দিক আছে। ক্রমাগত পোস্টার দেখিয়ে-দেখিয়ে যে-দোষ আমরা করেছি, আজকে তা শোধরানোর সময় এসেছে। যেমন আমি বিভিন্ন সম্মেলনে রঙীন পোস্টার করেছি, খুব চেক্‌নাই থাকত তাতে, ঐ চিকনদার পোস্টার দেখে ছবি বলে ভাবলে তো চলবে না। ছবি তো তা নয়। এখানে একটা কথা মনে রাখবে, তাৎক্ষণিক ছবির প্রয়োজন আছে, অবশ্যই আছে। যা দীর্ঘসময় থাকবে, এমন ছবির প্রয়োজন কিন্তু আরো বেশি। এই দোষমুক্ত হতে হলে আমাদের তো এখন যেতে হবে।

এরকম ভাবনা থেকেই আমি এই দিকে কিছুটা চেষ্টা অন্তত করেছি। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে, যেমন চিত্তরঞ্জন, বার্নপুর ইত্যাদি জায়গায় বহু প্রদর্শনী করেছি। জেলা হিসেবে বলা যায়, পুরুলিয়া থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া পর্যন্ত কাঁধে ছবি নিয়ে বেড়িয়েছি একসময়, প্রদর্শনী করেছি। কখনো সহশিল্পীদের সঙ্গে, কখনো আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। এসমস্ত অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছবির ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ অনুসন্ধানে আমাকে সাহায্য করেছে।

আবার একটা তাৎক্ষণিক বিষয়ও যে দেখার গুণে, আঁকার গুণে অসাধারণ ছবি হয়ে উঠতে পারে, তারও উদাহরণ আছে। অবনঠাকুর নন্দলালকে ছবি আঁকতে গেলে তোমাকে হাটে মাঠে মেলায় সর্বত্র যেতে হবে—একথা বারবার বলেছেন, সেখানে বসে পট এঁকে বেচতে বলেছেন—এবং নন্দলালও তা করেছেন। হরিপুরা কংগ্রেসে ওঁর

কাজের কথাই ভাবো—ভারতীয় লৌকিক জীবন নিয়ে অপূর্ব সব পটধর্মী ছবি এঁকেছেন। আজ সেসমস্ত ছবিকে 'হরিপুরা পোস্টার' বলা হচ্ছে, কিন্তু তা তো নয়। তিনি তো জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন, মহাভারতের অর্জুন তো আঁকেননি।

**অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট : কীভাবে দেখবো ?**

অ্যাবস্ট্রাক্‌শন—আর্টে এই একটা নতুন কথা, ইদানীং বেশি করে শোনা যাচ্ছে। এই কথাটা ওদের কাছে নতুন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এই তথাকথিত অ্যাবস্ট্রাক্‌শনের চূড়ান্ত হয়েছে। যেমন, তোমরা বোধহয় জানো, পুরীর মন্দিরকে 'দন্তপুরীমহাবিহার' বলা হয়, এটা বৌদ্ধবিহার বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের তিনটি মূর্তি, আজ যাদের তোমরা হিন্দু মূর্তি বলছো, আসলে কিন্তু বৌদ্ধ প্রতীক—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীকায়িত রূপ। তোমরা জানো, হীনযান বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার চল ছিল না। কখনো তাঁর পায়ের চিহ্ন, কখনো মহাবোধিবৃক্ষ ইত্যাদি প্রতীকের মধ্যে দিয়ে মনে করা হতো তাঁকেই প্রকাশ করা হচ্ছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই বিধিনিষেধের অবসান ঘটে। আবার কালীঘাটে যাও, কালীমূর্তির রূপ দেখ। আরো গভীরে যাও, এই মূর্তিও নেই।

মাদ্রাজে বা মদ্রদেশে চিদাম্বরম, কাঞ্চীভরম ইত্যাদি পাঁচটা জায়গায় পঞ্চ-জ্যোতিলিঙ্গ আছে। তার প্রতিটার অ্যাবস্ট্রাক্‌শন আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর। যেমন বায়ুলিঙ্গ—সেখানে মন্দিরের গর্ভগৃহে চক্রাকারে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলছে, কোথাও কোন শব্দ নেই, হাওয়া নেই। সমস্ত প্রদীপশিখা নিষ্কম্প, একমাত্র ঠিক মাঝখানের শিখাটি কোথা থেকে ক্ষীণ হাওয়ার সঞ্চারে মৃদু কাঁপছে। তো, এইভাবে বায়ুর অস্তিত্ব বোঝানো হলো এবং এই হলো বায়ুলিঙ্গ। এরকম পাঁচটি প্রতীকায়িত শিবলিঙ্গ আছে। চিদাম্বরমে মূল গর্ভগৃহে একটা পর্দা সরাতে দেখা গেল, সেখানে লেখা আছে 'চিদ্‌ যাহার অম্বর, তাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়,' এছাড়া আরো আছে। তাহলে যদি বলো অ্যাবস্ট্রাক্‌শন্‌, তা কোথায় গেছে ভাবো।

আবার অন্য দিক থেকে দেখ, অ্যাবস্ট্রাক্‌শন বলে আদৌ কোন কিছু হতে পারে কিনা। অ্যাবস্ট্রাক্ট তো যুক্তিহীন কোন কিছু হতে পারে না। সেখানে একটা ক্যানভাস আছে, তার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ রয়েছে, সেটা আয়তাকার হতে পারে, বর্গাকার হতে পারে। তারপর তুমি রঙ দিচ্ছ, রঙের প্রতিটা স্ট্রোক, প্রতিটা আঁচড় তুমি ভেবেচিন্তে দিচ্ছ। তোমার সামনে যা আছে, সেই ক্যানভাসটা নির্দিষ্ট, বাঁধাধরা। তার বাইরে তুমি বেরোতে পারছ না—একটা অত্যন্ত মেটিরিয়াল জিনিস সেটা। তারপর রঙের কথা ধরো, তুমি রঙ চাপাচ্ছ, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা মেটিরিয়াল প্রোসেস, ফিজিক্যাল

প্রোসেস—তোমার সমস্ত শরীর-মন নিয়ে একটা মেটিরিয়াল জিনিসের ওপর তুমি কাজ করছ। তাহলে, এখানে, নামে ছাড়া অ্যাবস্ট্রাক্‌শনের সুযোগ কোথায়? কিন্তু এসত্ত্বেও আমরা এজাতীয় ছবি দেখছি, অনেকে আঁকছে। আসলে এসমস্ত ছবিই যে আঁকছে একান্তভাবে তারই হয়ে থাকছে, শিল্পের সবচেয়ে বড় কথা যে কম্যুনিকেশন—এভাবে তার দায়িত্ব এড়ানো হচ্ছে।

অবশ্য এখানে আরো একটা কথা আছে। তোমরা বলবে, অক্ষর বা হরফও তো অ্যাবস্ট্রাক্ট—ঠিকই, কিন্তু তার একটা সর্বজনগ্রাহ্যতা আছে। এই সর্বজনগ্রাহ্যতা না এলে তো অ্যাবস্ট্রাক্‌শনের কোন অর্থ নেই। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট যাকে আজ বলা হচ্ছে, তার তো কোন স্ট্যান্‌ডার্‌ড-ডাইজেশন্‌ নেই, কী করে বুঝব, কোন্‌টা ভালো আর সঠিক, কোন্‌টা তা নয়। অর্থাৎ কম্যুনিকেট যদি না করা গেল, তাহলে তো হবে না। এইটা আসল কথা। যে-শিল্প কম্যুনিকেশনে ফেল করছে, তার মূল্য সেই শিল্পীর কাছে থাকতে পারে, আমাদের তা নিয়ে প্রয়োজনটা কী?

## 'গর্ভবতী জননী' থেকে 'চলো সাগরে' / শিল্পের নতুন প্রয়োগ

বিজন, বিজন ভট্টাচার্য আমার বহুকালের বন্ধু ছিল, এখন সে নেই। মনে আছে, গণনাট্য সংঘের সময়ে একবার বিজন আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার 'গর্ভবতী জননী'র মঞ্চ দেখাতে। একটা প্রতীকান্বিত নাটক, আর তার কিনা মঞ্চ করা হয়েছে একেবারে ন্যাচারালিস্টিক। এ তো চলবে না, পাল্টাতে হবে। বিজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কত টাকা তুমি খরচ করতে পারবে? তো বলল, পাঁচ টাকা। তা-ই সই। এখন একটা বাচ্চাদের রকিং হর্স যোগাড় করতে হবে। একজনের বারান্দায় অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্তূপ থেকে সেটা যোগাড় হলো। নাটকের গল্পটা সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে লেখা। সুন্দরবন তো আমার অচেনা জায়গা নয়। সেখানে জোয়ারের সময় নদীর জল ভীষণ বেড়ে যায়, ফলে বসতি অঞ্চলে লোকে করে কি, চারপাশে মাটির বাঁধ দিয়ে রাখে। আর সেই বাঁধের উপর থেকে নদী পর্যন্ত একটা বাঁশের মাচা করে যাতায়াতের জন্য। কেননা, ভাটার সময় যে-কাদা হয়, সেখানে হাঁটা যায় না, এঁটেল মাটির কাদা, পা দিলে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। সে-কাদা কিছুতে ছাড়ে না, লোকে বলে প্রেমকাদা। আমি এ সমস্তই ব্যবহার করলাম, সরাসরি নয় অবশ্য। ছেঁড়া চট ইত্যাদি দিয়ে স্টেজের পেছনে একটা বসতি অঞ্চলের চারপাশে মাটির বাঁধ বোঝানো হলো, সেখান থেকে একটা বাঁশ ফেলে দিলাম—ঐ যাতায়াতের মাচা বোঝাতে—মাচাটা থাকল না, ধরবার হাতলটা শুধু থাকল। দূরে রকিং হর্সটার সঙ্গে আর একটা বাঁশ বেঁধে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নৌকার পাল তৈরী হলো। ঘোড়াটা স্টেজ থেকে তিন-চার ফুট নীচে থাকল, কিন্তু ঐ পালের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এবার নাটক চলার সময় সারাক্ষণ দুপাশে দড়ি দিয়ে ঐ ঘোড়াটাকে দোলানো হলো—মনে হলো একটা নৌকা বাঁধা আছে, জল-

স্রোতে দুলছে। সুন্দরবনের নদীতে নৌকার ঐ দোলা একটা বিশেষ ব্যাপার। আবার, তার একটা প্রতীকী অর্থও ছিল। নাটকের বিষয়বস্তুই সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে মানুষের অন্ধবিশ্বাস আর নতুন জীবনের দ্বন্দ্ব, একদিকে চিরাচরিত পুরনো, স্থবির জীবন : অন্যদিকে নতুন সজীব জীবনের হাতছানি—এই চিরকালীন মানসিক দোলাচল কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ফলে, রকিং হর্সের ঐ ব্যবহারও একটা প্রতীক হয়ে উঠল।

তারপর ধরো বিজনেরই 'চলো সাগরে'। চারটে ভিন্ন গল্প নিয়ে নাটক। আর এ সমস্তকেই একসূত্রে বেঁধে ছিল এক মাদারি খেলোয়াড়, সেই আসলে সূত্রধর। প্রথম গল্পের বিষয়—কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে, একজন কমিউনিস্ট কর্মী মনে মনে কী প্রচণ্ড আহত হলো যে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলো। আর একটা গল্পের বিষয়—দাঙ্গা। তারপর এল নকশালবাড়ির কৃষকসংগ্রাম। এভাবে চারটে গল্প। প্রত্যেকটা গল্প কেন্দ্র করে ১৮ ফুট × ৪ ফুট কাপড়ে আলাদা আলাদা ছবি আঁকলাম—প্রতীকায়িত ছবি। আর ব্যবহার করলাম রঙীন কাপড়। কখনো লাল, দাঙ্গার গল্পে। ছাই রঙ ব্যবহার করলাম কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের গল্পে। হলুদ নকশালবাড়ির সংগ্রামে। এই ছবি আর রঙীন কাপড়ের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে কুশীলবরা মঞ্চে প্রবেশ করত। এছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো অনেক গল্প, অনেক অভিজ্ঞতার কথাই বলা যায়—পরে পরে তোমাদের বলব।

**শিল্পের অন্য প্রয়োগ, অন্য অভিজ্ঞতা**

তোমরা জানো, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে শুরু করে বহু কৃষক-সম্মেলন, ছাত্রসম্মেলনের মঞ্চসজ্জা ও অন্যান্য পরিকল্পনার কাজ একসময় প্রধানত আমাকেই করতে হয়েছে, এখানে সেইসব অভিজ্ঞতার কথা দু'একটা তোমাদের বলি।

যেমন, একবার কৃষক সম্মেলনে আঁকলাম এক কর্মরত কৃষক দম্পতির ছবি। তারা ক্ষেতে কাজ করছে, ধান রোপণ করছে। তো, স্বাভাবিকভাবেই এসময় শরীর অনেকটা ঝুঁকে পড়ে, মেয়েদের বুকের কাপড় অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। ফলে, সেই কৃষাণীর বুকের একটা অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদেব বৃদ্ধ আর প্রাচীন কমরেডরা তা মানবেন কেন, তাদের নৈতিকতায় আঘাত লাগল। আমাকে ডেকে সকলে বললেন, এটা কী করেছ, এ তো ঠিক নয়। কিন্তু আমি তো যেমন দেখেছি, তেমনি এঁকেছি, ভুলটা কোথায় হলো ? কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর ঠিক হলো—যে-কৃষকরা সম্মেলনে আসবে, তাদের মায়েদের ও মেয়েদের ডেকে আনা হবে—তারাই এসে বলুক যে তারা অপমানিতা বোধ করছে কী না। তাই হলো, তারা এল, আর তাদের রায় আমার পক্ষে গেল।

আর একবার ট্রেড-ইউনিয়ন সম্মেলনের ছবি আঁকছি। সেখানে দেখা গেল ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং স্তালিন। বিরাট মিছিল আসছে,

আর তার পুরোভাগে বলিষ্ঠদেহ শ্রমিক, তার মুখের আদলটা স্তালিনের মতো। সেই দেখে তো নেতারা খুব ক্রুদ্ধ—এ কী করে হয়, এ তো চলবে না, ইত্যাদি। শেষপর্যন্ত ঐ কংগ্রেসে যোগদানকারী শ্রমিকরাই রায় দিলেন, আর সেবারও রায় আমার পক্ষে। এভাবে আমি সর্বদা নির্ভর করেছি জনতার ওপর, তাদের বিচার-বুদ্ধির ওপর; দু'চারজন ব্যক্তির বিচারক্ষমতার ওপর নয়।

আর এই সেদিনের কথা, মেদিনীপুরের কৃষকসভা হবে, কাঁথিতে অনন্ত মাঝি আমাকে ধরল, একটা পোস্টার এঁকে দাও। অনন্ত তখন মেদিনীপুরে সি. পি.আই.-এর কৃষকফ্রন্টের নেতা। মেদিনীপুরে নকশাল আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আমি একটা পোস্টার আঁকলাম—দূর থেকে সংগ্রামী জনতার মিছিল আসছে, একজন কৃষক সামনে প্রায় লাফিয়ে উঠেছে, তার হাতে শানিত কাস্তে। নীচে স্লোগান—'জান দেব, জান নেব, তবু জমির দখল ছাড়বো না'। ৫,০০০ ছাপা হলো। সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরে আড়াই হাজার পাঠিয়ে দিতে বললাম অনন্তকে কেননা, আমি তো জানতাম, পার্টি, মানে সি. পি. আই. 'জান নেব'—একথায় একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'এ তো একেবারে নকশাল স্লোগান!'—ওরা বলবে। কিন্তু আমি জানি, এই হচ্ছে চাষীর স্লোগান—জান দেব, জান নেব। আমাকে মারলে আমি মারব না? ছেড়ে দেব? তা তো হয় না। তখন গোপীবল্লভপুর হচ্ছে, নকশালরা সেখানে দারুণ সব কাণ্ডকারখানা করছে, তখন মিঠে কথায় 'জান দেব' শুধু—এভাবে বলাটাই ভুল। সুতরাং এইভাবে আমি একজন শিল্পী হিসেবে, আমি তো সে অর্থে কোন পার্টিরই মেম্বার নই, সেই হিসেবে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতো এইসব কাজ করেছি। ভুল করেছি কি ঠিক করেছি জানি না।

### এ পর্যায়ের শেষ কথা

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি পার্টিমেম্বার?—এই প্রশ্ন কখনোই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আজও নেই। কিন্তু, পার্টির দায়িত্ব, সমাজের দায়িত্ব যখনই আমার কাঁধে এসে পড়েছে, তখনই আমি তা পালন করতে চেষ্টা করেছি, যথাশক্তি করেছি। আর আমি যে কখনো ভেঙে পড়িনি, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টি বারবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে—এই ঘটনা চোখের ওপর দেখেও বিচলিত হইনি, তার কারণ হলো, মার্কসবাদের প্রতি আমার আস্থা আজও অবিচল। আমি জানি, বারবার নানা বাধা আসবে, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই আমার হাঁটতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ নেই।

তোমাদের আমি একথাও বলছি যে মার্কসবাদ কারো মনোপলি দর্শন নয়, তোমারও বুদ্ধি আছে, তোমারও দেখার চোখ আছে, তুমি দেখো, বোঝো, বোঝার চেষ্টা করো, প্রয়োগ করো, লোকের কাছে যেতে পারছ কিনা দেখো—এছাড়া তো কোন পথ নেই। এইসূত্রে আবার সংগঠনের প্রশ্ন আসে। এখানে শিল্পীরা সেই আহ্বান তার

কাজে প্রকাশ করবে—সংগঠিত হওয়ার আহ্বান, একত্রিত হওয়ার আহ্বান শুধু আহ্বানেই শেষ হবে না, সংগঠনটা কিসের জন্য প্রয়োজন, বিপ্লবটা কী জন্য প্রয়োজন—একথা তাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে। এইখানে আসে রিয়্যালিজমের প্রশ্ন। ন্যাচারালিজম আর রিয়্যালিজম এক নয়—ন্যাচারালিজমে শুধু চোখের ব্যবহার, যা দেখছি শুধু তাই, রিয়্যালিজমে তার সাথে যুক্ত হয় মানুষের মন, মস্তিষ্ক। তোমরা গোইয়ার ছবির কথা ভাবো, প্রাক্‌বিপ্লব যুগের চীনের উড্‌কাটের কথা ভাবো। এইসব থেকেই তো শিক্ষা নিতে হবে আমাদের। □

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা একান্তভাবেই প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপন ষড়যন্ত্রের এতটুকু স্থান নেই। ছবি আঁকি, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখি, গান গাই, অভিনয় করি, বক্তৃতা দিই—গোপনে করা দূরে থাক, পাঠক, শ্রোতা দর্শক পর্যন্ত বেছে নেবার উপায় নেই। সোজাসুজি খোলাখুলি আমার দেশের সকল মতের সকল রুচির সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে দিতে হবে আমার সকল রকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। দেশের মানুষই তাই শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একমাত্র বাহক এবং বিচারক ' দেশবাসীর গ্রহণ ও বর্জনই' এক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োগযোগ্য আইন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ তাই সভ্যজগতে এত বড় অনিয়ম বলে মনে হয়।

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচয়, ১৩৫৭



শোভন সোম

# ছবির রাজনীতি

পরিবর্তিত পরিস্থিতি এক একটি কাল-পরিসরকে পূর্ববর্তী বা অন্যান্য কাল-পরিসর থেকে আলাদা করে বা বিশেষ করে দেখতে বাধ্য করে। আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদির ওঠাপড়া থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই ওঠাপড়া মানুষের গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে। এরই গভীর প্রতিক্রিয়া মানুষ সক্রিয়ভাবে ব্যক্ত করে তার ভাবনায়, তার কাজে এবং এরই গভীর প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও সাবেকি পথ থেকে অন্যদিকে যায়। বস্তুত এই প্রতিফলনই মানুষের পরিণামকামী কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। প্রাণীজগতের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মানুষের এখানেই তফাৎ যে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে পারিপার্শ্বিকের পক্ষে বা বিপক্ষে একই সঙ্গে তার মনন ও কাজ দিয়ে সাড়া দেয়, যে কল্পনা করবার ক্ষমতা ধরে, যে ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় ও ভবিষ্যৎ রচনা করে।

ইতিহাসে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ও তার প্রত্যুত্তরের অসংখ্য নজির রয়েছে। এদেশের বিস্তীর্ণ ইতিহাসে আমরা বারবার পরিস্থিতিজাত সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ দেশের মানুষ নানাভাবে

যে এইসব সংকটের মোকাবিলা করেছে, আমরা তারও ইতিহাস পাই। এই মোকাবিলার চেহারা সবসময় একরকম থাকে নি। কখনো তা দেখা গেছে সক্রিয় প্রতিবাদের চেহারায়; কখনো সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, দৈনন্দিন জীবনের স্তরে স্তরে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এ দেশের অর্থনীতিতে পড়লেও এ দেশের সীমা থেকে সেই যুদ্ধ ঢের দূরে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সেই সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লব এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নতুন চিন্তা উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল। সেই সময় থেকে কয়েক দশক যাবৎ এ দেশের বুদ্ধিজীবিদের একটি বড় অংশ বিশ্বের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাঁদের ধ্যানধারণাকে উত্তরোত্তর একটি নির্দিষ্ট দর্শনের দিকে নিয়ে চলেছিলেন, যার নাম মার্কস্‌বাদ। যুক্তি দিয়ে তাঁরা তাঁদের দেশ-কালপাত্রকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া, মার্কস্‌বাদী যুক্তিপ্রবণতার বাইরে যাঁরা ছিলেন অথচ যাঁরা কোন না-কোন কাজে সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ক্রমে বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। ত্রিশের গোড়া থেকে এভাবে এদেশের সংস্কৃতি-চিন্তায় প্রগতিমূলক চেতনা জেগে ওঠে। যাঁরা কোনোকালে রাজনীতির সংস্পর্শে থাকেন নি কিংবা কোন স্পষ্ট মতবাদ কোনোকালে প্রকাশ করেন নি, তাঁদেরও অনেকে বিশ্ব পরিস্থিতির সংকটের মোকাবিলায় শান্তি আন্দোলনের সূত্রে আন্তর্জাতিক বা দেশী প্রগতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পারেননি। উনিশ'শ ছত্রিশে রোম্যাঁ রোলাঁর আহ্বানে ব্রাসেল্‌সে যে বিশ্বশান্তি সভা আহূত হয়েছিল সেই ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, মুন্‌শি প্রেমচন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহরু ও নন্দলাল বসু। এর আগে এদেশী মানুষেরা, লেখক শিল্পী বিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ নির্বিশেষে, আর কোন বিশ্বভাবনার সঙ্গে এভাবে একাত্ম বোধ করেন নি।

এরই মধ্যে বাঙলায় নানা ধরনের সক্রিয়তার ভিতর দিয়ে দলমত নির্বিশেষে প্রগতিতে বিশ্বাসী সংস্কৃতিমান মানুষেরা একত্র হতে থাকেন ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। অভিব্যক্তির একটি সম্মিলিত রূপ ও চেতনার ঐক্যের খাতিরে এমন একটি মিলনমঞ্চ তৈরির ঐতিহাসিক প্রয়োজন সেদিন দেখা দিয়েছিল। বস্তুত এর আগে সংস্কৃতিশীল মানুষেরা প্রগতির লক্ষ্য সামনে রেখে দলমত নির্বিশেষে এভাবে এক মঞ্চে সমবেত হন নি। দলমতের দ্বন্দ্বও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রগতির লক্ষ্যে বাধা হয়ে ওঠে নি। এমনকি, সংস্কৃতিশীল মানুষদের একটি বড় অংশ প্রগতি মঞ্চে দলবদ্ধ না হয়েও স্বতন্ত্রভাবে প্রগতির লক্ষ্যে কাজ করে ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদের সবার কাজে যে লক্ষ্যের স্পষ্টতা, অভিব্যক্তির স্পষ্টতা, দর্শনের স্পষ্টতা ছিল, তা বলা যাবে না। কিন্তু একটি পরিণামকামিতা যে তাঁদের একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল, একথা অন্তত বলা যায়। আবার সব সৃজনশীল মানুষেরাই যে একই পরিণামকামিতায় সংবদ্ধ ছিলেন, তাও নয়। কেউ কেউ সময়ের হৃদ্‌ঘাত ধরতেও পারেন নি, কেউ কেউ



শোভন সোম

# চল্লিশ'এর রাজনীতি ও রাজনৈতিক ছবি

পরিবর্তিত পরিস্থিতি এক-একটি কাল-পরিসরকে পূর্ববর্তী বা অন্যান্য কাল-পরিসর থেকে আলাদা করে বা বিশেষ করে দেখতে বাধ্য করে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদির ওঠাপড়া থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই ওঠাপড়া মানুষের গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে। এরই গভীর প্রতিক্রিয়া মানুষ সক্রিয়ভাবে ব্যক্ত করে তার ভাবনায়, তার কাজে এবং এরই গভীর প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও সাবেকি পথ থেকে অন্যদিকে যায়। বস্তুত এই প্রতিফলনই মানুষের পরিণামকামী কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। প্রাণীজগতের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মানুষের এখানেই তফাৎ যে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে পারিপার্শ্বিকের পক্ষে বা বিপক্ষে একই সঙ্গে তার মনন ও কাজ দিয়ে সাড়া দেয়, যে কল্পনা করবার ক্ষমতা ধরে, যে ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় ও ভবিষ্যৎ রচনা করে।

ইতিহাসে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ও তার প্রত্যুত্তরের অসংখ্য নজির রয়েছে। এদেশের বিস্তীর্ণ ইতিহাসে আমরা বারবার পরিস্থিতিজাত সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এদেশের মানুষ নানাভাবে

যে এইসব সংকটের মোকাবিলা করেছে, আমরা তারও ইতিহাস পাই। এই মোকাবিলার চেহারা সবসময় একরকম থাকেনি। কখনো তা দেখা গেছে সক্রিয় প্রতিবাদের চেহারায়; কখনো সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, দৈনন্দিন জীবনের স্তরে স্তরে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এদেশের অর্থনীতিতে পড়লেও এদেশের সীমা থেকে সেই যুদ্ধ ঢের দূরে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সেই সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লব এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নতুন চিন্তা উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল। সেই সময় থেকে কয়েক দশক যাবৎ এদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ বিশ্বের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাঁদের ধ্যানধারণাকে উত্তরোত্তর একটি নির্দিষ্ট দর্শনের দিকে নিয়ে চলেছিলেন, যার নাম মার্কসবাদ। যুক্তি দিয়ে তাঁরা তাঁদের দেশ-কালপাত্রকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া মার্কসবাদী যুক্তিপ্রবণতার বাইরে যাঁরা ছিলেন অথচ যাঁরা কোন না কোন কাজে সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ক্রমে বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। তিরিশের গোড়া থেকে এভাবে এদেশের সংস্কৃতি-চিন্তায় প্রগতিমূলক চেতনা জেগে ওঠে। যাঁরা কোনকালে রাজনীতির সংস্পর্শে থাকেননি কিংবা কোন স্পষ্ট মতবাদ কোনকালে প্রকাশ করেননি তাঁদেরও অনেকে বিশ্ব-পরিস্থিতির সংকটের মোকাবিলায় শান্তি-আন্দোলনের সূত্রে আন্তর্জাতিক বা দেশী প্রগতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পারেননি। উনিশ'শ ছত্রিশে রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ব্রাসেলসে যে বিশ্বশান্তি সভা আহূত হয়েছিল সেই ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, মুনশি প্রেমচন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহরু ও নন্দলাল বসু। এর আগে এদেশী মানুষেরা, লেখক-শিল্পী-বিজ্ঞানী-রাজনীতিবিদ নির্বিশেষে আর কোন বিশ্বভাবনার সঙ্গে এভাবে একাত্ম বোধ করেননি।

এরই মধ্যে বাংলায় নানাধরনের সক্রিয়তার ভিতর দিয়ে দলমতনির্বিশেষে প্রগতিতে বিশ্বাসী সংস্কৃতিমান মানুষেরা একত্র হতে থাকেন ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। অভিব্যক্তির একটি সম্মিলিত রূপ ও চেতনার ঐক্যের খাতিরে এমন একটি মিলনমঞ্চ তৈরির ঐতিহাসিক প্রয়োজন সেদিন দেখা দিয়েছিল। বস্তুত এর আগে সংস্কৃতিশীল মানুষেরা প্রগতির লক্ষ্য সামনে রেখে দলমতনির্বিশেষে এভাবে এক মঞ্চে সমবেত হননি। দলমতের দ্বন্দ্বও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রগতির লক্ষ্যে বাধা হয়ে ওঠেনি। এমনকি, সংস্কৃতিশীল মানুষদের একটি বড় অংশ প্রগতি মঞ্চে দলবদ্ধ না হয়েও স্বতন্ত্রভাবে প্রগতির লক্ষ্যে কাজ করে ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদের সবার কাজে যে লক্ষ্যের স্পষ্টতা, অভিব্যক্তির স্পষ্টতা, দর্শনের স্পষ্টতা ছিল তা বলা যাবে না। কিন্তু একটি পরিণামকামিতা যে তাঁদের একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল, একথা অন্তত বলা যায়। আবার সব সৃজনশীল মানুষেরাই যে একই পরিণামকামিতায় সংবদ্ধ ছিলেন তাও নয়। কেউ কেউ সময়ের হৃদ্‌ঘাত ধরতেও পারেননি কেউ কেউ

সংবন্ধ ছিলেন তাও নয়। কেউ কেউ সময়ের হৃৎঘাত ধরতেও পারেননি, কেউ কেউ তাঁদের শর্তবদ্ধ মানসিকতা অতিক্রম করতে পারেননি, কেউ কেউ স্বার্থের সংস্কারেই দায়বন্ধ থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু, একথা সত্য যে, সৃজনশীল মানুষদের বড় অংশই ত্রিশের মাঝামাঝি থেকে বিশ্বপরিস্থিতির সংক্রান্তির মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাজে পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

বিশ্বপরিস্থিতিতেই যে যুদ্ধ, বিভিন্ন শক্তির বিকাশ, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ও শোষণ বিচিত্র সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল তা নয়, এদেশে, বিশেষ করে বাংলায় নানা ধরনের অভূতপূর্ব উপপ্লব একের পর এক দেখা দিতে থাকে। ত্রিশের মাঝামাঝি থেকে চল্লিশের শেষ পর্যন্ত কালপরিসরে ঘটে-যাওয়া এইসব বাস্তব ঘটনার নজির এদেশের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। ত্রিশের মাঝামাঝি থেকেই বাংলায় বামপন্থী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং এই সময় গঠিত সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ইত্যাদিতে ছাত্র ও লেখকেরা সমবেত হতে থাকেন। জাতীয় কংগ্রেসের একমুখী ভাবনার বাইরে ভিন্নমুখী চেতনার বিকাশ এভাবে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। এমনকি মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার বার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে ভিন্নমুখী চেতনার প্রবণতা এই দশের একটি উল্লেখ্য ব্যাপার হিসাবে দেখা যায়। এরই মধ্যে ত্রিশের শেষে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রাজনৈতিক আন্দোলন ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে জোরদার হয়ে ওঠে। বেয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বাংলায় অহিংস থাকেনি। একই সঙ্গে বাংলার উপকূলভাগে দেখা দেয় ব্যাপক বন্যা ও তেতাল্লিশে সবচেয়ে বেশি ফলন হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রসদভান্ডার গড়ে তুলতে খাদ্যশস্য মজুত করার মাধ্যমে তৈরি করা হয় মানুষের তৈরি বিশ্বের বৃহত্তম দুর্ভিক্ষ। ইংরাজ সরকারের তৈরি দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি স্যার জন উডহেড্ এই দুর্ভিক্ষকে এক বিশাল মানবিক ট্র্যাজেডি বলেছিলেন। একই সঙ্গে চলেছিল যুদ্ধের তোড়জোড়, শোষণ ও নিপীড়ন। এরই সঙ্গে পরপর ঘটে যায় তেভাগা তেলেঙ্গানা, নৌবিদ্রোহ, ছাত্র-আন্দোলন ইত্যাদি। যুদ্ধের শেষে দেশভাগের সবচেয়ে বড় মূল্যও দিতে হয় বাংলাকেই। তারই অব্যবহিত আগে বাংলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়ে সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। এইসব দ্রুতধাবমান ঘটনাসঞ্চারে কোন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষেই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কাজেও এর সুদূরপ্রসারী অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের নামেই স্পষ্ট যে এই সংগঠন ছিল বস্তুত লেখকদের সংগঠন। গণনাট্য সঙ্ঘের নামেও এটা স্পষ্ট ছিল যে এই সংগঠন ছিল নাট্যকর্মীদের। এভাবে, চিত্রকর-মূর্তিকরদের কোন স্বতন্ত্র প্রগতিশীল সংগঠন গড়ে তোলা হয়নি, যা শিল্প-কলার সাথে যুক্ত মানুষদের সমবেত হতে সাহায্য করে। যদিও লেখক ও নাট্য-সঙ্ঘের সঙ্গে কোন কোন চিত্রকর যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এইসব সঙ্ঘ তাঁদের প্রতিভা

ও অভিব্যক্তি বিকাশের পক্ষে কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করেনি ; বরং এইসব সঙ্ঘে তাঁদের ভূমিকা পোস্টার বা দেওয়ালনামা লিখনের মধ্যেই সীমিত ছিল। তবে, প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও প্রগতি আন্দোলনের আশেপাশে যেসব চিত্রকর ও মূর্তিকর ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন নতুন প্রজন্মের শিল্পী। যাঁরা তারও আগে থেকে শিল্প-চর্চায় যুক্ত ছিলেন কিংবা এক অর্থে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের ভাবনায় এই যুগের উৎক্রান্তি নানাভাবে কাজ করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে অনুভব করে তাঁরাও সৃজনশীল প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়ে যে-কালচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার মূল্যায়ন আগে প্রয়োজন।

শিল্পকলা যে সমাজেরই প্রতিফলন, এই সত্যনিষ্ঠা যাঁরা তাঁদের কাজে এই পরিস্থিতিতে প্রথম দেখিয়েছিলেন এবং এভাবে নতুন পথের সূচনায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এবং রামকিংকর। চল্লিশের শিল্পকলায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন যে তাঁরাই করেছিলেন, এই সত্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, তাঁদের কাজে তাঁরা যে নতুন ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন তারই ভিত চল্লিশের নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা পেয়েছিলেন এবং বর্তমানে চতুর্দিকে মুখরিত ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও চল্লিশের কয়েকজন বাছা বাছা তরুণ শিল্পীকেই মাত্র এই নতুন ভাবনার অগ্রপথিক বলা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ত মুসোলিনির যে উন্মাদ ভঙ্গির ছবি এঁকেছিলেন সেটিকে মুসোলিনির পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের পূর্বাভাস হিসাবে দেখতে হয়। বিশ্বযুদ্ধের আগে আঁকা এই ছবিটি শুধু এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, এদেশে এর আগে কোন বিশেষ রণনায়ককে নিয়ে এভাবে আর কেউ ছবি আঁকেননি। মুসোলিনির চরিত্র ব্যক্ত করতে রবীন্দ্রনাথ কোন কাল্পনিক পাত্র তৈরি করেননি, কিংবা কোন প্রতীক-সংকেতও ব্যবহার করেননি। তিনি সরাসরি মুসোলিনিকেই এঁকেছিলেন। লক্ষ্যের এই স্পষ্টতার কারণে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাজের থেকে এছবি বিশিষ্ট। আরো বিশিষ্ট এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি আঁকতেন না। তিনি বলতেন, তাঁর ছবির রূপগুলি জনকের লাঙলের ফলায় জেগে ওঠা সীতার মতো খুঁজে পাওয়া রূপ। কিন্তু, তাঁর এই ছবিটি যে উদ্দেশ্যমূলক ছিল, এ কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর শিষ্যমণ্ডল যে-শিল্পচর্চা এই শতকের গোড়া থেকে শুরু করেছিলেন, তার উদ্‌গমে ছিল শিকড় অন্বেষণের দূরাগত আকাঙ্ক্ষা। এই অন্বেষণে বৈজ্ঞানিক যুক্তি অপেক্ষা আবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, কোন কোন সংকীর্ণ স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়েছিল এবং বাস্তব পরিস্থিতির বদলে অতীতের কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তথাপি, এই অন্বেষণসূত্রে এক সর্বব্যাপী দেশাভি-মানের আবহ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই অন্বেষণধারাকেই নয়া বাংলা ঘরানা বলা

হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অন্বেষণে সহায়তা করলেও এই অন্বেষণকর্মের অতীতচারী মানসিকতা ও শর্তবদ্ধতার নিন্দা করেছিলেন ঢাকায় উনিশ'শছাব্বিশে প্রদত্ত 'আর্ট এন্ড ট্র্যাডিশন' বক্তৃতায়। এই অন্বেষণকে স্থায়ী রূপ দিতে উনিশ'শ সাতে দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট স্থাপিত হয়েছিল এবং উনিশ'শ উনিশে একটি বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল ইংরাজ সরকারের সহায়তায়। এই উদ্যোগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সে-সময় অবনীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমাদের যা কিছু জাতীয় মঙ্গল তা আমাদের উদ্যোগেই সাধিত হবে, ঔপনিবেশিক সরকারের সহায়তায় হবে না। রবীন্দ্রনাথ উহ্য রাখলেও, তার বক্তব্যে এই কটার্থ ছিল যে সরকার এদেশের অন্যান্য সমস্ত জাতীয় উদ্যমের বিরোধিতা করলেও এই বিশেষ জাতীয় শিল্পোদ্যমের সমর্থনে যখন অর্থ ও সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসছে, তখন ব্যাপার নিশ্চয়ই সন্দেহজনক।

অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং উনিশ'শ ত্রিশের পর থেকে এই সোসাইটি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকেন। এই সময় আরব্যরজনীর ধারাবাহিক ছবি আঁকার পর তিনি হাত থেকে তুলি নামিয়ে রাখেন দীর্ঘকালের জন্য। এই ঘরানার যে-শাখাটি নন্দলাল শান্তি-নিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের বাইরে অন্য পথে বিকশিত হতে থাকে। ক্রমে এক্ষেত্রে যে-সব বিশেষ প্রবণতা স্পষ্ট হতে থাকে, তা ক্রমেই সে শাখাটিকে মূল ঘরানা থেকে দূরে নিয়ে যেতে থাকে। এই শাখার শিল্পীদের মধ্যে রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নয়াবাংলা ঘরানার শিল্পী বলা যাবে না। আবার এই শাখার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের কাজে নয়াবাংলা ঘরানার রেশ লক্ষ করা যাবে।

নয়াবাংলা ঘরানার দুর্বলতার কারণ ছিল এই যে, এই প্রয়াসকে ঘিরে যে-সব দেশ-বিদেশী ভাবুকেরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরাই এই ঘরানার অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। এই তথাকথিত অভিভাবকদের শিল্পবিষয়ে কোন পূর্বাপর ধারণা ছিল না। বর্তমান ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁরা এদেশের অতীতের সবকিছুকেই গৌরবান্বিত করে দেখতে শুরু করেছিলেন। সকলেই ছিলেন অভিজাত এবং উচ্চপদাসীন। একারণে শিল্পীমহলেও এঁদের প্রতি এক স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ তৈরি হয়েছিল। এই বর্তমান-বিমুখতার পিছনে এই অভিভাবকদের কোনো গূঢ় রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঢাকা বক্তৃতা'য় এই আপনি-অভিভাবকত্বের অকুন্ঠ নিন্দা করেছিলেন। অতীত খুঁড়ে প্রাচীন শিল্পা-দর্শকে তুলে আনার মধ্যেই আধুনিক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিহিত, একথা তাঁরা শিখিয়েছিলেন। বিশ্বজুড়ে শিল্পের জগতে কী ঘটে চলেছে, তার কোন খবর এদেশের শিল্পীদের জানানোর তাঁরা প্রয়োজন মনে করেননি। বিশ্বনিরিখে তাঁরা নিজেরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, একথা না-জেনেই এদেশের শিল্পীরা অজন্তা, মোগল, রাজপুত ছবিতে দাগা বুলিয়ে আত্মমুগ্ধতায় মজেছিলেন। নিজের ছবিতে

আধুনিক শৈলীগত নানা পরীক্ষানিরীক্ষা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথ এই অভিভাবকদের স্বতাভিভাবনে প্রভাবিত হয়েছিলেন ও স্বাদেশিকতার পথে জাতীয় ঐশ্বর্যের দিকে তাকাতে গিয়ে তাঁর শিল্পবিষয়ক রচনাদিতে গুপ্তযুগের শিল্পশাস্ত্রকে আদর্শ মনে করেছিলেন। শিল্পগত বৈশিষ্ট্যে নয়াবাংলা ঘরানার ছবির মূল্য কী, সমাজবাস্তবতার দিক থেকেই বা এগুলির ভূমিকা কী, তার বিবেচনা কেউ করলেন না। এইসব অভিভাবকদের কাছে সতীদাহ,লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ইত্যাদিও জাতীয় মহিমার দ্যোতক বলে ব্যাখ্যাত হলো। সরলা দেবী বা অক্ষয় কুমার মৈত্রের প্রতিবাদেও কেউ কর্ণপাত করলেন না। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও ভাবলেন যে তাঁদের ছবি আদর্শগতভাবে এদেশের পরম্পরার অনুবর্তন ঘটিয়েছে। স্বদেশাভিমানকে যদি অতীতচারী কল্পনার মধ্যে না দেখা হতো, তাহলে নয়াবাংলা ঘরানা আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের দায়সঞ্চার করত।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই প্রয়াসকে ব্যর্থ বলা যাবে না একারণে যে, এই ঘরানার অগ্রসৃতির পথেই পরবর্তীকালে নন্দলালের ছবিতে এবং তাঁর ছাত্র রামকিঙ্করের মূর্তিতে ও ছবিতে আমরা বাস্তব চেতনার প্রতিফলন গভীরভাবে দেখেছি। নন্দলালের 'বোল-পুরের পথে' নামের ছবি ও রামকিঙ্করের 'সাঁওতাল পরিবার' নামের গুচ্ছমূর্তি ত্রিশের শেষদিকের কাজ। দুটি কাজেরই বিষয় লেবার মাইগ্রেশন বা পরিযায়ী শ্রমিক। শহরের কারখানায় কাজের জন্য ভূমিহীন খেতমজুরদের গ্রাম ছেড়ে চলে আসার বাস্তব ঘটনা এ দুটি কাজের বিষয়। আধুনিক ভারতীয় শিল্পে এই কঠোর বাস্তবতা এর আগে আর উঠে আসেনি। উপরন্তু এদেশের তৎকালিক মূর্তিকরেরা যখন অজুরায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি কিংবা শখের বশে কোন জীবন্ত মানুষের মূর্তি গড়ে চলেছিলেন, তখন রামকিঙ্কর কোন ফরমাশ বা শখপূর্তির বদলে নিজের অন্তরাত্মার তাগিদে ভারতীয় শ্রমজীবনকে শিল্পের উপজীব্য করে তুলেছিলেন। বেদীতে না বসিয়ে এই গুচ্ছমূর্তি তিনি মাটির সমতলে দাঁড় করিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের পায়ে-চলা পথের ধারে। গভীর এক বাস্তব চেতনা থেকে উঠে আসা এই মূর্তিটিকেই আমরা আধুনিক মূর্তি-কলার পুরোভাগে স্থান দিতে পারি।

চল্লিশে এদেশের শিল্পকলায় নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে যে দাবি করা হয়, তার ভিত এভাবেই তৈরি হয়েছিল। এই ভিতের কথা স্মরণ না করে চল্লিশের শিল্পকলার দিকে তাকানো যাবে না। চল্লিশের শিল্পকলা পর্যালোচনার আগে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। এক, যাঁরা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের শিল্পকর্মে সময়ের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেলেও তাঁরা কোন রাজনৈতিক চেতনা বা বিশেষ আদর্শের প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত হননি। তথাপি তাঁরা সময়ের প্রতি সচেতন সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন। দুই, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যেও দুটি বিশেষ শ্রেণী লক্ষ করা যায়। এঁদের মধ্যে একটি শ্রেণী

প্রগতিচিন্তায় তথা মার্কসবাদে বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে শিল্পকলার ক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং তাঁদের শিল্পকলায় সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছিলেন। আরেক শ্রেণীর শিল্পীরা সক্রিয় মার্কসবাদী না হলেও প্রগতিপথের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের অনেকে কখনো মার্কসবাদীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এক হয়েছিলেন ও লাল-পতাকার নিচে সমবেত কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিন, নতুন প্রজন্মের একদল তরুণ শিল্পী প্রগতিপথের কর্মসূচি বা লালপতাকার নিচে সমবেত কর্মপ্রয়াসে সামিল না হলেও কালচেতনার পরিচয় তাঁদের কাজে সমূহ প্রকাশ পেয়েছিল। আমাদের জানা নেই যে মার্কসবাদীরা এঁদের প্রগতির কর্মসূচিতে সামিল করার কোন চেষ্টা করেছিলেন কিনা, কিংবা ক্যালকাটা গ্রুপ তাঁদের সমবেত কর্মসূচিতে এঁদের কেন আহবান করেননি।

যাঁরা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা কখনো মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বা প্রগতি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, এমন নজির নেই। কিন্তু সময়ের বিশেষ চাহিদা তাঁরাও উপেক্ষা করেননি। এঁদের মধ্যে প্রথমেই আমাদের যে দুজনের কথা মনে আসে, তাঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু।

উনিশ'শ ত্রিশে আরব্যরজনীর চিত্রমালা আঁকার পর অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আট বছর তুলি হাতে নেননি। উনিশ'শ আটত্রিশ-উনচল্লিশে তিনি যখন আবার তুলি ধরলেন, তখন তাঁর ছবিতে দেখা গেল একেবারে নতুন এক শৈলীর আত্মপ্রকাশ। এই সময় তিনি আঁকলেন অন্নদামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের ধারাবাহিক ছবি। আরব্যরজনীর কোমল মৃদু পর্দাসম্পন্ন রঙ আর স্তিমিত রেখার বদলে তাঁর অন্নদামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের ছবিতে দেখা গেল বাংলার মাটির পুতুলের সমধর্মী রূপের সরলীকরণ, সমতলীয় রঙ ও মোটা রেখা। লোকশৈলীকে তিনি এভাবে আগে কখনো আত্মস্থ করেননি। কবিকঙ্কনের অন্নদামঙ্গলের তেত্রিশটি ছবি ও কৃষ্ণমঙ্গলের একুশটি ছবি কেবল শৈলীগত কারণেই নয়, বিষয়গত কারণেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রূপক, প্রতীকের ব্যবহার ছিল তঁ মজ্জাগত। উনিশ'শ পাঁচে 'ভারতমাতা'র ছবিতে তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। অন্নদামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের প্রচ্ছন্ন রূপক আমাদের নজর এড়ায় না। মঙ্গলকাব্যে যে ব্রাত্যজনের উত্থান, ঐশীশক্তির সঙ্গে মানবশক্তির যে সংঘর্ষ ও সমন্বয় লক্ষ করা যায়, সেই প্রেরণা অন্নদা-মঙ্গলের এই ছবিকে বিশেষ তাৎপর্যময় করে তুলেছিল। কালকেতুর ছবি, কালব্যাধের ঘরে দেবী অভয়ার ছবি, রাজার সাজে ব্যাধের ছবি, রায়বাঘের ছবি সেই ব্রাত্যশক্তির উত্থানের দিকেই সংকেত দেয়। এ ধরনের বিষয় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে আগে ভাবেননি, সে কথা বলা বাহুল্য।

কৃষ্ণমঙ্গলে কাগাসুর বধ, কেশী বধ, কংস নিসূদন, মুষ্টিক বধ, কুবলয়-পীড় বধ, কংস বধ, কালীয়দমন, বৃষাসুর বধ, বকাসুর বধ, তৃণাবর্ত বধ, বৎসাসুর বধ, পুতনা বধ প্রভৃতি ছবিকে আঠার'শ পঁচানব্বইতে তাঁর আঁকা কৃষ্ণলীলার চিত্রমালার পাশাপাশি

রাখলে বোঝা যাবে যে, যে-মানসিকতা থেকে তিনি কৃষ্ণলীলার ছবি এঁকেছিলেন, সেই মানসিকতা থেকে তিনি কৃষ্ণমঙ্গলের ছবি আঁকেননি। কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের প্রেমিকমূর্তিই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সেখানে তিনি রাধিকা, গোপিনীদের প্রিয়জন। কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গল চিত্রমালার প্রেরণা ছিল মঙ্গলকাব্য। ধ্রুপদী, শাস্ত্রীয় ও সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যের বাইরে একদিন ব্রাত্যজনের মর্মবাণী আশ্রয় পেয়েছিল মঙ্গলকাব্যে। সেই মঙ্গলকাব্যের রূপকে অশুভশক্তির পরাজয় ও মানবশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যে মানুষ ঐশীশক্তির কাছে নিঃশর্তে নতি স্বীকার করেনি, দেবশক্তিকে নেমে আসতে হয়েছিল মানবশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে। উনিশ'শ উনচল্লিশে পৃথিবীব্যাপী রণোন্মাদনার প্রেক্ষিতে হয়তো অবনীন্দ্রনাথের এই মঙ্গলকাব্য-আশ্রিত ছবিকে নতুন করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, এই প্রেক্ষিতে আজ অবধি তাঁর ঐ বিশেষ সময়ের ছবিকে কোন সমালোচকই দেখেননি। কৃষ্ণমঙ্গলের বিভিন্ন অশুভশক্তি নিধনে কৃষ্ণ ও বলরামের তৎপরতাকে উপজীব্য করে যে ছবি তিনি এঁকেছিলেন, সময়ের প্রেক্ষিত থেকে বিযুক্ত করে সেই ছবিকে দেখা যায় না।

বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত না করে রূপক ও প্রতীকের সংকেতে দেখাবার মজ্জাগত প্রবণতার কারণে এবং গল্প-বলিয়ে ছবি আঁকার মজ্জাগত অভ্যাসের কারণে অবনীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। চিরায়ত সাহিত্য এখানে তাঁর এই ছবিকে পিছন থেকে সাহায্য করেছিল।

এই সময় থেকেই অবনীন্দ্রনাথ কাঠকুটো, পড়ে-পাওয়া ভাঙা জিনিসের টুকরো জুড়ে ভাস্কর্যধর্মী যে কুটুম্‌কাটাম্‌ গড়ছিলেন, সেগুলিকে আধুনিক শিল্পের ভাষায় আসঁব্লজ বলা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার পাবলো পিকাসোর আগে থেকেই তাঁর গড়া এই সব কুটুম্‌কাটামে আসঁব্লজের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই কুটুম্‌কাটাম্‌ তৎকালীন বিদ্বজ্জনের চোখে খেলনা বা পুতুল হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। এগুলির ভাস্কর্যধর্মিতা তাঁদের নজরে পড়েনি। এ কারণে ঐ সব বিদ্বজ্জনের মন্তব্যে পরবর্তীকালের সমালোচকদের বিভ্রান্ত হবার অবকাশ থেকে গিয়েছিল। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এগুলিকে মনে করেছিলেন খেয়ালিপনার চূড়ান্ত নিদর্শন। একই সময়ে সাহিত্যরচনায় অবনীন্দ্রনাথ যেমন ইসলামি কেচ্ছা, পুঁথি, বটতলার বই ও লোকসাহিত্যের ফর্ম, শৈলী ও ভাষা, এমনকি চক্রব্যূহধর্মী কথকতা আত্তীভূত করার প্রবণতা প্রবলভাবে দেখাচ্ছিলেন, তেমনি অন্নদামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের ছবিতে লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের শৈলী আত্তীভূত করার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর শকুন্তলা থেকে যে-দূরত্বে হোতিহোতির বৃত্তান্ত দাঁড়িয়ে আছে, কৃষ্ণলীলা থেকে কৃষ্ণমঙ্গলের ছবিও সেই দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। একই প্রবণতা থেকে খেলাচ্ছলে পুতুল গড়ার মতো তিনি পড়ে-পাওয়া জিনিস দিয়ে গড়েছিলেন ভাস্কর্যধর্মী কুটুম্‌কাটাম্‌। এই কুটুম্‌-কাটামেও অতীতও বর্তমানের নানা পাত্রপাত্রীর আনাগোনা ঘটেছে। কল্পনা ও অতীতের



প্রতি বিশেষ ঝোঁক সত্ত্বেও এই কুটুম্‌কাটামে আমরা এমন কিছু চরিত্র লক্ষ করি যা ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের বাস্তব চরিত্র আমরা দেখি গাছের ডালপালার মধ্যে খুঁজে-পাওয়া, হাত-বাড়ানো খিদে নামক কুটুম্‌-কাটামুটিতে। খিদের যন্ত্রণা ডালের ভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের সময়ে গড়া এ. আর. পি. নামক কুটুম্‌কাটামুটিতে তাৎকালিক যুদ্ধ-সহায়ক ঐ বাহিনীর যান্ত্রিক রূপটি তিনি ধরেছিলেন। শৈলীগতভাবে অবনীন্দ্রনাথের ঐ সময়ের ছবিতে যে সরলতা-মুখী যাত্রা দেখা গিয়েছিল, একই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল কুটুম্‌কাটামেও। তবে ছবিতে তিনি রূপক ব্যবহার করলেও কুটুম্‌কাটামে তাঁর বক্তব্য ছিল সরাসরি। চল্লিশের সময়-সচেতন শিল্পরচনার পুরোভাগে তাঁর ঐ ছবিগুলি ও বিশেষ কয়েকটি কুটুম্‌কাটাম্‌ অবশ্যই স্থান পায়। চল্লিশের সূচনা থেকে মন্বন্তর ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অবনীন্দ্রনাথের এই সদর্থক ভূমিকা নান্দীমুখ হিসাবে অবশ্যই স্মরণ করতে হয়।

উনিশ'শ উনিশে শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে নন্দলালের ছবিতে প্রত্যক্ষ জনজীবন দেখা দিতে থাকলেও তিনি পূর্ববর্তী প্রবণতা কোনদিনই সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। ফলে একই সঙ্গে তাঁর ছবিতে দেখা দিতে থাকে শিব ও সাঁওতাল। যদিও রামায়ণের শবরী চরিত্রের ছবি আঁকতে বসে তিনি এঁকেছিলেন তাঁরই বাড়ির পাশের সাঁওতাল রমণীদের, তথাপি কাব্যপুরাণাশ্রিত ভাবাবেগ তিনি বর্জন করতে পারেননি। এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব ছিল তার একটা সমাধানের পথ হয়তো তিনি নিজের মতো করে খুঁজে পেয়েছিলেন।

রূপকের প্রতি অনুরাগ এবং কাব্যপুরাণাশ্রিত ছবির প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষক অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে নন্দলাল আঁকেন অন্নপূর্ণা ও রুদ্র। বস্তুতপক্ষে এই ছবি ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'মৌনেরে ঘিরিছে গান স্তব্ধের করেছে আলিঙ্গন সফেন চঞ্চল নৃত্য' পংক্তির প্রেরণায় আঁকা ছবির দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ। স্তিমিতনয়ন নৃত্যবিভোর সৌম্যসুকুমার নটরাজের নৃত্য-পদবিক্ষেপে জেগে ওঠা পদ্মে আসীন অন্নপূর্ণা ছিল আগের ছবির বিষয়। মন্বন্তরের কালে তিনি আঁকলেন নৃত্যরত রুদ্র শিব। গলায় মালার মতো জড়ানো সাপটির দেহত্বকের স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে শিবের শরীরের অস্থিপঞ্জর দেখা যাচ্ছে। অন্নপূর্ণার কাছে রুদ্র শিব ভিক্ষার্থী, তাঁর হাতে নরকরোটির ভিক্ষাপাত্র। এই ছবিটির নাম হিসাবে তিনি ভারতচন্দ্রের রূপকাত্মক পংক্তি 'অন্নপূর্ণা যাঁর ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে এ বড়ো মায়ার পরমাদ' ব্যবহার করলেন। বাংলার মন্বন্তরকে কেন তিনি প্রত্যক্ষভাবে না দেখিয়ে রূপকাশ্রয়ে গেলেন, তার উত্তর আছে তাঁর জীবন-দর্শনে। তাঁর মতে 'শিল্পের সৃষ্টিই হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় করে' এবং এই 'মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না'। এই মায়াবাদী দর্শনে তাঁর কাছে মন্বন্তরের আপাত অর্থের গভীরে সাবজেক্টিভ তাৎপর্যই বিবেচ্য মনে হয়েছিল। পূর্বতন আদর্শকে অতিক্রম

করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের কথা আলোচনায় আসে। চল্লিশের উদ্‌গম থেকে মন্বন্তরের কালে পরিচয় গোষ্ঠীর শাহেদ সুহরাবর্দি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ, বাংলার লাট কেসি-র সচিব জন আরউইন ও কয়েকজন বিদেশী গুণমুগ্ধ ব্যক্তি চল্লিশের গোড়ায় যামিনী রায়কে ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিকতার প্রতিভূ হিসাবে খাড়া করে নানা নিবন্ধ লিখতে থাকেন। নয়াবাংলা ঘরানার চিত্রকলাকে কাল্পনিক প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে তাঁরা যামিনীর চিত্রকলায় ভারতীয় চিত্রকলার মুক্তি দেখতে শুরু করেন। কুখ্যাত ভারতবিদ্বেষী 'ভারডিক্‌ট্‌ অন ইন্ডিয়া'র লেখক বেভারলি নিকলস্‌ ভারতে কেবল দুজন মহান ব্যক্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলেন। এঁদের একজন মহম্মদ আলি জিন্নাহ, অপরজন যামিনী রায়। বিষ্ণু দে, অস্টিন কোটস্‌ যামিনীকে পিকাসোর সঙ্গে তুলনা করে নিবন্ধ লেখেন।

উনিশ'শ ছত্রিশে বিশ্বশান্তি সভার ঘোষণাপত্রে ভারতীয় স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নন্দলাল বসু। কিন্তু পরবর্তীকালে বেয়াল্লিশের মার্চে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের সংগঠন তৈরির জন্য যে-কমিটি হলো তাতে সভাপতিমন্ডলীতে রাখা হলো যামিনীকে। আমাদের মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যামিনীকে সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য করার পিছনে ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ। এই সঙ্ঘের উদ্যোক্তারা সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালকে আহ্বান করেছিলেন কিনা জানা নেই। আহ্বান না করার অন্যতম কারণ হয়তো এই ছিল যে তাঁদের দৃষ্টিতে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু ছিলেন রক্ষণশীল। যামিনী এই সঙ্ঘে নাম-কে-ওয়াস্তের বেশি কিছু ছিলেন না। এমনকি সঙ্ঘের কোন অধিবেশনেও তিনি যোগ দেননি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পিপল'স্‌ ওয়র-র নভেম্বর, উনিশ'শ বেয়াল্লিশ সংখ্যায় রায় দিলেন যে যামিনীর চেয়ে অধিকতর সৃজনশীল শিল্পী এদেশে আর কেউ নেই। একই কথা ধ্বনিত হলো বেভারলি নিকলস্‌, জন আরউইন, বিষ্ণু দে ও যামিনীর গুণমুগ্ধ বিদেশীদের লেখায়। যে যামিনী দুর্ভিক্ষের আর্তিতে কাতর কলকাতায় বসে তাঁর সাহেব খদ্দেরদের জন্য নির্বিকার চিত্তে কৃষ্ণ আর যিশুর ছবি এঁকে গেলেন, তাঁর ছবিতে এঁরা দেখলেন প্রগতির চিহ্ন। লক্ষণীয় যে, বিষয় অপেক্ষা আঙ্গিকবাদকেই হীরেন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ প্রগতির পরিচায়ক মনে করেছিলেন। এ ধরনের শিথিল মন্তব্য করার আগে তাঁরা ভারতীয় শিল্পকলার গৌরবময় ঐতিহ্যের দিকে তাকাননি; ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ করেননি। এই শতকের গোড়ায় বিষয় ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে সময়-সচেতন প্রগতির লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছিল, তা তাঁরা সম্যক্‌ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই তাঁদের বিচারে

সেদিন যে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি ঘটেছিল, তা ছিল অত্যন্ত বেদনার।

এমনকি অতুল বসুও যে তাঁর ছবিতে সমকালিক ঘটনাকে স্থান দিতে কতখানি তৎপর ছিলেন তাও তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। মন্বন্তরের কলকাতার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সেদিন বড় বড় মানুষদের প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে অতুলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে রঙে-রেখায় লিপিবদ্ধ না করে পারেননি।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতির উদ্যোগে জাপানি আক্রমণ, মেদিনীপুরের বন্যা, মন্বন্তর ইত্যাদি ঘটনায় সভাসমাবেশ নাটকের তোড়জোড় শুরু হয়। বিশ্ব ও দেশের সংকটজনক পরিস্থিতিতে লেখক শিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের সংগঠিত করার কাজ পুরোদমে শুরু হয়। ক্রমেই এইসব সংগঠনে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী একদল শিল্পী-কর্মী সংগঠনের সারাক্ষণের কর্মী হিসাবে জুটতে থাকেন। পার্টির সদস্য নন অথচ মার্কসবাদে আস্থা আছে, এমন অনেক তরুণ শিল্পী-কর্মীও এসে জোট বাঁধেন। পার্টির পতাকার নিচে সমবেত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মণি রায়, সূর্য রায়, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়। এঁরা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে পরিচিত হন। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের শিল্পকলা বিভাগের সংগঠক হন মণি রায় এবং শাখা-সম্পাদক হন রথীন্দ্রনাথ মৈত্র। এই বিভাগের অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন নীরদ মজুমদার। গণনাট্য সঙ্ঘের মুক্তধারা নাটকের মঞ্চসজ্জা ও নেত্রকোণায় সারা ভারত কিষাণ সম্মেলনের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন তিনি। পার্টির পতাকাতলে সংগঠিত প্রোগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রথম ক্যাটালগে উল্লিখিত সদস্যদের মধ্যে প্রদোষ দাশগুপ্তের নাম ছিল।

সরকারি আর্ট কলেজ থেকে রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত মণি রায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন ও পার্টির নির্দেশে ছবি আঁকা ছেড়ে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে শিল্পীদের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সঙ্ঘের ও সহযোগী সঙ্ঘগুলির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলি তাঁরই উদ্যমে হয়েছিল। কিন্তু পার্টির এই একনিষ্ঠ কর্মীটিকে পার্টিরই এলিটিস্ট সদস্যরা পরবর্তীকালে যে পাত্তা দেননি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীকালে লক্ষ করা যায় যে, গণনাট্য সঙ্ঘ ও পার্টির এলিটিস্ট সদস্যরা পার্টির কর্মী-শিল্পীদের উপেক্ষা করে প্রগতিবাদের ঢক্কা পিটিয়ে আসরে আবির্ভূত ক্যালকাটা গ্রুপ নামক গোষ্ঠীর কীর্তনে সমবেত হয়েছেন।

সূর্য রায় ছিলেন পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। মধু বসুর চলচ্চিত্রে শিল্প-পরিচালক হিসাবে তিনি কাজ শুরু করেন ও ক্রমে বিজ্ঞাপনী শিল্পের জগতে আসেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা অবলম্বনে তাঁর আঁকা ছবি তিনি হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে সংস্কৃতি সফরে গিয়ে প্রদর্শনীতে দেখান। বাংলার বাইরে

বাংলার মন্বন্তরের রূপ তুলে ধরে তিনি সেদিন সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

চিত্তপ্রসাদও মন্বন্তরের মর্মান্তিক ছবি এঁকেছিলেন। শ্রমিককৃষক শিশুনারী সমন্বিত জনজীবন ছিল তাঁর ছবির প্রত্যক্ষ প্রেরণা। পার্টির একনিষ্ঠ সদস্য চিত্তপ্রসাদের ছবি পিপল'স ওয়র-এ নিয়মিত প্রকাশ পেতে থাকে। ক্রমে লিনোতে কাটা ছাপছবিতে তাঁর লোকশিল্পের সরলতাধর্মী এক অসাধারণ বলিষ্ঠ শৈলীর বিকাশ লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক কারণে এ-আর-পি থেকে বিতাড়িত দেবব্রত মুখোপাধ্যায় পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন ও গণজীবনের ছবি আঁকতে শুরু করেন। তিনি প্রথম এদেশে রাজনৈতিক পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। দ্রুতটান মুক্ততুলির রেখায় রূপের ছন্দোময় সরলীকরণ তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

সোমনাথ হোড় চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে মন্বন্তরের সময় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ত্রাণসেবার কাজ করেছিলেন। ত্রাণসেবার সময় তিনি ও চিত্তপ্রসাদ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক ছবি আঁকতে শুরু করেন। তেভাগা আন্দোলনের কালেও তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ছবি আঁকেন। ক্রমে কাঠখোদাই ও অন্যান্য ছাপছবির মাধ্যম তাঁর প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। তাঁর ছবির প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে নিপীড়িত আর্ত মানবিকতা।

সূর্য রায় থেকে সোমনাথ হোড় পর্যন্ত পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত শিল্পীরা সরাসরি বাস্তবের প্রেরণায় শিল্পচর্চা করেছিলেন। এই বাস্তবের বনিয়াদ তাঁদের ছবিকে এক আশ্চর্য সাম্যে বেঁধেছিল। লক্ষ করা যায় যে, এক, রৈখিক অভিব্যক্তিই তাঁদের শৈলীর অন্যতম গুণ হয়ে উঠেছিল। দুই, প্রত্যক্ষ বাস্তবের রূঢ়তার কারণেই সম্ভবত এঁরা সব রঙ ছেড়ে সাদা-কালোর কম্পোজিশন শুরু করেছিলেন। জীবনের সংঘাত সম্ভবত সাদা-কালোর সংঘাতে প্রতীকরূপ পেয়েছিল। তিন, মানবতাবোধের কারণে মানবিক অবয়বই এঁদের ছবির প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। চার, ব্যঞ্জনাই এঁদের রূপের সরলীকরণের মূলে কাজ করেছিল।

শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টির সবচেয়ে বড় অবদান ছিলেন এই একনিষ্ঠ শিল্পীরা। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত অনেকে এই সঙ্ঘকে যে তাঁদের উৎক্ষেপন মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, এমন নজিরের অভাব নেই। গণনাট্য সঙ্ঘকে তাঁরা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন, যে কারণে অত মজবুত একটি সংগঠনও শেষপর্যন্ত টেঁকেনি। কিন্তু পার্টির ও পার্টির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শাখাপ্রশাখার সঙ্গে যুক্ত এইসব একনিষ্ঠ শিল্পী-কর্মীরা পার্টি সংগঠনে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করলেও তাঁদের মেধা ও শ্রমকে পার্টি কীভাবে দেখেছিল ও ব্যবহার করেছিল, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, শিল্পী

হিসাবে এঁদের যে ভূমিকায় ব্যবহার করা যেত তা করা হয়নি। এঁদের ব্যবহার করা হয়েছিল পোস্টার আর্টিস্ট হিসাবে, ইলাস্ট্রেটর হিসাবে, মঞ্চসজ্জাকর হিসাবে; কিন্তু কখনোই শিল্পী হিসাবে তুলে ধরা হয়নি। পিপলস্ ওয়র-এর এলিটিস্ট লেখকেরা শিল্পী হিসাবে তুলে ধরেছিলেন যামিনী রায়কে, ক্যালকাটা গ্রুপের আঙ্গিক-বাদী শিল্পীদের। গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে বোম্বেতে প্রদর্শনী করতে এঁদের ছবি নিয়ে যাওয়া হয়নি, নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যালকাটা গ্রুপের ছবি। এই প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে প্রভূত প্রচারও করা হয়েছিল।

মণি রায়ের উদ্যোগে একাধিক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। যাঁরা ফ্যাসিবিরোধী শিবিরের বাইরে ছিলেন, এমন শিল্পীদেরও সমবেত করার ব্যাপারে তাঁর তৎপরতা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একাধিক প্রদর্শনীর মধ্যে অন্যতম ছিল পঁয়তাল্লিশের মার্চে অনুষ্ঠিত দুদিন ব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের যুক্ত প্রদর্শনীটি। এই প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'আমাদের দেশ'। উদ্বোধন করতে ডাকা হয়েছিল অসিতকুমার হালদারকে। উদ্বোধনে ছ'শর মতো দর্শক এসেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে ছবি দিয়েছিলেন অতুল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জয়নুল আবেদিন, সতীশচন্দ্র সিংহ, শৈল চক্রবর্তী, রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্ত, মুরলীধর টালি এবং এই প্রদর্শনীতেই বাংলার মন্বন্তরের ছবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন গোবর্ধন আশ। তৎকালীন চিত্রকরেরা মন্বন্তরের রূপ দেখেছিলেন কলকাতা শহরে, গোবর্ধন দেখেছিলেন তাঁর গ্রামে। গ্রাম-বাংলার এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জলরঙে তুলির বলিষ্ঠ মোটা ছোপে এঁকেছিলেন মন্বন্তরের ভয়ায়ক রূপ। বাস্তবচেতনাসম্ভূত ছবির এহেন প্রদর্শনী ছিল অভূতপূর্ব। তদুপরি, সংগঠক মণি রায় রাজনৈতিক মতাদর্শের গন্ডী না মেনে সক্রিয় শিল্পীদের যেভাবে এক মঞ্চে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন, তাও ছিল অভূতপূর্ব।

এই প্রদর্শনীর তিন মাস আগে চুয়াল্লিশের ডিসেম্বরে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন একটি ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছিল। ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে বাংলায় মন্বন্তরের ত্রাণভান্ডার গড়ে তোলার জন্য অরুণ দাশগুপ্ত, কামরুল হাসান, আদিনাথ মুখোপাধ্যায় ও সফিউদ্দিন আহমেদের সম্পাদনায় প্রকাশ করা হয়েছিল বেঙ্গল পেইন্টার্স টেস্টিমনি নামে ছবির একটি অ্যালবাম বা চিত্রসংগ্রহ। এই অ্যালবামের ভূমিকা লিখেছিলেন সরোজিনী নাইডু। রবীন্দ্রনাথ থেকে চিত্তপ্রসাদ অবধি আঠাশ জন শিল্পীর ছবি ও ভাস্কর্যের আলোকচিত্র এই সংগ্রহে ছিল। দুর্ভিক্ষ ও তৎকালীন প্রত্যক্ষ জীবনের ছবি এঁকেছিলেন অসিতকুমার হালদার, রামকিঙ্কর, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল আবেদিন, গোপাল ঘোষ, ইন্দ্র দুগার, নীরদ মজুমদার, অতুল বসু, প্রদোষ দাশগুপ্ত, কামরুল হাসান, মুরলী-

ধর টালি, আদিনাথ মুখোপাধ্যায় এবং চিত্তপ্রসাদ। এই অ্যালবামে ছাপা যামিনী রায়ের দুটি ছবির একটি ঢোলে পড়ুয়াদের ছবি ও অপরটি গো-দোহনরতা মহিলার ছবি। দুটি ছবিতেই সম্পন্ন অতীতের ছায়াপাত ঘটেছিল। এই অ্যালবামে লেখা রচনায় নয়া বাংলা ঘরানার প্রতিপক্ষ হিসাবে যামিনীকে খাড়া করিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর মধ্যে বাংলার শিল্পের মুক্তি দেখেছিলেন ও ঘোষণা করেছিলেন যে ক্যালকাটা গ্রুপের কাজ প্রমাণ করে যে যামিনীর কৃতিত্ব ব্যর্থ হয়নি। এভাবে বিষ্ণু দে তাঁর নানা লেখায় আঙ্গিকবাদী ক্যালকাটা গ্রুপকেই যামিনীর যোগ্য উত্তরসূরি সাব্যস্ত করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ যতখানি সমাবেশের পিছনে ছুটেছিল, ততখানি স্থায়ী অবদানের দিকে নজর দেয়নি; যেমন মনোযোগ দিয়েছিল লেখক সমাবেশে তেমনই উদাসীনতা দেখিয়েছিল শিল্পীদের প্রতি। মণি ও রথীন তাঁদের দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে যথাসাধ্য করলেও উপরতলের সংগঠন তাঁদের অবদানকে সেভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। একদা পার্টির একনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক কর্মী মণি রায় আজ বিস্মৃত।

সংগঠনের বাইরে যাঁরা এককভাবে তাঁদের শিল্পকর্মে যথার্থ কালচেতনার পরিচয় রেখেছিলেন তাঁদের নামের তালিকাও বেশ বড়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামকিংকর, সুধীর খাস্তগীর ও জয়নুল আবেদিন।

সময়চেতনা রামকিংকরের শিল্পকর্মে গোড়া থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। বিশেষ করে, ঊনিশ'শ আটত্রিশে তাঁর গড়া সাঁওতাল পরিবার নামক গুচ্ছমূর্তিতে এদেশে প্রথম পরিযায়ী শ্রম বা লেবার মাইগ্রেশন বিষয় হিসাবে দেখা গিয়েছিল। তাঁরও দুবছর আগে রবীন্দ্রনাথের মাটির বাড়ি শ্যামলীর প্রধান দরজার দুপাশে দ্বারীমূর্তি হিসাবে তিনি সাঁওতাল শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীমূর্তি গড়েছিলেন।

বেয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও বাংলার মন্বন্তর তাঁর অন্তর্লোককে কত গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল তা বোঝা যায় এই সময়ে তাঁর আঁকা অসংখ্য তেল রঙের ছবি, লিনোকাট, এচিং, ড্রয়িং ও অসংখ্য ভাস্কর্যের দিকে তাকালে। সৃষ্টির দিক থেকে এই সময় তাঁর জীবনের বহুপ্রসূ সময়। এই কাজের ভিতর দিয়ে তাঁর শৈলীর ঋজুতা প্রখরতর হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনবাসী রামকিংকর তাঁর আশপাশের জনজীবনের অভিজ্ঞতাকেই তাঁর ছবিতে ও ভাস্কর্যে তুলে ধরেছিলেন।

দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতে তিনি কেবল বর্ণনাই দেননি, এদেশের চিরাচরিত শোষণ ও নিপীড়নের দিকটিও তিনি তুলে ধরেছিলেন। ফলে তাঁর দুর্ভিক্ষের ছবিতে তাৎক্ষণিক ঘটনাকে অবলম্বন করে আমরা এদেশের চিরাচরিত ব্যবস্থার ছবিও দেখতে পাই। দুর্ভিক্ষের কালেই তিনি গড়েছিলেন তাঁর ধানঝাড়াই মূর্তি। যখন কলকাতার ভাস্করেরা অজুরার জন্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি তৈরি করছিলেন তখন রামকিংকর কোন ফরমাশের তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষের জন্য তাদের চলার পথের ধারে ধারে

মূর্তি গড়ে চলেছিলেন নিজের অন্তরাত্মার তাগিদে। মুখহীন এই ধানঝাড়াই মূর্তিতে তিনি ব্যক্তিকে মহীয়ান করেননি, ব্যক্তির শ্রমকে মহীয়ান করে দেখতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন যে চাষীরাই তো অবস্থার আসল বন্দী। এদেশের সমাজ ও ভূমিব্যবস্থার স্বরূপ তিনি সাঁওতাল পরিবার ও ধানঝাড়াই মূর্তির মধ্যে রূপায়িত করেছিলেন।

সুধীর খাস্তগীর বাংলার বাইরে থাকলেও ছাপছবির মাধ্যমে তিনি তৎকালীন সমাজের ছবি এঁকেছিলেন। লক্ষণীয় যে, দুর্ভিক্ষের রূঢ় বাস্তবতাকে তিনিও সাদা কালোর বৈপরীত্যে ও রেখায় ব্যক্ত করেছিলেন।

বাংলার বাস্তব পরিস্থিতি কেবল বিষয় হিসাবেই নয়, বলিষ্ঠ শৈলী নির্মিতিতে শিল্পীদের কীভাবে সহায়তা করেছিল তা আমরা সূর্য রায়, চিত্তপ্রসাদ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ পার্টির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের কাজে এবং পার্টি-বহির্ভূত রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল আবেদিন প্রভৃতির কাজে লক্ষ করি। বিষয় এবং শৈলী যে ওতপ্রোত এবং বিষয়ের স্পষ্টতাই যে আঙ্গিককে নির্দিষ্ট পরিণতিতে নিয়ে যায় তা ক্যোথে কোলভিৎসের মতো এঁদের কাজেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। লক্ষণীয় যে, এই বাস্তবতাকে রূপ দিতে তাঁরা প্রত্যেকেই সাদা-কালোর মাধ্যমকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ কথা বলা আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, গগনেন্দ্রনাথের পরে চল্লিশের এই শিল্পীদের কাজের ভিতর দিয়েই বাংলার শিল্পকলা আবার প্রত্যক্ষ জনজীবনের স্বেদরক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

এই সময়ে কামরুল হাসানের ড্রয়িং ও লিথোগ্রাফে এবং সফিউদ্দিন আহমেদের উডকাটে জনজীবন সম্পৃক্ত বিষয়ের ভিতর দিয়ে ক্রমেই তাঁদের বলিষ্ঠ শৈলী তৈরি হচ্ছিল। একই সঙ্গে চিত্তপ্রসাদ লিনোকাট ও সোমনাথ হোড় উডকাট করছিলেন। রামকিঙ্কর করছিলেন এচিং। ছাপছবি এদেশে এযাবৎ কালে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছিল। মুকুল দে ও নন্দলাল আধুনিককালে ছাপছবিকে শিল্পমাধ্যম হিসাবে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের প্রেরণায় ললিতমোহন সেন, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ ও শান্তিনিকেতনের কয়েকজন শিল্পী অন্যান্য মাধ্যমে কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছাপছবির ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু সার্বিকভাবে লিনোকাট, উডকাট, লিথোগ্রাফ, এচিং ইত্যাদির চর্চা চল্লিশের আগে এমন ব্যাপকভাবে হয়নি। তাঁদের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার তাগিদে কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়, আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর টালি প্রমুখ ছাপছবির মাধ্যমসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এক্ষেত্রে প্রয়োগের বলিষ্ঠতা ও সম্ভাবনার প্রতি আমাদের সচেতন করেছিলেন। এই সময়ের আরেকজন শিল্পী হরেন দাসের ছাপছবির প্রধান প্রেরণা ছিল চারপাশের জনজীবন। মুকুল দে ও নন্দলাল বসু ছাপছবির যে চল শুরু করেছিলেন তার মজবুত ভিত গড়লেন চল্লিশের

শিল্পীরা এবং সেই থেকেই ভারতীয় শিল্পকলায় ছাপছবি একটি জনগ্রাহ্য ও বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র জয়নুল রামকিঙ্করের মতোই বাংলার গ্রামীণ পটভূমি থেকে উঠে এসেছিলেন। এঁরা কেউ দল গড়ে ফতোয়া জাহির করে আধুনিক হননি। প্রগতির লক্ষণগুলি তাঁদের সময়চেতনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল এবং তার দরুণ তাঁদের কোন বিলাতি পত্রপত্রিকার দ্বারস্থ হতে হয়নি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রামবাংলা থেকে উজাড় হয়ে আসা বুভুক্ষু মানুষের প্রতিবাদহীন অসহায়তা জয়নুলকে গভীর-ভাবে আলোড়িত করেছিল। এই প্রতিবাদহীন অসহায়তা ও পরিস্থিতির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দিকটিকেই তিনি তাঁর কালো কালিতে বলিষ্ঠ রেখার টানে প্রকাশ করেছিলেন। ড্রাইব্রাশ বা শুকনো তুলির মাধ্যমে এভাবে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ভারতীয় চিত্রকলায় আগে তুলে ধরা হয়নি। তাঁর এই ছবি দেখলেই আমরা বুঝি বিষয় ও আঙ্গিক কীভাবে পরস্পর সংযুক্ত এবং কীভাবে বিষয় থেকেই আপনিই আঙ্গিক তৈরি হয়। এদিক থেকে তাঁর এই ছবি অবশ্যই শিক্ষণীয়।

চল্লিশের অন্যতম ঘটনা ক্যালকাটা গ্রুপের আবির্ভাব। উনিশ'শ তেতাল্লিশে সুভো ঠাকুর ও রথীন মৈত্রের উদ্যোগে পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত ও কমলা দাশগুপ্ত, এই আটজনকে নিয়ে এই গ্রুপ গঠিত হয়। সদ্য বিলাতফেরত প্রদোষ দাশগুপ্তের পরামর্শে লন্ডন গ্রুপের অনুসরণে এই আটজন শিল্পীর গোষ্ঠীনাম রাখা হয় ক্যালকাটা গ্রুপ। লন্ডন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন ওল্টার সিকার্ট ও উইন্ডহ্যাম ল্যুইস্। পারি-কেন্দ্রিক ইমপ্রেশনিজম্ ও কিউবিজম্ সিকার্ট ও ল্যুইসকে প্রভাবিত করেছিল। ফরাসি আঙ্গিক-বাদী চর্চার মাধ্যমে তাঁরা ইংল্যান্ডের শিল্পকলায় আধুনিকতার প্রবাহ তৈরি করার লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের শিল্পীদের সমবেত করার জন্য লন্ডন গ্রুপ তৈরি করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, উনিশ'শ একষট্টিতে, ভাঙা ক্যালকাটা গ্রুপের তিনজন শিল্পীর প্রদর্শনী প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র উনত্রিশে জানুয়ারির সংখ্যায় 'আধুনিক চিত্রকলার আন্দোলনে ক্যালকাটা গ্রুপের অবিসংবাদী স্থানের' প্রশংসা করলেও উনিশ'শ ছিয়াত্তরে শারদীয়া সংখ্যার কবিপত্রে পরিতোষ সেন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আগন্তুক বিদেশী মারফৎ য়ুরোপীয় প্রতিচিত্র দেখে তীব্র অনুসন্ধিৎসা' থেকেই তাঁরা এই গ্রুপের মাধ্যমে আঙ্গিকচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রদোষ দাশগুপ্ত উনিশ'শ একাশিতে প্রকাশিত ললিতকলা কন্টেম্পোরারি-র একত্রিশতম সংখ্যায় বলেছিলেন যে, প্রধানত পাশ্চাত্য শিল্পের পরীক্ষানিরীক্ষা ও নতুনত্বের শৈল্পিক প্রেরণাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি এ-ও স্বীকার করেছিলেন যে পশ্চিমি আধুনিকতার যে অসার্থক প্রকাশচেষ্টা তাঁরা করেছিলেন, তার বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। বিষ্ণু দে উনিশ'শ পঁয়তাল্লিশের পনেরো এপ্রিল সংখ্যায় পিপল'স্ ওয়র-এ


Zainul



লিখেছিলেন, 'যামিনী রায়ের কৃতির মাধ্যমে মুক্ত হয়ে (এই শিল্পীরা) তাকাচ্ছেন সামনের দিকে যেখানে বিদ্রোহই গঠন...' ইত্যাদি। উনিশ'শ প'য়তাল্লিশে গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদর্শনী উপলক্ষে বিষ্ণু দে 'শিল্পী যখন জেগে ওঠেন' শিরোনামে পিপল'স্ ওয়র-এ এই কথা বলেছিলেন।

বাংলার লাটের পত্নী শ্রীমতী কেসি ক্যালকাটা গ্রুপের স্টুডিয়োতে এসেছিলেন এবং এই খবর স্টেটস্ম্যান পত্রিকা মারফৎ প্রচারিত হয়। যুদ্ধের জন্য সরকারি আর্ট স্কুল অধিগৃহীত হয়েছিল এবং যুদ্ধের কাজে আসা সাহেবরা সেখানে সার্ভিসেস্ আর্ট ক্লাব খুলেছিলেন। শ্রীমতী কেসি-র উদ্যোগে এই সার্ভিসেস্ আর্ট ক্লাবে ক্যালকাটা গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল। পরবর্তীকালে উনিশ'শ সাতচল্লিশের ওরা জুনের স্টেটস্ম্যানে কিম্ ক্রিস্টেন বলেছিলেন যে বাংলার মন্বন্তরের প্রেরণা থেকেই এই গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অনেক পরে উনিশ'শ তিরাশির সতেরো অগস্টের যুগান্তরে প্রদোষ লিখেছিলেন যে, 'নতুন এক্সপেরিমেন্ট শুরু করব ভারতীয় পথকে অবলম্বন করে, বিদেশী প্রধানত ফরাসি শিল্পের নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গে হাত মিলিয়ে...যে করেই হোক আমাদের বেঙ্গল স্কুলের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির আওতা থেকে ছাড়া পেতে হবে' ইত্যাদি। সার্ভিসেস্ আর্ট ক্লাবের প্রদর্শনী প্রসঙ্গে উনিশ'শ প'য়তাল্লিশের সতেরো মার্চের স্টেটস্ম্যানে মন্তব্য করা হয়েছিল যে যামিনী রায় এই গোষ্ঠীর প্রেরণাদাতা এবং তাঁরা আঙ্গিকের প্রেরণা পাচ্ছেন গগ্যাঁ, মদিলিয়ানি ও মাতিসের কাছ থেকে। এ-ও বলা হয়েছিল যে, ঐ সব ফরাসি শিল্পীদের কাজ থেকে শিল্পের বর্ণপরিচয় পেলেও ঐ সব শিল্পীদের কাজের গুণাবলী এখনো এই শিল্পীরা আয়ত্ত করতে পারেননি এবং সেটা না-হওয়া অবধি এঁদের কাজে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হবে না। একই প্রদর্শনী দেখে সাতাশে মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, এই শিল্পীরা প্রবলভাবে তাঁদের জাতীয় পরম্পরাকে অস্বীকার করতে উঠেপড়ে লেগেছেন এবং তাঁরা দূর-পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে আনা আবর্জনার ত্রিশ ফিট নিচে নিজেদের জাতীয় অস্তিত্বকে চাপা দিয়ে রেখেছেন। মন্বন্তরই এই গ্রুপ গঠনের অন্যতম কারণ কিনা, এই প্রশ্ন করা হলে, উনিশ'শ বিরাশির ফেব্রুয়ারি সংখ্যা মহানগর পত্রিকার প্রতিবেদককে নীরদ বলেছিলেন, 'আন্দোলনের দেহ ছিল, মাথা ছিল না'। এইসব মন্তব্য এই গ্রুপের উদ্ভব, লক্ষ্য ও পরিণাম সম্পর্কে আমাদের রীতিমতো ধাঁধায় ফেলে। এইসব পরস্পরবিরোধী মতামত এবং শিল্পীদের আপন ধারণা ও আত্মজীবনী থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই গ্রুপের সামনে কোন বস্তুবাদী আদর্শ বা কমিটমেন্ট ছিল না। আদর্শের অভাবেই এই গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ঐকাত্ম গড়ে ওঠেনি। সদস্যরা প্রায়ই গ্রুপ ছেড়ে গেছেন। তাঁদের জায়গায় নতুন নতুন সদস্য আনা হয়েছে। আবার সদস্যেরা একে অপরের বিরুদ্ধেও নানা অশোভন মন্তব্য করেছেন। তথাপি ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী

সঙ্ঘ এবং গণনাট্য সঙ্ঘ এই গ্রুপকে দেশব্যাপী প্রগতি আন্দোলনেরই একটি শরিক শাখা মনে করেছে। কমুনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ওয়র ও স্বাধীনতা এই গ্রুপের প্রচারে তৎপর থেকেছে। বস্তুতপক্ষে পার্টির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিভাগ ও মুখপত্র শিল্প-পরম্পরার মূল্যায়নেই ব্যর্থ হয়েছিল।

উনিশ'শ প'য়তাল্লিশে এই গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীতে প্রতিষ্ঠাতা আটজন সদস্যই অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর অব্যবহিত পরেই গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে বোম্বেতে এঁদের প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়া হয়। গণনাট্য সঙ্ঘের তরফে যেভাবে ক্যালকাটা গ্রুপকে তুলে ধরা হয়েছিল এবং পার্টির বিভিন্ন মুখপত্রে যেভাবে গ্রুপের বিষয়ে লেখা হয়েছিল, সেভাবে পার্টির কর্মী-শিল্পীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ পার্টির বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে এঁদের বিষয়ে লেখালেখি করেছিলেন, পার্টির কর্মী-শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁরা সেভাবেই নীরব ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

বোম্বে প্রদর্শনীর পরেই সুভো ঠাকুর গ্রুপ থেকে সরে আসেন। ছেচল্লিশের জানুয়ারিতে কলকাতায় গ্রুপের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী হয়। তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী হয় সাতচল্লিশের মে মাসে এবং প্রদর্শনীর অব্যবহিত আগে অবনী সেনকে সদস্য করা হয়। উনপঞ্চাশের জানুয়ারিতে গ্রুপের চতুর্থ বার্ষিক প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশে জুনের নেশন পত্রিকায় লেখা হয়: পিকাসো, মাতিস, ভ্যান গঘ, পিজারো এবং য়ুরোপের অন্যান্য আধুনিকতাবাদীদের প্রবণতা ও করণকৌশলই এই গ্রুপের প্রেরণার উৎস। এক দশকেরও বেশি আগে একদল ইংরাজ আধুনিকতাবাদী লন্ডন গ্রুপ গঠন করেছিলেন। স্থানীয় ভারতীয় অনুকারকেরা স্পষ্টতই সেই পথে কিংবা সেই আদর্শে ক্যালকাটা গ্রুপ নামের লেবেল এঁটেছেন।

উনপঞ্চাশের অগস্টে পাঁচ বছরের কাজের পূর্বাপর প্রদর্শনী হয়। বিষ্ণু দে এই প্রদর্শনীতে শিল্পীদের মধ্যে দেখেছিলেন সাম্যবাদী আগ্রহ আর তাঁদের কাজে দৈনন্দিন জীবনের ছাপ। তাঁর মনে হয়েছিল 'যামিনী রায়ের কীর্তির পরে এঁরা এবং এঁদের সহকর্মীরা ভারতশিল্পের আশা'। বাহান্নতে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বইতে এই আলোচনা গ্রথিত হয়েছিল। ভারতশিল্পের ভবিষ্যৎ এই শিল্পীরা কতখানি বহন করেছেন, তা বিবেচনার ভার সময়ের উপর।

পঞ্চাশে ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপের যৌথ প্রদর্শনী হয়। বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ থেকে ছবি পাঠান মকবুল ফিদা হুসেন, এ. এইচ. গাড়ে, এ. এ. রাইবা, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, এস. এইচ. রেজা, শ্রীকান্ত বাকরে এবং কে. এইচ. আরা। ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নীরদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, কমলা দাশগুপ্ত, প্রদোষ দাশগুপ্ত, নতুন সদস্য গোবর্ধন আশ, রথীন মিত্র ও অতিথি সদস্য রামকিঙ্কর। এই প্রদর্শনীর অব্যবহিত আগে গোপাল ঘোষ ও রথীন মৈত্র গ্রুপ

ছেড়ে দেন। তাঁরা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের কর্মপরিষদে ও কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে অধ্যাপকপদে যোগ দেন। গোপাল ঘোষ ও রথীন মৈত্র গ্রুপ ছেড়ে দেওয়ায় শূন্যস্থান পূরণ করা হয় গোবর্ধন আশ ও রথীন মিত্রকে সদস্য করে।

বিষ্ণু দে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সাম্যবাদী আগ্রহ ও তাঁদের কাজে দৈনন্দিন জীবনের ছাপ দেখলেও এই প্রদর্শনীতে প্রদোষ-কৃত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রতিকৃতি ছিল। তখন নলিনীরঞ্জন সরকারের জীবিতাবস্থায় হিন্দুস্থান ইনসিয়োরেন্স্ বিল্ডিং-এ বসাবার জন্য নলিনীরঞ্জনের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি প্রদোষ গড়ছিলেন। এই পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিরই আবক্ষ-অংশ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল।

এর অব্যবহিত পরে প্রদোষ বরোদা চলে গেলে দুবছর গ্রুপ নিষ্ক্রিয় থাকে। দু-বছর বাদে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে সুনীলমাধব সেন ও হেমন্ত মিশ্রকে গ্রুপের সদস্য হিসাবে নেন ও গ্রুপের শেষ প্রদর্শনী হয় দিল্লিতে উনিশ'শ তিপ্পান্ন সালে। গ্রুপের সদস্য নেওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সম্ভবত নেওয়া হতো না। সচিব প্রদোষ নিজেই সদস্য মনোনয়ন করতেন। এ কারণেই গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য পরিতোষ সেন পরবর্তীকালে কবিপত্রে লেখা নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে প্রদোষ 'গ্রুপকে জীইয়ে রাখতে নতুন সদস্য নিলেন। সুনীলমাধব সেন, রথীন মিত্র এবং হেমন্ত মিশ্র ইত্যাদিরা এলেন। আমাদের মননশীলতা ও মানসিকতার সঙ্গে এদের তেমন যোগ-সূত্র ছিল না'।

ক্যালকাটা গ্রুপে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই শিল্পকর্মে 'দৈনন্দিন জীবনের ছাপ' ক্যালকাটা গ্রুপে যোগদানের আগেই দেখা গিয়েছিল; তার জন্যে তাদের গ্রুপে যোগ দেওয়ার সময় অবধি অপেক্ষা করতে হয়নি।

সুভো ঠাকুরের ছবির জ্যামিতিক আঙ্গিকে এ কালের যান্ত্রিক জীবনের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। আধুনিক কলকারখানা, চাষী, শ্রমিক তাঁর ছবির বিষয় হয়ে উঠেছিল। রথীন মৈত্র লোকশিল্পের সরলীকরণ তাঁর রূপের সরলীকরণে ব্যবহার করেছিলেন, যার মধ্যে অনেকে যামিনী রায়ের প্রভাব দেখেছিলেন। একই উৎস থেকে রথ... ও যামিনী প্রেরণা পেলেও দুজনেরই উৎস-ব্যবহারের প্রক্রিয়া যে একেবারে আলাদা ছিল তা তাঁদের ছবি পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যায়। যামিনীর ঝোঁক ছিল অলঙ্করণের দিকে, তিনি তাঁর অলঙ্করণের নিয়মে রূপগুলিকে ঢালাই করেছিলেন। রথীনের ঝোঁক ছিল বিপরীতধর্মী। রূপের নিজস্ব প্রাণছন্দের অনুসরণেই তিনি তাঁর রূপগুলিকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। গ্রামবাংলার জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং সেই পরিচয়ের ভিত্তিই ছিল তাঁর ছবির বিষয়। লোকায়ত বিষয়কে তিনি লোকশিল্পের সাযুজ্য ছাড়া ভাবতে পারেননি। লোকায়ত জীবনের শাশ্বতরূপই তাঁর ছবিতে ব্যক্ত হয়েছিল। গোপাল ঘোষের ছবির রৈখিক প্রবণতা সাইকেলে দেশভ্রমণের সময়েই দেখা গিয়েছিল। উনিশ'শ ছত্রিশে অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি জনজীবনের

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে সাইকেলে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং গ্রুপে যোগ দেবার আগেই তিনি দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছিলেন। বরং গ্রুপে যোগ দেবার পর জন-জীবনের ছবি থেকে তিনি রোমান্টিক দৃশ্যচিত্রের জগতে চলে আসেন। অবনী সেন ও গোবর্ধন আশ গ্রুপে যোগ দেবার আগেই প্রত্যক্ষ জনজীবনের ছবি এঁকেছিলেন। সুতরাং এঁরা গ্রুপে যোগ দেবার পর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছিলেন, এমন কথা মনে করার কারণ নেই। এঁদের মধ্যে প্রদোষ দাশগুপ্ত লখনউ ও মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে শিক্ষা শেষ করে বৃত্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যান ও সেখানে লণ্ডন গ্রুপের আঙ্গিকবাদী দর্শনে প্রভাবিত হলেও কলকাতায় ফিরে এসে অজুরায় প্রতিকৃতি গড়ার জন্য স্টুডিয়ো খোলেন। গ্রুপ সদস্যদের কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনের ও তাঁদের চার-পাশের আশু পরিস্থিতির ছাপ পড়লেও তাঁদের প্রদর্শিত ছবি ও ভাস্কর্যে প্রতিকৃতি, কাল্পনিক বিষয় ইত্যাদিও প্রাধান্য পেয়েছিল। বাংলা ঘরানাকে কল্পিত প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে তাঁরা য়ুরোপীয় আদর্শে আঙ্গিকবাদী পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে শিল্পের মুক্তির সন্ধান করেছিলেন। তাঁদের অন্যতম পরামর্শদাতা বিষ্ণু দে তাঁদের এই মুক্তিদাতার ভূমিকায় যামিনী রায়কে খাড়া করে আঙ্গিকেই যে শিল্পের মুক্তি দেখেছিলেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্যালকাটা গ্রুপের আগে এ দেশে নানা গোষ্ঠী গঠিত হলেও এই গোষ্ঠীই প্রথম সমবেতভাবে য়ুরোপীয় আঙ্গিকবাদের অনুসরণে সক্রিয় পন্থায় ভারতীয় শিল্পকলায় 'আধুনিকতা' সঞ্চার করতে তৎপর হয়েছিল। শিল্পী হিসাবে তাঁরাও গগনেন্দ্রনাথকে ধর্তব্য জ্ঞান করেননি। রামকিঙ্করের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। অবনীন্দ্র-নাথকে মনে করেছিলেন সেকেলে। নন্দলাল ছিলেন তাঁদের কাছে রক্ষণশীল পুনরু-জ্জীবনবাদী। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে তাঁরা উচ্চবাচ্য করেননি। অমৃতা শেরগিলের কোন অস্তিত্বই তাঁদের কাছে ছিল না। য়ুরোপীয় আধুনিকতার জোয়ারকে তাঁরা আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা মনে করেছিলেন। এমনকি জার্মানির প্রগতিশীল শিল্পীদের নামও তাঁরা জানতেন কিনা সন্দেহ। আর, ভারতে একমাত্র যামিনীই ছিলেন তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী।

কেবল তাই নয়, ভারতীয় পরম্পরা অস্বীকারের উন্মাদনায় এবং পাশ্চাত্য আঙ্গিক-বাদী শিল্প অনুসরণের মোহে এই গ্রুপের সদস্যরা পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কেও অজ্ঞতা দেখিয়ে নানা ধরনের হাস্যকর মন্তব্য করতে শুরু করেছিলেন। তিপ্পান্নর দিল্লী প্রদর্শনীর হ্যান্ডবুকে নীরদ মজুমদার বলেছিলেন যে ভারতশিল্পের বড়স হচ্ছে শিল্পের বড় শত্রু এবং তাঁর কাছে রূপগতভাবে একটি জড় কলাস ও একটি জীবন্ত মানুষের মুখের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আবার উনিশ'শ একাশির ললিতকলা কন্টেমপোর্যারির একত্রিশতম সংখ্যায় পরবর্তীকালে প্রদোষ দাশগুপ্ত সাফাই গেয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা নাকি বড়সকে অগ্রাহ্য করেননি। বস্তুতপক্ষে আবোলতাবোল

কথা বলার সময় নীরদ ভুলেই গিয়েছিলেন যে রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ কেবল ভারতীয় শিল্পের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, এইগুলি বিশ্বজোড়া শিল্পকলার বর্ণপরিচয়। সম্ভবত নতুন কিছু চটকদার কথা বলার মোহে তাঁরা যুক্তিবাদকেই অগ্রাহ্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রদোষ তাঁর আত্মজীবনী স্মৃতিকথা-শিল্পকথায় বলেছেন, নীরদ মজুমদারের নাকি মাথার ঠিক ছিল না। পরিতোষ সেন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, গ্রুপে পরে আসা নূতন সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের মানসিকতার মিল ছিল না এবং তাঁর উক্তিতে এমনও ইঙ্গিত আছে যে, এই সব নতুন সদস্য নেবার ব্যাপারে প্রদোষই ছিলেন সর্বেসর্বা। কেননা, সর্বসম্মতভাবে নতুন সদস্য নিলে গ্রুপের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এমন মন্তব্য নিশ্চয়ই করতেন না।

গ্রুপ ফরাসি আঙ্গিকবাদের অনুসরণে ছবি আঁকাকে যেমন আধুনিকতা ও শিল্পের মুক্তি মনে করেছিল তেমনি কর্মপন্থার দিক থেকে ফরাসি আদর্শে সাঁলো বা প্রদর্শনী করাকেই উচিৎ মনে করেছিল। অনবরত ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়েই গ্রুপ প্রায় এক দশক চলেছিল। একদিকে অ্যাকাডেমিক আর্ট ও অন্যদিকে বাংলা ঘরানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা তুললেও দু'জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য রথীন মৈত্র ও গোপাল ঘোষ অ্যাকাডেমিক রক্ষণশীল শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে যোগ দিলেন ও অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের পরিচালন পরিষদে অংশ নিলেন। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তৎকালীন কর্মকর্তাদের মানসিকতা যে আধুনিক শিল্পচর্চার অনুকূলে ছিল তা নয়। রথীন ও গোপাল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের শিল্প-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে যে সহায়তা করেছিলেন, এমনকি তাও সত্যি নয়।

উনিশ'শ প'য়তাল্লিশে গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদর্শনী বোম্বের আঙ্গিকবাদী তরুণ শিল্পীদের একটি অনুরূপ গ্রুপ গড়ার প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁরা বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ গড়েছিলেন — ক্রমে এদেশে অনুরূপ আরো গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। কলকাতার ক্যালকাটা গ্রুপ ও বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপের যৌথ প্রদর্শনীর লক্ষ্য ছিল সর্বভারতীয় একটি মোর্চা তৈরি করা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি।

একদিকে অ্যাকাডেমিক ধরনধারণ ও অন্যদিকে বাংলা ঘরানার অতীতচারিতার বিরোধিতা করলেও তাঁরা অ্যাকাডেমিক ধরনধারণকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারেননি। বাংলা ঘরানার মতো তাঁরা ডিভাইন ইমেজেস বা দৈবী মাহাত্ম্যদ্যোতক প্রতিমাকে প্রশ্রয় না দেওয়ার কথা বারবার বললেও তাঁরা যিশুর ডিভাইন ইমেজকে রূপকার্থে ব্যবহার করেছিলেন। রুস্ ফিশার তিস্পান্নর দীপাবলী সংখ্যা মার্গ পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধে মানবতাবাদকেই গ্রুপের উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। নগ্ন সবুজ নারীর ছবি, ঔপনিবেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আবক্ষ মূর্তি, নলিনীরঞ্জন

সরকারের আবদ্ধ প্রতিকৃতি, সমকামী নারীর ছবি, নগ্ন পুরুষদের স্নানদৃশ্যের ছবি, মহাজাগতিক বিশ্বের ছবি, স্বপ্নপুরীর ছবি, মদ্যপ তাসখেলুড়েদের বিনোদনের ছবি ও ভাস্কর্যে কোন্ মানবতাবাদ প্রতিফলিত হয়েছিল তা অবশ্য বোঝা যায় না।

কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রপত্রিকা, পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ এই গ্রুপকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে মার্কসবাদের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বকেই উপেক্ষা করেছিলেন। 'ফরাসি দেশের নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার' আদর্শে আঙ্গিকবাদী চর্চায় ও মানুষের অর্জিত পরম্পরা বর্জনে কেন তাঁরা প্রগতি খুঁজে পেয়েছিলেন, এই প্রশ্ন তোলার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

গণনাট্য সঙ্ঘ কেবল নাট্য আন্দোলনই নয়, ব্যাপক সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। পঁয়তাল্লিশে এই গ্রুপের প্রদর্শনী বোম্বেতে নিয়ে গিয়ে ও পিপল্'স ওয়র-এ এই গ্রুপকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে সম্ভবত গণনাট্য সঙ্ঘ এই গ্রুপের মধ্যে সঙ্ঘের কর্মপন্থার প্রসারণ দেখতে চেয়েছিল। লক্ষণীয় যে, পার্টির কর্মী-শিল্পীদের এই গ্রুপ আহ্বান জানায়নি, এমনকি তৎকালীন যে সব শিল্পী সমাজ-সচেতন দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছিলেন, তাঁদেরও গ্রুপে সম্মিলিত করার চেষ্টা করেনি। পরবর্তী কালে তেরো'শ একাশি সালে শিল্প-সাহিত্য পত্রিকায় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক সুধী প্রধান স্বীকার করেছিলেন যে, এই গ্রুপের অধিকাংশ সদস্য বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনাকেই প্রকাশ করেছিলেন। 'বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরোধী, পৃথিবীর চিন্তাজগতে তার প্রতিক্রিয়া এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার সুযোগ গ্রহণ এবং এদেশে তার প্রতিফলন এই পরিবর্তনের কারণ'। অবশ্য সুধী প্রধান দীর্ঘকাল বাদে এই গ্রুপের সদস্যদের চিন্তাভাবনায় ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের ব্যাপার দেখলেও এই কায়েমি স্বার্থের রূপ এই গ্রুপ গঠনের গোড়াতেই তথাকথিত প্রগতিশীলতার চিক্কণলেপ ভেদ করে বেরিয়ে পড়েছিল। তা দেখতে না পারা আদৌ দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল না।

কর্মপন্থার দিক থেকেও এই গ্রুপ কায়েমি ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করেছিল। কায়েমি ব্যবস্থায় শিল্পীরা গ্যালারির জন্য শিল্পরচনা করেন, প্রদর্শকক্ষে বাছাই করা লোকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং একদল পেশাদার সমালোচক লেখালিখির ভিতর দিয়ে শিল্পীদের বিক্রয়যোগ্যতা তৈরি করেন। এই তথাকথিত প্রগতিশীল শিল্পীরা সাধারণ মানুষের কাছে শিল্প পৌঁছে দেওয়ার কিংবা জনমানসে শিল্পচেতনা বিস্তারের কোন চেষ্টা না করে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাঁলো-র আদর্শকেই যে গ্রহণীয় মনে করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই গ্রুপে শিল্পীরা কোনো আদর্শগত ভিত্তিতে সমবেত হননি। তাঁদের তাৎকালিক মতামতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তাঁরা পশ্চিম আঙ্গিকবাদী শিল্পচর্চার একটি মঞ্চ গড়তেই একত্রিত হয়েছিলেন। পরপর প্রদর্শনীতে একই শিল্পী

যে-ভাবে বিচিত্র, পরস্পরবিরোধী রীতিতে রচিত শিল্পকর্ম উপস্থিত করতেন, তার মধ্যে তাঁদের বিভ্রান্তি ও অপরিপক্কতাই ফুটে উঠত। আদর্শগত মজবুত ভিত না থাকায় প্রথম প্রদর্শনীর পর থেকে গ্রুপে যে ভাঙন ধরে সেই ভাঙন বারবার এই গ্রুপের দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে তুলছিল। পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে প্রদোষ দাশগুপ্ত গ্রুপের গঠনে আদর্শবাদ খাড়া করবার চেষ্টা করলেও পরিতোষ সেন বলেছিলেন যে, তাঁদের কোন বস্তুবাদী লক্ষ্য ছিল না; নীরদ মজুমদার বলেছিলেন যে, কোন বাহ্যিক কার্যকারণ বা বাস্তবের প্রতিফলন এই গ্রুপের গঠনে কার্যকর ছিল না এবং তাঁদের লক্ষ্যই ছিল 'আধুনিক' পাশ্চাত্য আঙ্গিকের অনুসরণে শিল্পচর্চা করা।

সুভো ঠাকুর গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আর ছবি আঁকেননি। রথীন মৈত্র গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসার পর খুব কমই ছবি এঁকেছেন ও তাঁর শেষদিকের ছবিতে ছিল পরাবাস্তববাদের দিকে ঝোঁক। গোপাল ঘোষের অব্যাহত তুলিতে এদেশের নিসর্গ তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল এবং শৈলীর দিক থেকে তাঁর ছবি এদেশের পরম্পরাকেই সমৃদ্ধ করেছিল। নীরদ মজুমদার শেষপর্যন্ত ফরাসি ঢঙে ভারতীয় তন্ত্রোক্ত দেবীবর্ণনাকেই সারাৎসার মনে করেছিলেন। বিদেশীদের কাছে এদেশী তথাকথিত তন্ত্র আর্টের রমরমার বাজারে তাঁর ছবি চটকদারিত্বে কারো কারো কাছে গ্রহণীয় মনে হয়েছিল। প্রদোষ দাশগুপ্ত একদিকে যেমন নলিনীরঞ্জন সরকার আর সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে খদ্দেরের রুচি মিটিয়েছেন, তেমনি আধুনিকতা থেকে যে তিনি দূরে নন তা বোঝাতে মার্কিন শিল্পী হিবলহেম ডিকুনিং-এর নকলে হাতের চাপে তাৎক্ষণিক মূর্তি গড়েছেন। কমলা দাশগুপ্ত আর মূর্তি গড়েছেন কি না জানা নেই। হেমন্ত মিশ্রের ছবিতেও পরাবাস্তববাদী রোম্যান্টিসিজম প্রাধান্য পেয়েছিল। অবনী সেনের শেষদিকের ছবিতে লোকশিল্পের প্রভাব নতুন রূপ পেতে চলেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সেই পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গোবর্ধন আশ নিরন্তর রূপ ও রীতির অনুসন্ধানে এখনো তৎপর। পরিতোষ সেন সমাজ-রাজনীতি-বস্তুর ভাবনাকে শিল্পে রূপ দিতে বর্তমানেও সমান আগ্রহী। প্রাণকৃষ্ণ পাল লোকশিল্পের রূপ থেকে প্রেরণা নিয়ে যেভাবে রূপ সন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন তা সার্থকতার চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছেও থেমে যায়। তাঁর মতো একজন চিত্রকর যিনি লোকশিল্প, লোকায়ত জীবন, এদেশী মানসিকতা, দেশজ রঙ ইত্যাদির মর্মে পৌঁছেছিলেন, তাঁর তুলি কেন অকস্মাৎ থেমে গিয়েছিল তার কারণ জানা নেই। গ্রুপের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এই চিত্রকর এদেশকে অনেককিছুই দিতে পারতেন। রথীন মিত্র কেন ছবি আঁকা ছেড়ে কলকাতার পুরনো ঘরবাড়ির নিষ্প্রাণ রেখাচিত্র আঁকাকে সিদ্ধিজ্ঞান করলেন, তার কারণ জানা যায় না। আইনব্যবসায়ী সুনীলমাধব সেন কোনদিনই ছবিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

গ্রুপে কয়েকজন সম্ভাবনাময় শিল্পীর সমাবেশ অবশ্যই ঘটেছিল যাঁরা চটকদারির

ব্যাপারী ছিলেন না, যদিও অনেকেই আবার বাণিজ্যব্যাপারে দক্ষ ছিলেন। শিল্পের জগতে একটি সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে নেওয়ার জন্যই গ্রুপ তৈরি হয়েছিল এবং পরে এর গায়ে প্রগতিশীলতার ছাপ লাগিয়ে বাজারচলতি করার চেষ্টা হয়েছিল।

চল্লিশের খতিয়ান এবং প্রাপ্তির কথা জানা এ কারণে প্রয়োজন যে মানবজাতির পরিপূর্ণ বিকাশে শিল্পকলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবস্থাগুলি কোন না কোনভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে, তার ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলন ফেলে এবং সেই প্রভাব ও প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে বোঝা যায় যে শিল্পী কতখানি কালসচেতনতার পরিচয় দিচ্ছেন। বাস্তব থেকে সত্তা বিচ্ছিন্ন নয় এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপও পারিপার্শ্বিকতার প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শিল্প সমাজ থেকে উঠে আসা সময়েরই প্রতিচ্ছবি। চল্লিশের বিশেষ অবস্থা এ দেশের শিল্পে কী প্রভাব ফেলেছিল, শিল্পীরা কীভাবে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে সাড়া দিয়েছিলেন, তার হিসাব নিশ্চয়ই নেওয়া দরকার। এবং এই খতিয়ানে এযাবৎ কেবল উঠতি শিল্পী-দের সদর্থক ভূমিকার কথাই বলা হয়েছে।

চল্লিশে অবশ্যই নতুন প্রজন্মের অনেক শিল্পী একসঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন, এ কথা যেমন ঠিক, সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিল্পীদের অনেকেই এই সময় নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছিলেন। দীর্ঘকালের লালিত সংস্কার হয়তো তাঁরা সর্বাংশে ত্যাগ করে নিজেদের নতুনভাবে গড়ে নিতে পারেননি এবং তা সম্ভবও ছিল না, কিন্তু তাঁরা যেভাবে আবার পৃথিবীকে নূতন করে দেখার প্রয়াস করেছিলেন, তা মেকি ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের ঐ সময়ের অন্নদামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের ছবির রূপকার্থ এবং তাঁর কুটুম্‌কাটামে সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতিফলন পড়েছিল। তাঁর এই শেষ সৃষ্টিগুলিকে সময়ের সঙ্গে যুক্ত করে নতুনভাবে চিনে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। নন্দলালের রূপকধর্মী ভিক্ষুক শিব ও অন্নপূর্ণার ছবিতে সুফলা বাংলায় খাদ্যের অভাবের মতো অকল্পনীয় বাস্তবটি উহ্য থাকেনি। এছাড়া উনিশ'শ সাঁইত্রিশে হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য ছবি আঁকার পর থেকে তাঁর ছবিতে জনজীবনের প্রতি নিবিড় আগ্রহ নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'যখন রাত জাগে' ও অন্যান্য দুর্ভিক্ষের ছবিতে বাংলার মন্বন্তরে বঞ্চনার মর্মান্তিকতা ও অসহায়ভাবে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপার প্রকাশ পেয়ে-ছিল। অতুল বসু অভিজাত মানুষের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে হিসাবে বিখ্যাত হলেও মন্বন্তর তাঁকেও গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছবি যেমন তিনি এঁকেছিলেন, তেমনি এঁকেছিলেন কল্কি অবতারের ছবি, গ্রামের গভীর বাঁশঝাড়ের মধ্যের মাটিতে চারপাশের বুভুক্ষা বঞ্চনা ও হাহাকারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে নতুন প্রজন্মের মানবক। এই ভাবেই বদলে যাচ্ছিলেন রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল আবেদিন, গোপাল ঘোষ ও আরো অনেকে, যাঁরা তখন সবে তারুণ্যের সীমা ছাড়াচ্ছেন। সময়কে

আত্মস্থ করার লক্ষণগুলি তাঁদের শিল্পকর্মে সদর্থকভাবেই প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তা প্রত্যক্ষণসঞ্জাত প্রতিক্রিয়া থেকেই ঘটছিল, কোন বাহ্যিক আন্দোলনের দ্বারা কিংবা আঙ্গিকের চটকদারির মোহে ঘটেনি। এর দরুণ তাঁরা কোন প্রচারেরও অপেক্ষা করেননি। তাঁদের এই বাস্তবনিষ্ঠা গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে।

একই সঙ্গে রাজনীতি সচেতন আরেক দল নতুন শিল্পীর আবির্ভাবও এই সময়ের অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। মণি রায়, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সোমনাথ হোড়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সূর্য রায়, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখের ছবিতে সময়ের হৃদস্পন্দন যেভাবে ধরা পড়েছিল তা ছিল তাঁদের বাস্তবনিষ্ঠারই পরিচায়ক। তাঁদের শিল্পকর্মে শিল্প ও জীবনের নিবিড় সম্পর্কের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শৈলীর দিক থেকে এক অখন্ড বলিষ্ঠতা তাঁরা দেখিয়েছিলেন। ভারতীয় পরম্পরার রেখা-নির্ভরতাকে তাঁরা ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং মাধ্যম ব্যবহারের বৈচিত্র্যে তাঁরা আমাদের শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। চল্লিশের এই পরম প্রাপ্তি আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি। রাজনীতির বাইরে থেকেও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রথীন মৈত্র, নীরদ মজুমদার ও গোবর্ধন আশ। তাঁদের তৎকালীন ছবিতে সামাজিক বাস্তবতার ছাপ দেখা গিয়েছিল। যদিও নীরদ মজুমদার ক্যালকাটা গ্রুপে যোগদানের পর আঙ্গিকবাদী শিল্পচর্চার দিকে ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু তার আগে তিনি দুর্ভিক্ষ, বঞ্চনা ইত্যাদির যে অভিব্যক্তি ছবিতে প্রকাশ করেছিলেন তার মূল্য ছিল অপরিসীম। এঁদের সকলের কাজে শিল্পের নতুন চেহারার সঙ্গে যেমন আমাদের পরিচয় ঘটেছিল, তেমনি আমরা নতুন করে বুঝে নিতে পেরেছিলাম শিল্পের উদ্দেশ্য কী, সমাজে শিল্পের ভূমিকা কী এবং ঐতিহাসিক যুগে শিল্পে কী কী লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ, দেবব্রত, সূর্য তাঁদের সেই নিষ্ঠা থেকে পরেও বিচ্যুত হননি। বিচ্যুত হননি রামকিঙ্কর, গোবর্ধন, সুধীর ও আরো অনেকে

কিন্তু সর্বাধিক প্রচারিত ক্যালকাটা গ্রুপের উদ্দেশ্য ও পরিণাম আমাদের শিল্পকে কোন দিশা দিতে পেরেছিল কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। স্পষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব, আরোপিত প্রগতিশীলতা, আঙ্গিকবাদকে প্রগতি মনে করা এবং পরম্পরবিরোধী মন্তব্য থেকে এই গ্রুপের যে ছবি উঠে আসে, তা আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। ইদানীং মিথ্ বা অতিকথা দিয়ে এই গ্রুপকে গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টাও আমাদের কাছে বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়।

প্রত্যেকটি কালেই সময়কে ঠিকমতো বুঝে নেবার দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। চল্লিশেও সেই দ্বন্দ্ব ছিল। বাস্তবনিষ্ঠা শিল্পে যদি প্রকাশ পায় তবে তা আপনিই নজরে পড়ে। ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে শিল্পে অবতীর্ণ হলে বুঝতে হয় যে তার পিছনে চটকদারির মোহ অনেকখানি কাজ করছে। এই চটকদারির মোহই আধুনিক শিল্পকে দিশাহীন করে তুলেছে। রামকিঙ্কর, চিত্তপ্রসাদ প্রমুখের কথায় ও কাজে বৈপরীত্য ছিল না। মুখে

'কিছু প্রগতির কথা আওড়ে পুঁজিপতির ও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিনিধির মূর্তি গড়ে প্রদর্শনীতে দেখানো হলে কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য চাপা পড়ে না। তখনই প্রয়োজন হয় মেকি আদর্শবাদ জাহির করার। উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও পরিণামের স্তর-গুলি থেকেই সত্যকে চিনে নেওয়া যায়। ইতিহাসের দূরত্বে তা আরো স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই স্পষ্টতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি চল্লিশের শিল্পচর্চায় যেমন সদর্থক দিক ছিল, তেমনি বিভ্রান্তিও ছিল। এই বিভ্রান্তির পাশে সদর্থক দিকগুলিই শেষ-পর্যন্ত অন্ধকারের পাশে আলোর উজ্জ্বলতার মতো প্রতিভাত হয়ে ওঠে। □

মাঝে মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রসারের থেকে
মানুষের চোখে-পড়া না-পড়া সে কোন স্বভাবের
সুর এসে মানবের প্রাণে
কোন এক মানে পেতে চায়:
যে-পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।
চারিদিকে কলকাতা টোকিয়ো দিল্লী মস্কো অতলান্তিকের কলরব,
সরবরাহের ভোর,
অনুপম ভোরাইয়ের গান;
অগণন মানুষের সময় ও রক্তের যোগান
ভাঙে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমি চাঁদ
রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক;
প্রীতি নেই,—পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের
প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত করে তোলে মোহিনী নরক।
আমাদের এ-পৃথিবী যতদূর উন্নত হয়েছে
ততদূর মানুষের বিবেক সফল।
সে-চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিন্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।
—জীবনানন্দ দাশ, বেলা অবেলা কালবেলা।



# ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

নির্বাচিত রসগ্রাহকের নিষ্ক্রিয় অবলোকনের যাবতীয় সীমাশুদ্ধি ভেঙে
সর্বাধিক মানুষের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় কার্যকরী অংশগ্রহণের সজীব তাৎপর্যে
ছবি আজ মুখ্যত গণমানসিক, ছাপাছবির প্রসারপ্রযুক্তির যোগ্যতর ব্যবহার থেকে
বিস্তৃত দেওয়ালছবিতে ব্যবহারিক ভাষাশৈলীর মনোযোগী চর্চা ও প্রয়োগে,
জাগতিক সমূহ বস্তু-উপাদানের রূপান্তরিত দৃশ্যানুষ্ঠান থেকে যৌথ চেতনাক্রিয়ার
লুপ্ত সামাজিক ভূমির পুনরাবিষ্কারে ছবি আজ উদ্দেশ্যত রাজনৈতিক।
লিখেছেন শার্ল বোদল্যার, ক্যোথে কোলভিৎস, গেয়র্গ গ্রোস, পিটার সেল্‌জ,
পল হোগার্থ, ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, দাভিদ আলফ্যেরো সিক্যেরাস,
ডেভিড ক্যুনজ্‌লে, ডেভিড শাপিরো, লু স্যুন, এড্রিয়েন হেনরি, মাও ৎসে-তুঙ,
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রসাদ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়,
শোভন সোম ও আরো অনেকে।





দীপায়নের বই